উৎসর্গ

যাদের সাথে আমার যৌবনের
বেশকিছু উদ্দীপনাময় বছর কাটিয়েছিলাম
সেইসব আমেরিকান বন্ধু—
লো ও বিল ওয়েক, ক্রিডা-বীড, মন্‌রো মেরিক এবং
প্রয়াত ডিক সেসিলের উদ্দেশে

সূচীপত্র

১

সাম্প্রদায়িকতাবাদ কী ?

[এক]

খুব সহজ কথায়, সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল এমন এক বিশ্বাস, যে একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল সেই বিশ্বাস, যা অনুযায়ী ভারতে হিন্দু, মুসলিম, খ্রীশ্চান ও শিখরা বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, যারা স্বাধীনভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত এবং সংহত। এই বিশ্বাস অনুযায়ী একটি ধর্মের অনুবর্তীরা শুধুমাত্র এক ধর্মীয় স্বার্থের অংশীদার নন, বরং তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থ, অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থও অভিন্ন। এই বিশ্বাস অনুযায়ী ভারতীয়রা অনিবার্যভাবে ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থকে দেখে ধর্মীয় গোষ্ঠীর চশমা এঁটে, এবং তাঁদের এক এক রকম ধর্মীভিত্তিক পরিচিতির দরুন থাকবে ব্যবধান, অর্থাৎ ধর্মকে তাঁদের রাজনৈতিক সামাজিক পরিচালনার ভিত্তি হতে হবে, তাঁদের মৌলিক সামাজিক সম্পর্কসমূহের নির্ণায়ক হতে হবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী মতাদর্শ অনুযায়ী ভারতীয়দের মধ্যে উপরি উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে এইরকম স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা সত্তা বা একক হিসেবে কাজ করার এবং সেই অস্তিত্ব বজায় রাখার অন্তর্নিহিত প্রবণতা রয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলি নাকি স্বতন্ত্র "স্বাভাবিক সম্পূর্ণতা' বা সমধর্মী ও ঘনাপনদ্ধ সম্প্রদায়—বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এই রকম প্রতিটি ধর্মীয় "সম্প্রদায়ের' নাকি নিজস্ব, স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে; সাম্প্রদায়িক পরিচিতি ও বিভাজন নাকি চিরকাল ভারতীয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছিল, যদিও আধুনিক যুগে হয়ত তারা নতুন বল পেয়েছে; ধর্মীয় "সম্প্রদায়" নাকি ভারতে আধুনিক রাজনীতি সংগঠনের ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে এবং ভারতীয় জনগণ কিভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গসমূহকে

দেখেন তারও ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। একজন "প্রকৃত" হিন্দু বা মুসলিম নাকি কেবল সম্প্রদায়ের দলের অংশীদার হতে পারেন এবং রাজনৈতিকভাবে অন্য হিন্দু বা মুসলিমের সঙ্গে মতভেদ পোষণ করতে পারবেন না ; সমস্ত হিন্দু বা মুসলিমকে নাকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একই রকম চিন্তা করতে হবে কারণ তাঁরা হিন্দু বা মুসলিম ; অর্থাৎ, বস্তুত, প্রতিটি ধর্মীয় "সম্প্রদায়" নাকি একটি সমরূপ সত্তা বা এমন কি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট "সমাজ" ; এবং ভারতীয় জাতি বলে কিছু ছিল না, থাকতে পারে না—ভারত চিরকাল নিছকই একটি "ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের সংঘ" ছিল, আছে, এবং থাকবে।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অনুমান করে নেয় যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে ভারতীয় জনগণের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক প্রভেদ নির্দেশের ভিত্তি হল উল্লিখিত ধরণের ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ। ভারতীয় জনগণ তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে ও তাঁদের সমবেত বা গোষ্ঠীগত বা অ-ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করতে এবং সামাজিকভাবে কাজ করতে পারেন কেবল ধর্ম-ভিত্তিক সম্প্রদায়সমূহের সদস্য হিসেবে। তাঁরা সবসময়ে চিন্তা করেন, কোনো কিছু কামনা করেন, অনুভব করেন বা কাজ করেন ঐ রকম সমরূপ সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে, যাদের স্বার্থ, দিশা, জীবনধারা, ইত্যাদি সবই অভিন্ন। তাঁরা অন্য কোনোভাবে কিছু ভাবেন না, কামনা করেন না, অনুভব করেন না, বা কোনো কাজ করেন না। তাঁরা ঐ সম্প্রদায়গুলির সদস্য হিসেবে সমস্ত কিছু স্থির করেন এবং সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। প্রতি সম্প্রদায়ের নিজস্ব নেতা থাকে। যারা জাতীয়, আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত নেতা হওয়ার কথা বলে, তারা আসলে ছদ্মবেশী ; মুখোশের আড়ালে এরাও কেবল স্ব স্ব সম্প্রদায়েরই নেতা। কিছু লেখক আরো এগিয়ে গিয়ে হিন্দু মন, মুসলিম মন, ইত্যাদির অস্তিত্বের কথা বলেন।

সুতরাং, সাম্প্রদায়িকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দাবী করে যে ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মীয় প্রভেদ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা মৌলিক প্রভেদ বা ফাটল বা নির্দেশ চিহ্ন। এই প্রভেদ অন্য সমস্ত প্রভেদের ঊর্ধ্বে। অন্যদিকে, অন্য সমস্ত সামাজিক পরিচিতি বা বৈশিষ্ট্যকে হয় অস্বীকার করা হয়, অথবা, তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করলেও প্রয়োগক্ষেত্রে হয় নাকচ করে দেওয়া অথবা ধর্মীয় সত্তার অধীনস্থ রাখা হয়। জাতি, জাতিত্ব, ভাষাগত গোষ্ঠী বা শ্রেণী নয়, বরং ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই ভারতীয় সামাজিক পরিবেশের মৌলিক সামাজিক একক রূপে দেখা হয়। একই কারণে, যেমন সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতিতে, তেমন সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইতিহাসচর্চায়, জোর দেওয়া হয় কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দিকটার উপর, আর অন্য সমস্ত প্রসঙ্গ—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, এবং এমনকি নিছকই ধর্মীয়—অগ্রাহ্য করা হয়, গুলিয়ে দেওয়া হয়, বা এমন কি চেপে যাওয়া হয়।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের অন্তর্নিহিত দ্বিতীয় একটি ধারণা হল যে হিন্দু, মুসলিম,

খ্রীশ্চান ও শিখদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বিসদৃশ এবং বিকিরণশীল। খুব দেখার মত বিষয় হল, ধর্মের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থের ঐক্য এবং উপরে উল্লিখিত বিসদৃশ এবং বিকিরণশীল স্বার্থের তত্ত্ব, কোনটাই, কখনোই, তথ্য বা যুক্তি দিয়ে কোনো ক্ষেত্রে প্রমাণ করার চেষ্টা হয় না। হয় এগুলিকে স্বয়ং প্রমাণিত সত্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, অথবা প্রমাণের প্রয়োজন নেই এই দাবী করে দৃঢ়ভাবে জাহির করা হয়।

তার উপর, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সাধারণত শুরু করে পার্থক্য ও ভিন্নমুখী গতির কথা বলে, কিন্তু শেষ করে সর্বদাই এই জায়গায় এসে, যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের স্বার্থ একে অপরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে, এবং তারা নাকি বাস্তবে বৈরিতাপূর্ণ, অসঙ্গত এবং পরস্পর খাপ খাওয়ানোর অসাধ্য, এবং এটাই নাকি হতে বাধ্য, কারণ তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। এখানে আবার পার্থক্য ও বিকীরণশীলতাকে বাস্তব প্রমাণ ছাড়া, হাত সাফাই করে, অনৈক্য, অসঙ্গতি ও বৈরিতার সঙ্গে সমীকরণ করে দেখা হয় বা তাতে রূপান্তরিত করা হয়। তার ফলে দেখা যায় যে 'সম্প্রদায়ের" মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, এমন কি ঘৃণা, স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী উপাদান হিসেবে চিরকাল ছিল, আজও আছে, আর সহনশীলতা, শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করা, সহযোগিতা ও সংগতি, এ সবই সাময়িক ও শর্তসাপেক্ষ। আর একটি ফলশ্রুতি হল: যে কোনো নির্বাচনে ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে, একটি ধর্মের অনুবর্তীরা অর্থাৎ একটি "সম্প্রদায়ের" সদস্যরা, নিজেদের ভোট দিতে, নির্বাচিত হলে কেবল নিজধর্মাবলম্বীদের স্বার্থে কাজ করতে এবং অন্য সম্প্রদায়গুলিকে কঠোর শাসনে রাখতে বাধ্য। ফলে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীর মতে যে কোনো গণতান্ত্রিক শাসন মানে সংখ্যাগুরু "সম্প্রদায়ের" শাসন, সুতরাং সংখ্যালঘু "সম্প্রদায়ের" উপর জোর খাটানো। ফলে সে আরো বিশ্বাস করে যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র তার "সম্প্রদায়ের" প্রতি বিপজ্জনক। মজার কথা হল, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও একথা বিশ্বাস করে, এবং কেবল এই কারণেই জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে স্বাগত জানায়। কিন্তু তারা তা করে কেবল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। যে সব রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের কাছেও গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ, দুটিই অবাঞ্ছিত।[২]

সমাজকে এইরকম কঠোর "সম্প্রদায়"গত বিভাজন করার আর একটা ফল হল, সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা ও ব্যক্তির ভাগ্যের উপর তার প্রভাব, বা উভয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার বদলে একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী যে কোনো লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তিগত ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে অন্য "সম্প্রদায়"কে। যথা, মুসলিমদের "পশ্চাদপদ অবস্থা" বা একজন মুসলিম চাকরী পেতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ দাঁড়ায় হিন্দুদের "প্রগতি", বা "বিদ্বেষ" বা "আধিপত্য", আর "হিন্দুদের" প্রগতি নাকি ক্রমান্বয়ে ব্যাহত বা ব্যর্থ হয় মুসলিম "শত্রুতার" ফলে।

[দুই]

আমাদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির মধ্যে প্রভেদ বুঝতে হবে।[৩] প্রথমটি, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, ঘটত থেকে থেকে, এবং সাধারণত তাতে সরাসরি জড়িয়ে পড়ত কেবল নিম্নতর শ্রেণীগুলি। যখন এবং যে অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বিরাজ করত, তখন, সেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ হত। তা ঘটত ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা বৃদ্ধির ফলে। মৌখিক এবং লিখিত হিংস্র প্রচার, উত্তেজক অভিযোগ, এবং অনেক ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় প্রসঙ্গ নিয়ে গুজব—যথা গোহত্যা বা মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো—এর উন্মাদনা বৃদ্ধি করত। উত্তেজনা ও উন্মাদনার পরিবেশ সৃষ্টি হত, এবং অনেক সময়ে বাস্তবে হিংস্রতা দেখা দিত। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আদর্শ নমুনা হল দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অংশগ্রহণকারী ও শিকার যারা---তবে তার পিছনে যারা থাকে সবসময়ে তারা নয়—সাধারণতঃ হত শহরের দরিদ্র মানুষ এবং লুম্পেন-গুণ্ডা প্রকৃতির লোকজন, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষকরাও জড়িত ছিল। মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের নজির প্রায় মেলে না, যদিও তারা অনেক সময়ে লুম্পেন-গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেদের বস্তুগত ও নৈতিক সমর্থন জোগাত। কিন্তু একবার উন্মাদনা প্রশমিত হলে, উত্তেজনা চলে গেলে, এবং তাৎক্ষণিক ভীতির পরিবেশের অবসান হলে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দ্রুত বিলীন হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরে আসত। প্রত্যেক ঘটনা একটা ঐতিহ্য রেখে গেলেও, সাধারণভাবে দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত, বা দাঙ্গা কর্তৃক সৃষ্ট চাপ। উত্তেজনা দ্রুতবেগে, এবং সামগ্রিকভাবে, দূর হয়ে যেত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাৎপর্য বাড়িয়ে দেখাটাও ঠিক নয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা শুরু হয়েছে কেবল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছর থেকে। তাছাড়া, ১৯৪৬-৪৭-এর আগে ভারতে দাঙ্গার চল খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। ভারতীয়দের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, বিশেষত গ্রামাঞ্চল, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা থেকে মুক্ত ছিল। ১৯৪৬-এর আগে টানা চার বছর সর্বাধিক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল ১৯২৩-২৬-এর মধ্যে। ঐ সময়ে ৭২টি প্রধান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল, যা থেকে বেরোয় যে এই বিশাল, মহাদেশপ্রমাণ ও জনবহুল দেশে গড়ে প্রতি ২০ দিনে একটা করে দাঙ্গা হয়েছিল।

অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ছিল দীর্ঘমেয়াদী, অটল, এবং লাগাতার। এতে যুক্ত ছিল প্রধানত মধ্য শ্রেণীগুলি, ভূস্বামীরা, ও আমলারা। এরা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের রাজনৈতিক ধাঁচের প্রতিনিধিত্ব করত এবং তার বহিঃপ্রকাশ খুঁজে পেত "অন্য সম্প্রদায়ের" সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে খোলাখুলি দৈহিক ক্রিয়াতে নয়, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। এমন কি, যখন সংঘাতের ভিত্তি ছিল নিছক ব্যক্তিগত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ব্যক্তি-

গত স্বার্থসিদ্ধি করা, তখনো এভাবেই কাজ চলত। ব্যক্তিগত স্তরে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতিবিদদের এবং তাদের মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর সমর্থকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতেই পারত। কার্যক্ষেত্রে দেখা যেত যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার পর সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা প্রায়ই পৌর কমিটিতে, জেলা বোর্ডে ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। অন্তত ১৯৪৫ পর্যন্ত বহু সময়ে তারা বন্ধুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক সম্পর্কও রাখত।[৪]

এই বইটিতে আমরা প্রধানত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মতাদর্শের প্রসঙ্গেই থাকব, কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রধান ধরণ বা অন্তর্বস্তু নয়। সেগুলি হল মূলতঃ তার প্রতিফলন, তার সক্রিয় সামযিক অভিব্যক্তি, তার তিক্ত ও তীব্র বহিঃপ্রকাশ এবং ফল, এবং তার প্রসারের অন্যতম হাতিয়ার ও মাধ্যম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল আকস্মিক ও অনিয়মিত, তা ছিল সামাজিক বিকারত্বের একটি দিক। দাঙ্গা ঘটার কারণ হত, হয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শজনিত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া, অথবা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক সংকটের সন্ধিক্ষণে, সেগুলির মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতিও থাকত, বা কখনো তার সঙ্গে যুক্ত হত কোনো নির্দিষ্ট স্থানীয় স্বার্থ। দক্ষ প্রশাসনিক বা পুলিশী পদক্ষেপ এবং ধর্মনিরপেক্ষ জনমতের মাধ্যমে যথাযথভাবে এই দাঙ্গার মোকাবিলা করা যেত। সুতরাং বিশ্লেষণের বিষয় হিসেবে, এবং মতাদর্শগত রাজনৈতিক সংগ্রামের বিষয় হিসেবে আসতে পারে, এবং হয়ত আসা উচিত, রাজনীতি ও মতাদর্শরূপী সাম্প্রদায়িকতা।

উভয় ধরণের সাম্প্রদায়িকতাবাদ অবশ্যই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। উভয়েই উভয়ের বিকাশে সাহায্য করত। তবে, বহু ধর্মমত সমৃদ্ধ সমাজে একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ না ঘটলেও কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে পারত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটা প্রবণতা হল, মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিকেও তা সাময়িকভাবে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার খাতিরে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে বাধ্য করা। তার ফলে এক দুষ্টচক্রের সূত্রপাত হয়। তা ছাড়া, একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কিছুটা অবশিষ্টাংশ বা উত্তরাধিকার অনুভূতিতে থেকে যায়, এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী তাত্ত্বিক বা রাজনীতিবিদ্ পরে তা ব্যবহার করতে পারে। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত আসে নিম্নতর শ্রেণীদের জড়িয়ে নিতে পারা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করার সম্ভাব্য বা বাস্তব ক্ষমতার উপর। ১৯৩৭-৩৯ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিস্তৃত ও সর্বব্যাপী ঘটনা বা মৌলিক রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত না হয়ে সাধারণভাবে মধ্য শ্রেণীগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকার অন্যতম কারণ ছিল ব্যাপক জনগণ সার্বিকভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি উৎসাহ না দেখানো। অন্যদিকে, একবার সাম্প্রদায়িক

শক্তিগুলি জাতীয় স্তরে ব্যাপক হারে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়ার পর এবং দেশের ব্যাপক অংশে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড শুরু করার পর তাদের রাজনৈতিক সাফল্য নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এটা মনে রাখতে হবে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাজনীতির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় কেবল ১৯৪৬ সালে, যখন মুসলিম লীগ ১৬ই অগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়।

[তিন]

এই পর্যায়ে, আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে আমার মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর কিছু দিক স্পষ্ট করা যাক।

সাম্প্রদায়িকতাবাদ অতীতের অবশিষ্টাংশ নয়, মধ্যযুগ থেকে চলে এসেছে এমন কিছু, বা "অতীতের ভাবা", নয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটা আধুনিক মতাদর্শ, যা একটি নতুন মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বক্তব্য সৃষ্টি করার জন্য অতীত মতাদর্শসমূহের, প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং ঐতিহাসিক পট-ভূমির কিছু দিক, কিছু উপাদানকে মিশিযে নিয়েছে। যেহেতু সাম্প্রদায়িকতা-বাদ অতীতের বহু উপাদানকে ব্যবহাব করেছে, তাই তাকে ভ্রান্তভাবে একটি মধ্যযুগীয় মতাদর্শ বা তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন বা অন্তর্বৃত্তি বলা হয়েছে, অথবা দাবী করা হয়েছে, তার "শিকড়" চলে গেছে মধ্যযুগ পর্যন্ত। সাম্প্রদাযিকতাকে অনেক সময়ে ধর্মীয় পুনরভ্যুদয়বাদের (revivalism) সঙ্গে সমার্থক মনে করাও হয়, যেহেতু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অনেক সময়ে ধর্মীয় পুনরভ্যুদয়বাদী° বটে। কিন্তু এই সমীকরণ সবসময়ে সঠিক নয়। তাছাড়া, নতুন তত্ত্ব ও মতাদর্শ সৃষ্টি করার জন্য অতীতের উপাদানকে ব্যবহার করা একটা সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা। বহু আধুনিক মতাদর্শ-ই দাবী করে যে তা অতীতেব পুনরভ্যুদয় ঘটাচ্ছে। জাপানের দুটি আধুনিক মতাদর্শ, প্রথমে মেইজী স্বৈরতন্ত্র ও পরে সমরবাদ, মধ্যযুগীয় শিন্টোতন্ত্র ও সম্রাটের উপাসনার ভিত্তিতে সৃষ্ট হয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকে চিয়াং কাই শেকের ফ্যাশিস্ট নিউ লাইফ মুভমেণ্টের ভিত্তি ছিল কনফুসি-য়াসের মতবাদ। হিটলার এবং মুসোলিনী অতীত মতাদর্শের পুরোনো ও রক্ষণ-শীল উপাদানেব ভিত্তিতে হৃদয়বৃত্তিতে নাড়া দিত এবং মতাদর্শ-গত পুষ্টিসাধনের জন্য সুপ্রাচীন অতীত থেকে খাদ্য আহরণ করত। ইহুদী বিরোধিতা অবশ্যই মধ্যযুগ থেকে এসেছে। কিন্তু নাজী জার্মানীতে ইহুদী বিরোধিতা অতীতের ভাবের পুনরুজ্জীবন ছিল না, তা ছিল আধুনিকতম একটি মতাদর্শের সুবিন্যস্ত অঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইতালী ও জার্মানীতে, এবং ১৯৩০-এর দশক থেকে অল্পদিন আগে পর্যন্ত স্পেনে ও পর্তুগালে শাসকদলের মতাদর্শ-সমূহের অনেকাংশের ভিত্তি ছিল আধুনিক ক্যাথলিক চার্চ। ঐ চার্চের ধর্মতত্ত্ব

প্রায় পুরোটাই মধ্যযুগ থেকে ধার করা। কিন্তু ক্রীশ্চান ডেমোক্রেসী অতীতের অবশিষ্টাংশ বা অতীতে তার "শিকড়" চলে গেছে একথা কেউই বলবেন না। আই বি. এস. বা বহুজাতিক সংস্থা যতটা আধুনিক, ক্রীশ্চান ডেমোক্রেসী ততটাই আধুনিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ফ্রান্স ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের মৌলিক অংশ হিসেবে জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করত। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব প্রথম জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের জন্ম দিয়েছিল বলে ফরাসীবিপ্লবকে সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের উৎস হিসেবে দেখাতে চাওয়া সম্পূর্ণ অনর্থক কথা বলা।

শেষে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। এটা অবশ্য আগের উদাহরণগুলোর তুলনায় ভিন্ন, কারণ তা এমন এক মতাদর্শ সংক্রান্ত, যা অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করছে এমন দাবী তোলে নি, বরং একটি নতুন শ্রেণীর নতুন, বিপ্লবী বিশ্বদিশা হওয়ার বলিষ্ঠ দাবী করেছিল। মার্কসবাদ যে নতুন, এবং সন্ধিক্ষণকালীনভাবে পৃথক, তা সুবিদিত। কিন্তু মার্কসবাদ জার্মান ক্লাসিক্যাল দর্শন, ফরাসী রাজনৈতিক দর্শন, এবং বৃটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতির সম্বলকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। সুতরাং, বহুবিধ আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যের প্রেরণা দাবী করে এবং সেইজন্য ঐ ঐতিহ্যের প্রতীকচিহ্ন ও উপাদান আত্মস্থ করে। আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যায়: বৃটিশ পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র নিজের ঐতিহ্য খুঁজেছিল ম্যাগনা কার্টা থেকে, মার্কস ও লেনিনের পথ থেকে নিজের সমস্ত বিচ্যুতিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করার জন্য স্তালিন লেনিনবাদকে খাড়া করেছিলেন, বর্ণভেদের পক্ষে মৌলিক শূদ্র বর্ণটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ভারতের পশ্চাদপদ ও মধ্যজাতগুলি (backward and middle castes) তাকে উৎপাটন করেছে, এবং তারপর জাতিভেদ প্রথাকে ব্যবহার করেছে তপশীলি জাতিগুলিকে নীচে রাখার জন্য, আরো কাঁচাভাবে, ইরানের শাহ সরাসরি ঘোষণা করেছিল যে সে অ্যাকামেনিড সাম্রাজ্য নতুন করে স্থাপন করছে, এবং তারপর প্রাচীন অভিষেকের রীতিগুলি পালন করেছিল। সুতরাং, একটি নতুন ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান বা মতাদর্শ অতীতের কাঠামোর কম বেশী অংশ আত্মস্থ করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু এই অতীত কাঠামোগুলি নতুন প্রতিষ্ঠান বা মতাদর্শের "জন্ম" বা কার্য-কারণ সম্বন্ধের সংজ্ঞা দিয়ে দেয় না। একজন সমাজ বিজ্ঞানীকে অবশ্যই পুরোনো যুগের উপাদান ও কাঠামোগুলিকে অধ্যয়ন করতে ও প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সে কাজ করতে হবে সেগুলিকে "উৎস" বা "কার্য-কারণ সম্পর্কের" ভূমিকায় না ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কসবাদের উদাহরণটির দিকে তাকানো যায়। মার্কসবাদ সৃষ্টির জন্য পূর্ববর্তী তত্ত্বের যে বহু উপাদান নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি মার্কসবাদের 'উৎস' ও উদ্ভব" হয়ে যায় না। মার্কসবাদের

উদ্ভবের কারণ সাধারণভাবে সমসাময়িক সমাজ কাঠামোতে ও বিশেষভাবে ধনতন্ত্রের বিকাশে নিহিত রয়েছে।

ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি, অর্থাৎ ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে ধর্মকে আনার চিন্তা, নতুন বিষয় ছিল। তবে ধর্মীয় প্রভেদ এবং সামাজিক গোষ্ঠী গঠনে কর্মকে অন্যতম নীতি হিসেবে আগেই দেখা হত। প্রাচীন এবং মধ্যযুগেও ধর্মীয় দমন-পীড়ন চলত, কিন্তু মধ্যযুগীয় রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা একটি আধুনিক বিষয়, যার অভ্যুত্থান ঘটেছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রভাবে এবং ভারতের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, স্তর ও গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি আধুনিক মতাদর্শ, যার প্রয়াস ছিল জনগণের সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক আধুনিক রাজনীতিকে ধর্মীয় অভিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদ ধর্ম, বিবাহ ও একত্রে খাদ্যগ্রহণ করার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নির্মাণের যে চেতনা হিন্দু ও মুসলিম জনমানসে পরম্পরাগতভাবে চলে এসেছিল, সেই চেতনাকে ব্যবহার করেছিল।[৫] সাম্প্রদায়িকতাবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির নতুন, আধুনিক চরিত্র বুঝতে হলে একথা উপলব্ধি করা আবশ্যক যে, সমস্ত ক্ষেত্রের মত, ইতিহাসেও, যেমন স্থায়ীত্ব আছে, তেমন ছেদ ও নতুনত্বও আছে—এবং এই ছেদ ও নতুনত্বগুলির ফল ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন, সাধারণতঃ এগুলিই সমাজ বিকাশের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান ঘটেছিল আধুনিক রাজনীতির উত্থানের ফলে। এই রাজনীতি মধ্যযুগীয় বা প্রাচীন বা প্রাক্-১৮৫৭ যুগের রাজনীতির সঙ্গে তীব্র ছেদ নির্দেশ করেছিল। রাজনীতির চরিত্রে কাঠামোগত ছেদের পরই যেমন একটি রাজনীতি এবং একটি মতাদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদ বা সমাজতন্ত্রের উত্থান সম্ভব ছিল, সাম্প্রদায়িকতাবাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ছিল। অর্থাৎ, গণভিত্তিক রাজনীতি, জনগণের সার্বভৌমিকতার রাজনীতি, জনগণের অংশগ্রহণ ও সমাবেশের রাজনীতি, জনমত গঠন ও তাকে সংহত করার ভিত্তিতে রাজনীতি আরম্ভ হওয়ার পরই (জনগণ কথাটার সংকীর্ণ সংজ্ঞা দিলেও) এই রাজনীতি ও মতাদর্শের উত্থান সম্ভব ছিল। পূর্ববর্তীকালের রাজনীতির ভিত্তি ছিল পূর্ণমাত্রায় উচ্চশ্রেণী বা শাসকশ্রেণী, এবং জনগণকে হয় তাদের লড়াইয়ে তাদের স্বার্থে প্রাণ দিতে হত, বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে এসে বিদ্রোহ করতে হত। সফল বিদ্রোহী নেতারা আবার পুরোনো শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ত। ফলে সেই রাজনীতিতে জনগণের কাছে রাজনীতি নিয়ে যাওয়ার এবং জনগণরূপে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ ও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করার, কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সুতরাং, হিন্দুরা বা মুসলিমরা হিন্দু হিসেবে বা মুসলিম হিসেবে রাজনীতির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন—বা এমন কি ভারতীয়রা রাজনীতির

স্বার্থে ভারতীয় হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন—এই চিন্তার উদ্রেক হতে পারে কেবল তখনই, যখন রাজনীতির অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হিসেবে প্রবেশ করেন জনগণ, যখন জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের ভিত্তিতে রাজনীতি চালু হয়। অষ্টম অধ্যায়ে দেখানো হবে যে এই কারণেই ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারা ১৯০৫ পর্যন্ত মুসলিমদের মুসলিমরূপে অরাজনৈতিক রাখতে চেয়েছিল এবং ১৯০৫-এর পর, যখন গণরাজনীতি এড়ানো আর সম্ভব ছিল না, তখন থেকেই, বেশ সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তিতে হলেও, তাদের মুসলিম হিসেবে রাজনৈতিক সমাবেশকে অনুপ্রেরণা দিতে থাকে।[৬] একই ভাবে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি চরম বা ফ্যাসীবাদী রূপ নিতে পেরেছিল কেবল ১৯৩৭-এর পর যখন অনেক ব্যাপকহারে জনগণের কাছে আবেদন রাখা ও লড়াইয়ের জন্য তাঁদের একজোট করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই আবশ্যকীয়তা দেখা দিয়েছিল গণতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তার প্রসার, ভোটের অধিকারের প্রসার ও জাতীয় আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতির ফলে।

সাম্প্রদায়িকতাবাদকে চিরাচরিত মতাদর্শের পুনরুত্থান, যা চিরাচরিত ভারতের একটি অঙ্গ, যাকে এবার বর্জন করার সময় এসেছে, এরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা ভ্রান্ত। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ঐতিহ্যে উপস্থিত ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি অনাদি অনুভূতি নয়। সাম্প্রদায়িক বৈরিতা অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্যা নয়। তা আমাদের ইতিহাসের অনিবার্য ফলশ্রুতি নয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ শুধু বর্তমানে উপস্থিত নয়, তা বর্তমান যুগেরই বিষয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ ভূতপূর্ব বা ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক গোষ্ঠী ও ব্যবস্থাদির সেবা করত না, এবং করে না। সাম্প্রদায়িকতাবাদ অতীতকে ফিরিয়ে আনতে চায় না। যে সব "সেকেলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহ, যেগুলি দুই সহস্র বর্ষ প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে চায়", সাম্প্রদায়িকতাবাদ তাদের প্রতিনিধিত্ব করে না। সাম্প্রদায়িকতাবাদ কতকগুলি সমসাময়িক সামাজিক গোষ্ঠী, স্তর বা শ্রেণীর সামাজিক প্রেরণার প্রতি সাড়া দিয়েছিল, তাদের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছিল, এবং তাদের সামাজিক চাহিদা ও লক্ষ্যসিদ্ধি করতে চেয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ঔপনিবেশিকতার রাজনীতির একটা অংশে পরিণত হয়েছিল। আর, ঔপনিবেশিকতাবাদকে অন্তত কোনো কল্পনাতেই অতীতের ধ্বংসাবশেষ বলা চলে না। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক উৎস, এবং তার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য সবই ছিল আধুনিক, বর্তমানে উপস্থিত, এবং বর্তমানের নিজের বিষয়।[৭] সাম্প্রদায়িকতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বর্তমানের, সমসাময়িক সমাজ বিন্যাস। এ কথা বলার মাধ্যমে অবশ্যই তার উত্থান ও ব্যাপ্তি কেন হল সেই ব্যাখ্যা করা হয় নি। তা করা হল ইতিহাসবিদ্ ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের কাজ।

সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে

একটি বিশেষ বাধা আছে। বিগত এক শতাব্দী ধরে মধ্যশ্রেণীগুলিকে ও বুদ্ধিজীবীদের স্থায়ীভাবে ঘিরে ছিল একটি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, যা রাজনীতিতে, পত্রপত্রিকায়, সাহিত্যে, এবং বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী হয়েছিল। এই মতাদর্শগত মগজ ধোলাইয়ের ফলে বিশ্লেষণের হাতিয়ারগুলি পর্যন্ত দূষিত হয়ে পড়েছে। ফলে যেমন বাস্তব জীবনে, তেমনি, সমাজবিজ্ঞানে, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে অনেক সময়ে দেখা হয়েছে সচেতন বা অবচেতন সাম্প্রদায়িক চিন্তার চশমা চোখে এঁটে।[৮] রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে, যেখানের ঐতিহ্যই হল চিন্তা ও মতাদর্শের উপর জোর দেওয়া, তাদের সামাজিক ভিত্তিভূমির উপর নয়, সেখানে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া, বহু সমাজবিজ্ঞানী অবচেতনভাবে, এবং ধর্মনিরপেক্ষ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও, তত্ত্বগত ও কল্পনাগত অস্বচ্ছতা বা পূর্ণতর ঐতিহাসিক অধ্যয়নের অভাবে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রতিধ্বনিত করেন। অনেক সময়ে এটা হয় তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, যখন মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বক্তব্যকে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য বলে মনে করেন। "কিন্তু স্পষ্টতই, যেখানে বাহ্য রূপগুলির ভুল সহজে বোঝা যায় এমন, সেখানে কেবল সেগুলির বিবরণ প্রাসঙ্গিক মৌলিক সম্পর্কসমূহের যথাযথ ধারণা দেবে না। কারণ এই ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য বিবৃত হবে তা বিবৃত রূপগুলির বিভ্রান্তিকর বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিখুঁতভাবে পুনরুৎপাদন করবে।"[৯] সুতরাং, এই বিষয়ে আজকের দিনে সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগতে যা লেখালেখি হচ্ছে তার অনেকটাই অসচেতনভাবে পুরোনো উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে পরিণত হচ্ছে। ফলে, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িকতাবাদের উপর ভারতে ও বিদেশে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে, যেগুলি দেখিয়ে দেয়, মতাদর্শের সামাজিক উৎস ও ভূমিকা, তত্ত্বগতভাবে এবং ভারতে তার ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক রূপে, কি ছিল, তা কম করে বললেও অপ্রতুল ছিল যাদের, সেই সব সদুদ্দেশ্যপূর্ণ গবেষকদের এই বিষয়ে লেখার বিপদ কি কি। তাঁরা অনেকেই গবেষণা শুরু করেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এবং ধর্মভিত্তিক সুবিন্যস্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে, যেখানে এই বিশ্বাসগুলিকেই সর্বাগ্রে পরীক্ষা করে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করে তবে সমস্যাটির আলোচনার দিকে এগোনো যেতে পারে।[১০] একইভাবে, আজকের দিনের বহু ধর্মনিরপেক্ষ লেখক, গোড়ার দিকের বহু জাতীয়তাবাদী নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মৌলিক সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস ও একক গুলিকে গ্রহণ করে বা অভিযোজন (adapt) করে নিয়ে তারপর সাম্প্রদায়িকতাবাদী যুক্তিগুলি বর্জন করেন। তার অর্থ দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িকতাবাদের নিজের রাজনৈতিক প্রয়োগের ভিত্তিতে তার বিশ্লেষণ করা ও তারই জমিতে থেকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তার বন্দী হয়ে পড়া।[১১] তার বদলে,

সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রশ্নকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অধ্যয়ন করতে হলে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ এবং গবেষকের মতাদর্শ দুটিকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, সমালোচনাত্মকভাবে তদন্ত করে দেখতে হবে। "শিক্ষককে নিজেকে শিক্ষিত হতে হবে", এই ধারণা-টিকে এখানে প্রয়োগ করতে হবে।[১২] গত একশ বছর ধরে, বিশেষত ১৯২২ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে, যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক পরিভাষার চল হয়েছে, সেগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে, বা অন্ততপক্ষে সেগুলি ব্যবহার করার আগে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তা না হলে, ইচ্ছে থাক আর নাই থাক, শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পথেই যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারো বিশ্লেষণ শুরু হয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের তাঁদের স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রতিনিধি-রূপে গ্রহণ করে—এবং যদি কেউ হিন্দু, মুসলিম বা শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হিন্দু নেতা, মুসলিম নেতা বা শিখ নেতা অভিহিত করে—অথবা যদি কেউ স্বীকার করে নেয় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনৈতিক কাজকর্ম হল তাদের "সম্প্রদায়ের" রাজনৈতিক কাজ, তাহলে সে তো ইতিমধ্যেই চিন্তা ও বিশ্লেষণের মৌলিক সাম্প্রদায়িকতাবাদী কাঠামোটা গ্রহণ করে নিয়েছে। অন্যদিকে, যদি কোনো সাম্প্রদায়িক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্বার্থের অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পক্ষে সে রকম কোনো স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়, সুতরাং তারা নিজ নিজ "সম্প্রদায়ের" "প্রতিনিধি" নয়। সুতরাং তারা স্পষ্টতই অন্য কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করছে ; তাদের রাজনীতি উদ্দিষ্ট হয় তাদের "সম্প্রদায়সমূহ" ব্যতিরেকে অন্য কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। অন্য-ভাবে বলা যায়, হিন্দু বা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু ও মুসলিম স্বার্থের যে সংজ্ঞা দেয়, তার সঙ্গে ভারতীয় জনগণের অংশ হিসেবে হিন্দুদের ও মুসলিম-দের আসল স্বার্থের মধ্যে প্রভেদ কি, তার বাছবিচার করা প্রয়োজনীয় : হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির সঙ্গে হিন্দুদের ও মুসলিমদের রাজ-নৈতিক কাজকর্মের প্রভেদ বিচার করা প্রয়োজনীয়। একইভাবে, যারা হিন্দু মন বা মুসলিম মনের কথা বলেন, তাঁরা এর মধ্যেই হিন্দু ও মুসলিমদের সম্প্রদায়রূপে পূর্ণমাত্রায় বিন্যস্ত ধাঁচ কল্পনা করে নিচ্ছেন।

একটু পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি সত্ত্বেও, আমার দৃষ্টিভঙ্গি কি তা স্পষ্ট করা দরকার। হিন্দু বা মুসলিম বা শিখ বা খ্রীশ্চানরা কেবল জাতি (nation) বা জাতিসত্তা ছিল না তা নয়, ধর্মীয় প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো অর্থে তারা আদৌ একটি সুনির্দিষ্ট এবং সমধর্মা "সম্প্রদায়" ছিল না। অর্থাৎ তারা "একটি অখণ্ড সামা-জিক কাঠামো" বা ধর্মের ভিত্তিতে সাধারণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ বা বাঁধন বা দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন আসঞ্জনশীল গোষ্ঠীরূপে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত ছিল না। ধর্মীয় স্থানাঙ্কগুলি শ্রেণীগত, জাতিগত, ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক স্থানাঙ্কসমূহের সমস্থানিক ছিল না। হিন্দুদের এবং মুসলিমদের কোনো সুস্পষ্ট

ভাবে অঙ্কিত বা উচ্চারিত স্বার্থ ছিল না, যা "একে-অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে"। বিশেষত, হিন্দু ও মুসলিম কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা ছিল একই রকম। একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করার কথা বললে বা তাতে বিশ্বাস করলেও, বাস্তব জীবনে ধর্মীয় ক্ষেত্রের বাইরে সেরকম কোনো স্বার্থের অস্তিত্ব ছিল না।[১৩] সর্বভারতীয়, এমন কি আঞ্চলিক ভিত্তিতেও, হিন্দু ও মুসলিমদের ঐ ধরণের কোনো স্বতন্ত্র স্বার্থ বিদ্যমান ছিল না।[১৪] সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই সমানভাবে এবং সাধারণভাবে যে রকম হোক না কেন জাতীয়, ভাষাগত-আঞ্চলিক, বা স্থানীয় সমাজের এবং সর্বভারতীয় শ্রেণী, স্তর ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হত।[১৫] অন্যদিকে হিন্দুরা ও মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ, শ্রেণী, বর্ণ, সামাজিক পদমর্যাদা, ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রথা, এমন কি ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভক্ত ছিল।[১৬] একটি ধর্মের অন্তর্বর্তীদের মধ্যে, ভাষা, সংস্কৃতি, প্রথা, আহারাদি সংক্রান্ত আচার ইত্যাদি প্রসঙ্গে যা কিছু সার্বজনীন হত, তা সীমাবদ্ধ থাকত একটি ভাষাভিত্তিক এলাকা, এবং অনেক সময়ে তার মধ্যে আরো সংকীর্ণ অঞ্চল বা এলাকাতে। বস্তুত, একজন উচ্চশ্রেণীভুক্ত মুসলিমের সঙ্গে একজন নিম্নশ্রেণীর মুসলিমের চেয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অনেক বেশী মিল ছিল। একজন পাঞ্জাবী হিন্দু সংস্কৃতিগতভাবে একজন বাঙালী হিন্দুর চেয়ে একজন পাঞ্জাবী মুসলিমের নিকটতর হত: অবশ্যই একথা একজন বাঙালী মুসলিমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—সে একজন পাঞ্জাবী মুসলিমের চেয়ে একজন বাঙালী হিন্দুকে অনেক কাছের লোক বলে বোধ করত।[১৭]

যদি হিন্দুদের বা মুসলিমদের হিন্দু বা মুসলিমরূপে ব্যাপকতর, সর্বভারতীয় স্তরে কোনো সাধারণ স্বার্থ থাকত, তবে তা কেবল হতে পারত যৌথভাবে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজ বিকাশের পক্ষে: সুতরাং তা হত ভারতীয় রূপে, এবং অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে একত্রে। অথবা তার ভিত্তি হতে পারত ভাষা ও সংস্কৃতি, এবং ঐ ভাষা ও সংস্কৃতি যাঁদের, তাঁদের সকলের সঙ্গে। অথবা তা হতে পারত শ্রেণী, স্তর বা গোষ্ঠীরূপে, ঐ একই শ্রেণী, স্তর বা গোষ্ঠীর অন্যান্যদের সঙ্গে।[১৮] এই অবাস্তব সাম্প্রদায়িক বিভাজন তাই ভারতীয় জনগণের ভাষাগত-সাংস্কৃতিক অঞ্চল, এবং সামাজিক শ্রেণীতে বাস্তব বিভাজনকে এবং তাঁদের একটি জাতীয় সত্তা হিসেবে বাস্তব, বিকাশমান ও ক্রমবর্ধমান ঐক্যকে আড়াল করে রাখছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিসেবে, জাতীয় কংগ্রেস বারংবার সকল ভারতীয়দের মধ্যে ঐকতানের বাণী প্রচার করত এবং তাঁদের সার্বজনীন, সর্বভারতীয় স্বার্থকে তুলে ধরত। কিন্তু একই সঙ্গে, কংগ্রেস ভাষাগত অঞ্চল এবং সামাজিক শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। কংগ্রেস তাঁদের সকলকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে এবং

জাতীয়তা-গঠন ও দেশ-গঠনের কাজে সহযোগিতা করতে আহ্বান করেছিল।

যদি হিন্দু ও মুসলিমদের বিষয়গত অর্থে কোনো সার্বজনীন স্বার্থ না থেকে থাকে, তবে কি হিন্দু বা মুসলিমরা প্রকৃত অর্থে এক একটি সম্প্রদায় ছিল? এই তথাকথিত ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়গুলির সদস্যদের মধ্যে একমাত্র বন্ধন ছিল কয়েকটি ধর্মীয় ব্যবস্থা এবং এলাকাভিত্তিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথার বিচিত্র জটলা।[১৯] বড়জোর বলা যায় যে এরা ছিল সমধর্মী উপাসকবৃন্দের সম্প্রদায়সমূহ। কেবল সম্প্রদায় কথাটাকে আংশিকভাবে বা লঘুভাবে ব্যবহার করলেও দেখাতে হবে যে হিন্দু বা মুসলিমরূপে তাদের কিছু সার্বজনীন ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থ ছিল।

আরেকভাবে বিষয়টা দেখা যেতে পারে। একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও একজন অ-সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির মধ্যে তফাৎটা এই নয় যে প্রথমজন সংকীর্ণমনা হত, এবং কেবল নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখত, তাকে রক্ষা করত এবং তার জন্য লড়াই করত, আব দ্বিতীয়জন ব্যাপকতর জাতীয় বা শ্রেণীস্বার্থ দেখত বা সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখত। একথাও ঠিক নয় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী সামাজিক বাস্তবতার অংশমাত্র দেখতে পেত। বহু ধর্মনিরপেক্ষ লেখক ও রাজনৈতিক নেতা একথা বলে থাকেন। যেমন কে. পি. করুণাকরণ সম্প্রতি লিখেছেন: "ভারতে সাম্প্রদায়িকতা হল সেই দর্শন, যা একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বা একটি নির্দিষ্ট জাতির সদস্যদের স্বার্থের উন্নয়নের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।" তিনি বলেন, "হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু মহাসভাতে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন পেয়েছিল, যা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু স্বার্থকে উন্নীত করার কাজে নিয়োজিত ছিল।"[২০] একইভাবে, এস. আর. মেহরোত্রা লিখেছেন, "কংগ্রেস গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং একটি সাধারণ ভারতীয় জাতীয়তার পক্ষে ছিল। মুসলিম লীগের অস্তিত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল একটি বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সত্তারূপে ভারতীয় মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়ন।' তিনি এর পর লীগের বর্ণনা করেন, "মুসলিম স্বার্থের রক্ষাকর্তা"[২১] বলে। লুই ডুমোঁ বলেছেন: "যেন, যে আনুগত্য দেশের প্রতি থাওয়া উচিত, সাম্প্রদায়িকতাবাদী সেই আনুগত্য দেখায় তার সম্প্রদায়ের প্রতি।"[২২] বহু ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উপদেশ দিয়েছেন যেন তারা তাদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের অধীনস্থ রাখে। এই লেখক ও নেতাদের তত্ত্বগতভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় তাঁদের বিশ্লেষণ বা অভিজ্ঞতামূলক আচরণের সময়ে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নিজেদের সম্বন্ধে যে দাবী, তা মেনে নেন।

দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আসল পার্থক্য হল, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীরা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের—ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে হিন্দু বা মুসলিম স্বার্থ—অস্তিত্বকে অস্বীকার করতেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদ সামাজিক বাস্তবতার আংশিক বা খণ্ডিত দর্শন

নয়। তা হল সামাজিক বাস্তবতার ভুল বা অবৈজ্ঞানিক দর্শন। সাম্প্রদায়িকতাবাদ কেবল একটি মাত্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করত বলে সংকীর্ণ বা মিথ্যা নয়। বাস্তবে তা ঐ প্রতিনিধিত্বও করত না। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কেবল জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হত না। তারা যে "সম্প্রদায়ের" প্রতিনিধিত্বের দাবীদার ছিল, তার স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্ব করত না। হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের রাজনৈতিক কাজকর্ম সাধারণভাবে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ছিল, এবং হিন্দু ও মুসলিমদের স্বার্থেরও পরিপন্থী ছিল।[২৩] অন্যদিকে, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বৃহত্তর জাতীয় বা শ্রেণী স্বার্থের কাছে সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে অবনত করা ছিল না। তা ছিল ঐ রকম সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হিন্দু, মুসলিম বা শিখ সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করার অর্থ সাম্প্রদায়িকতাবাদকে স্বীকার করা।

সুতরাং এক অর্থে, সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল "সচেতন ছলনা বা অসচেতন আত্মপ্রবঞ্চনা।" সাম্প্রদায়িকতাবাদী হয় অন্যদের সঙ্গে ছলনা করছিল, অথবা, যা বেশী সম্ভব, সে নিজেকেও প্রবঞ্চিত করছিল। সে নিজেকে এবং অন্যদের ছলনা করছিল, কারণ সে যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করছিল, বাস্তব জীবনে সেরকম স্বার্থ ই ছিল না, এবং সে যে দাবী পূরণের অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, সেই দাবী তার প্রস্তাবিত ধাঁচে, এবং তার প্রস্তাবিত পথে, পূরণ করতে সে অক্ষম ছিল।

সুতরাং, আগের একটা কথায় ফিরে গেলে বলতে হয়, ভারতের অধিবাসী হিন্দু বা মুসলিম বা শিখদের প্রসঙ্গে সম্প্রদায় কথাটা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিল, এবং আছে। তা ব্যবহার করতে রাজি হওয়ার অর্থ ছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদের অন্যতম মৌলিক পূর্বশর্তকে গ্রহণ করা। সম্প্রদায় কথাটি দীর্ঘকাল ব্যবহার করার মাধ্যমে বিশ্লেষণের বা রাজনীতির একটি শ্রেণী হিসেবে একটি সামাজিক গোষ্ঠীকে নির্দেশ করা এবং এই ব্যবহারের মাধ্যমে কতকগুলি গোষ্ঠীস্বার্থকে সনাক্ত করা ও ব্যক্ত করাও সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসারের হাতিয়ারে পরিণত হয়। এমন কি যেখানে এই কথাটির ব্যবহার, কর্তারা তার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে প্রভেদ বোঝাতে বা প্রভেদ সৃষ্টি করতে চান নি, সেখানেও একথা প্রযোজ্য। যদি ভারত বাস্তবে সুবিন্যস্ত সম্প্রদায়সমূহ নিয়ে গঠিত হত, তা হলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ থাকত, একটি সম্প্রদায়ের নিজের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিবর্গ থাকত, বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ত, এবং এক সম্প্রদায় আর একটির উপর আধিপত্য কায়েম করত। এই আধিপত্য এড়াতে, হয় একটা তৃতীয় কোনো নিরপেক্ষ দলের প্রশাসন চাই, অথবা, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে, বিচ্ছিন্নতা ছিল সাফল্য আনার পথ। যে কোনো ক্ষেত্রেই, সম্প্রদায়গুলিকে ক্রমান্বয়ে ঐক্যবদ্ধ করা ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষা ও তার উন্নয়নের

চেষ্টা করা। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কেও একই কাজ করতে হত, যেন একটি শক্তি-শালী, ঐক্যবদ্ধ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বলপ্রয়োগ করে ও ফ্যাসীবাদী পদ্ধতি ব্যবহার করে আধিপত্য কায়েম করতে পারে না।

[চার]

সাম্প্রদায়িকতাবাদকে বোঝার প্রক্রিয়ায় ভ্রান্ত চেতনার (false consciousness) ধারণাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমস্ত বিষয়গত বাস্তবতাকে মানবমন অবধারণাপূর্বক গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষের সমস্ত চিন্তা, চেতনা বা মতাদর্শ বাস্তবের সমভাবে গ্রহণযোগ্য "প্রতিফলন" বা অবধারণ নয়। কিছু চিন্তা ও মতাদর্শ অন্যদের তুলনায় বিষয়গতভাবে বেশী গ্রহণযোগ্য, যে পরিমাণে তারা বিষয়গত বাস্তবতার অনেক প্রকৃত প্রতিফলন করে, সামাজিক বাস্তবতায় অনেক গভীরভাবে এবং অনেক যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং যে পরিমাণে অনেক কম খামখেয়ালীভাবে, অর্থাৎ অনেক বেশী দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল ও দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যয় সহ তাদের ঘিরে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠন করা যায়। বিপরীতে অবধারণা বা সচেতনতা ছাড়া কোনো কিছুই রাজনীতিতে আসে না। কিন্তু সব রাজনীতি বা রাজনৈতিকবোধ এক স্তরে থাকে না। তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু মনস্তত্ত্ব বা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নে আটকে থাকে না। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বিষয়গত সামাজিক উপাদানসমূহ মানুষের রাজনীতির ভীত্তি, এবং সেগুলিই বিভিন্ন নরনারীর রাজনীতির পরি-চালক। কিন্তু রাজনীতিতে এই উপাদানগুলির প্রতিফলন ঘটে নানাবিধ প্রতীক এবং মতাদর্শের মধ্যে। তখন উপাদানগুলির এবং যে মতাদর্শে তারা প্রতিফলিত আছে সেগুলির মধ্যে পৃথকীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

যেহেতু বিষয়গত বাস্তবতার অস্তিত্ব আছে, তাই সঠিকভাবে তার অবধারণা করা বা তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্ভব, এবং ঐ সঠিক চেতনার ভিত্তিতে রাজ-নৈতিক সংগঠনও সম্ভব। কিন্তু যেখানে সঠিক চেতনা যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয় না, সেখানে শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে ভ্রান্ত চেতনা। এই ভ্রান্ত চেতনার উৎস অনেক সময়েই থাকে বাস্তবতাকে পরিবর্তন করার জন্য নরনারীর প্রচেষ্টার মধ্যে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বহু ভ্রান্ত চেতনার উদ্ভব হয়, আংশিকভাবে কারণ মানুষ নতুন বাস্তবতাকে ধরতে চেষ্টা করে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সামাজিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত, চিরাচরিত পরিচিতিসমূহের পরি-প্রেক্ষিতে, তাদের সাহায্যে, ও তাদের অনুসারে। কিন্তু ঐ ধারণা, প্রতিষ্ঠান ও পরিচিতিসমূহ, প্রাচীনতর, ভিন্নতর সামাজিক বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত, এবং নতুন সামাজিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সেগুলি কম বেশী পরিমাণে অযোগ্য

হতে পারে। নতুন সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব এবং যে নতুন সামাজিক ধারণা ও পরিচিতির সাহায্যে এই সম্পর্কগুলিকে আত্মস্থ করা দরকার সেগুলির প্রসারের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে একটা সময়ের ব্যবধান থাকে। তাছাড়া, বিষয়গত সম্পর্ক-সমূহ অবধারিতভাবে বিষয়ীগত চেতনায় রূপান্তরিত হয় না। বাস্তবতার সঠিক প্রতিনিধিত্বমূলক নতুন চেতনার বিকাশ হয় অপ্রতুলভাবে, এবং তা অনেক সময় বাস্তবতা থেকে পিছিয়ে থাকে। ফলে বহু ভ্রান্ত চেতনার উত্থান ও প্রসার ঘটে।[২৪] কিন্তু সমস্ত ভ্রান্ত চেতনার বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি ঘটে না। তাদের টিঁকে যাও-য়ার ক্ষমতা অনেক সময়ে তাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বা বাস্তবতার সঙ্গে নৈকট্যের উপর নির্ভর করে না, করে অন্যান্য সামাজিক শক্তি ও কাঠামোর কার্যপ্রণালীর উপর। উপরি-উল্লিখিত ব্যবধানের ফলে যে সমস্ত ভ্রান্ত চেতনার উদ্ভব হয়, সেগুলি কোনো না কোনো সামাজিক গোষ্ঠী, শ্রেণী ও স্বার্থের চাহিদা ও প্রেরণা না মেটালে খুব দ্রুত অপসৃত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থেরা নিজেদের প্রয়োজনে তার বিরোধিতা করলে অনেক যথাযথ চেতনার প্রসার রুদ্ধ হতে পারে।

অর্থাৎ, ভ্রান্ত চেতনা নিজের উদ্ভবের কারণ নয়, আর তার বৃদ্ধি এবং প্রাদুর্ভাবেরও ব্যাখ্যা করা দরকার। তার উপর, একটি চেতনাকে ভ্রান্ত বলার অর্থ শুধু বাস্তবতার সঙ্গে তার গরমিলের উল্লেখ করা। তা থেকে ঐ চেতনার রাজ-নৈতিক কার্যকারীতা নিরূপণ করা যায় না। তা নির্ভর করে অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উপাদানের উপর। যদি একটি ভ্রান্ত চেতনা দীর্ঘকাল ধরে ও ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়, তাহলে তা বহু সংখ্যক মানুষের আত্মস্থ হয়ে যেতে পারে, খুবই কার্যকর হতে পারে, এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটি প্রধান চালিকা শক্তিরূপে দেখা দিতে পারে। ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে জাতি-বাদের (racism বা ১৯০৭ সালে ভারত ব্যবচ্ছেদে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সাফল্য এরই উদাহরণ। কোনো চেতনা, মতাদর্শ, বা সামাজিক আন্দোলনের বিষয়গত ভিত্তি না থাকলে তাকে দীর্ঘকাল ধরে রাখা যায় না, এই যুক্তি ভ্রান্ত। তার উল্টো যুক্তি, অর্থাৎ যে কোনো চেতনা, মতাদর্শ বা সামাজিক আন্দোলন যথেষ্ট দীর্ঘকাল ধরে জনপ্রিয় থাকলে তা যথাযথ বা সত্য বা বাস্তবতার সঠিক প্রতিফলন, এ কথাও ভুল।[২৫] তা নাহলে জাতিবাদ বা ইহুদীবিদ্বেষবাদ (anti-Semitism) বা মেয়েদের হীনতা সংক্রান্ত তত্ত্ব এতদিনে বহুবার সঠিক বা যথাযথ বলে প্রমাণিত হয়ে যেত। সেগুলি অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতাবাদের চেয়ে অনেক বেশী "সাফল্য" দেখিয়েছে। অবশ্যই, একটি ভ্রান্ত চেতনার বৃদ্ধির কারণ অধ্যয়ন করা—উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রদায়িক আন্দোলনগুলির, সাম্প্রদায়িক সামা-জিক প্রক্রিয়ার অধ্যয়ন করা—একটি জরুরী কাজ। কিন্তু তা ঐ চেতনার সঠিকতা, বা "সত্য", বা বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ প্রমাণ করতে সাহায্য করবে

না। একটি চেতনাকে ভ্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করার কারণ এই নয় যে সামাজিক প্রক্রিয়া উপলব্ধি করার সম্ভাবনা রোধ করে দেওয়া হচ্ছে। বরং এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐ উপলব্ধির দরজা খোলা হয়, প্রক্রিয়াটির বৈজ্ঞানিক গবেষণার শর্তাবলী সৃষ্টি করা হয়, এবং সামাজিক প্রক্রিয়াকে তার নিজের উৎসের কারণ এবং তার নিজের সত্য বলে মনে করার অভিজ্ঞতাবাদী ভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব হয়।[২৬]

ভারতে জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ উভয়ই সাম্প্রতিক, অর্থাৎ আধুনিক ঘটনা। উভয়েই ছিল সামাজিক পরিবর্তনের, একই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। ঐ প্রক্রিয়া হল ঔপনিবেশিকতাবাদের ধাক্কায় ভারতের রূপান্তর। প্রাক্-ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর ভস্মাবশেষ থেকে যে নতুন, প্রসারমান বাস্তবতা জন্মগ্রহণ করছিল, তারা তারই প্রতিফলন। দেশের ও জনগণের বিকাশমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক একীকরণ, একটি ভারতীয় জাতীয়তা নির্মাণের প্রক্রিয়া, ঔপনিবেশিকতা ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিকাশমান মৌলিক বিরোধ, এবং আধুনিক সামাজিক শ্রেণী ও স্তরসমূহের গঠনের ফলে জনগণের মধ্যে বিস্তীর্ণতর যোগাযোগ ও আনুগত্য থাকা এবং প্রশস্ততর ঐক্য ও পরিচিতির খোঁজ করা জরুরী কাজ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে যে আধুনিক রাজনীতির উত্থান ঘটেছিল, তার নতুনত্ব থেকেও এই চাহিদা উদ্ভূত হয়। আধুনিক রাজনীতি ছিল গণ অংশগ্রহণের রাজনীতি, জনমতের উত্থানের রাজনীতি, জনগণের সার্বভৌমিকতার মত বৈপ্লবিক ও অভূতপূর্ব চিন্তার রাজনীতি। এই নতুন রাজনৈতিক জীবন ও আনুগত্যকে নতুন ধরণের ঐক্যের নীতির উপর, নতুন রাজনৈতিক পরিচিতির উপর ভিত্তি করতে হয়।[২৭]

নতুন বাস্তবতা অভিজ্ঞানের প্রক্রিয়া এবং তার মধ্যে ও তার উপরে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা নানা ধরণের চেতনার জন্ম দিয়েছিল। তার কারণ, ভারতীয় জনগণ ও আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের কাছে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো নজীর ছিল না, যা তাদের কার্যপ্রণালীর পথপ্রদর্শন করতে পারবে। তাদের চোখের সামনে যে সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল, তার সম্পর্কেও তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।[২৮] এই পরিস্থিতিতে ব্যাপকতর যোগাযোগের জন্য তারা যে জাতি (caste), স্থান, আঞ্চলিকতা, 'জাতি' (race), ধর্ম, ধর্মীয় উপগোষ্ঠী (sect) এবং পেশা ইত্যাদি আত্ম-পরিচিতির প্রাক্-আধুনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যবহার করবেন এবং নতুন পরিচিতি ও মতাদর্শগুলির কিছু কিছু যে সেগুলির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, তা অনিবার্য ছিল।

জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা এমন কি জাতিভেদ প্রথা (ধর্ম ও জাতি থেকে স্বতন্ত্রভাবে) ছিল নতুন ধরণের চেতনা, নতুন মতাদর্শ, রাজনৈতিক সংগঠনের নতুন নতুন নীতি। মূলগতভাবে এগুলি আধুনিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালের ঘটনা। জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িতাবাদ উভয়েই অতীতের

কাছে আবেদন করতে পারে, অতীতের মতাদর্শ, আন্দোলন এবং ইতিহাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এ দুটির কোনোটিই অতীতে ছিল। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে এবং ভারতীয় জনগণ বা ভারতীয় জাতীয়তার নতুন পরিচিতির চেতনা হিসেবে জাতীয়তাবাদ ছিল বিষয়গত বাস্তবতার যথাযথ বা ন্যায়সঙ্গত চেতনা। অর্থাৎ, আধুনিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য, এবং বিশেষভাবে সাধারণ শত্রু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যের প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে ভারতীয় জনগণের সাধারণ স্বার্থের যে পরিচিতির বিকাশ ঘটেছিল, জাতীয়তাবাদ ছিল তার ন্যায়সঙ্গত চেতনা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হাত থেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রতিনিধি ছিল জাতীয়তাবাদ।[২৯] সেই মুহূর্তে তা ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল, কারণ তা একটি বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান দিয়েছিল—ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিপরীতে জাতীয় মুক্তি।[৩০]

ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবী একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সাধারণ সাংস্কৃতিক বিকাশের চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ছিল—এবং এটা উল্লেখযোগ্য, যে এই দাবীকে সহজেই জাতীয়তাবাদের মধ্যে স্থান দেওয়া গিয়েছিল। একইভাবে, আধুনিক শ্রেণী সচেতনতা সঠিকভাবে সর্বভারতীয় স্তরে আধুনিক সামাজিক শ্রেণী ও স্তরদের সাধারণ স্বার্থের প্রতিফলন করেছিল। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে তিনটি ক্ষেত্রেই উল্লিখিত চেতনার বৃদ্ধি ও প্রসার একটি কঠিন ও দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়া হয়েছিল, কারণ ঐ চেতনা ছিল সম্পূর্ণ নতুন, তার ভিত্তি ছিল নতুন ধরণের কল্পনা ও নতুন চিন্তা পদ্ধতি। অন্যদিকে, ভারতীয় সমাজের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ও গোষ্ঠীর মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশ হওয়ার একটি কারণ ছিল, তারা যথাযথভাবে নতুন জাতীয় চেতনা, ভাষাগত সাংস্কৃতিক সংহতি এবং শ্রেণী পরিচিতির বিকাশ ঘটাতে পারে নি।[৩১] এই ব্যর্থতা জড়িয়েছিল উদীয়মান জটিল সমাজ কাঠামো এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উচ্চমাত্রার অস্বচ্ছতার সঙ্গে এবং তার ফলে প্রথমদিকে বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন অংশের পক্ষে তার ত্রুটিপূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে।[৩২] সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল বিগত ১৫০ বছরের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভ্রান্ত চেতনা, কারণ বিষয়গত ভাবে হিন্দুদের ও মুসলিমদের স্বার্থের মধ্যে কোনো বাস্তব সংঘাতের অস্তিত্ব ছিল না।[৩৩] অবশ্যই, বাস্তব জীবনে একটি সামাজিক বৈচিত্র্য বা পৃথকীভবনের উপাদান হিসেবে ধর্মের অস্তিত্ব ছিল ; কিন্তু এই বৈচিত্র্যকে রাজনৈতিক সংগঠন, গণসমাবেশ ও কর্মপ্রণালীর ভিত্তিতে পরিণত করা, বা একেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রধান আভ্যন্তরীণ বিরোধ রূপে চিহ্নিত করা অবশ্যই ভ্রান্ত চেতনার একটি দিক ছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা বা শ্রেণী সচেতনতার মত এটি বাস্তব সংঘাত ভিত্তিক

চেতনা ছিল না। বরং তার ভিত্তি ছিল বাস্তব সংঘাতের একটি বিকৃত প্রতিফলন অথবা বাস্তব সংঘাতের 'পরিবর্ত'। সাম্প্রদায়িকতাবাদের অন্য দিকটির, অর্থাৎ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমস্ত সদস্যের স্বার্থের সংহতি বা ধর্ম-ভিত্তিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কল্প-কাহিনীরও কোনো বিষয়গত ভিত্তি ছিল না।[৩৪] হিন্দু ও মুসলিম স্বার্থ, অথবা হিন্দু ও মুসলিম মন, বা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় যাদের বলা হত, সে সব ছিল জমাটবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভ্রান্ত চেতনা, অথবা লেখক বা মন্তব্যকার কর্তৃক এই ভ্রান্ত চেতনার জাল ভেদ করায় ব্যর্থতা।[৩৫] এখানে আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বাস্তবতার একটি আংশিক দর্শন নয়, যেখানে সাম্প্রদায়িক দিকটি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু জাতীয় দিকটি দেখা হয় না। তার কারণ, বাস্তবতার কোনো সাম্প্রদায়িক দিকের অস্তিত্ব ছিল না। সাম্প্রদায়িকতাবাদ বাস্তবতার একটি মিথ্যা দর্শন। সুতরাং ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিষয়গত বিরোধ ছিল জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবের দক্ষ (বা 'বাস্তব') কারণ; কিন্তু হিন্দু-মুসলীম বিরোধের যেহেতু কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না, তাই তা সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদ্ভবের দক্ষ (বা 'বাস্তব') কারণও ছিল না।

একথাও মনে রাখতে হবে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা ধর্মকে ঘিরে পরিচিতি গঠন আধুনিক ভারতে উত্থিত একমাত্র ভ্রান্ত চেতনা নয়। জাতিভিত্তিক পরিচিতি ছিল এরকম আরেকটি ভ্রান্ত চেতনা। এ ছাড়া আরো অনেক ছিল। ভারতীয়দের মধ্যে প্রশস্ততর ঐক্য ও যোগাযোগের চাহিদা পূরণের জন্য উদ্ভূত ভ্রান্ত চেতনার একটি দর্শনীয় উদাহরণ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম' গানটির প্রথম রূপটিতে। লেখক এতে সাত কোটি কণ্ঠের ঐকতান ও চৌদ্দ কোটি বাহুর ঐক্যবদ্ধ উত্থানের চিত্রাঙ্কন করেন। এখানে ঐক্য, আনুগত্য ও দেশপ্রেমের কোন নীতি উচ্চারিত হচ্ছিল? সাত কোটি সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা ছিল না, হিন্দুদের ছিল না, এমন কি বাঙালীদেরও ছিল না। এটা ছিল বৃটিশ-সৃষ্ট সমসাময়িক বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর জনসংখ্যা। ঐ প্রেসিডেন্সীতে বাঙালী ছাড়াও ছিলেন ওড়িয়া, অসমীয়া এবং বিহারীগণ! একইভাবে, ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্ম ও প্রসার ভারতীয় চরিত্র বা ভারতীয় ঐতিহাসিক বিকাশের বিরল চরিত্রের জন্য হয় নি। অন্যান্য সমাজেও, একই ধরণের অবস্থায় বড় ধরণের সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা সাম্প্রদায়িক ধরণের মতাদর্শ সৃষ্ট হয়েছে, যদিও তার মধ্যে সেই সমাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পার্থক্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আয়ার্ল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, লেবানন ও শ্রীলঙ্কার কথা।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের যে কোনো ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা ছিল না তা আরেকভাবে দেখা যায় যদি বোঝা যায় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ তার নিজের জন্মগত

সত্য নয়, বা তা যে "ভারতের ঐতিহাসিক বিকাশের যুক্তিসঙ্গত ও অনিবার্য ফল" নয়। তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক উৎস ও উদ্ভবের কারণ ছিল, কিন্তু তা ঐতিহাসিক বা সামাজিকভাবে অনিবার্য ছিল না। বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে একটি স্বাভাবিক বা অনিবার্য সামাজিক ঘটনা বলা যায় না, যেমনভাবে বলা যায় যে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সামাজিক শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব থেকে জাতীয়তাবাদ ও সামাজিক শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্য ফলশ্রুতি। অন্যভাবে বলা যায়, সাম্প্রদায়িকতাবাদ সামাজিক বাস্তবতার ধারণাগত রূপ নয়—তা ঐ বাস্তবতার ভ্রান্ত চেতনা।

একটু স্বগতোক্তি করে একটা ধাঁধার সমাধান করা যায়: সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ও লেখকগোষ্ঠীর অনেকে কেন আজও সাম্প্রতিক ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক পাঠ নিয়ে থাকেন? একজন বৃটিশ, আমেরিকান বা ফরাসী লেখক কি করে সাম্প্রদায়িকতাবাদী হতে পারেন? তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি পুরাতন সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির অনুবর্তী, এবং তা ঐ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কিছু ইতিহাস-দর্শন সম্বন্ধীয় বা মতাদর্শগত উৎসের অংশীদার। পুরাতন সরকারী ব্যক্তিদের মতই, এই লেখকরা ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে জাতীয়তাবাদের ন্যায্যতা অস্বীকার করেন, এবং আধুনিক ভারতীয় সমাজে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় সমাজ বিকাশের স্বার্থের বিরোধকে কেন্দ্রীয় বিরোধ হিসেবে দেখতে অস্বীকার করেন। ফলে জাতীয় আন্দোলনের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁদের হাতে থাকে শুধু সম্প্রদায়গত, জাতিগত, ভাষাগত, আঞ্চলিক, প্রাদেশিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের পারস্পরিক খেলা ও সংযোগ। সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। সুতরাং ক্রমবর্ধমান ভারতীয় রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও আন্দোলন ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে চালিত না হয়ে থাকলে, তা নিশ্চয় অন্য কোনো ভারতীয় সামাজিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। একথা মনে করা হয় যে সে জন্য ভারতের ইতিহাস ও সমাজ বিকাশ একটি বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি করে। সেখানে সবচেয়ে সহজলভ্য ভিত্তি হল ধর্ম। যদি ভারতের জাতীয় আন্দোলন একটি জাতীয়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন না হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয় হিন্দু, বা ব্রাহ্মণ, বা আর্য সমাজপন্থী, বা বাঙালী আধিপত্যের জন্য আন্দোলন ছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ব্যবহার করে গোড়ার দিকের বহু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রবিদ্‌ ও লেখক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ন্যায়সঙ্গত চরিত্রকে, বা তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তি ছিল ১৯০৬ সালের 'মুসলিম প্রতিনিধিবর্গের' প্রতি লর্ড মিন্টোর উত্তর:

"আপনাদের সম্ভাষণের সার হল··· (যে) মহামেডান সম্প্রদায়কে সম্প্রদায়গতভাবে প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। আপনারা দেখিয়েছেন যে বহু ক্ষেত্রে নির্বা-

চকমণ্ডলী বর্তমানে যেভাবে সংগঠিত তাতে মহামেডান প্রার্থী নির্বাচিত হবেন এমন আশা করা যায় না. এবং যদি কোনোক্রমে তাঁরা তা করেন, তবে তা হতে পারে শুধু সেই প্রার্থীর দৃষ্টিভঙ্গিকে **তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের বিরোধী এক সংখ্যাগরিষ্ঠের** দৃষ্টিভঙ্গির কাছে বিসর্জন দেওয়া, এবং নিজের সম্প্রদায়ের কোনোভাবেই প্রতিনিধিত্ব না করা·· আমি সর্বতোভাবে আপনাদের সঙ্গে একমত·· ভারতে যে নির্বাচনী প্রতিনিধিত্ব **এই মহাদেশের জনগণের সম্প্রদায়গত** বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করে **একটি ব্যক্তিগত ভোটদানের অধিকার** দিতে চায়, তা যে ক্ষতিকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য এ বিষয়ে আমার প্রত্যয় দৃঢ়, আমার বিশ্বাস আপনাদেরও।"[৩৬] (জোর লেখকের)

এই দুটি বক্তব্য, যে ভারত একটি জাতি নয় বা জাতিতে পরিণত হচ্ছে না, বরং ভারতীয় সমাজ পূর্বে থেকে এবং বর্তমানে সুসংবদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ঔপনিবেশিক প্রশাসক ও লেখকরা অগণিতবার প্রচার করেন। ১৮৮৮ সালে ভাইসরয় লর্ড ডাফ্‌রিন লেখেন: "আমাদের ভারতীয় ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য হল যেন দুই মেরুর মত দূরবর্তী দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তার বিভাজন ··।"[৩৭] ১৯০৯-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে **দি ইকনমিস্ট** লেখে: "ভারতের রাজনৈতিক পরমাণু যাই হোক না কেন, তা অবশ্যই পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক তত্ত্বের ব্যক্তি নয়, বরং কোন এক রকম সম্প্রদায়।"[৩৮] ১৯২৩ সালে সি. এইচ. টাইন লেখেন যে ভারতে ধর্ম হল জাতিত্বের পরিবর্ত, এবং বিশেষত মুসলিমরা "সব অর্থেই একটি জাতি, এবং সরকারকে তাদের সেভাবেই দেখতে হবে।"[৩৯] লর্ড আরউইনের চোখে, ১৯২৯ সালে, ভারতীয় নেতারা ছিলেন "মহান্ সম্প্রদায়গুলির"[৪০] নেতৃত্ব। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটরি কমিশনের মত সাম্প্রদায়িকতার কারণ ছিল দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম।[৪১]

সুতরাং, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনেতা, কর্মচারী ও লেখকরা যে সাধারণত সাম্প্রদায়িকতাবাদপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিতেন ও নেন তার কারণ কেবল এই ছিল না যে তাঁরা 'কপট' ছিলেন বা মনোগতভাবে হিন্দু বা মুসলিম পন্থী ছিলেন বা আজও আছেন। তা তাঁদের ব্যর্থতারও অবধারিত ফল ছিল। ঐ ব্যর্থতা আবার ছিল ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। তাঁদের ব্যর্থতার মূল কথা ছিল উপনিবেশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে যথাযথভাবে বুঝতে না পারা, অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের বিকাশমান বিরোধ ও জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে বুঝতে না পারা।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া

সম্পর্কে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ। একই ভাবে, তৎকালীন সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঔপনিবেশিক ভারতের মূল বিরোধকে ধরতে পারত না। সে যে উত্থান বা আধিপত্য বা শোষণকে সর্বাপেক্ষা ভয় পেত তা ঔপনিবেশিতাবাদ নয়, হিন্দুদের, মুসলিমদের বা শিখদেব; তার শত্রু ছিল ঔপনিবেশিকতাবাদী নয়, হিন্দু বা মুসলিমরা। এই সাধারণ দিশা, এবং সাধারণ স্বার্থ, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সহযোগিতা ও মৈত্রী সম্ভবপর করে তুলেছিল। প্রশ্নটা সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের সচেতন দালাল হওয়ার জায়গা ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ এক সময়ে হিন্দুপন্থী ও অন্য সময়ে মুসলিমপন্থী হওয়ার প্রশ্নও ছিল না, বা তার পক্ষে নীতিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সমর্থক হওয়ার প্রশ্নও ছিল না। সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে মৈত্রী অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কারণ সাম্রাজ্যবাদ সেই সমস্ত শক্তির সঙ্গে মৈত্রীর জন্য সচেষ্ট ছিল যারা ঔপনিবেশিক সমাজের মূল বিরোধেব উপর জোর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার দিকে এগোয় নি।[৪২] একই সঙ্গে, ঔপনিবেশিক মতাদর্শ ও ঔপনিবেশিক নীতি সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্য যে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক স্থান করে দিয়েছিল তা থেকে তার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে। এই জন্যই এক গভীর ও সূক্ষ্ম কারণে বিংশ শতাব্দীতে, ও বিশেষত ১৯৩৭-এর পব, সাম্প্রদায়িকতাবাদ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ভিত্তিতে পরিণত হয়।[৪৩]

আমরা এবার বর্তমান পরিচ্ছেদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসতে পারি: যেখানে বিভিন্ন ধর্ম বর্তমান সেখানে কেন সাম্প্রদায়িকতাবাদেব উত্থান হবেই এবং তা জয়ী হবেই, তাব কোনো অন্তর্নিহিত ও অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ নেই, ঠিক যেমন বহুনরগোষ্ঠী সমৃদ্ধ সমাজে জাতিভেদ বা বহু জাতভিত্তিক সমাজে জাতিভেদ প্রথা থাকবেই, এমন কথা বলা যায় না। বহু সময়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদের 'অন্তর্নিহিত' কারণ বলে যেগুলিকে মনে করা হয়, যথা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে একটি মৌলিক অসঙ্গতি বা 'বিভাজন যা কিছুতেই সারানো যাবে না', একটি বহুযুগ ব্যাপী ও অবিরাম স্বার্থের সংঘাত, বা তাদের মধ্যের বহু শতাব্দী ব্যাপী কৃষ্টিগত, ধর্মীয় ও জাতীয় বৈরিতা, দুটি নির্দিষ্ট কৃষ্টি বা সভ্যতা যারা "পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকত এবং যাদের মিলন হত কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে" তাদের এক মৌলিক সংঘাত, "দুটি সমাজ ব্যবস্থার" মীমাংসার অসাধ্য চরিত্র, শাসক ও শাসিত হওয়ার ঐতিহাসিক স্মৃতি, স্বতন্ত্র 'ইতিহাস' ও তার তিক্ত স্মৃতি —এ সব আসলে সাম্প্রদায়িকতাবাদের কারণ নয়, বরং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মতাদর্শ কর্তৃক সৃষ্ট ও ঐ মতাদর্শের মৌলিক অঙ্গ। বস্তুত, এ কথা দেখানো যায় যে এইগুলি ও অনুরূপ অন্যান্য 'অন্তর্নিহিত' কারণগুলি অতীতে বা বর্তমানে ভারতে ছিল না। কোন নাগরিক, বা রাজনৈতিক কর্মী, বা ইতিহাসবিদ্ এগুলিকে কতটা

গ্রহণ করেন, তা থেকে তিনি বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে সফলভাবে প্রতিহত করতে কতটা ব্যর্থ হয়েছেন তার পরিমাণগত বিচার করা যায়, কারণ এগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদের কারণ নয়, বরং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের ফসল। এই প্রসঙ্গে আমরা আরেকবার উল্লেখ করতে পারি যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসঙ্গে গবেষণার ক্ষেত্রে শুধু যে সঠিক উত্তর খুঁজতে হবে তা নয়, বরং প্রশ্নগুলিকে পর্যন্ত ঠিকভাবে গঠন করতে হবে। একবার কেউ সাম্প্রদায়িকতাবাদীর শর্তে স্পষ্ট প্রশ্ন করতে রাজি হন তাহলে উত্তরগুলিও সাম্প্রদায়িক চৌহদ্দির মধ্যেই থাকার প্রবণতা দেখাবে। সুতরাং কেউ যদি বাস্তব পরিস্থিতি ও তার ভ্রান্ত সাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্যেও পৃথকীকরণ না করে, তবে সে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে ডুবে যেতে পারে এবং মনোগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও ভুল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ও উত্তর দিতে শুরু করতে পারে।

[পাঁচ]

হয়ত, সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসঙ্গে সঠিক প্রশ্ন এই নয়, যে তার উদ্ভব কেন হয়েছিল? আমরা দেখেছি যে তা অন্তত কিছুটা পরিমাণে নতুন বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার প্রক্রিয়া এবং নতুন পরিচিতি গঠন প্রক্রিয়ায় অন্তর্নিহিত ছিল। ইতিহাসে সর্বত্র, একই ধরণের প্রক্রিয়া থাকলে এরকম ভ্রান্ত চেতনা ও মতাদর্শের উদয় হয়েছে, কিন্তু সেগুলি সর্বদা বেঁচে থাকে নি বা ছড়িয়ে পড়েনি এবং বিকশিত হয় নি। অনেকগুলি একটি নির্দিষ্ট পর্বের জন্য শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে এবং তারপর যখন অধিকতর যথার্থ নতুন চেতনা ও পরিচিতির বিকাশ ঘটেছে তখন পিছু হটেছে। ভারতেও, সাম্প্রদায়িকতাবাদ একমাত্র ভ্রান্ত চেতনা নয়, যার উদয় ঘটেছিল। নির্দিষ্ট সময়ে ও কিছু অঞ্চলে, জাতিবৈষম্যবাদ ও প্রাদেশিকতা ছিল আপাতঃভাবে অনেক বেশী শক্তিশালী ও 'সহজাত'।[৪৪] কিন্তু ১৯২০-র ও ১৯৩০-এর দশকে সাধারণভাবে এগুলিকে দ্রুত অতিক্রম করা গিয়েছিল—যদিও সাম্প্রতিককালে এগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এমন কি সাম্প্রদায়িকতাবাদও ১৯৩৭ পর্যন্ত নিম্নস্তরে আটক ছিল। বন্দে মাতরমের প্রথম রূপের ভ্রান্ত চেতনা, আঞ্চলিক-দেশপ্রেম, বঙ্কিমের জীবদ্দশাও কাটাতে পারে নি। ঔপন্যাসিক স্বয়ং সাত কোটি কণ্ঠকে কুড়ি কোটি করে দেন—যদিও এবারও রাজন্যবর্গ-শাসিত রাজ্যগুলিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়। এগুলি ভারতীয় জনগণের মধ্যেও যুক্ত হয় কেবল ১৯৩০-এর দশকে, 'স্টেটস পিপলস' মুভমেন্ট জন্মলাভ করার পরে।

সুতরাং যথাযথ প্রশ্ন হল: কেন এবং কোন প্রক্রিয়াতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধি, প্রসার এবং পুষ্টি হয়েছিল? কি করে তা সামাজিক বাস্তবতার এত-

খানি ব্যাপক অঙ্গে পরিণত হয়েছিল? লক্ষ লক্ষ মানুষ কেন অনুভব করতে শুরু করেছিল যে সারা দেশে তাদের সমধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাদের সমস্বার্থ, নিছক ধর্মীয় ঐক্যের কারণেই? হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে প্রকৃত কোন স্বার্থের সংঘাত না থাকলে কি ভাবে ১৯৪৬-এর মধ্যে তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে খুনের নেশা জাগানো সম্ভব হয়েছিল? অন্য কথায়, ঐতিহাসিকের কাজ প্রধানত **সাম্প্রদায়িকতাবাদের উৎস** সন্ধান করা নয়, বরং তার বৃদ্ধি ও একের পর এক পর্বে তার সামাজিক ভিত্তি সম্প্রসারণের জন্য **ভারতীয় সমাজের কোন কারণ বা উপাদান** দায়ি ছিল তা অনুসন্ধান করা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জাত, ভাষা ও প্রদেশভিত্তিক ফারাক, বা 'ভদ্র' ও 'অভদ্রের' ফারাক, আর্য-সমাজপন্থী ও সনাতনপন্থীর, ধর্মসংস্কারপন্থী ও পুনরুত্থানবাদীর মধ্যে ফারাক, সবই বাস্তব জীবনে উপস্থিত ছিল, এবং এগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সাম্প্রদায়িক-ধাঁচের আন্দোলনের 'উৎসের' ভূমিকা পালন করতে পারত, ঠিক যেমন ধর্মীয় প্রভেদ ছিল, এবং তাকে সাম্প্রদায়িকতাবাদের 'উৎস' হিসেবে দেখা যেত।[৪৫]

এই কারণ ও উপাদানগুলি ছিল, এবং এদের বিশ্লেষণ করা যায়। একথা বলা যথেষ্ট নয় যে জাতীয়তাবাদ বা শ্রেণী সংগ্রাম যে অর্থে বাস্তব পারিস্থিতির অন্তর্নিহিত ছিল, সাম্প্রদায়িকতাবাদ সে অর্থে ছিল না, বা তা ভ্রান্ত চেতনা ছিল, কারণ সাম্প্রদায়িকতাবাদ কেবল কিছু বুদ্ধিমান, ক্ষমতা-লোলুপ রাজনীতিবিদ্ ও প্রশাসকের গড়া নিছক চক্রান্তও ছিল না।[৪৬] ঔপনিবেশিক ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এমন কিছু অবশ্যই ছিল যা তার উদ্ভব ও বৃদ্ধির প্রতি সহায়ক ছিল। তা শূন্য থেকে উদ্ভূত হয় নি, এবং তা শূন্যে ঝুলে ছিলও না। তার একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক, অর্থাৎ কাঠামোগত ভিত্তি ছিল। তা জনগণের কিছু আকাঙ্ক্ষার, তাঁদের জীবনের পরিস্থিতির, কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি সাড়া দিয়েছিল। একথা ঠিক, যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল দক্ষ প্রচার এবং ধর্মীয় পরিচিতির সুকৌশল পরিচালনা, কারণ কোন প্রকৃত সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বা ধর্ম-ভিত্তিক সম্প্রদায় ছিল না, কিন্তু সেরকম প্রচার ও পরিচালনা ভারতীয় জনগণের বৃহৎ অংশের মধ্যে সফল হতে পারত কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট ও বিশেষ সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, এবং নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শর্তজনিত সমস্যার ফলে।[৪৭] অর্থাৎ, যদিও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বাস্তব জগতে কোনো বিষয়গত ভিত্তি ছিল না, তা ছিল একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির ভ্রান্ত উপলব্ধি এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও বাস্তবতার মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল, 'যারা পরস্পরের সদৃশ ছিল একরাশ মধ্যস্থতা সহযোগে'। এই দিকটিকে আমরা অনেকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রতিনিধিত্ব করত **বাস্তবতার এক বিকৃত বা ন্যায়ভ্রষ্ট প্রতিফলনের**। অর্থাৎ, তা বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতো এক

অন্যায়, বিকৃত রূপে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন অংশের আশা, ভীতি ও অনুভূতির প্রতিফলন ঘটিয়েছিল, বিশেষত পরের দিকের পর্বে কিন্তু ঐ প্রতিফলন ছিল বিকৃত, 'মিথ্যা' ধরণের। তা বিকৃত ছিল, কারণ তা যে সমাধানগুলি প্রস্তাব করেছিল, সেগুলি গৃহীত হলেও যে সমস্যাগুলি সমাধান করার কথা সেগুলির সমাধান হত না, তাই সেগুলি বাস্তব সমাধান ছিল না। জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ছিল একটি বস্তুগত দিক, কিন্তু তা লাঘব করার জন্য হিন্দুদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ। উদাহরণস্বরূপ, ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলিমরা নিপীড়িত ছিলেন মুসলিম রূপে না, ভারতীয় শ্রমিক, কৃষক, বেকার যুবক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি রূপে। আর, হিন্দুরাও একইভাবে নিপীড়িত ছিলেন। আর, তাঁরা একে অপরের কষ্টের জন্য দায়ী ছিলেন না। অন্য যে প্রধান আধুনিক মিথ্যা চেতনা, সেই ফ্যাসীবাদের সঙ্গে পরিস্থিতি এই দিক থেকে সদৃশ ছিল। ফ্যাসীবাদেরও সামাজিক উৎস ছিল এবং তাও ছিল আশু সমাধানপ্রার্থী বাস্তবতার একটি প্রতিফলন; কিন্তু তা ছিল একটি বিকৃত প্রতিফলন, বা ঐ বাস্তবতা। মিথ্যা উপলব্ধি, সামাজিক ও ঐতিহাসিক উৎসের যুক্তিসঙ্গত ও অনিবার্য ফসল নয়। অন্যদিকে, উপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ ছিল মৌলিকভাবে প্রকৃত একটি চেতনা কারণ সমাজ বিকাশের পথ উন্মুক্ত হওয়ার জন্য প্রাথমিক আবশ্যক শর্ত ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলা। ঠিক একই কারণে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ ছিল মিথ্যা উপলব্ধি কারণ তা জনগণের কোনো সমস্যা সমাধানে সাহায্য করত না, বরং শ্রেণী বিভাজনকে লুকিয়ে রাখত। একই সময়ে, যদি সামাজিক পরিস্থিতির চাহিদা হয় নতুন সংহতি ও নতুন পরিচিতির, এবং সমাজ বদলের লড়াইয়ের জন্য যদি প্রয়োজন হয় সংগঠন ও আন্দোলনের নতুন নীতি, এবং যদি সমাজের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ও খণ্ডে পরিস্থিতির ডাকে সাড়া দিয়ে জাতীয় ও শ্রেণীগত সচেতনতার বিকাশ না ঘটে, তাহলে সাম্প্রদায়িক ও এই ধরণের অন্য পরিচিতি ও রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ ও শূন্যস্থান দখল করার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ বাস্তবতার সঠিক প্রতিফলন ও প্রতিনিধিত্ব না ঘটলে তা বিকৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে ও তার সেইরকম প্রতিনিধিত্ব হবে।

তবে এই বিকৃত প্রতিফলন এমন কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে যাদের স্বার্থসিদ্ধি হত না, বা এমন কি যাদের স্বার্থহানী হত, যদি সমাজের প্রকৃত সমস্যাবলীর ফলে এমন রাজনীতি ও মতাদর্শ উদ্ভূত হত যা তাদের সমাধানের জন্য প্রাসঙ্গিক হত। উল্লিখিত গোষ্ঠীস্বার্থগুলির 'চাহিদা' ছিল বাস্তবতার ঐ বিকৃত প্রতিফলনের অর্থাৎ মিথ্যা চেতনার, উত্থান ও প্রসার, কারণ তা তাদের ক্ষেত্রে ছিল যথাযথ প্রতিনিধিত্ববাহী এবং জনগণের ক্ষেত্রে ছিল কৌশলে পরিচালনা করার প্রতিনিধি। উদাহরণস্বরূপ, এই কথা বলা যায় ভারতে ঔপনিবেশিক

শাসকদের এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী ও স্তরসমূহের চাহিদার ক্ষেত্রে।[৪৮] তা ছাড়া ছিল সেই সমস্ত মধ্য শ্রেণীগুলি, যাদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা অন্যান্য অনুরূপ বিকৃতির প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যারা সেগুলিকে ব্যবহার করে স্বল্প মেয়াদে নিজেদের স্বার্থের পৃষ্ঠপোষণ করতে পারত।[৪৯] তদুপরি, মধ্যশ্রেণীভুক্ত বহু গোষ্ঠী বিশ্বাস করত যে তারা সাম্প্রদায়িকতাবাদের মাধ্যমে অনেক সহজে বস্তুগত সম্পদ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। সবশেষে, সমাজের এমন অংশ ছিল, যথা কৃষক শ্রমিক, যারা নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে দেখত বিকৃতরূপে, যারা নিজেদের সামাজিক স্বার্থ ও তার রাজনৈতিক প্রতিফলনের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত না, এবং যারা তার ফলে নিজেদের সামাজিক সংগ্রামকে দেখেছিল সাম্প্রদায়িক (বা জাতিভেদপন্থী) আয়নাতে।[৫০]

সাম্প্রদায়িকতাবাদকে মিথ্যা চেতনা বলে দেখার বিশ্লেষণগত মূল্য এখানেই। একদিকে, সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিষয়গতভাবে মিথ্যা চরিত্র দেখা যায় এবং তাই তার উপরিস্তরের ছবি গ্রহণ করা যায় না ; অন্যদিকে একথাও বোঝা যায় যে মিথ্যা চেতনার বিকাশ হত না, যদি না তা, ন্যায়ভ্রষ্টভাবে হলেও, সামাজিক বাস্তবতার কোনো দিকের প্রতিফলন করত এবং কোনো সামাজিক গোষ্ঠী, শ্রেণী ও স্বার্থের একটি সামাজিক কর্মের কাজে লাগত।[৫১] সমাজবিজ্ঞানী ও নাগরিকদের দায়িত্ব, কোন নির্দিষ্ট ও বিশেষ পরিস্থিতি এই বিশেষ মিথ্যা চেতনার বৃদ্ধির জন্য দায়ী তার অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করা।[৫২] তার পিছনে রয়েছে কোন সামাজিক শক্তি ? তা কেন কিছু লোককে আকর্ষণ করে ? তা কোন প্রেরণা যোগায় ? তার অনুবর্তীদের সামাজিক পরিস্থিতিতে কি ছিল, যার প্রতি তা সাড়া দিয়েছিল ? তা কোন সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করেছিল ? তা কাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিল বা স্বার্থসিদ্ধি করেছিল ? তা থেকে কারা লাভবান হয়েছিল ? অতীতে, অনেকে এই প্রশ্নগুলি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ও তার ফলে সাম্প্রদায়িকতাবাদের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। অন্য অনেকে যথার্থ উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তার ফলে জাতীয়তাবাদ, নৈতিকতা ও মানবিকতার প্রতি তাঁদের আবেদন, এবং প্রতিবাদসূচক উপবাস এবং রাজনৈতিক চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামে সফল হতে পারেন নি। উদাহরণস্বরূপ, গান্ধীর মত বহু জাতীয়তাবাদী, জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা এবং উদারপন্থীরা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে তার ঐতিহাসিক ভিত্তির নিরীখে, অথবা, বিকৃত রূপে হলেও, বাস্তবতার অংশ রূপে, উপলব্ধি করেন নি, এবং তার ফলে তাঁরা তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি সুস্পষ্ট বা দক্ষ রণনীতি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তাছাড়া, প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলা যায় যে সাম্প্রদায়িক চেতনার মিথ্যা চরিত্র

বুঝতে পারা বা প্রমাণ করা যথেষ্ট ছিল না। ঔপনিবেশিক সমাজ, এবং আজকের ধনবাদী সমাজ, চিরন্তন ভারসাম্যহীনতায় থাকার প্রবণতা দেখায় এবং তার ফলে ক্রমান্বয়ে নানা রকম মিথ্যা চেতনার জন্ম দিতে থাকে। পৌরাণিক অসুরের মতই, একটিকে বধ করলে দ্রুত আরেকটি সৃষ্ট হবে। এই মিথ্যা চেতনাকে নিছক উদঘাটন করলে তা অপসৃত হবে না। সামাজিক পরিস্থিতি, যা একটি বিকৃত পথে সমাধানের 'চেষ্টা' করছিল, এবং যা মিথ্যা চেতনার জমি তৈরী করছিল, তার রূপান্তর ঘটানো আবশ্যক ছিল। অনেক সময়ে শুধু যে সামাজিক বাস্তবতার ব্যাখ্যাগুলি ভ্রান্ত ছিল তা নয়, বরং বাস্তবতাই 'ভ্রান্ত', বা 'নিজের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে'। তাই প্রয়োজন শুধু তাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং তার ভ্রান্ত বা বিকৃত ব্যাখ্যার সমালোচনা করা নয়, বরং প্রয়োজন তার পরিবর্তন সাধন করা, তাকে 'পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে' তাকে 'শুধরে' দেওয়া। মিথ্যা চেতনার সমালোচনা এবং তা যে সামাজিক পরিস্থিতির ভ্রান্ত উপলব্ধি বা বিকৃত প্রতিফলন সেই কথা প্রকাশ্যে দেখানোর সঙ্গে, একই সময়ে তা হল সামাজিক পরিস্থিতিকে উপলব্ধি ও পরিবর্তন করার সংগ্রামের প্রয়োজনীয় অংশ। (আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন রূপের উপর একটি আলোচনার জন্য সংযোজন দ্রষ্টব্য।)

টীকা

১। এই অর্থে, একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই ধারণার ঘনীভূত নির্যাস, কারণ তখন যে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার ঘটনাকে দেখা হয় তার 'সম্প্রদায়ের' উপর এ আক্রমণ এবং হত্যাকারীর 'সম্প্রদায়ের' প্রতিরক্ষা।

২। একইভাবে, বেশী হিন্দু চাকরী পেলে তাকে দেখা হয় হিন্দু 'আধিপত্যের' সমার্থক হিসেবে, যাকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধিক্কার জানায় ও আক্রমণ করে এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সোল্লাস সম্বর্ধনা জানায় এবং সমর্থন করে।

৩। এই পার্থক্য প্রথম দেখান কে বি কৃষ্ণ, তাঁর "দ্য প্রব্লেম অফ মাইনরিটিস"-এ। দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৭৭-৭৯। এছাড়া দ্রষ্টব্য ডব্লিউ সি. স্মিথ, "মডার্ন ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ১৯৪, ১৯৬-৭।

৪। দ্রষ্টব্য, তুফাইল আহমেদ ম্যাঙ্গালোরি, "মুসলমানো কা রোশন মুস্তাকবিল": "নির্বাচনের এই প্রথা (অর্থাৎ সতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী) উচ্চশ্রেণী নিঃসৃত ব্যক্তিদের এই সুবিধা পেতে দেয় যে তারা নিজ সম্প্রদায়ের ভোটে নির্বাচিত সদস্য হতে পারে এবং তারপর, সদস্য হয়ে, হিন্দুদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে পারে। শহরে দাঙ্গা হলে দরিদ্র হিন্দু ও মুসলিমদের মাথা ফাটে, আর সিভিল লাইনসে [একটি শহরের উচ্চ শ্রেণীর এলাকায়] হিন্দু ও মুসলিমরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করতে পারে। তারা একে অন্যের সঙ্গে খানাপিনা করে। তাদের মেয়েদের বহুলাংশে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য থাকে। এসব কারণে তারা বোর্ড ও কাউন্সিলে একে অপরের জন্য ভোট দিতে পারে। তারা পরস্পরকে সাহায্য করে। অন্যদিকে, একজন হিন্দু সদস্য কোনোভাবে একজন দরিদ্র

মুসলিমের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে না। ফলে একজন দরিদ্র মুসলিম সর্বতোভাবে শোষিত ও বঞ্চিত থাকে।" পৃঃ ৪১৯-২০। (উর্দু থেকে অনুদিত।)

৫। সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে মধ্যযুগের ইতিহাস আধুনিক ভারতকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ অর্পণ করে নি, বরং মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এক এক বিশেষ দর্শন, যা স্বয়ং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মতাদর্শ এবং মতাদর্শের ফসল, তাই সাম্প্রদায়িকতাবাদকে আনে।

৬। একইভাবে, চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, সৈয়দ আমেদ খান এবং রাজা শিবপ্রসাদ ১৮৮০-র দশকে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছিলেন জাতি (race), জন্ম, সামাজিক মর্যাদা ও জাতবিচারের ভিত্তিতে উচ্চশ্রেণীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে। এর প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পরই সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রশস্ততর মতাদর্শ ব্যবহার করা হয়েছিল।

৭। দ্রষ্টব্য জওহরলাল নেহরু (১৯৩৬ সালে): 'একথা যেন কখনো বিস্মরণ না হয়, যে ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি আধুনিক ঘটনা যা আমাদের চোখের সামনে গড়ে উঠেছে।' [illegible] এরপর থেকে নি রচ), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯। হুমায়ুন কবীর, 'কথা শোনা যাচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতাবাদের জোয়ারের'। আমি মনে করি এখাটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। বস্তুত, সাম্প্রদায়িক প্রভেদ ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্ব [illegible] কেবল আধুনিক যুগের গোড়া থেকে।" "মুসলিম পলিটিক্স [illegible] প্রেস", পৃঃ ৮৬। এবং কানপুর রায়টস এনকোয়ারী কমিটি রিপোর্ট ১৯৩১ সালে বলে: মুসলিম যুগের প্রতি আমরা যে পশ্চাদ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি তা [illegible] তার বর্তমান [illegible] হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বাস্তবে সাম্প্রতিককালে জন্মেছে।" প্রকাশিত হয়েছে এন জি ব্যারিয়ার সম্পাদিত 'রুট্স অব কমিউন্যাল পলিটিকস", পৃঃ ১৬২। [illegible] দ্রষ্টব্য, ইমতিয়াজ আহমদ, "পারস্পেকটিভস অন দ্য কমিউন্যাল প্রব্লেম", পৃঃ ১৬-১৭।

৮। [illegible] সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের [illegible] দিক [illegible] গভীর, সূক্ষ্ম ও [illegible] অনুপ্রবেশ করেছে তার পূর্ণ মাত্রা আমরা অধিকাংশ মানুষ খুব কম [illegible] উপলব্ধি করতে পারি।

৯। [illegible] ও অন্যান্য, 'সোশ্যালিস্ট কনস্ট্রাকশন অ্যাণ্ড মার্কসিস্ট থিয়োরী", পৃঃ ১৪। লেখকরা [illegible] মতাদর্শের [illegible] মার্ক্সের মত অনুযায়ী "মতাদর্শের [illegible] মানুষের ভ্রমাত্মক বিশ্বদর্শন, তা 'কৌশলে পরিচালিত' হোক বা না হোক, সেখানে [illegible] তা পাওয়া যাবে পৃথিবী অভিজ্ঞতার কাছে যে 'স্ব-প্রতিনিধিত্ব' করে [illegible] দর্শনের মধ্যে। মতাদর্শ সৃষ্ট হয় মৌলিক সম্পর্কের বাহ্যরূপ থেকে। মার্ক্সের মতে [illegible] বিভ্রান্তিকর হতে পারত। যদি মার্ক্সের দাবী [illegible] অভিজ্ঞতা চেতনার ভিত্তি [illegible] তা হলে সেগুলি যেখানে বিভ্রান্তিকর, অভিজ্ঞতা স্বয়ং প্রধান 'মতাদর্শগত উৎপাদনের উপাদানে" পরিণত হয়।" পৃঃ ২১। উক্ত লেখকদের মতে, যাঁরা মতাদর্শ বা বাস্তবতার বিশ্লেষণ করতে চান তাঁদের পর্যবেক্ষণের বেশী যেতে হবে। তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনে মার্ক্সের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন: "দৃশ্যমান, কেবল মাত্র বাহ্য গতিকে প্রকৃত অন্তঃস্থ গতিতে রূপান্তরিত করা একটি বিজ্ঞানের কাজ": পৃঃ ১৪। (কার্ল মার্ক্স, "ক্যাপিটাল", ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৩)।

১০। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক দুটি রচনায় এই দুর্বলতা দেখা যায়। উত্তর প্রদেশের মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদারপন্থী পর্বের উপর তাঁর অন্য দিক থেকে নির্ভরযোগ্য, এমন কি অত্যুৎকৃষ্ট গবেষণাতেও, ফ্রান্সিস রবিনসন এই বিভ্রান্তি এড়াতে পারেন নি। এইভাবে তিনি সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে লেখার বিপদগুলি দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি শুরু করে-

ছিলেন সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণাকে স্পষ্টভাবে বুঝে নিয়ে, সমগ্র রচনা জুড়ে তিনি দেখান যে মুসলিমরা যে একটি সম্প্রদায় না, এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধি যে তাই অন্য ঐতিহাসিক উপাদান ও শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে, তা তিনি বোঝেন (পৃঃ ৩-৪, ২৪-৩৩, ৩৪৫ ইত্যাদি)। কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণের হাতিয়ারগুলি অযোগ্য হওয়ার ফলে তাঁর ক্রমাগত পদস্খলন হয়, এবং তিনি মুখবন্ধেই "ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম উৎসাহ", "মুসলিম স্বার্থ", "মুসলিম রাজনৈতিক কার্যকলাপ", "স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের জন্য মুসলিম দাবীর সরকারী স্বীকৃতি", "মুসলিম দাবীসমূহ", "সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিমদের রাজনীতি", "মুসলিমরা কংগ্রেসের নীতি স্থির করার ক্ষমতা হারালেন", "কি করে সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিমরা সারা ভারতের মুসলিমদের নেতৃত্ব দিতে পারলেন", ইত্যাদি ধরণের কথা বলেন। "সেপারেটিসম্ অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্", পৃঃ ৪-৬। একই ভাবে, মুশিরুল হাসান তাঁর "ন্যাশনালিসম অ্যাণ্ড কমিউনাল পলিটিকস ইন ইণ্ডিয়া, ১৯১৬-১৯২৮" গ্রন্থে প্রথমে দেখিয়েছেন যে ভারতীয় মুসলিমদের একটি একক সত্তা বা অভিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে বিচার করা যায় না (পৃঃ ৩, ১১ ও অন্যত্র)। কিন্তু তারপর তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের প্রসঙ্গে ঐভাবেই আলোচনা করেন এবং তাঁর কাজের মূল অংশে তাদের সাম্প্রদায়িক মাত্রায় পর্যালোচনা করেন। সঙ্গে তিনি সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ, কোনটিকেই পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। তাই তিনি দেখান [illegible] নেতৃত্ব", সংযুক্ত প্রদেশের "মুসলিমরা" ভারতের অন্য জায়গার "মুসলিমদের" চেয়ে [illegible] অগ্রসর ("সংযুক্ত প্রদেশে মুসলিমরা রাজনীতি [illegible] সামনের সারিতে ছিলেন · [illegible] চাকরী ও বিভিন্ন পেশায় তাঁদের প্রভাবের [illegible]। [illegible] রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক [illegible] প্রদেশের [illegible] অদ্বিতীয় স্থান উপভোগ করতেন", 'এই এলাকা ছিল [illegible] সংযুক্ত প্রদেশে …মুসলিমরা কৃত্যকসমূহে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান [illegible], সরকারী চাকরীতে তারা হিন্দুদের তুলনায় [illegible] অবস্থা [illegible] ও শিক্ষাগত অবস্থান সম্পর্কে এই [illegible] অবধারিত ভাবে তার রাজনৈতিক [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] ইত্যাদি [illegible]। [illegible] কেবল মুখবন্ধ ও প্রথম অধ্যায়ে। [illegible] ধর্মনিরপেক্ষ [illegible] সাম্প্রদায়িক কাঠামোতে [illegible] অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ। উদাহরণ স্বরূপ আর একটি উদ্ধৃতি [illegible] মুসলিমরা …মনোনয়নের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের [illegible] তাঁদের স্বার্থ ভালভাবে দেখত", পৃঃ ৮৬ [illegible]। এই বিশেষ [illegible] লেখকদের মধ্যে আছে তাদের তালিকা আরো বাড়ানো যায়। উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য, প্রভু, দাশগুপ্ত, "কমিউনালিসম—এ স্ট্রাগল ফর পাওয়ার", পৃঃ ১-৩, ৮৯, ৮৩ ৮৮-৮৯, ১৩৮ ৪৩ ১৪২ ৫৫, ১৪৮-৫৯, ১৬৫, ১৭৭-৯৮ ; মুশিরুল হক, "দ্য [illegible] অফ মুসলিম কমিউনালিসম ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিকস", পৃঃ ২-৩, ১৩, ১৫ ; রফিকউদ্দিন খান, "দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ন্যাশনাল কনশাসনেস ইন ইণ্ডিয়া : এ পলিটিকাল অ্যানালিসিস", পৃঃ ১-২, ১৫।

১১। প্রয়োজন ছিল কেবল পুরোনো কাঠামোর মধ্যে, পুরোনো প্রশ্নগুলোর নতুন উত্তর নয়, একটি নতুন চিন্তাগত কাঠামো ও নতুন প্রশ্নাবলী। জাতীয়তাবাদীরা, এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা, আগেরটা দিয়েছেন। কিন্তু একবার সাম্প্রদায়িকতাবাদের আভ্যন্তরীণ যুক্তি স্বীকৃতি হলে সাম্প্রদায়িক উত্তর আসতে বাধ্য ছিল। যথা, হিন্দু ও মুসলিমরা যদি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হয় ও তাদের স্বতন্ত্র স্বার্থ থাকে, তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে একটি গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থায় মুসলিম ও শিখরা হয় পীড়া বোধ করবে অথবা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য লড়াই করবে।

১২। একজন ব্যক্তি পেশাদার সাইকো অ্যানালিস্ট হওয়ার আগে তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সাইকো অ্যানালিসিসের সম্মুখীন হতে হয়, যাতে তাঁর লুকোনো মনস্তাত্ত্বিক গোলযোগ ধরা পড়ে। একইভাবে বলা যায় যে কোনো ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার আগে তাঁর উচিত নিজের মনে লুকোনো সাম্প্রদায়িক ঝোঁকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা।

১৩। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইস্তাহারে মধ্যবিত্তদের অধিকার সংক্রান্ত দাবী ছাড়া মুসলিমদের পক্ষে সম্প্রদায়গত ভাবে উপযোগী দুটি মাত্র দাবী ছিল। একটি মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের দাবী, আর অন্যটি মুসলিমদের সাধারণ অবস্থার উন্নয়নের দাবী। অন্য দাবীগুলি অন্যান্য ভারতীয়দের জন্য সমান প্রযোজ্য ছিল, যেমন ছিল, বস্তুত, উল্লিখিত দাবী দুটির দ্বিতীয়টি। জেড এইচ জাইদি, 'আসপেক্টস অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম লীগ পলিসি, ১৯৩৭-৪৭', পৃঃ ২৫২। লীগের ১৯৩৮ অধিবেশনে গৃহীত মূল প্রস্তাব সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। এস এস. পীরজাদা (সম্পাদিত), ফাউণ্ডেশনস অফ পাকিস্তান, অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ড, ১৯২৪-১৯৪৭, পৃঃ ২৮০। এছাড়া দ্রষ্টব্য, এম নমান, মুসলিম ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৩৫৬-৫৭ : আবিদ হুসেন, দ্য ডেস্টিনি অফ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস, পৃঃ ১০২।

১৪। সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব ও লেখকরা কখনোই তথ্যনিষ্ঠভাবে দেখাতে চেষ্টা করেন নি যে অন্য সম্প্রদায়ের প্রভুত্বের ভয় ইত্যাদি ছাড়া, বা সাধারণভাবে সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে সাধারণ অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া তাঁদের সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থ কি ছিল।

১৫। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর ভারতে গ্রাম স্তরে সামাজিক সত্তা গঠিত হত ধর্মীয় ভিত্তিতে নয়, জাতের ভিত্তিতে, এবং মুসলিমরা সেখানে কাযত আর একটি জাতের ভূমিকা পালন করত। গ্রামের মানুষ নিজেদের দেখত ব্রাহ্মণ, জাট, চামার, আহীর, রাজপুত, মুসলিম ইত্যাদিতে বিভক্ত বলে। হিন্দুদের ও মুসলিমদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে সংহত হওয়ার কোনো প্রয়াস ছিল না। সুতরাং, কেউ যদি লেখেন, "তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের চোখে তারা ছিল মুসলিম', তবে তিনি বাইরে থেকে 'হিন্দু প্রতিবেশী" তত্ত্ব চাপিয়ে দিচ্ছেন। একজন মুসলিমের কাছে তার প্রতিবেশীরা, একটি সীমিত ধর্মীয় অর্থে ছাড়া, হিন্দু ছিল না, ছিল জাট, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বাণিয়া, চামার ইত্যাদি। একইভাবে, শেষে উল্লিখিত গোষ্ঠীর মানুষের চোখে একজন মুসলিম একটি জাত-ধর্মের সদস্য মনে হত, একটি সম্প্রদায় বা জাতীয়তার অংশ মনে হত না। দ্রষ্টব্য, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর রোহটাকের ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক দিল্লী ডিভিশনের কমিশনারকে প্রেরিত চিঠিতে বলা হয় 'হিন্দু ও মুসলিম জাটরা, এবং হিন্দু ও মুসলিম গুজ্জররা নিজেদের সাধারণ পূর্বপুরুষের কথা বেশী মনে রাখে, তারা যে কেউ হিন্দু আর কেউ মুসলিম তা নয়, এবং তারা একই গ্রামে পরস্পর যথেষ্ট শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে বাস করে, যেন তারা একই জাতি ও ধর্মের মানুষ"। প্রেম চৌধুরী, রোল অফ স্যার ছোটু রাম ইন পাঞ্জাব পলিটিকস-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ১২৩। এ ছাড়া দ্রষ্টব্য, ডেঞ্জিল হবেটসন, পাঞ্জাব কাস্টস, পৃঃ ১৩-১৪।

১৬। সংযুক্ত প্রদেশ সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, ফ্রান্সিস রবিনসন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪-২৫, ২৮-৩৩, এবং ৩৪৫-৩৪৬। মুসলিমদের মধ্যে নরগোষ্ঠী ভিত্তিক, জাত, মর্যাদা, ধর্মীয় ও অর্থ নৈতিক কারণভিত্তিক বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করে রবিনসন লিখেছেন : "মুসলিমরা যত না একটি সম্প্রদায় ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল বহু স্বার্থের যোগ। হিন্দুরা মুস-

লিমদের চেয়ে কম বিভক্ত ছিল না…এ কথা স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে মুসলিম সরকারী কর্মচারী ও ভূস্বামীরা ছিল এই (উর্দুভাষী) এলিটের একটি অংশমাত্র, যদিও একটি বড় অংশ, এবং যে হিন্দুরা এই এলিটের অংশ ছিল, তাদের সঙ্গে এদের সংযোগ যে মুসলিমরা এলিটের অংশ ছিল না তাদের সঙ্গে বা গ্রামের গোঁড়া তন্তুবায়দের সঙ্গে সংযোগের চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠ ছিল…, ধর্ম ছাড়া মুসলিমদের একের অপরের সঙ্গে প্রায় কিছুই একরকম নয়, হিন্দুরা ধর্মের মাধ্যমেও মৌলিকভাবে বিভক্ত ছিল।" পৃঃ ২৮, ৩২-৩৩। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৪৫। দ্রষ্টব্য, ইমতিয়াজ আহমদ, প্রাগুক্ত, ৩৬-৩৭, পিটার হার্ডি, দ্য মুসলিমস অফ বৃটিশ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১-২, ৮, কামরুদ্দীন আহমেদ, এ সোস্যাল হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, পৃঃ ১২-১৩।

১৭। এ সব প্রতীয়মান হয়ে পড়ে পাকিস্তান গঠনের পর, যখন বাংলা মুসলিমরা দাবী করেন যে পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলিমদের সঙ্গে তাঁদের কোনো ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নৈকট্য ছিল না।

১৮। জাতীয়তাবাদ সমগ্র সমাজের বিষয়গত সাধারণ স্বার্থের রাজনৈতিক মতাদর্শগত প্রতিক্ষেপ। সমস্ত হিন্দু, মুসলিম, ইত্যাদি ভাষাগত ও কৃষ্টিগত গোষ্ঠী বা শ্রেণী স্তরে বিভক্ত ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

১৯। রশীদউদ্দিন খান সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে ধর্মের বন্ধনের ও অস্তিত্ব আছে "কেবলমাত্র আবেগের স্তরে, কোনো নির্দিষ্ট অর্থে নয়, যদি আমরা মুসলিম সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বিশেষত আঞ্চলিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক রীতিনীতি, ব্যক্তিগত আইন এবং ঐতিহাসিক মিথ, ও প্রতীকসমূহের কথা মনে রাখি (বহুবচন ইচ্ছাকৃতভাবে দেওয়া)।" লেখক বলেছেন, এই বন্ধন ছাড়া 'একটি তথাকথিত মুসলিম পারাচতিকে প্রস্ফুটিত করার মত অন্য কোনো বন্ধনী শক্তি নেই"। 'সেলফ-ইমেজ অফ মাইনরিটিস : দ্য মুসলিমস ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ১৯।

২০। কে পি করুণাকরণ, 'পলিটিকাল ফিলসফি অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস অফ দ্য হিন্দু মহাসভা', পৃঃ ২ ও ১৯।

২১। "দ্য কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া", পৃঃ ১৯২ ও ১৯৩। ফ্রান্সিস রবিনসনও একই ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন : 'সরকারী আচরণে এই পরিবর্তন সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিমদের দুটি মূল ভাগে বিভক্ত করে ফেলল : যারা যে কোনো মূল্যে মুসলিম স্বার্থ বজায় করতে প্রস্তুত ছিল, এবং যারা ছিল না", প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫। এছাড়া দ্রষ্টব্য, প্রভা দীক্ষিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১, ১৬৫। এমন কি ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদও সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তাই তিনি "সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী রূপে মুসলিম, শিখ ও খ্রীস্টানদের স্বার্থসাধনের জন্য গঠিত সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক সংগঠন ও দল সমূহের" উল্লেখ করেন। "ইকনমিকস অ্যাণ্ড পলিটিকস অফ ইণ্ডিয়াস সোসালিস্ট প্যাটার্ন", পৃঃ ২৯৪। এ ছাড়া দ্রষ্টব্য, রশীদউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮-১৯।

২২। লুই দুমোঁ, "রিলিজিওন, পলিটিকস অ্যাণ্ড হিস্ট্রি ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৯০।

২৩। জওহরলাল নেহেরুর উক্তি, যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন একটি "মেকী প্রশ্ন", এই অর্থেই এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। দ্রষ্টব্য, নিঃ রচ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০৭

২৪। দ্রঃ, বেণী প্রসাদ, "দ্য হিন্দু-মুসলিম কোয়েশ্চনস, পৃঃ ১৭ : "যে পুরোনো অভ্যাস ও ঐতিহ্য ভেঙে পড়ছে তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত জীবনে নতুন অভ্যাস এবং সামাজিক জীবনে নতুন প্রথা গড়ে তুলতে সময় লাগে। এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন নতুন দিশা আনার এক বিশাল প্রয়াস, এবং তা প্রধানত যুক্তির রাজ্যে পড়ে। মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা যা থাকে, তা হল সেই সব অনুভূতি, যেগুলি বিভিন্ন কাজের মনোগত মূল্যায়ন করে, এবং তার ফলে

যেগুলিতে প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের শিকড় রয়েছে, সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা।"

২৫। সেক্ষেত্রে আমাদের একথাও বলতে হবে যে, মুসলিম লীগ ভারত ভাগ করতে সক্ষম হওয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদের যাথার্থতা প্রমাণ করে, এবং পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হওয়া তাকে অসিদ্ধ বলে প্রমাণ করে।

২৬। আমি অবশ্যই পুরোমাত্রায় সচেতন যে নরনারীর সামাজিক অস্তিত্ব ও সামাজিক চেতনা আমার সরলীকৃত ব্যাখ্যায় যেটুকু দেখা গেছে তার চেয়ে অনেক জটিল এবং তার অনেক বেশি বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধ রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন বা মতাদর্শের তত্ত্বায়ন সংক্রান্ত নয়, তাই কিছুটা সরলীকরণ অনিবার্য।

২৭। তদুপরি, যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শত শত গ্রাম ও নগরব্যাপী, এমন কি কখনো কখনো একাধিক জেলা ব্যাপি, ক্ষেত্রে ভোটদাতাদের কাছে ভোট প্রার্থনা আবশ্যক করে তোলে, তা-ই চিরাচরিত গ্রাম-স্তরের বা আঞ্চলিক স্তরের চেয়ে ব্যাপকতর অভিন্নতা গড়ে তোলা ও তার প্রতি আবেদন করাও আবশ্যক করে তোলে।

২৮। যথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয়রা যেমন বালগঙ্গাধর তিলক ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নেশন কথাটি সমস্ত ভারতীয়দের, হিন্দু, মহারাষ্ট্রীয়, বাঙালী, ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করতেন। রেস কথাটি একই রূপে ব্যবহার করা হত, সমস্ত ধরণের সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য।

২৯। একদিক থেকে একটি ঔপনিবেশিক জাতি একটি শ্রেণীর মত—প্রধানত এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে বলে, তার একতা গড়ে উঠেছে। কয়েক বছর আগে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না: "জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি ছিল গড়নের পথে-জাতির [nation-in-the-making] ঘটনাটি, আবার এই আন্দোলন ঐ ঘটনার পিছনে অন্যতম শক্তিশালী উপাদান ছিল। জনগণ কতটা সচেতন হয়ে থাকেন যে তারা একটি জাতির অংশ, যার মৌলিক স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে [illegible] সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল তার উপর জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তি ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছিল। জাতি হবার, একটি জনগণ হওয়ার—এই যে চেতনা, তা কিন্তু বিষয়গত বাস্তবতা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেরিয়ে আসে না। তা নিজেকে জাহির করার এক কঠিন, কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া হতে বাধ্য ছিল, যাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করত।"

৩০। একথা মনে রাখা দরকার যে বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদ এবং একটি মিথ্যা চেতনা ও শ্রেণী আধিপত্যের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে, অর্থনীতি ও সমাজের ঐক্যসাধন ও বিকাশ বা ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী সংগ্রামের নিরিখে যার আর কোনো বিষয়গত ভিত্তি নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছর থেকে পশ্চিম ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে জাতীয়তাবাদ—জাতিদাম্ভিকতার পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে একথাই প্রযোজ্য।

৩১। যৌথ পরিচিতি গঠনের ভিত্তি হিসেবে যথার্থ জাতি, ভাষাগত-আঞ্চলিক এলাকা বা শ্রেণী গঠন না হলে বা দুর্বলভাবে গঠন হলে—সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জাতিবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, ও অন্যান্য সমধর্মী পরিচিতি শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে ও দ্রুত সেই পরিচিতির ভিত্তি হিসেবে সামনে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য ৫ম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩২। একথার মাধ্যমে নতুন ও অধিকতর প্রযোজ্য পরিচিতি অর্জনের জন্য সক্রিয় ও সচেতন রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রামের দিকটির উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। এই পরিচিতি অর্জন একটি সচেতন প্রক্রিয়া হওয়া আবশ্যক, এবং নিছক বিষয়গত বাস্তবতা বা প্রয়ো-

জনীয়তা থেকে তা ঘটতে পারে না। এই সচেতনতা রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রক্রিয়ার ফসল। শ্রেণী সচেতনতা সম্পর্কে ই. পি. টমসন যেমন লিখেছেন : "মানুষ যে উৎপাদন সম্পর্কে *জন্মেছে—বা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রবেশ করেছে, শ্রেণী অভিজ্ঞতা প্রধানত তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই অভিজ্ঞতাগুলিকে কৃষ্টিগত দিক থেকে কিভাবে দেখা হয়, তাই হল শ্রেণী সচেতনতা* : তা নিহিত আছে প্রথা, মূল্যবোধ, চিন্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক আকৃতির মধ্যে। অভিজ্ঞতা যদি পূর্বনির্ধারিত বলে দেখা দেয়, তা হলেও শ্রেণী সচেতনতা তা করে না।" "দ্য মেকিং অফ দি ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস", পৃঃ ১০। এই সমগ্র সমস্যা আলোচনায় অ্যাডাম প্রজেভোরস্কির অপ্রকাশিত প্রবন্ধ "দ্য প্রসেস অফ ক্লাস ফর্মেশন : ক্রম কার্ল কাউটস্কিস্ "ক্লাস স্ট্রাগল" টু রিসেন্ট কন্ট্রোভার্সিস" আমার অত্যন্ত উপযোগী মনে হয়েছে।

৩৩। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের একজন প্রধান ব্যাখ্যাকার, কে. কে. আজিজ, নিজে কি লিখছেন তার পূর্ণ তাৎপর্য না বুঝেই জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে নিম্নরূপ মৌলিক পার্থক্য দেখেছেন : "মুসলিমরা অনুভব করেছিলেন যে তাঁরা একটি জাতি, এবং এর ফলে তাঁরা বিষয়ীগত উপাদানের উপর জোর দিয়েছিলেন। হিন্দুরা দাবী করেন যে ভারত একটি জাতি, এবং এতে তাঁরা বিষয়গত উপাদানের উপর জোর দিয়েছিলেন।" আবার : "চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা ছিল যত না রাজ্যাংশ ভিত্তিক তার চেয়ে বেশী মনোগত, যত না রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশী মনস্তাত্ত্বিক, যেখানে 'ভারতীয়' বা হিন্দু জাতীয়তাবাদ ছিল যত না কৃষ্টিগত তার চেয়ে বেশী দেশভিত্তিক, এত না ধর্মীয় তার চেয়ে বেশী ঐতিহাসিক" "দ্য মেকিং অফ পাকিস্তান" যথাক্রমে পৃঃ ২১০ ও ২০৯।

৩৪। ধর্মের (বা জাতের) ভিত্তিতে কতকগুলি সাধারণ স্বার্থের বাস্তব ভিত্তি কিছুদিনের জন্য থাকতে পারে কেবল যদি ধর্মীয় (বা জাতভিত্তিক) দমননীতি সমাজে প্রচলিত থাকত। ঔপনিবেশিক ভারতে এই অবস্থা ছিল না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতা বা তাত্ত্বিকরা এই দিকটিকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন ; এই জন্যই, তাঁরা হিন্দু, মুসলিম বা শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদী, যাই হ'ন না কেন, তাঁদের সাধারণ কৌশল ছিল ভীতি ও সম্ভাব্য দমন নীতির দিকে আঙুল তোলা। দ্রঃ, ৫ম অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ। এই কারণেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তৎসংলগ্ন প্রাণহানি ও সম্পত্তিনাশ ভীতির বাতাবরণ ছড়িয়ে দেওয়া এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংহতির চিন্তার সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করত।

৩৫। ধর্মীয় প্রভেদ থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ঘটে নি, বরং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মতাদর্শগত প্রয়োগ ধর্মীয় প্রভেদকে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদে রূপান্তরিত করেছিল।

৩৬। রাম গোপাল কর্তৃক "ইণ্ডিয়ান মুসলিমস" গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, পৃঃ ৩৩৮।

৩৭। "রিপোর্ট অন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশনাল রিফর্মস", ১৯১৮, পৃঃ ৯১, অনুচ্ছেদ ১৪১-এ উদ্ধৃত। তিনি আরো বলেন যে মুসলিমরা "একটি ৫ কোটির জাতি···যারা আজও মনে রেখেছে সেই দিনগুলির কথা, যখন দিল্লীর সিংহাসন থেকে তারা হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতাবলে শাসন করত।"

৩৮। কে. কে. আজিজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১-৭২-এ উদ্ধৃত।

৩৯। ঐ, পৃঃ ১৬৭-তে উদ্ধৃত।

৪০। সি. ম্যানশারড, "দ্য হিন্দু মুসলিম প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৭৬-এ উদ্ধৃত।

৪১। "রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটারি কমিশন", ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯-৩০। একই ধরণের আরো দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দ্রষ্টব্য কে. কে. আজিজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-১, ১৬৭-৮, এবং বর্তমান রচনার ৮ম অধ্যায়।

৪২। একইভাবে সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকা ও এশিয়াতে সমস্ত অ-জাতীয়তাবাদী শক্তি ও মতাদর্শের সঙ্গে মৈত্রী করেছে, এবং তার তাত্ত্বিকরা উপনিবেশ ও প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে সমস্ত রকম মতাদর্শ ও আন্দোলনকে, এমন কি 'বামপন্থী'দেরও ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু জাতীয়তাবাদী বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মতাদর্শ ও আন্দোলনদের নয়।

৪৩। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত পর্যালোচনার জন্য ৪র্থ ও ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৪। উদাহরণস্বরূপ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পশ্চিম ভারতের শক্তিশালী ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনগুলি, দক্ষিণ ভারতে ১৯২০-র দশকের এবং ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকের অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন, বিহার ও উড়িষ্যার বাঙালী-বিরোধী প্রাদেশিক আন্দোলন।

৪৫। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪১ সালে বেণীপ্রসাদ লিখেছিলেন : "বিভিন্নতাবাদের ধারণা নিজেকে স্বাভাবিকভাবে প্রচার করে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহকে আঁকড়ে ধরে এবং সেগুলিকে বড় করে, মৌলিক বলে দেখিয়ে" ; প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০। সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা জাতিতত্ত্বের মত ঘটনার 'উৎস' সন্ধান করলে এরকম কারণে পৌঁছনো অনিবার্য। 'আদি' কারণ শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায় সেই পার্থক্য, যা ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িকতাবাদী বা জাতিতন্ত্রী [racist] নিজের মতাদর্শের সংজ্ঞা দেয়।

৪৬। কিছু লেখক মনে করেন সাম্প্রদায়িকতাবাদ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অন্তর্নিহিত প্রসঙ্গ আবার অন্যরা তাকে কেবল চতুর প্রচারের সাফল্য মনে করেন। আবো কেউ কেউ মনে করেন তা একাধারে ধর্মীয় গোষ্ঠীদের প্রতি লাভজনক এবং রাজনৈতিক কলকাঠি নাড়ার ফল।

৪৭। এ কথা বুঝতে না পারার অর্থ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উপযোগী রণ-নীতি গড়ে তোলায় ব্যর্থ হওয়া। এর সংখ্যক ব্যক্তির ব্যাপক মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়, কিন্তু তা হলেও আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত, ঐ অল্পসংখ্যক ব্যক্তি কেন সফল হতে পেরেছিল। এছাড়া দ্রষ্টব্য ডব্লু. সি স্মিথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০-১।

৪৮। ৪র্থ ও ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ফ্রান্সিস রবিনসন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৮ দ্রষ্টব্য।

৪৯। ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫০। ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫১। সুতরাং, যেহেতু সম্প্রদায়ের' স্বার্থের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ ও আইন প্রণেতাদের তাদের 'সম্প্রদায়ের' প্রতিনিধি' হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু একই সময়ে তাদের দেখতে হবে তারা যে স্বার্থের সেবক বলে দাবী করছে তা ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থের সেবা করছে বা প্রতিনিধিত্ব করছে বলে। যদিও ই.পি. টমসন মিথ্যা চেতনার তত্ত্বটি পছন্দ করেন না তাহলেও এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য দিয়ে শেষ করা যায় : "আমি 'মিথ্যা চেতনা' ধারণাটি নিয়ে সুখী নই। কারণ, যদিও ঐ রকম মতাদর্শগত চেতনা নিশ্চিতভাবে সার্বজনীনতার মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া এবং যৌক্তিকতাকে দুর্বোধ্য করা সত্ত্বেও তা একটি শক্তিশালী এবং 'সত্য' চেতনা হতে পারে—যে বিশেষ শক্তিগুলি তার পৃষ্ঠপোষণ করে, তাদের জন্য। তা তাদের কাছে প্রয়োজনীয় একটি মুখোশ, তারা অন্য গোষ্ঠীদের যেরকম প্রণালীবদ্ধভাবে শোষণ করে তার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তত্ত্বের সমাহার, এবং যে আত্ম-প্রবঞ্চনা ও অলঙ্কারবহুল বাগাড়ম্বর নিজগুণে একটি শক্তিশালী সামাজিক বল, তার একটি প্রধান উপাদান।" "অ্যান ওপেন লেটার টু লেজেক কোলাকোস্কি" ভ্র সোশালিস্ট রেজিস্টার ১৯৭৩, পৃঃ ৮৭।

৫২। ফ্যাসীবাদ প্রসঙ্গে রেনজো ডি ফেলিসের নিম্নলিখিত উক্তিগুলি এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক :

"প্রথমত, কেউ এরকম সুচিন্তিত বক্তব্য রাখতে পারে না যে ফ্যাসীবাদের কোনো ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না বা তাকে একটি অযৌক্তিক ঘটনা বলে দেখা উচিত। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ইতালী বা জার্মানীর মত দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা যায় এমন "কিছু বিষয় পরে ফ্যাসীবাদী আমলে বড় হয়ে উঠেছিল এবং যার মধ্যে পরবর্তীকালে ফল ধরেছিল এমন বীজ দেখা যায় (শাবো)। দ্বিতীয়ত, এ থেকে অবশ্য বলা যায় না যে ফ্যাসীবাদ অনিবার্য এবং ঐ দেশগুলির পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর যুক্তিযুক্ত ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি ছিল। বরং তা শেষ পর্যন্ত এড়ানো সম্ভব ছিল। যদি ফ্যাসীবাদ জয়ী হয়ে থাকে, তবে তা ততটা ঐ 'উপাদান' বা 'বীজ'-এর—যেগুলির ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্ধারক বা প্রাথমিক ভূমিকা ছিল না—পূর্ববর্তী উপস্থিতির জন্য নয়, যতটা তা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সমাজের 'গণকরণের ['massification'] জন্য। কেবল এই নতুন পরিস্থিতিতে, এবং বিদ্যমান শাসকশ্রেণীর দোষত্রুটির জন্য, এই উপাদান' ও 'বীজ', যা আগে গৌণ ছিল তা মুখ্য হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অন্যান্য, যথেষ্ট নতুন ও নির্ধারক উপাদান; এবং এদের যোগফল থেকে বার হয় ফ্যাসীবাদ। এই দ্বিমুখী সমালোচনা অন্য যে কারো থেকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন গেরহার্ড রিটার, যখন কার্ল গোয়েডলার ও নাজী-বিরোধী ধারা সম্পর্কে তাঁর বইয়ে তিনি বলেন: '...তা সত্ত্বেও, এ কথা মূলগতভাবে অসত্য... যদি বলা হয় যে ন্যাশনাল সোশালিসম ছিল পূর্বতন জার্মান ইতিহাসের ফলশ্রুতি, জার্মান ঐতিহ্যের শেষ ফল, তার চূড়ান্ত পরিণতি...শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল সোশালিসম মৌলিক জার্মান ঘটনা নয়, বরং একটি ইউরোপীয় ঘটনার জার্মান আকৃতি, যে ঘটনা হল এক পার্টি রাষ্ট্র -এবং তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে অতীত প্রথা থেকে উত্থিত হিসেবে নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট সমকালীন সংকট, উদারনৈতিক সমাজের সংকট থেকে উত্থিত রূপে ...।" "ইন্টারপ্রিটেশনস অফ ফ্যাসীসম", পৃঃ ২৭-২৮।

২

সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক উৎস : ১

মূলতঃ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ঔপনিবেশিকতাবাদের ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্রের, ঔপনিবেশিক অধঃবিকাশের, এবং সাম্প্রতিক কালে, ধনবাদ কর্তৃক অর্থনীতি ও সমাজের বিকাশ ঘটাবার অক্ষমতার অন্যতম উপজাত ফল। যে সমাজ কাঠামোতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সৃষ্ট হয়েছিল, এবং যার মধ্যে তার বৃদ্ধি সম্ভব ছিল, তা গড়েছিল ঔপনিবেশিকতাবাদ। ঐতিহাসিকভাবে, ভারতে আধুনিক রাজনীতি ও সামাজিক শ্রেণীগুলির উত্থান ঠিক সেই যুগেই হয়েছিল, যখন ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিকরণের পূর্ণাঙ্গ অভিঘাত সার্বিকভাবে অনুভূত হতে থাকে, এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সংকট দেখা দিতে থাকে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, অধঃবিকাশ এবং অর্থনৈতিক নিশ্চলতা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যা সমাজের আভ্যন্তরীণ বিভাজন ও বৈরিতার পক্ষপাতি ছিল, এবং তার মৌলিক রূপান্তরেরও পক্ষপাতি ছিল। এ কথা বিশেষভাবে সত্য মধ্যশ্রেণীগুলির উপর ঔপনিবেশিকতার অভিঘাত প্রসঙ্গে। বিশেষভাবে তারাই ভীতি, ঈর্ষা ও নৈরাশ্যে ভুগত।

[এক]

প্রথমত, আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তুলনামূলক অর্থনৈতিক নিশ্চলতার পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যশ্রেণী বা পেটি বুর্জোয়া ভিত্তির প্রতি।

গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়ে, আধুনিক শিল্প, এবং আধুনিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কৃত্যকের (যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কৃত্যক, পত্রপত্রিকা, গ্রন্থাগার, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, রেডিও ও চলচ্চিত্র) বিকাশের অভাবে, এবং সরকারী ব্যয় ক্ষীয়মান হওয়ায়, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, এবং তা

ক্রমেই নিকৃষ্টতর হয়ে চলেছিল। বেকারত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর, যাদের জমির উপর নির্ভর করার সুযোগ ছিল না, এবং যারা দেখতে পেল যে সরকারী চাকরী ক্রমেই কমছে এবং বিভিন্ন পেশায় ভিড় বাড়ছে, এ কথা বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমন কি যে সমস্ত যুবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা যথেষ্ট ভাল, তারাও দেখতে পেত যে অর্থনৈতিকভাবে কোনো কিছু অর্জন করা ও সাফল্য লাভ করার সম্ভাবনা সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। ১৯২৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মন্দার বছরগুলিতে, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে, এই সমস্যা তীব্রতর হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এক প্রচণ্ড মূল্য-বৃদ্ধি দেখা দেয়, এবং মধ্য শ্রেণীদের যুদ্ধের পর কি হবে সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন ও ভীতিপূর্ণ করে তোলে। অধিকন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকৃত চরিত্র, যা আজও কিয়দংশে ক্রমানুসারে চলে এসেছে, এমন একটি বৃহৎ মধ্যবর্তী বা কৃত্যক বা তৃতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল, যেটি উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে একীভূতও ছিল না, এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বা আজকের অধঃবিকশিত ধনবাদ কর্তৃক যাকে উৎপাদনশীলভাবে আত্মভূত করা সম্ভবও ছিল না। অন্যভাবে বলা চলে যে মধ্যশ্রেণীগুলির বৃদ্ধি সর্বক্ষণ অর্থনৈতিক বিকাশের চেয়ে দ্রুততর ছিল। তদুপরি, ১৯২০-র দশক পর্যন্ত উচ্চ বেতন ও সামাজিক সম্মান যুক্ত উচ্চ-স্তরের চাকরীর অধিকাংশই ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত থাকায় ঐ ধরণের চাকরীর সুগভীর ঘাটতি ছিল। ফলে, যে ক'টি ঐ প্রকার চাকরী বাকী থাকত, তার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিত।

ফলতঃ, সাধারণভাবে মধ্যশ্রেণী, এবং বিশেষত নিম্ন মধ্যশ্রেণী ও নব্য শিক্ষি-তরা তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতের ক্রমাম্বয় অধঃপতন সহ্য করতে বাধ্য হত, এবং তাদের উপর সর্বদাই ভর করত বেকারত্বের প্রেত। উপরন্তু, নিম্নমধ্যশ্রেণীকে শোষণ করত সকলেই তার মধ্যে দেশীয় ব্যবসায়ী, মহা-জন ও শিল্পপতিরাও পড়ত। সর্বোপরি, ১৯২৯-এর পর, মন্দার বছরগুলিতে, এই শ্রেণীর সদস্যরা এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যায়, এবং তারা হতাশা, নিরাপত্তার অভাব, অনির্দিষ্ট ভয় ও উদ্বেগপূর্ণ অবস্থায় থাকে। সামাজিক বিকাশ বিদ্যমান শ্রেণী পরিচিতি ও মর্যাদা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলছিল। নিম্ন মধ্যশ্রেণীর অনেকেই শ্রেণীচ্যুত হয়ে নীচে নামার সম্মুখীন হয়, আর অন্য অনেকে দেখে যে তাদের কষ্টার্জিত উর্ধ্বগতি অতি দ্রুত রূদ্ধ হয়ে পড়েছে। জীবনধারণের বিদ্যমান সুযোগসুবিধা ও পরম্পরাগত উৎসগুলি হারিয়ে যাচ্ছিল। কারো কারো ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ দেখা দেয়, কিন্তু সেগুলিও অনেক সময়ে তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বা দুই প্রজন্মের মধ্যে। কারো ক্ষেত্রে মর্যাদা ও নতুন অবস্থানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব ছিল, আর অন্যদের মর্যাদাগত অবস্থানের সম্পূর্ণ ভাঙন দেখা দিয়েছিল। একদিকে প্রত্যাশা

ও আকাঙ্খা, আর অন্যদিকে সুযোগ, এদের মধ্যে সর্বক্ষণ বিরোধ দেখা দেয়। অর্থাৎ, নিম্ন মধ্যশ্রেণী অর্থ নৈতিক কষ্ট, সুযোগ-সুবিধার অভাব, তাদের বিদ্যমান অবস্থার প্রতি হুমকী, এবং তাদের শ্রেণীগত অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা ও মূল্য-বোধ ব্যবস্থার ভাঙনের মধ্যে পড়ছিল। শ্রেণীগত অবস্থান ও পরিচিতি রক্ষা করার জন্য তাদের যে জাগতিক সংগ্রাম, তাকে নির্দিষ্ট একটা ধার এবং ত্বরা প্রদান করা হচ্ছিল। বস্তুত, এই সংগ্রাম উত্তরোত্তর তীব্র, এমন কি তিক্ত হয়ে উঠছিল, যদিও তা অনেক সময়ে হতাশাব্যঞ্জকও হত। এই হতাশা, সামাজিক বঞ্চনাবোধ, এবং পরিচিতি ও মর্যাদা হারাবার এক ধ্রুব ভয় অনেক সময়ে হিংস্রতা ও পাশবিকতার এক আবহাওয়া সৃষ্টি করত। কোনো এক ধর্মীয় ঘটনা এই আবহাওয়ায় গোলযোগ বাধিয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যেত। পেটি বুর্জোয়া পরিচিতি এবং অহংভাব জড়িয়ে পড়ত গোরক্ষা বা বোধিবৃক্ষরক্ষা এবং মসজিদের সামনে সঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে। গো-হত্যা চলবে না, সঙ্গীতে রত মিছিলকে মসজিদেব সামনে নীরব হয়ে পড়তে হবে—এ সমস্ত অধিকারবলে কথিত দাবীগুলির রক্ষা করাকে জীবন-মরণ প্রশ্ন হিসেবে দেখা হয়, কারণ এগুলি পেটি বুর্জোয়া স্বার্থের রক্ষা বা ধ্বংসের প্রতীকে পরিণত হয়।

মধ্যশ্রেণীসমূহ কর্তৃক তাদের পূর্বতন জগত হারাবার সম্ভাব্যতা বা বাস্তবতার এই সামাজিক পরিস্থিতিতে দূরদর্শী বুদ্ধিজীবীরা, জাতীয় আন্দোলন, বামপন্থী গোষ্ঠী ও দলগুলি, এবং অন্যান্য জনপ্রিয় আন্দোলন ঔপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদ করে এবং সমাজ ব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বিন্যাস করে সামাজিক পরিস্থিতির দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজ করেছিল। তারা এক ঝকঝকে নতুন জগত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজ রূপান্তরের দিশা তুলে ধরেছিল। ঐ বেকারত্ব, অর্থ নৈতিক নিশ্চলতা, অধঃবিকাশ এবং হতাশা ও অস্থিরতার আবহাওয়াকে ব্যবহার করে তারা মধ্য ও নিম্নমধ্য শ্রেণীগুলিসহ জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। বস্তুত, নিম্ন মধ্য-শ্রেণীভুক্ত স্তরগুলিই ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের, এবং ১৯২০-র দশক থেকে বামপন্থী আন্দোলন, দল ও গোষ্ঠী-সমূহের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল।

কিন্তু মধ্যশ্রেণীগুলির যে সমস্ত ব্যক্তি ও শাখাসমূহের ব্যাপকতর সামাজিক দিশা বা জাতীয় ও সামাজিক আন্দোলনসমূহ কর্তৃক যুক্তিগ্রাহ্য কালের মধ্যে বাস্তব পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটাবার ক্ষমতায় আস্থা ছিল না, তারা যখন তাৎক্ষণিক সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াত, তখন তারা ব্যক্তিগত সমস্যায় স্বল্পমেয়াদী সমাধান খুঁজত, সংকীর্ণ তাৎক্ষণিক স্বার্থ দেখত। এমন কি যারা দীর্ঘ-মেয়াদী হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের দিশার অংশীদার ছিল, তাদের কেউ কেউ পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষার আবশ্যকতা বোধ করত।

এই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীরা যে ধারণার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিত, তা হল, স্থিতাবস্থা মেনে নিলে 'যেটুকু আছে তার জন্ম লড়াই করা' শ্রেয়, অথবা, 'প্রতিষেধক যতক্ষণ সুদূর ইরাক থেকে আনা হচ্ছে, ততক্ষণে সাপে কাটা লোকটি মারা যেতে পারে'।

অর্থনৈতিক নিশ্চলতার ফলে, মধ্যশ্রেণীভুক্ত ভারতীয়রা অপ্রতুল সুযোগসুবিধা ও সম্পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধ্য হয়েছিল। চাকরী ও পেশার ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্ম এবং ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্ম, এক চিরস্থায়ী ও উত্তরোত্তর তীব্র, কঠোর ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল।[১] চাকরী পেলে, বা পেশায় প্রবেশ করলে, বা ব্যবসা শুরু করলে, এই সমস্যার সমাধান হত না। কারণ তারপর আসত পদোন্নতি, আত্মোন্নতি ও সাফল্যের জন্য আজীবন ব্যক্তিগত সন্ধান ও প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় সমস্ত রকম পন্থা ব্যবহার করা হত, এবং সাফল্য হাতের মুঠোয় আনার জন্য কোনো হাতিয়ারকেই বেশী নীচ বলে মনে করা হত না। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সংগ্রাম হত—এবং মধ্যশ্রেণীর বাবা-মা, (এবং কোনো কোনো সময়ে অন্য আত্মীয়রা) সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষাগত সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতেন। স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। সম্প্রসারিত পরিবারের যোগসূত্রের জাল অনেক ছড়িয়ে থাকত, এবং কখনো কখনো শত শত সরকারী কর্মচারী তার মধ্যে পড়ত।[২] চাকরী দেওয়া বা নির্দিষ্ট পদে কাউকে বসাবার বিনিময়ে উৎকোচ দেওয়া-নেওয়া ক্রমেই সাধারণ হয়ে ওঠে। বেসরকারী ক্ষেত্রে চাকরী দেওয়ার মূল পন্থা ছিল পারিবারিক যোগাযোগ।

কিন্তু তাদের সংগ্রামের জন্ম প্রশস্ততর লড়াইয়ের জমি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মধ্য শ্রেণীগুলি অন্যান্য গোষ্ঠী পরিচিতিও ব্যবহার করত, যথা জাতি, প্রদেশ, অঞ্চল ও ধর্ম। একটি গোষ্ঠীর মাধ্যমে ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা হত। এই বিষয়টিকে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা যায়। যদি কোনো পেশা বা চাকরীর জন্ম একজন ব্যক্তিকে একশ' জনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়, সেক্ষেত্রে আইনী বা অন্য যে কোনো পন্থায় সে যে বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত, ঐ চাকরী বা পেশা তার সদস্যদের জন্ম 'সংরক্ষণ' করতে পারলে তার সুযোগ উল্লেখযোগ্য রকম বৃদ্ধি পেত ; এমন কি, সময়ে সময়ে, যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিযোগীর সংখ্যা অল্প হলে, প্রচণ্ড রকম বৃদ্ধি পেত। অনেক সময়েই চাকরী বা পেশাদার অবস্থানের সন্ধানে কোনো যুবক একই সঙ্গে একাধিক গোষ্ঠীতে পরিচিতি, স্বজনপোষণ, পারিবারিক ও গ্রামসম্পর্ক, এবং 'সুপারিশ', সব অস্ত্রই ব্যবহার করত।

সুতরাং, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সমাজের সংকট সর্বক্ষণ 'পেটি বুর্জোয়া'-দের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দু'ধরণের মতাদর্শ ও রাজনৈতিক প্রবণতার জন্ম দিত। একদিকে, সমাজ পরিবর্তন ও বিপ্লব আশু সম্ভাবনা রূপে দেখা দিলে—যথা, এক বছরে স্বরাজ, বা 'ভারত ছাড়ো' শ্লোগান—পেটি বুর্জোয়ারা উৎসাহ

ভরে তাদের বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতি এবং তার ফলে সমাজেরও মৌলিক রূপান্তরের সংগ্রামে যোগদান করত। তখন তারা ধনিকশ্রেণী থেকে শুরু করে কৃষক ও শ্রমিক, সমগ্র সমাজের স্বার্থ ও দাবী তুলে ধরত। তারা ব্যক্তিগত প্রয়াস তুচ্ছ করে বা অতিক্রম করে, এবং ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষকে ব্যাপকতর সামাজিক দিশায় নিমজ্জিত রেখে এগিয়ে যেত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও সামাজিক রূপান্তরের আন্দোলনগুলির দিকে, অন্যদিকে, যখন বিপ্লবী পরিবর্তনের সম্ভাবনা অপস্রয়মান, যখন প্রকৃত সামাজিক সমাধানসমূহ অলীক স্বপ্ন বলে মনে হত, যখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে ভাঁটা আসত, ঐ আন্দোলন তার তাৎক্ষণিক বাস্তবতা হারাত ও পেটি বুর্জোয়াদের আর অনুপ্রেরণা দিতে পারত না, যখন আশার দিনগুলির অবসান হত, যখন মনে হত যে অবস্থা কখনোই পাল্টাবে না, যখন সংযুক্ত জাতীয় আন্দোলন কর্তৃক সমাজের মুক্তি ও রূপান্তর ঘটানোর ক্ষমতা প্রসঙ্গে আস্থা হ্রাস পেত, তখন পেটি বুর্জোয়ারা স্বল্পমেয়াদী চিন্তা ও লাভের হিসেব করতে বসত, ব্যক্তিগত অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে মনঃসন্নিবেশ করত, অহংবাদী ও স্বার্থপর রাজনীতির দিকে সরে যেত, অর্থাৎ বিদ্যমান সামাজিক অবস্থান ফিরে পাওয়ার বা রক্ষা করার প্রচেষ্টার রণনীতি গ্রহণ করত। সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক পরিস্থিতিকে তখন দেখা হত 'প্রদত্ত' বা 'স্থির' উপাদান হিসেবে এবং ক্রমহ্রসমান জাতীয় রুটিতে কামড় বসাবার জন্য তীব্রপ্রতিযোগিতা দেখা দিত। অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার জন্য সংগ্রাম এখন আভ্যন্তরীণ হয়ে পড়ে। নিজের শ্রেণীগত অবস্থান ও পরিচিতি রক্ষা করার জন্য এবং 'বহির্গমনের পথহীন পরিস্থিতি' থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে কোনো পন্থাকেই ভাল মনে করা হত।

ধর্মের ভিত্তিতে গোষ্ঠী গঠন থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ, এবং তার সদৃশ অন্যান্য গোষ্ঠী ও মতাদর্শ, এই সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারত, এবং করেছিল। এখানে শত্রু ছিল একটি গোষ্ঠী, যাকে সমবেতভাবে হটিয়ে দিয়ে পাল্টা একটি গোষ্ঠীর সদস্যরূপে নিজের ব্যক্তিগত অবস্থানের উন্নতিসাধন করা সম্ভব ছিল। অথবা, কেউ এমন এক গোষ্ঠীকে মদৎ দিত, যার সদস্য হিসেবে সে উন্নততর সুযোগসুবিধা সহ একটি অবস্থান বজায় রাখতে পারত, এবং এমন এক গোষ্ঠীর বিরোধিতা করত, যার অনুপ্রবেশ তার নিজের সুযোগসুবিধা কমিয়ে দিত। উপরন্তু, একজন পেটি বুর্জোয়া যখনই দেখে যে তার অবস্থা নড়বড়ে, নিরাপত্তাহীন ও বিপন্ন, এবং পুনরুন্নয়নের পথ বন্ধ, তখনই সে এমন কোনো গোষ্ঠীকে খুঁজতে থাকে যাদের তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বলে ঘোষণা করা এবং তার নিজের অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য দায়ী করা যায়। কিন্তু জাতি, অঞ্চল বা প্রদেশ ভিত্তিক অন্য সমস্ত গোষ্ঠী যেখানে সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক এবং সামাজিক ব্যাপ্তির ফলে স্বয়ং-সীমিত ছিল,[৩] সেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদের কেন্দ্র ছিল

সর্বভারতীয় ধর্মসমূহ, তাই তার সম্ভাবনাও ছিল সর্বভারতীয়। আমরা পরে দেখব, তার পক্ষে ব্যাপক সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়াও সম্ভব ছিল। ফলে ঔপনিবেশিক ভারতে মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সংগ্রাম এবং নিন্দার পাত্র খোঁজার আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত প্রধানত সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করেছিল।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মধ্য শ্রেণীভুক্ত মুসলিমরা মনে করতে পারত যে সরকারী চাকরী ও পেশাগত ক্ষেত্রে মুসলিমদের ভাগ বাড়লে উক্ত চাকরীতে বা পেশাদার প্রতিযোগিতায় তাদের প্রত্যেকেরই সুযোগ বাড়বে। একই কারণে মধ্য শ্রেণীভুক্ত হিন্দুরা মনে করতে পারত যে মুসলিমদের ভাগ বাড়লে তাদের প্রত্যেকেরই সুযোগ কমবে। এইভাবে, এদের পরস্পরকে মনে করানো যেত যে এরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী যারা পরস্পরের থেকে চাকরী কেড়ে নিতে উৎসুক। বিভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে চাকরীর জন্য প্রতিযোগিতাকে দুটি 'সম্প্রদায়ের' মধ্যে সংগ্রাম হিসেবে দেখানো যেত, যদিও যে ঔপনিবেশিক অধঃবিকাশ এই প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছিল এবং তাকে তীব্রতর করে তুলেছিল তা হিন্দু ও মুসলিম উভয়কেই সমানভাবে এবং একই সঙ্গে আঘাত করছিল। চাকরীর কোনো একটি ক্ষেত্রে হিন্দুদের অধিকতর হারকে 'হিন্দু অর্থনৈতিক আধিপত্য' বলে ঘোষণা করা যেত, আবার একই ক্ষেত্রে মুসলিমদের বৃহত্তর অংশকে 'হিন্দু অবস্থানের' প্রতি 'মুসলিম হুমকী' বলা যেত।

বিশেষত, চাকরীর ঘাটতির ফলে সরকারী চাকরীতে প্রতিটি নিয়োগকেই সাম্প্রদায়িক ও অন্যায় বলে দেখা হত এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদে ইন্ধন যোগাতো। শীঘ্রই, এক লৌহদৃঢ় কাঠামোর মধ্যে একটি আবর্ত চক্র দেখা দিল, যা অনুযায়ী প্রতিটি নিয়োগ, সচরাচর পত্রপত্রিকা মারফৎ যথেষ্ট ঘোষিত হয়ে, সাম্প্রদায়িকতাবাদের 'সত্য'কে প্রমাণ করে দিত। উদাহরণস্বরূপ, কেউ নিযুক্ত না হলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী নিশ্চিত হত যে 'ওরা' তার 'সম্প্রদায়'কে এগিয়ে যেতে দেবে না, এবং কেউ নিযুক্ত হলে বোঝা যেত যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ কাজে লাগে। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ তার অঙ্গ হিসেবে নির্মিত এক স্বরণযন্ত্র মারফৎ কাজ চালাত।

উপরন্তু, মেধার প্রতিযোগিতায় পরাস্ত, অথবা মেধাভিত্তিক নিয়োগ এবং পদোন্নতি, অথবা ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যার কলেজে আসনপ্রাপ্তি থেকে সংরক্ষণ, স্বজনপোষণ ইত্যাদির ফলে বঞ্চিত হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে হতাশাগ্রস্ত ও তাদের পরিবারের সংখ্যা যথেষ্ট বড় মাপের ছিল। শক্তিশালী পারিবারিক ও কুটুম্বিক সম্পর্ক ও অনুভূতির ফলে, একটি মাত্র নিয়োগ বা পদোন্নতির ফলে বহু ব্যক্তি বস্তুগত বা মানসিকভাবে প্রভাবিত হত। পারিবারিক সংহতিই ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাম্প্রদায়িক অভিঘাতকে প্রশস্ত করত। বস্তুত, ব্যক্তিগত হতাশা ও অপর 'সম্প্রদায়ের' প্রতি তজ্জনিত ক্ষোভের প্রবণতা ছিল কার্যত গোটা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীকে গ্রাস করার।

এভাবে দেখলে, মধ্য শ্রেণীভুক্ত এত ব্যক্তি যে সাম্প্রদায়িকতাবাদে জড়িত ছিল তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, বরং বিস্ময়ের এটাই, যে অন্য কতজন তার প্রভাবের বাইরে থাকতে পেরেছিল। আর একথা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যে এমন কি ১৯৩০-এর এবং ১৯৪০-এর দশকে ও মধ্য শ্রেণীভুক্ত ব্যাপক সংখ্যক ব্যক্তি মোটামুটিভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এ কথা বিশেষভাবে সত্য বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে। বাস্তবিক, ১৯৩০-এর দশকের টিপিক্যাল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর ধর্মনিরপেক্ষ এবং মোটা দাগে বামপন্থী, এই দুই-ই হওয়ার প্রবণতা ছিল।

ব্যক্তিস্বার্থ ভিত্তিক আভ্যন্তরীণ বিরোধে পীড়িত মধ্য শ্রেণীগুলি সর্বক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা সাম্প্রদায়িক-ধাঁচের রাজনীতির মধ্যে দোলায়মান ছিল। একই সামাজিক কারণ থেকে মধ্য শ্রেণীগুলি জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ও সামাজিক র‍্যাডিক্যাল মতবাদ গ্রহণ করত, আবার সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জাতিবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদিও গ্রহণ করত। এক প্রশস্ত অর্থে তারা উভয় ক্ষেত্রেই নিজেদের সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করার ও সম্প্রসারণের চাহিদায় কাজ করত। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ ছিল। যেখানে তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মাধ্যমে চালিত হত, সেখানে এই স্বার্থ সার্বিক সমাজ বিকাশের স্বার্থের সঙ্গে মিলিত হত, এবং তাদের রাজনীতি মিশে যেত বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে মধ্য শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব থাকত একটি সার্থবাহী গোষ্ঠীরূপে, তখন তারা একটি সাম্প্রদায়িক বা সাম্প্রদায়িক ধাঁচের মতাদর্শের মাধ্যমে কাজ করত, এবং অভিন্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার স্বীকৃতির উপর, এবং ঔপনিবেশিক ভারতের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা হত হয় ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষাবলম্বী, অথবা বড়জোর তার প্রতি উদাসীন। কিন্তু তা অনিবার্যভাবে ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলনসমূহের বিরুদ্ধে থাকত।

সুতরাং, একটি প্রধান দিক থেকে বলা যায় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল সমাজ রূপান্তরের সতেজ সংগ্রামের অভাব এবং অর্থনৈতিক নিশ্চলতার দ্বারা বর্ণিত এক সামাজিক পরিস্থিতিতে মধ্যশ্রেণীদের স্বার্থ, আকাঙ্ক্ষা, দিশা ও মনোভাব এবং মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীরভাবে প্রথিত এবং তারই অভিব্যক্তি। এক কথায়, এক দিক থেকে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ছিল সর্বাগ্রে পেটি বুর্জোয়া প্রশ্ন। ঠিকই সঙ্গে, যদিও সাম্প্রদায়িকতাবাদ সব শ্রেণীর মানুষের মধ্য থেকেই সমর্থক টেনে আনতে পেরেছিল, তবু তার মূল সামাজিক ভিত্তি দেখা যেত মধ্য শ্রেণীগুলির বা পেটি বুর্জোয়াসির মধ্যে। সাম্প্রদায়িকতাবাদে তার প্রধান সামাজিক

সমর্থন পেত, এবং তার প্রধান আবেগপূর্ণ আহ্বান রাখত, এই সামাজিক স্তর-গুলির কাছে।

[দুই]

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আর একটি বিশেষ দিক ছিল, যা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষে যেত। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক কৃত্যকে, এবং সংস্কৃতি ও বিনোদনের ক্ষেত্রে সুযোগের অনুপস্থিতিতে, বিশেষত যৎসামান্য মূলধন বা জমির মালিক যে শিক্ষিত মধ্য ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীগুলি, তাদের কর্মসংস্থানের মূল সড়ক ছিল সরকারী বা পৌর সংস্থার চাকরী। শিক্ষক, চিকিৎসক ও ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরীরও বহুলাংশ ছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। ১৯৫১ সালেও, যেখানে ফ্যাক্টরী আইনের অধীনে ছিলেন ১২ লক্ষ ব্যক্তি, সেখানে সরকারী চাকরীতে নিযুক্তের সংখ্যা ছিল ৩৩ লক্ষ। এ থেকেই মধ্য শ্রেণীদের প্রধান অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য প্রতিযোগিতার তীব্রতা ব্যাখ্যা করা যায়। উপরন্তু, উপস্থিত ভাল বেতনের চাকরীর প্রায় সবই ছিল সরকারী ক্ষেত্রে। ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্চতর কর্মচারীরা প্রায় সর্বদাই হত বিদেশী, আর সে যুগের ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি খুব কম সময়েই বহিরাগতদের উচ্চতর পদে নিয়োগ করত।

ব্যক্তিগত স্বার্থকে ঘিরে গোষ্ঠীগত জোটগঠন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল যখন সরকারী চাকরী, শিক্ষাগত সুযোগ, ব্যবসায়িক চুক্তি ইত্যাদি নিয়ে প্রতিযোগিতা দেখা দিত, কারণ তার সঙ্গে প্রশাসনিক পদক্ষেপ, সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি জড়িত ছিল। কিন্তু কোনো ব্যাপকতর গোষ্ঠী গঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দাঁড়িপাল্লায় ফেলা যেত না। তবে একবার গঠিত হলে এই ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সবচেয়ে 'ফলপ্রসূ' হতে পারত, বিশেষত যখন সরকার তাকে উৎসাহ দিত। এই কারণে, সংবিধান সংস্কার উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে তোলে। সেগুলির ফলে যে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা পাওয়া গিয়েছিল, তা-ও এখন ঐ সংগ্রামে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যেত। তাই সাম্প্রদায়িক সংঘাত যে প্রধানত ঘটেছিল সরকারী চাকরী, শিক্ষাগত ছাড়, ইত্যাদির জন্য, এবং সেগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে দিত যে আইনসভা ও পৌর প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক স্থান তা দখল করার জন্য, সেটা আকস্মিক নয়।[৪]

সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁদের 'সম্প্রদায়দের' জন্য যে সমস্ত মৌলিক অঙ্গীকার দাবী করতেন তার প্রায় সবকটিই এই দুই বিষয়ের উল্লেখ করত। তদুপরি, সরকারী চাকরী, শিক্ষাগত সুযোগসুবিধা, চুক্তি ইত্যাদির উপর মধ্যশ্রেণীগুলির নির্ভরশীলতার ফলে পৃষ্ঠপোষকতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র চলে যায় ঔপনিবে-

শিক রাষ্ট্রের হাতে এবং প্রশাসনের ভিতর থেকে বা বাইরে থেকে নিয়োগক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাবান সাম্প্রদায়িক নেতাদের হাতে। এই পৃষ্ঠপোষকতাকে ব্যবহার করে চাকরীর জন্য ক্ষুধার্ত মধ্যশ্রেণীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধিকে প্রেরণা দেওয়া এবং জাতীয়তাবাদকে নিরুৎসাহ করা যেত। একবার চালু হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক পৃষ্ঠপোষকতা মধ্য শ্রেণীভুক্ত যুবকদের সাম্প্রদায়িক ব্যবহার ও চিন্তার ধাঁচের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী বাহ্যিক উপাদানে পরিণত হয়—ঠিক পাভলভীয় কুকুরেরই মত। চাকরীর জন্য উদ্দাম প্রয়াস অন্যান্য গোষ্ঠীগত জোটের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ করা যেত। একবার কর্ম সংরক্ষণ আদর্শে পরিণত. হলে ভারতীয় সমাজকে অনন্ত খণ্ডে বিভক্ত করা যেত। চাকরী ইত্যাদির জন্য সংগ্রামে রাজনৈতিক শক্তিকে জড়িয়ে নেওয়ার জন্য জাতি ও প্রাদেশিক পরিচিতিকে ব্যবহার করা যেত, এবং করা হয়েছিল। কিন্তু তা সফলভাবে করা যেত কেবল স্থানীয় স্তরে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে সর্বভারতীয় স্তরে উপযোগী ছিল কেবল সাম্প্রদায়িক পরিচিতি। সুতরাং, অনেক সময়ে একই সামাজিক গোষ্ঠী স্থানীয় স্তরে জাতি বা আঞ্চলিকতাকে ঘিরে জমায়েত হত, আর সর্বভারতীয় স্তরে হত সাম্প্রদায়িকতাবাদের ভিত্তিক। যথা, ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মুসলিম অংশ জাতির ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল, তাই তারা শিখ ও হিন্দু জাতিবাদীদের সঙ্গে ঐক্য গড়েছিল। অন্যদিকে, সর্বভারতীয় স্তরে তারা মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভিন্নতর শ্রেণী ও জাতির প্রেক্ষিতে ১৯৩০-এর দশকে এবং ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে বঙ্গদেশেও একই ধরণের পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল।

একইভাবে, সরকার জড়িত থাকায় এবং রাজনীতির মাধ্যমে চাকরী দেওয়া বা পদোন্নতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকায় ১৯২০-এর দশকে এমন কি রেল শ্রমিকরাও, বিশেষত কেরাণী, গার্ড, টি.টি., ড্রাইভার ইত্যাদি পেটি বুর্জোয়া অবস্থানে স্থিত যারা, তারা সাম্প্রদায়িকতাবাদের দিকে ঘোরার প্রবণতা দেখাতো।[৫]

লক্ষ্যণীয় যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে খণ্ড পরিচিতি প্রভাবশালী ছিল না এবং তা ভেঙে পড়ার প্রবণতা দেখাতো। উদাহরণস্বরূপ, যে পর্বে সাম্প্রদায়িকতাবাদ মূলতঃ প্রশাসনে স্থান বণ্টন ও আইনসভায় আইন বণ্টন সংক্রান্ত দাবী তুলত, সে সময়ে ধনিক শ্রেণী সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল না। মুসলিম ধনিকরা তখনই সাম্প্রদায়িক অবস্থান নিতে শুরু করে, যখন সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদের স্তরে উপনীত হয়। ধনিকরা এবার স্বতন্ত্র 'মুসলিম' রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে—যথা হিন্দু ধনিকদের বাদ দেওয়া—নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করতে পারত।

[তিন]

মধ্য শ্রেণীগুলি থেকে আগত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি স্বল্পমেয়াদী হিসেবে অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতাবাদের দ্বারা লাভবান হয়েছিল। এ কথা সত্য বিশেষত তুলনামূলকভাবে নিশ্চল অর্থনীতি এবং সরকারী কর্মক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এক ধরণের "ন্যায্যতা" লাভ করে যার ফলে একজন সরকারী চাকরীতে নিজের সুযোগ বাড়াতে পারত। আংশিকভাবে এই তথ্য দেখিয়ে দেয় কেন সাম্প্রদায়িক প্রচার মধ্যশ্রেণীদের মধ্যে সফল হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদের মাধ্যমে নিজের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা বৃথা, বা সামাজিক বাস্তবতায় সাম্প্রদায়িকতাবাদের আদৌ কোনো ভিত্তি নেই, জাতীয়তাবাদী বা সংহতিবাদী বিশ্বাসের এটা বিপরীতে। পেটি বুর্জোয়াদের সামাজিক অস্তিত্বে, যত বিকৃত ও খণ্ডিতভাবে হোক না কেন, সাম্প্রদায়িকতাবাদের একটা ভিত্তি ছিল। সাম্প্রদায়িক প্রচার সম্পূর্ণরূপে সামাজিক বাস্তবতা বিবর্জিত ছিল না। সাম্প্রদায়িকতাবাদীর মধ্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের বাস্তবতায় তাদের ব্যাখ্যা চাপিয়ে দিতে পারত, কারণ তা যেন তাদের অভিজ্ঞতা অথবা তাদের সমসাময়িক জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খেয়ে যেত। অবশ্যই, সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে একজন যত উপরে উঠতে পারত, এবং যত প্রতিদ্বন্দ্বী কমত, সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে লাভের পরিমাণ তত বৃহত্তর হত. নিম্ন মধ্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের চেয়ে উচ্চ মধ্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা অনেক বেশী লাভবান হত। যারা চাপরাসী বা কেরানী হতে চেষ্টা করত, তাদের চেয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদ মারফৎ অনেক বেশী লাভবান হওয়ার সুযোগ ছিল যারা উচ্চ আদালতের বিচারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা উপাচার্য, বা চিকিৎসালয়ের পরিচালক পদপ্রার্থী, তাদের। তবে পূর্বোক্তরাও, যৎসামান্য পরিমাণে হলেও, কিয়দংশে নিজেদের জীবনের সুযোগসুবিধা বাড়িয়ে নিতে পারত। অবশ্যই, দীর্ঘ মেয়াদী হিসেবে তারা যত না সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে লাভবান হত, তার চেয়ে বেশী সাম্প্রদায়িকতাবাদের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। তবে এ কথা স্পষ্ট যে মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিতে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভূমিকাকে খাটো করে দেখা যায় না।

কালক্রমে মধ্য ও ধনী কৃষক এবং ছোটো ভূস্বামীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার পেটি বুর্জোয়াসির গণ্ডী গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে দিল। নবা শিক্ষিত গ্রামীণ যুবকরা ঔপনিবেশিক অধঃবিকাশের ফলে বা ভূস্বামী বা কৃষকরূপে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে দলে দলে কর্মসংস্থানের আশায় নগরাঞ্চলে আসতে থাকে। তদুপরি, উচ্চশ্রেণীর ভূস্বামীরাও অর্থনৈতিক সংকট ও ধীরগতিতে ভাঙনের ফলে বিপন্ন বোধ করে এবং তা অতিক্রম করতে চেষ্টা করে শহরে চাকরীর বাজারে প্রবেশ করে এবং সংরক্ষণ ও মনোনয়ন ব্যবস্থার পক্ষে বা বিপক্ষে লড়াই করে। এই ক্রম-

বিকাশ ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করে যাতে তা গ্রামাঞ্চলকেও জড়িয়ে নেয়। ১৯৪৭-এর আগে এই বিকাশ প্রধানত ভূস্বামী ও ধনী কৃষকদের উপর প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তা কৃষকদের সমস্ত অংশের মধ্যেই অনেক গুণ দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং সাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রদায়িক-ধাঁচের আন্দোলনের এক বিশাল সম্ভাব্য ভূমি তৈরী করেছে, যা কখন আন্দোলন মাঝেমধ্যেই প্রচণ্ড আক্রোশ ও দাপটের সঙ্গে ফেটে পড়ে।

উপরে বিবৃত পরিস্থিতিতে কেবল মুসলিমরা নয়, বরং হিন্দু, খ্রীষ্টান, ও শিখ মধ্য শ্রেণীগুলিও সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি কমবেশী আকৃষ্ট ছিল।

যে কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি করে বলা দরকার যে ব্যক্তিগত সুযোগ বৃদ্ধির আশায় মধ্য শ্রেণীগুলি যে যে হাতিয়ার ব্যবহার করত, সাম্প্রদায়িকতাবাদ তার একটি মাত্র। একই সঙ্গে অনুরূপ অন্যান্য হাতিয়ার, যথা জাতিবাদ, ধর্মীয় গোষ্ঠীতন্ত্র, ভাষা, এলাকা, প্রদেশ বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীবাদ, সবই যথেচ্ছ ব্যবহার করা হত। বস্তুত, একবার সফলভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ব্যবহার করে আত্মোন্নতি সাধনের পর দ্রুত নিজের 'সম্প্রদায়ের' কথা ভুলে যাওয়া হত এবং স্বজনপোষণ, পারিবারিক যোগাযোগের ব্যবহার, দুর্নীতি, জাতিবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক-ধাঁচের মতাদর্শ সবই নিজের 'সম্প্রদায়ের' সদস্যদের বিরুদ্ধেও বিনা দ্বিধায় যথেচ্ছ ব্যবহার করা হত। নিজের 'সম্প্রদায়ের' মধ্যে চাকরি বা পদোন্নতির জন্য সংগ্রাম বহুক্ষেত্রেই কম তীব্র, নির্দয় ও হিংস্র হত না। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে সংগ্রাম, আর্য সমাজপন্থী ও সনাতনী, শহর ও গ্রামের মানুষ, জাট ও অ-জাট, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণ, বাণিয়া ও জাট, ভূমিহার ও কায়স্থ, রেড্ডী ও কাম্মা, জাট বা কুর্মি ও রাজপুত, পূর্ব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশবাসী, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়, বাঙালী ও বিহারী, মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাতি, সিন্ধী ও গুজরাতি, পাকিস্তানে সিন্ধী ও পাঞ্জাবী এবং প্রাক্তন সংযুক্ত প্রদেশনিবাসী, বাংলাদেশে বাঙালী ও বিহারী, উত্তর ও দক্ষিণ বিহারবাসী, এদের মধ্যে সংগ্রামকে। এরই আধুনিক উদাহরণ হল বিহারে 'অগ্রসর' ও 'অনগ্রসর' দের মধ্যে সংগ্রাম এবং কেরালাতে জাতি ও সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক আনুপাতিক অংশ অনুযায়ী শিক্ষক ও চিকিৎসকসহ প্রায় সর্বপ্রকার কর্ম সংরক্ষণ।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হবে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ভূস্বামী, আমলাতন্ত্র ও ঔপনিবেশিকতাবাদীদেরও স্বার্থসিদ্ধ করত। কিন্তু ভূস্বামী ও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ নিম্নমধ্যশ্রেণী ও জনগণের থেকে এত দূরে ছিল যে তাদের পক্ষে পরোক্ষদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা ও আন্দোলনের পথে আনা সম্ভব ছিল না। আধুনিক পথে সংগঠিত ও বিকশিত

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতা বা স্রষ্টা হওয়া উলেমার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাদের প্রধান ভূমিকা ছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও আন্দোলনের সমর্থনে ধর্মীয় উন্মাদনাকে জাগিয়ে তোলা। তারা প্রধানত জনগণ ও নিম্নমধ্য শ্রেণীদের জমায়েত করার দায়িত্ব পালন করতে পারত। একটি সাম্প্রদায়িক আন্দোলন সংগঠিত করার, তার নেতৃত্ব দেওয়ার, এবং নিম্নমধ্য শ্রেণীগুলি ও কৃষকদের কিছু অংশকে তার অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব পালন করতে হত বুদ্ধিজীবীসহ মধ্য-শ্রেণীর আধুনিক, শিক্ষিত অংশসমূহকে। পরবর্তী, ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হবে যে আধুনিক ভারতে হিন্দু ও মুসলিম, এই দুই সাম্প্রদায়িকতাবাদের ভিন্ন ভাগ্য ও সাফল্যের পরিমাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের নিজের কাছে টেনে আনার আপেক্ষিক দুর্বলতা এবং মুসলিম মধ্য-শ্রেণীসমূহ ও বুদ্ধিজীবীদের তুলনামূলক অনগ্রসরতা ও তার ফলে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও দলের মধ্যে তাদের অধিকতর বিশোষণ।

[চার]

বহু লেখকের মত সত্ত্বেও, এ কথা ঠিক নয় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ মূলতঃ একটি অনগ্রসর (মুসলিম) মধ্যশ্রেণী কর্তৃক একটি অগ্রসর (হিন্দু) মধ্যশ্রেণীকে ধরে ফেলার প্রচেষ্টা। তা ছিল একটি অসচ্ছল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মধ্যশ্রেণী-দের অন্তর্বর্তী ব্যক্তিবিশেষদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং সে কাজ সফল-ভাবে করার উদ্দেশ্যে বা প্রতিযোগিতায় তাদের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির আশায় বিভিন্ন 'শাখা' বা 'গোষ্ঠী' গঠনের ফলশ্রুতি। বঙ্গদেশে মুসলিম মধ্যশ্রেণীরা পশ্চাদপদ হলেও, যুক্তপ্রদেশ বা বম্বেতে তারা পশ্চাদপদ ছিল না। পাঞ্জাবে হিন্দু মধ্যশ্রেণীরা অধিকতর অগ্রসর হলেও কম সাম্প্রদায়িক ছিল না। বস্তুত, ১৯৪৭ পর্যন্ত, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ অন্য যে কোনো জায়গার তুলনায় যুক্তপ্রদেশে, এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ অন্য যে কোনো প্রদেশের চেয়ে পাঞ্জাবে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। অনুরূপভাবে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কেবল তেলেঙ্গানার অনগ্রসর মধ্যশ্রেণীরা নয়, বরং উপকূলবর্তী অন্ধ্র-প্রদেশের অগ্রসর মধ্যশ্রেণীরাও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। মহারাষ্ট্রে শিব সেনার সামাজিক ভিত্তি ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর এক বুর্জোয়াসি। কেরালায় অনগ্রসর এঝাভা মধ্যশ্রেণী এবং অগ্রসর নায়ার মধ্যশ্রেণী উভয়েই জাতি-সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছে। পাঞ্জাবে যুগপৎ হিন্দু ও শিখ সাম্প্র-দায়িকতা বিরাজ করছে। বিহারে 'অনগ্রসর' ও 'অগ্রসর' জাতিভুক্ত পেটি বুর্জোয়ারা উভয়েই সাম্প্রতিককালে প্রচণ্ড লড়াই করেছে।

বাস্তব সত্য এই ছিল যে মধ্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা ঘটতই। প্রশ্নটা ছিল প্রতিযোগীদের উপর কোনো না কোনো নাম এঁটে দেওয়া এবং প্রতিযোগিতার সহায়ক কোনো এক খণ্ড গোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া বা গঠন করা নিয়ে। তাই যখন এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এক রকম খণ্ড গোষ্ঠী পিছিয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ অন্য একটি তার স্থান নিতে এগিয়ে আসে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে গোটা ভারতে এবং মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক ও জাতিভিত্তিক গোষ্ঠীতন্ত্র মিউজিক্যাল চেয়ার খেলার মত একের পর এক আবর্তিত হয়েছে।

উপরন্তু, মধ্যশ্রেণীসমূহের কিছু 'খণ্ড' বা 'গোষ্ঠী' শিক্ষাগত বা অর্থনৈতিক-ভাবে বেশী বা কম যতটাই বিকাশপ্রাপ্ত হোক না কেন, এরকম প্রতিযোগিতা দেখা দেবেই। কম বিকাশপ্রাপ্ত বা পশ্চাদপদরা অধিকতর সুযোগের জন্য লড়াই করবে, আর বেশী বিকাশপ্রাপ্ত বা অগ্রসররা বিদ্যমান সুবিধা রক্ষার জন্য লড়বে। বাস্তবতা এটাই, যে অধিকতর শিক্ষিতরা চাকরী পেতে কম উদগ্রীব নয়; অর্থ-নৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্তরাও সুবিধা বজায় রাখতে কম উৎসাহী নয়। একই-ভাবে, হিন্দুরা, বা ব্রাহ্মণরা বিদ্যমান চাকরীর বৃহত্তর শতাংশ দখল করে আছে এই জ্ঞান নির্দিষ্ট কোনো হিন্দু বা ব্রাহ্মণের কাছে বেকারত্বকে অধিকতর সহনীয় করে তোলে না। সুতরাং মধ্যশ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি, তারা যতটা অগ্রসর বা অনগ্রসর হোক না কেন, চাকরীর বাজারে প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খণ্ড গোষ্ঠীকে ব্যবহার করতে নিজেকে প্রস্তুত বলে প্রতিপন্ন করেছে।

সুতরাং তুলনামূলক অর্থনৈতিক নিশ্চলতা ও চাকরীর উন্নতির জন্য সীমিত সুযোগের পরিস্থিতিতে পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে কিছু পরিমাণ সাম্প্রদায়িক ধাঁচের জোট গঠন ও তাদের পারস্পরিক রাজনৈতিক সংঘাত হয়ত অনিবার্য ছিল। প্রশ্ন ছিল, ব্যাপকতর রাজনৈতিক সংগ্রামে কার প্রাধান্য থাকবে—এগুলির না অন্য, অনেক বেশী অর্থপূর্ণ জাতীয়তাবাদী বা সামাজিক সংগ্রামের?

প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্যণীয় যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণবশতঃ[৬], ধর্ম, জাতি, ভাষা বা অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্থানীয় বা জাতীয় স্তরে বাস্তবিক অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত পার্থক্যের বিকাশ ঘটেছিল। এই পার্থক্য দূরীকরণও প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদ আরো এগিয়ে যায়, এবং এই অসাম্যগুলিকেই রাজনীতির ভিত্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীরা বহু সময়ে জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় সংহতির নামে এই অসাম্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করেছিলেন। এই অবহেলার মূল্য ছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক ধাঁচের মতাদর্শ ও আন্দোলনের বৃদ্ধি।

[পাঁচ]

সাম্প্রদায়িকভাবে চিন্তা করা ও কাজ করার মধ্যশ্রেণীর যে প্রবণতা, তা যুক্ত হত সাধারণভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে ও বিশেষত জাতীয় আন্দোলনে মধ্য শ্রেণীদের বিরাট ভরের সঙ্গে। এই সমন্বয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার পক্ষে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে দুর্বল করে তুলত। ১৯০৫-এর পর থেকে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সামাজিক সমর্থন ক্রমেই প্রশস্ততর হওয়া সত্বেও, শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন মৌলিকভাবে নির্ভরশীল ছিল নিম্ন মধ্যশ্রেণী-দের উপর। তাদের চাহিদা ও আত্মিক গঠন জাতীয় আন্দোলনের সাধারণ রাজ-নৈতিক ও মতাদর্শগত দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলত। এমন কি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় অভিযানের পর্বগুলিতেও এই নির্ভরশীলতা উপস্থিত ছিল। তবে সে সময়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব জনগণের উপর নির্ভর করে এবং জনগণের মধ্যে সৃষ্ট উৎসাহে ভর করে কিছুটা পরিমাণে মধ্যশ্রেণীদের অগ্রাহ্য করতে পারত। কিন্তু পার্লা-মেণ্টারী রাজনীতির পর্যায়সমূহে, যখন আইনসভা বা স্থানীয় সংস্থার জন্য নির্বাচনী লড়াই লড়তে হবে, সে সময়ে এই নির্ভরশীলতা হত উল্লেখযোগ্য, এমন কি সম্পূর্ণ। ১৯১৯-এর এবং ১৯৩৫-এর আইনানুসারে যে সীমিত ভোটাধিকার ছিল তাতে নির্বাচনী রাজনীতি আবদ্ধ ছিল ভোটাধিকার প্রাপ্ত মধ্যশ্রেণীদের মধ্যে, কারণ ব্যাপক জনগণের এই অধিকার কার্যত ছিল না। ১৮৯২-এর পর থেকে প্রতিবার ভোটদাতাদের পরিসর প্রশস্ততর করায় আরো বেশী পেটি বুর্জোয়া ভোটদাতা সৃষ্ট হয়েছিল, এবং এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সম্ভাব্য নির্বাচনী ভিত্তি সম্প্রসারিত হয়েছিল। খুব কম দল ও প্রার্থীরই মধ্যশ্রেণীদের সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য পক্ষপাতদোষ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার রাজনৈতিক সাহস ছিল। স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী থাকায় এই নির্ভরশীলতা হিন্দু ও মুসলিম, উভয় ধর্মের প্রার্থীদের উপরই দ্বিগুণভাবে আরোপিত হয়। জাতীয়তাবাদী নেতারা সাধারণভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু যে সমস্ত প্রতিপত্তিসম্পন্ন সাম্প্রদায়িক নেতারা—কী হিন্দু কী মুসলিম—জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে মধ্যশ্রেণীদের বড় বড় অংশের সমর্থনের অংশীদার ছিলেন, তাঁদের সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী নেতারা দৃঢ় সংগ্রাম চালাবার সাহস পেতেন না।[৭] হিন্দু ও মুসলিম উভয় সাম্প্র-দায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে যুগপৎ ও বলিষ্ঠ সংগ্রাম পরিচলনা করার অর্থ হত প্রাথমিকভাবে সমর্থন ও আসন হারানো, এমন কি নির্বাচনী বনবাস যাত্রা। সুতরাং কংগ্রেস নেতৃত্ব ১৯৩৬ পর্যন্ত যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা হল উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের যুগপৎ তোষণ নীতি।

ফলতঃ, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টা যে রূপ নিত তা হল প্রধানত উপর থেকে, স্বীকৃত সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে,

আলোচনা চালানো। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে সাম্প্রদায়িক দাবী ছিল সর্বাগ্রে সরকারী চাকরী এবং পৌর প্রতিষ্ঠান ও আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে আসন ভাগ করা সংক্রান্ত। এ ক্ষেত্রে একটি কার্যোপযোগী উত্তর হত হিন্দু মধ্যশ্রেণীসমূহের দিক থেকে ঔদার্য প্রদর্শন। সম্ভবত এই ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া জনগণ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে কম সামাজিক ব্যয়সাপেক্ষ হত। কিন্তু হিন্দু মধ্যশ্রেণী, বিশেষত পাঞ্জাব, সিন্ধ এবং বঙ্গদেশে, ছিল সমান সাম্প্রদায়িক। ফলে ঠিক এখানেই জাতীয়তাবাদী নেতারা ইতস্তত করেন এবং উদার মনোভাব দেখিয়ে সমঝোতা করতে সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি, পাছে তাঁদের মধ্যশ্রেণীভুক্ত সমর্থকরা তাঁদের ত্যাগ করে। যতবার তাঁরা সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের কোনোরকম বিশেষ সুবিধা অর্পণ করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, ততবার হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা শক্তিশালী পাল্টা প্রচারাভিযান সংগঠিত করে। প্রায় কোনো উচ্চস্তরের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলনে এবং সাংবিধানিক আলোচনাতেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব হিন্দু সাম্প্রদায়িক মতামতকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। এরকম সমস্ত আলোচনাতেই হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতারা এক অন্তর্ভুক্ত নিষেধাজ্ঞার ক্ষমতা উপভোগ করতেন। অনুরূপ প্রক্রিয়ায়, জাতীয়তা-বাদী মুসলিম নেতারা বহু সময়েই মুসলিম মধ্যশ্রেণীদের পক্ষ থেকে আনীত চাকরী ও শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত দাবী ইত্যাদির বিরোধিতা করা কঠিন বলে আবিষ্কার করতেন।

স্বল্পমেয়াদী হিসেবে জাতীয়তাবাদী নেতাদের রাজনৈতিক বিচার ভ্রান্ত ছিল না। মধ্যশ্রেণীদের সাম্প্রদায়িক মতামত প্রকাশ্যে নাকচ করার নির্বাচনী ও রাজ-নৈতিক মূল্য যথেষ্ট চড়া হতে পারত। যথা, ১৯২৬ সালে যখন সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-নিরপেক্ষ মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস নেতৃত্ব মধ্যশ্রেণীর শক্তিশালী সাম্প্রদায়িক মতকে অগ্রাহ্য করে, তখন তার মূল্য ছিল সারা দেশে ব্যাপকহারে কেন্দ্রীয় আইনসভার আসন হারানো, এবং পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে কার্যত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া। বিজেতারা ছিলেন সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীরা এবং উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, যাঁরা প্রকাশ্যে মতিলাল নেহরুকে 'মুসলিমপন্থী', 'গোমাংস ভক্ষক' ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছিলেন। কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদেরও হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীর কাছে হারায়। একইভাবে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাছে অনেকগুলি সাধারণ আসন হারায়, যদিও ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীদের জন্য কং-গ্রেসের ভিতর আবার স্থান করে দেওয়া হয়েছিল। মধ্যশ্রেণীর মুসলিমদের মধ্যেও কংগ্রেস কোনো বড় রকম দাঁত ফোটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের সংবিধান গণতন্ত্রীকরণ ও অনুরূপ ফল সৃষ্টি করেছিল। তখন থেকে, যে পরিমাণে কংগ্রেসের ভিতর আভ্যন্তরীণ পার্টি গণতন্ত্র সক্রিয় ছিল, সেই পরিমাণে একজন

কংগ্রেস নেতাকে দলের ব্যাপক পেটি বুর্জোয়া সদস্যবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও পক্ষপাতের প্রতি সাড়া দিতে হত।

সে অর্থে, জহরলাল নেহরু যখন বলেছিলেন যে মূলতঃ মধ্যশ্রেণীদের উপর ভিত্তি করে গঠিত জাতীয় আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতাবাদ এক জন্মগত দুর্বলতা, তখন ঠিক কথাই বলেছিলেন।[৮] অন্যভাবে বলা যায়, কংগ্রেস অনেক সহজে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প সংগ্রামে নিযুক্ত হতে পারত, যদি তার সামাজিক ও মতাদর্শগত ভিত্তির ভরকেন্দ্র পেটি বুর্জোয়াদের থেকে অপসৃত হয়ে যেত ব্যাপক কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর দিকে; অথবা, যদি সামাজিক পরিস্থিতির উপর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ কায়েম থাকত, যাতে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক চোরাগলি পেটি বুর্জোয়াদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি গ্রহণ করার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তা থেকে পেটি বুর্জোয়াদের উদ্ধার করা যেত। তৃতীয় বিকল্প ছিল পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে গভীর শিক্ষামূলক মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রচার অভিযান গ্রহণ করা।

হয়ত সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গের সঙ্গে সরকারী চাকরীতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ প্রসঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়াও রাজনৈতিকভাবে বিপরীত ফলপ্রদায়ী ছিল। এই আলোচনা জনমানসে সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গকে স্ব-স্ব 'সম্প্রদায়ের' 'স্বার্থের' জন্য যোদ্ধারূপে আবির্ভূত হতে সুযোগ দেয়। উপরন্তু, এর ফলে এমন কি ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদেরও সাম্প্রদায়িকতাবাদের ছোঁয়াচ লাগে এবং তাঁরাও নিজ নিজ 'সম্প্রদায়ের' নিরিখে ভাবতে শেখেন। এই সব নীতির ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে কোনো বিতর্ক বা আলোচনার অর্থ ছিল যে সাম্প্রদায়িক নেতারা ও ঔপনিবেশিক শাসকরা যে সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করছিল তাদের সুবিধা করে দেওয়া।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক-ধাঁচের আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়তে ব্যর্থ হওয়ার ব্যাখ্যা সম্ভবত একই ভিত্তিতে করা যায়। এমন কি যে সমস্ত রাজনৈতিক দল সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক ধাঁচের দৃষ্টিভঙ্গী, মতাদর্শ ও রাজনীতি মুক্ত, তারাও সফল লড়াই লড়তে পারে নি কারণ তারা তাদের পেটি বুর্জোয়া জনভিত্তিকে বিচ্ছিন্ন করার ভয়ে ভীত ছিল। বরং, তারা হয় সাম্প্রদায়িক-ধাঁচের আন্দোলনের সঙ্গে রফা করার প্রবণতা দেখিয়েছে, অথবা ঝড় বয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নীরব থাকা কাম্য মনে করেছে।

[ছয়]

আরো একটি কারণে মধ্যশ্রেণীগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদের মূল গণ-সামাজিক ভিত্তি হয়েছিল। কেবলমাত্র মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতা ছিল, ব্যক্তিগতভাবে সমাজে উপরে ওঠা বা নীচে নামার ; কেবল তাদের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও সামাজিক প্রশ্নের সমন্বয়সাধন সম্ভব ছিল। সংখ্যার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীগুলি তা করতে পারত শ্রেণীভিত্তিতে। সুতরাং, শ্রমিক ও কৃষকরা সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে কোন অর্থে লাভবান হতে পারতেন না। বস্তুত, হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকরা, কৃষকরা, হস্তশিল্পীরা, কারিগররা, এবং এমন কি নিম্ন-মধ্য শ্রেণীদেরও কোনো কোনো অংশ সাধারণভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোনো রকম দ্বন্দ্ব ছিল না। সুতরাং বিরল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় কুসংস্কারের ভিত্তিতে সংগঠিত দাঙ্গার সময়ে ছাড়া, ১৯৩৭-৩৯ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদ এই শ্রেণীগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। অন্যদিকে, ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুটি অসহযোগ আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলন, এ সবে তাদের সফলভাবে জমায়েত করা সম্ভব ছিল এবং সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু ঔপনিবেশিক নিশ্চলতা ও সামাজিক শোষণের ফলে এই শ্রেণীগুলিও উত্তরোত্তর সাধারণ কিন্তু অস্পষ্ট সামাজিক অতৃপ্তি ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রাম দৃঢ়ভাবে সংগঠিত না হওয়ায় এই অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য অন্য কোনো দিকে পরিচালিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। উপরন্তু, মন্দার ফলে বেকারসংখ্যা এত তীব্রভাবে বাড়ে যে সমাজের সর্বস্তরেই বামপন্থা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, উভয়েরই আহ্বানে সাড়া জাগার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ছোট-বড় শহরগুলিতে ক্রমবর্ধমান লুম্পেন ব্যক্তিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক আহ্বান বিশেষ আনুকূল্য লাভ করে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে প্রধান সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি, তাদের সম্প্রদায়ের নামে কথা বলে, মধ্যশ্রেণী সম্পর্কিত দাবী ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ তুলে ধরে নি, বা অন্য কোনো ভাবে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংজ্ঞা দেয় নি। সংখ্যালঘু সমস্যার আলোচনায় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক অধিকার খুবই আলোচিত হত। সে প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখ হত বড়জোর দায়সারা আচারপালনের মত করে, এবং ধোঁয়াটেভাবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কেন্দ্রে ও রাজ্যে 'নিরাপত্তা', 'রক্ষাকবচ', ইত্যাদি যা দাবী করা হত তার সংজ্ঞা অভিন্নভাবে হত সরকারী চাকরীর ভাগ, সে ধরণের চাকরী, বা বিভিন্ন পেশার জন্য প্রশিক্ষণমূলক উচ্চ শিক্ষার ভাগ, এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ঘিরে। সুতরাং ইহা

আকস্মিক নয় যে, মধ্য শ্রেণীরাই 'সম্প্রদায়সমূহের' মধ্যে ইহাকে প্রতিযোগিতা হিসাবে দেখত। উদাহরণস্বরূপ, যে সব প্রদেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, সেখানে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দাবী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত রাখা, প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী নয়, যদিও সাম্প্রদায়িক যুক্তি অনুসারেও তা ঐ সমস্ত প্রদেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃহত্তর সংখ্যক মুসলিম আইনসভা সদস্যের নির্বাচন নিশ্চিত করে দিত। একইভাবে, সরকারের কাছে সকলের জন্য শিক্ষার দাবী করা হত না, দাবী করা হত মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের। এমন কি, ১৯১১ সালে মহম্মদ শফী ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষা বিলের বিরোধিতা করেছিলেন। মুসলিম বা হিন্দু কৃষক ও শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করার প্রশ্ন কোনো স্তরেই ওঠে নি, কারণ এমন কি সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও বুঝেছিল যে এই অধিকারগুলি কোনো সাম্প্রদায়িক প্রাচীরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়।[৯] মধ্যশ্রেণীকে যেমন তাদের দাবীর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গণ্ডীর ভিতর আনা হয়েছিল, ব্যাপক জনগণের ক্ষেত্রে তা হয় নি। বরং তাঁদের আনা হয়েছিল ধর্মের মাধ্যমে তাঁদের আবেগ জাগিয়ে তুলে (যদিও আমরা পরে দেখব যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন 'এমন কি ধর্মীয় প্রসঙ্গের সঙ্গেও সম্পর্কিত ছিল না') অথবা তাঁদের শ্রেণী সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত করে।

এ পর্যন্ত আমাদের পর্যালোচনা যে সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেছে তা হল, এক অর্থে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল (এবং আজও তা) মূলতঃ একটি পেটি বুর্জোয়া মতাদর্শ। আবার এই শ্রেণীর কোনো স্বাধীন, অথবা সমপ্রকৃতিভুক্ত অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থান নেই। তারা 'তার নিজস্ব স্বাভাবিক ক্রিয়া ও শক্তি সম্পৃক্ত প্রকৃত সামাজিক শ্রেণী' নয়। তাদের সামাজিক অবস্থান তার নিজস্ব 'শ্রেণী ব্যবস্থার' কোনো সুযোগ রাখে না, বা তার নিজস্ব "শ্রেণী" স্বার্থে সমাজে আধিপত্য কায়েম করার সম্ভাবনা রাখে না। ইহা রাজনৈতিক অর্থে শাসক শ্রেণীর অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু ভূস্বামী, বা বুর্জোয়া বা শ্রমিক শ্রেণীর মত ইহা এমন কোন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না যা মূলতঃ তার স্বার্থ দেখবে এবং যেখানে ইহা মালিকানা সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। এই স্তরের 'স্বাধীন, স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক কর্মপন্থাসমূহ' থাকতে পারে না। তার পক্ষে 'নিজস্ব একটি বাস্তব বিকল্প' সামনে রাখা বা প্রক্ষেপ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, সামাজিক সমস্যাবলীর যেরকম ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সমাধান সম্ভব, সেরকম কোনো 'মধ্যশ্রেণীর' সমাধান নেই।

এমন কি সংকীর্ণতর অর্থে, মধ্যশ্রেণীর জন্য অধিকতর চাকরী ও বৃহত্তর অর্থনৈতিক সুযোগের ক্ষেত্রে, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি অতিরিক্ত চাকরী বা অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে নি। তা করা যেত

কেবল যদি অর্থ নৈতিক বিকাশ ঘটানো যেত, এবং যদি সামাজিক বাস্তবতাকে—সাম্প্রদায়িকতাবাদ যার এক বিকৃত প্রতিফলন ছিল—ঠিক করা যেত। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী এমন কি সমগ্র পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্যও একটি সমাধান বাৎলে দিতে পারত না। তা বড়জোর যা পারত, তা হল কিছু পেটি বুর্জোয়া-শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিকে চাকরী, কন্ট্রাক্ট, ইত্যাদি দিতে পারত, এবং তা পারত বিদ্যমান, অত্যন্ত সংকীর্ণ চাকরী, পেশাগত, শিক্ষাগত ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে।[১০]

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী যখন দাবী করত যে তার 'সম্প্রদায়ের' সামাজিক সমস্যাবলীকে সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ, রক্ষাকবচ, ইত্যাদির মাধ্যমে বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে সমাধান করা যাবে, তখন সে তার বিশ্বাস 'সৎ' ছিল কি না, অর্থাৎ সে তার নিজের বা মধ্যশ্রেণীর স্বার্থে জনগণকে সচেতনভাবে ভুল বোঝাচ্ছিল কিনা, এই প্রশ্ন মৌলিক নয়। অনেক সময়ে সে নিজেকে এবং মধ্যশ্রেণীদেরও ছলনা করছিল।

সবচেয়ে বড় কথা এই, যে, স্বল্পমেয়াদী হিসেবে পেটি বুর্জোয়া ব্যক্তিরা কেউ কেউ বা লাভ করুক না কেন, দীর্ঘমেয়াদী হিসেবে পেটি বুর্জোয়াদের রাজনীতি অন্য কোনো সামাজিক শ্রেণী বা শ্রেণীদের স্বার্থ ও রাজনীতির সেবা করতে বাধ্য। অন্য পরিস্থিতিতে পেটি বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এবং সমাজতান্ত্রিক, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটাবার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এবং করছিল। কিন্তু চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায়ে দেখানো হবে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের মাধ্যমে তাদের রাজনীতি ঔপনিবেশিকতাবাদ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং প্রতিক্রিয়াশীল 'সামন্ত-বাদী' জাগীরদারী শ্রেণী ও স্তরের হাতে সমর্পিত হয়েছিল। এই অর্থে, মধ্যশ্রেণী সাম্প্রদায়িকতাবাদের মূল সামাজিক ভিত্তি রচনা করলেও, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে একটি 'মধ্যশ্রেণীর আন্দোলন' রূপে দেখা ভুল হবে।

[সাত]

প্রকৃত প্রশ্ন সব সময়েই ছিল, (এবং আজও আছে), এই, যে কোন ধরণের সংগ্রাম প্রভাববিস্তারে সক্ষম হবে? জাতীয় ও সামাজিক সংগ্রাম, যা বাস্তবতার সঠিক সচেতনতার প্রতিফলন করছিল, এবং সেকারণে সমাজ পুনর্বিন্যাসের জন্য বাস্তব, তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক সমাধানের যোগান দিয়েছিল; না ব্যক্তিগত ও খণ্ড-সংগ্রাম, যা বাস্তবতার বিকৃত চেতনাকে প্রতিফলিত করছিল, এবং যা সেজন্য সামাজিক সমস্যা সমাধানে অপারগ ছিল, কিন্তু যা মধ্যশ্রেণীদের বা অন্তত মধ্য

শ্রেণীভুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তির স্বল্পমেয়াদী স্বার্থসেবা করত, এবং তাদের সামাজিক পরিস্থিতির জন্য দোষ দেওয়া যায় এমন ব্যক্তি বা বৈরী গোষ্ঠী খোঁজার চেষ্টা করে তাদের মানসিকতার প্রতি আনুগত্য দেখাত?

যথার্থ সামাজিক সংগ্রাম ও বাস্তবতার যথার্থ উপলব্ধির অভাবে কেবল ওষুধ-টাই যে ভ্রান্ত হত তা নয়, বরং রোগের কারণও ভুলভাবে দেখা হত। কারো বেকারত্ব বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার জন্য ঔপনিবেশিকতাবাদ বা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্যান্য ব্যক্তি বা ধর্মীয় (বা জাতিগত বা আঞ্চলিক) গোষ্ঠীদের দায়ী মনে করা হত। যে হিন্দু ব্যবসায় সফল হয়েছে, বা যে মুসলিম সংরক্ষণের মাধ্যমে চাকরী পেয়েছে, নিজের বেকারত্বের কারণ হিসেবে তাদেরই মনে হত। সাম্প্রদায়িক লক্ষণ অনুযায়ী রোগনির্ণয় করা যেন মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ মনে হত। একটি নির্দিষ্ট চাকরীতে তো একজন মাত্র ব্যক্তি, একজন হিন্দু বা একজন মুসলিম, নিযুক্ত হতে পারত। অন্য পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্য অনুরূপ ও আপাতঃ সঠিক রোগনির্ণয় হত। উদাহরণস্বরূপ, সন্তান চাকরী না পেলে বা পরীক্ষায় ভাল ফল না করলে পিতামাতা তার "দোষ" ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন যে সবরকম সমাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 'সৎ' সমাজেও পরীক্ষার ফল বড়জোর বিদ্যমান চাকরীগুলিকে 'যুক্তি-সঙ্গতভাবে' বণ্টন করতে পারে, নতুন চাকরী সৃষ্টি করতে পারে না। যদি সমস্ত ছাত্রই খাটে, এবং সকলেই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলেও কিছু সংখ্যক বেকার থাকবেই। অনুরূপভাবে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ সফল হলেও মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে চাকরী পুনর্বণ্টন কবতে পারে, কিন্তু নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না। বেকারত্ব ছিল একটি বিষয়গত সত্য। কিন্তু তাকে হিন্দু বনাম মুসলিম সমস্যা, এই মোচড় দেওয়াটা ছিল একটি মিথ্যা পদক্ষেপ। একইভাবে, মুসলিমরা এবং হিন্দুরা অর্থনৈতিকভাবে কষ্ট সহ্য করছিলেন, কিন্তু তাঁরা মুসলিম বা হিন্দু বলে নয়। সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী এই কষ্ট লাঘব করার কোনো ওষুধ বলেও দেয় নি। বস্তুত, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বলে কিছু ছিল না, ছিল কেবল সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ছদ্মবেশী ব্যক্তিগত স্বার্থ। যখন আমরা বলেছি যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সমস্যাটাকে সঠিকভাবে উপলব্ধিও করে নি এবং সঠিক সমাধানও দেয় নি, তখন আমরা এটাই বলতে চাই—ইহা বাস্তবতার এক ভ্রান্ত চেতনা।

[আট]

উপরের আলোচনা সংক্ষিপ্তসার হল : প্রথমত, সাম্প্রদায়িকতাবাদ তার অন্যতম মৌলিক দিক থেকে অধঃবিকাশ ও ব্যক্তিগত অগ্রগতির সীমাবদ্ধ সুযোগের পরি-স্থিতিতে মধ্য ও নিম্নমধ্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের, এবং ভূস্বামী, কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী

থেকে সদ্য এই স্তরগুলিতে আগত ব্যক্তিদের পক্ষে জোট গঠন করা ও নিজেদের ব্যক্তিগত অবস্থান বজায় রাখা ও তার উন্নতিসাধনের জন্য সংগ্রামের অন্যতম রূপ।

দ্বিতীয়ত, এক অর্থে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক ধাঁচের আন্দোলনসমূহ নিশ্চল অর্থনীতিতে এবং যথেষ্ট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন রূপে জোট বাঁধার বিকল্প পথের অনুপস্থিতিতে অনিবার্য ছিল। যদি মধ্যশ্রেণীদের, এবং এমন কি ব্যাপক জনগণের সক্রিয়তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজ রূপান্তরের আন্দোলন সমূহে পরিচালিত না হত, তবে তাদের উৎকণ্ঠ আকাংখা, আবেগ, চাহিদা ও রাজনৈতিক শক্তি অন্যান্য, সামাজিকভাবে পশ্চাদমুখী ও বিয়োগান্ত পথে আপন অভিব্যক্তি খুঁজে পেত। যে সামাজিক পরিস্থিতি সামাজিক বিপ্লব ও রূপান্তরের জন্য পরিপক্ক, সেখানে বিপ্লব ও রূপান্তর যদি না ঘটে তবে অন্য কোনো ধরণের সামাজিক বিভাজন ও সংঘাত ঘটবেই।

তৃতীয়ত, যদি মধ্যশ্রেণীর চাকরীর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সৃষ্টি করে থাকে, সেক্ষেত্রে রাজনীতির মধ্যশ্রেণী ভিত্তিক চরিত্র ও মধ্যশ্রেণীর আধিপত্যের ফলে তার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম পরিচালনা করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব ছিল।

সর্বশেষ, এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি ও বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো চূড়ান্ত সমাধান হতে পারত না। তার অর্থ এই নয়, যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও তদনুরূপ সামাজিক ঘটনার বিরোধিতা করা উচিত নয়। তাদের সফলভাবে বিরোধিতা করা উচিত এবং করা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে স্পষ্ট স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে যে যতদিন তাদের জন্য সামাজিক জমি উর্বর থাকবে, ততদিন তারা সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবে না। যতদিন না অর্থনীতির বিকাশ আরম্ভ হয় এবং রাজনীতি ও সমাজের চারিত্রিক গঠনে পেটি বুর্জোয়াদের আধিপত্য লুপ্ত হয়, ততদিন এই ধরণের ঘটনা ও মতাদর্শ জন্ম নেবে ও বৃদ্ধি পাবে, এবং যখন দৃঢ়ভাবে তাদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রতিরোধ করা হবে না, তখন তারা বিজয়ীও হবে।[১১]

টীকা

১। এই প্রতিযোগিতা একটি প্রকৃতিবিশিষ্ট ধাঁচের প্রতিযোগিতার রূপও নিত। তা হল, ধর্মীয় প্রয়োগের তথাকথিত জনসাধারণের অনুমিত অধিকারসমূহ রক্ষা করার প্রতিযোগিতা, এবং তা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিকাশ ঘটত। সাধারণত তা সংগঠিত করত ও অর্থ সরবরাহ করত পেশাদার ব্যক্তিরা, দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা।

২। পরবর্তীকালে যাকে চাকরী বা পেশার ক্ষেত্রে হিন্দু বা মুসলিম প্রাধান্য বলে দেখা হয়েছিল তার অনেকাংশই গোড়ায় হিন্দু বা মুসলিম সাম্প্রদায়িক প্রয়াসের ফল ছিল না, বরং

ছিল পারিবারিক বা গ্রামীণ বা বৈবাহিক বা জাতিভিত্তিক সম্পর্কের প্রতি আনুগত্য। এজন্য উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, আর ই. ফ্রাইকেনবার্গ, "গুন্টুর ডিস্ট্রিক্ট, ১৭৮৮-১৮৪৮", এবং ফ্রান্সিস রবিনসন, "সেপ্যারেটিসম অ্যামং ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্", পৃঃ ৬০, টীকা ৩। পরে এ ধরণের ব্যাপক উপস্থিতি সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছড়িয়ে পড়ার একটি কারণে পরিণত হয়।

৩। প্রদেশ ও জাতিকে কেন্দ্র করে এরকম মধ্যশ্রেণীর, চাকরী-মুখী গোষ্ঠী বাস্তবে দৃঢ়ভাবে বিকশিত হয়েছিল। যথা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙালী বিরোধী মতাদর্শ, বিহার, মাদ্রাজ ও বম্বেতে জাতি, ইত্যাদি ছিল তাদের স্তম্ভ। কিন্তু এভাবে কেনো সর্ব-ভারতীয় জোট জন্ম নেওয়া সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক কালে, ভারতীয় ক্রান্তি দল (বি. কে ডি); বা ভারতীয় লোকদল (বি এল. ডি) বা লোকদল জাট, আহির ও কুর্মিদের ঘিরে হরিয়ানা থেকে বিহার পর্যন্ত একটি জাতিজোট গঠন করতে পেরেছে, কিন্তু এ সমস্ত তারা অন্ধ্র প্রদেশের রেড্ডী ও কাম্মাদের, মহারাষ্ট্রের মারাঠাদের, গুজরাটের প্যাটেলদের, এবং কর্ণাটকের লিঙ্গায়তদের বোঝাতে পারে নি, যে তারা আপেক্ষিক অবস্থান অনুসারে উত্তর ভারতের জাটদের সমস্তরভুক্ত।

৪। আইনসভার সদস্যরা সরকারী চাকরীতে নিয়োগের প্রশ্নে তাঁদের সময় ও শক্তির অনেকাংশ ব্যয় করতেন। এর ফলে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবাদে ইন্ধন যোগাতেও পারতেন। আবার তাঁদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীভুক্ত সমর্থকদের সাম্প্রদায়িক অনুভূতিকে তুষ্ট করতেও পারতেন। এই অদ্ভুত আলো-আঁধারের জগতে, একবার সাধারণ মাপকাঠি স্বীকৃত হয়ে গেলে, একজন চাপরাসী থেকে একজন উচ্চ আদালতের বিচারক পর্যন্ত সমস্ত পদের জন্য লড়াই-ই এক অদ্ভুত ন্যায্যতাকে দৃঢ়তর করত।

৫। এই বিষয়টির উল্লেখের জন্য আমি লাজপত জাগ গার কাছে ঋণী।

৬। ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। উদাহরণস্বরূপ, এমন কি মধ্যযুগেও প্রশাসনের নিম্নতর স্তরের কর্মচারীরা ছিলেন প্রধানত হিন্দু। বঙ্গদেশে, যেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অসমতা ছিল, সেখানেও এ কথা সত্য।

৭। "রিপোর্ট অফ দ্য কানপুর রায়টস্ এনকোয়্যারি কমিটি" দ্রষ্টব্য : "কাউন্সিলে প্রবেশের কর্মসূচী তাঁদের জনগণের মেজাজের প্রভাবগ্রাহী করে তোলে। ফলতঃ, কংগ্রেস কর্তৃক সমবেতভাবে এবং পূর্ণপ্রাণে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী সংগ্রাম করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়…নির্বাচনী প্রচারের তাৎক্ষণিক চাহিদা কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদের মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব করে তোলে", পৃঃ ২২২-২৩, ২২৫।

৮। "আমাদের স্বীকার করতে হবে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে, এবং যতদিন মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা আমাদের নীতির উপর আধিপত্য রাখে, ততদিন আমরা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে পূর্ণরূপে বাতিল করতে পারব না"। ১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণ, "নির্বাচিত রচনাবলী", ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৯।

৯। উদাহরণস্বরূপ, তাঁতীরা, যাঁরা অনেকে ছিলেন মুসলিম ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং ভারতে আধুনিক টেক্সটাইল শিল্পের উত্থানের ফলে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছিলেন। হিন্দু বা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কেউ তাঁদের হয়ে লড়াই করেন নি। জাতীয়তাবাদীরা, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাধ থেকে সক্রিয়ভাবে তাঁদের স্বার্থের পক্ষে যুদ্ধে দাঁড়ান। দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে হিন্দু বা মুসলিম টেনান্ট ও জমির মালিক এমন কৃষকদের স্বার্থ প্রসঙ্গে একই অবস্থা দেখা যায়।

১০। এখানেই ১৯২০-র দশকের আগে পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তের

ব্যাপক সংখ্যা ও মুসলিমদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তের স্বল্প সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষিত হিন্দু যুবকরা দেখতে পায় যে "তারা সংখ্যায় বড় বেশী, এবং যথেষ্ট চাকরী নয়, সুতরাং তারা পরিণত হয় শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবীতে, যারা জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের মেরুদণ্ড"। সাম্প্রদায়িকতাবাদ শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের বিদ্যমানতায় পরিস্থিতিতে অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক ছিল। জওহরলাল নেহরু, "অ্যান অটোবায়গ্রাফি, পৃঃ ৪৬৪।

১১। অন্যদিকে, দ্রুত বিকাশ যে এমন কি সবচেয়ে বিচিত্র ধরণের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে দেখানো যায়। উত্তেজনা সত্ত্বেও, বাক্য-বাগীশ কশ, উত্তেজনাপ্রবণ ইতালীয়, জাতিদাম্ভিক জার্মান, অবিচলিত ইংরেজ, সমস্ত দেশের নিপীড়িত ইহুদী, প্রাক্তন দাস কৃষ্ণাঙ্গ, সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন জাপানী ও চীনা এবং অন্যান্য দেশের আরো অসংখ্য মানুষকে ঢালাই করে একটি শক্তিশালী ও তীব্রভাবে আত্ম-সচেতন জাতিত্ব দান করা হয়েছিল। দ্রুত বিকাশমান সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। সে দেশ অতীতের পরস্পরের প্রতি বৈরীমনোভাবাপন্ন জাতীয়তা-সমূহকে সোভিয়েত জনগণের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ও জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

৩

সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক উৎস ঃ ২

[এক]

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যেখানে মধ্যশ্রেণীদের ভিতর ব্যক্তিগত স্থান ও পদ লাভের জন্য সংগ্রামকে লুকিয়ে রাখত, জনগণ ও নিম্নশ্রেণীগুলির স্তরে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সেখানে অনেক সময়ে শোষক ও শোষিতের মধ্যে সামাজিক টানাপোড়েন ও শ্রেণী সংঘর্ষকে বিকৃত করে বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরিণত করত। গণ অসন্তোষ সাধারণতঃ দেখা দিত অ-ধর্মীয় বা অসাম্প্রদায়িক উপাদান থেকে, এবং বস্তুত, অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উপাদানের দরুণ। কিন্তু পশ্চাদ-পদ সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিস্থিতিতে তা এক বিকৃত প্রকাশ খুঁজে পেত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করত, বা সেই পথে পরিচালিত হত, বা তার উপর সেই রূপ আরোপিত হত, অথবা তাকে সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম রূপে ব্যাখ্যা করা হত। শ্রেণীগত নিপীড়নকে সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন রূপে দেখা হত বা ঘোষণা করা হত।

আর তা হত দুই অর্থে : কখনো বিকৃতিটা জনমানসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটত, অথবা সাম্প্রদায়িক অনুভূতি ও প্রচারের বৃদ্ধির ফলেও ঘটত। অসন্তোষটা ছিল বাস্তব; বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক যন্ত্রণা ছিল তার বিষয়গত ভিত্তি। কিন্তু তা ব্যক্ত হত সাম্প্রদায়িকতাবাদ (এবং জাতিভেদ তত্ত্বের) ভ্রান্ত চেতনার মাধ্যমে। অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক ক্রিয়ার সাধারণ প্রেক্ষাপট এবং প্রেরণা অর্থনৈতিক হলেও, তাদের চেতনায় তা বাহ্য রূপ নিত ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক। সি. জি. শাহের ভাষায় : "সাম্প্রদায়িক প্রচারের চাপে জনগণ তাঁদের শোষণ, নিপীড়ন ও যন্ত্রণার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থ

হন এবং সেগুলির উৎস সম্পর্কে এক কাল্পনিক সাম্প্রদায়িক উৎসের চিন্তা করেন।"[১]

কিন্তু অনেক সময়ে সামাজিক সংঘর্ষের উপর সাম্প্রদায়িক রূপ চাপিয়ে দেয়, অংশগ্রহণকারীরা নয়, বরং দর্শকরা, রাজকর্মচারীরা, সাংবাদিকরা, রাজনীতিবিদরা, ও শেষে ইতিহাসবিদরা। তারা সকলেই তাদের নিজেদের সচেতন বা অসচেতন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সংঘর্ষ হয়ে যাওয়ার পর তার একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, বহু লেখক ১৯২১-এ মালাবারের মোপলা কৃষি অভ্যুত্থানকে হিন্দু-বিরোধী হিসেবে দেখেন, কিন্তু ১৮৭০-এর দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গাকে মহাজন-বিরোধী মনে করেন, মাড়ওয়ারী বিরোধী নয়। একইভাবে, সৎনামী, জাট, শিখ বা মারাঠা দলপতিদের মুঘল বিরোধী সংগ্রামকে মুসলিম-বিরোধী মনে করা হয়, কিন্তু অন্ত মারাঠা শাসকদের পেশওয়া বিরোধী সংগ্রামকে ব্রাহ্মণ-বিরোধী বলে মনে করা হয় না।[২] এই বিকৃতির একটি চূড়ান্ত উদাহরণ হল ১৯৩৭-৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহ কর্তৃক গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র জনতার আকাঙ্খা পূরণে তুলনামূলকভাবে ব্যর্থ হওয়াকে কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা রূপে দেখানো। লক্ষ্যণীয়, মুসলিম শ্রমিক ও প্রজাদের জন্য মুসলিম লীগ সমর্থিত বা তাদের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভাগুলির তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের কৃতিত্ব বেশী ছিল।

ভারতীয় সমাজ বিকাশের একটি অদ্ভুত চরিত্র হল, যে দেশের বহু অংশে ধর্মীয় প্রভেদ সামাজিক ও শ্রেণীগত প্রভেদের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল: একদিকে জমিদার, ভূস্বামী, মহাজন, আইনজীবী, বা ব্যবসায়ীরা, আর অন্যদিকে প্রজা, ভাগচাষী, কৃষি শ্রমিক, দেনাদার, বা কারিগররা, অনেক সময়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হত বা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতিভুক্ত হত। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দরুণই সামাজিক-অর্থনৈতিক বিরোধ ও দ্বন্দ্বের উপর সাম্প্রদায়িক বর্ণ আরোপ করা বা সাম্প্রদায়িক (বা জাতিভিত্তিক) বিকৃতিসাধন সম্ভব হত। এই সামাজিক চরিত্র সাম্প্রদায়িক ও জাতিভিত্তিক, উভয় ধরণের উত্তেজনাকেই প্রশ্রয় দিত। উপরন্তু, অধিকাংশ সময়ে বিত্তবান ও শোষক অংশগুলি হত উচ্চ জাতির হিন্দু এবং দরিদ্র ও শোষিতরা হত মুসলিম বা নিম্নজাতির হিন্দু, যার ফলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রচার, যে হিন্দুরা মুসলিমদের শোষণ করছে, বা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রচার, যে মুসলিমরা হিন্দু সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর হুমকী দিচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভুল হলেও সফল হতে পারত। ফলে, শোষক ও শোষিত, উভয়েরই রাজনৈতিক সংগঠন সাম্প্রদায়িক পথে অগ্রসর হতে পারত। ১৯৪০-এর দশকের গোড়ায় তাই ডব্লু. সি. স্মিথ লক্ষ্য করেছিলেন যে অনেক সময়ে "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল সাম্প্রদায়িক ছদ্মবেশে শ্রেণী সংগ্রামের বিচ্ছিন্ন উদাহরণ।"[৩]

যেমন, পূর্ববঙ্গের ব্যাপক অংশে, প্রজা ও দেনাদাররা অধিকাংশই ছিল

মুসলিম, আর জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীরা ছিল মূলতঃ হিন্দু। উপরন্তু, জমিদাররা অধিকাংশই জমিদারী থেকে অনুপস্থিত থাকত বা নিজেরা প্রশাসন চালাত না ; তারা তাদের জমিদারীর কাজ চালাত নায়েবদের বা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে : এবং তাদের প্রায় সকলেই হত হিন্দু, এমন কি মুসলিম জমিদারদের ক্ষেত্রেও। রায়তরা অধিকাংশ সময়ে প্রত্যক্ষ শোষণ অনুভব করত এই হিন্দু নায়েবদের কাছে।[৪] অবশ্যই মুসলিম প্রজা ও দেনাদারদের সমস্যাগুলি বিশেষভাবে 'মুসলিম' ছিল না। হিন্দু প্রজা ও দেনাদাররা গুরুভার কর, চড়া সুদের হার ও কৃষকদের উপর অন্যান্য ধরণের শোষণে ততটাই জর্জরিত ছিল, যতটা ছিল মুসলিম প্রজা ও দেনাদাররা। কিন্তু প্রজা ও ভূস্বামী উভয়েই যখন সমধর্মাবলম্বী হত, শ্রেণী সংঘর্ষ তখন সাম্প্রদায়িক রূপ নিতে পারত না। এটাও লক্ষ্যণীয় যে প্রজা ও জমিদাবের সংঘর্ষ, এবং দেনাদার ও মহাজনের সংঘর্ষ বিংশ শতাব্দীর এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থানেব আগে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয় নি। ১৮৭৩-এ পাবনার কৃষি দাঙ্গায় হিন্দু ও মুসলিম প্রজারা একত্রে জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, ঠিক যেমন হিন্দু ও মুসলিম জমিদাররা উভয়েই ১৮৮৫-র বেঙ্গল রেণ্ট বিলের বিরোধিতা করেছিল। অন্যদিকে, ১৯০৬-এ মৈমনসিংহের কৃষি দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করেছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে মহাজন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলিম কৃষকদের অসন্তোষ উত্তরোত্তর সাম্প্রদায়িক রূপ নিতে থাকে,[৫] ঠিক যেমন হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা বঙ্গদেশের কংগ্রেস দলের উপর 'হিন্দু' স্বার্থরক্ষার জন্য ক্রমেই চাপ দিতে থাকে।

পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে ছোট কৃষক ও বড় ভূস্বামী উভয়েই ছিল মুসলিম, কিন্তু তাদের পাওনাদার ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতারা ছিল হিন্দু বা শিখ। উপরন্তু, মুসলিম কৃষকরা এদের কাছেই বেশী গুরুতরভাবে ঋণগ্রস্ত ছিল, "এবং নিষ্ঠুরভাবে পাওনা আদায় করতে প্রস্তুত পাওনাদারের প্রতি দরিদ্র দেনাদারের সমস্ত অনুভূতি যেত সাম্প্রদায়িক জোয়ারে ঢেউ তুলতে।"[৬] পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বৃদ্ধির অন্যতম দিক ছিল একদিকে বড় মুসলিম ভূস্বামীদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান রক্ষা করার জন্য তাদের মুসলিম প্রজাদের আক্রোশকে হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজনদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, এবং অন্যদিকে পরোক্তদের দিক থেকে নিজেদের আক্রান্ত শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করার জন্য হিন্দু স্বার্থ বিপন্ন, এই চীৎকার করে সাম্প্রায়িকতাবাদকে ব্যবহার করা। মুসলিম কৃষকরা বারংবার সাম্প্রদায়িক পতাকার নীচে জমায়েত হয়ে অভ্যুত্থান করে, যেমন ১৯১৫ ও ১৯২২-এ মুলতান ডিভিশনে, ১৯২৬-এ রাওয়ালপিণ্ডি জেলায়, এবং ১৯৩০-এ ফিরোজপুর ও মুলতান জেলায়। তাদের আক্রোশের লক্ষ্য ছিল মহাজন ও তার 'বহি' (হিসাব খাতা) যেখানে তাদের প্রমাণ লিপিবদ্ধ ছিল।[৭] অন্যদিকে ১৯০১ সালে পাঞ্জাব এলিয়েনেশন অফ ল্যাণ্ড অ্যাক্ট প্রণীত হওয়ায়

পরম্পরাগত মহাজন-ব্যবসায়ী হিন্দু জাতিগুলির কৃষক ও ভূস্বামীর জমি ক্রয় করা রুদ্ধ হওয়ায় তাদের অনেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আইনের চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ ও কৃষকের অনুকূল হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করার ফলে ১৯০৮-৯ সালে এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য হিন্দু সভাগুলি জন্ম নেয়। পরেও, হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজনরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে এক দৃঢ় ভিত্তি জুগিয়েছিল—বিশেষত যে সমস্ত পর্যায়ে কৃষি আইনের উপর বিতর্ক বা ঐ আইন বলবৎ করা হত তখন। তার বিনিময়ে, হিন্দু মহাসভা গ্রামীণ ঋণের ভার লাঘব করার এবং জমি হস্তান্তরের উপর বাধানিষেধ চাপাবার সমস্ত পদক্ষেপের দৃঢ় বিরোধিতা করছিল।[৮]

মালাবারে শ্রেণীগত বিভাজন ও বৈরীতা প্রধানত ধর্মীয় খাতে হওয়ার ফলে মোল্লারা ১৯২১-এর ভূস্বামী ও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষবিরোধী মোপলা কৃষক বিদ্রোহকে এক মারাত্মক সাম্প্রদায়িক মোচড় দিতে পেরেছিল। বিদ্রোহী (মুসলিম) মোপলারা ছিল প্রজা, আর তাদের ভূস্বামী ও মহাজনরা ছিল হিন্দু।[৯]

এমনকি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে, যেখানে মুসলিমরা ছিল সংখ্যালঘু, সেখানেও মুসলিম কৃষকরা অবধারিতভাবে তাদের সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যের বৃহদাংশের আত্মসাৎকারী হিসেবে মুখোমুখি হত হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে।

১৯২৯-এ বম্বে শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চরিত্র ছিল বেনামে শ্রেণী যুদ্ধ—ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী ও দালালদের মধ্যে সংঘর্ষ। দুটি তেলের কোম্পানীতে একটি ধর্মঘট ভাঙার জন্য মালিকরা দালাল হিসেবে আনে পাঠানদের। দালালদের সঙ্গে ধর্মঘটরত শ্রমিক ও তাদের শ্রমিক সমর্থকদের লড়াই বেধে যায়। তার উপর, বম্বে শহরে বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা পাঠান মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত ছিল, এবং তারা অত্যধিক চড়া হারে সুদ নিত। ধর্মঘটরত শ্রমিক ও ধর্মঘট ভাঙা পাঠানদের মধ্যে সংগ্রাম অল্পদিনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক চরিত্র অর্জন করে।[১০]

যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ১৯২০-র এবং ১৯৩০-এর দশকে কৃষক আন্দোলনের দ্রুত বৃদ্ধিকে বিপথগামী করার জন্য ভূস্বামীরা এবং মহাজন-ব্যবসায়ীরা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই উৎসাহ দিয়েছিল। উত্তর ভারতের বহু শহরে বহু ক্ষেত্রে তাঁতি ও অন্যান্য কারিগররা ছিল মুসলিম, আর তাদের দালালরা উৎপন্ন দ্রব্য এবং উৎপাদনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করত তারা ছিল হিন্দু। একইভাবে, যে মুসলিমরা (এবং যে হিন্দুরা) মামলা করত, অনেক সময়েই হিন্দু আইনজীবীরা ও অন্য পেশাদাররা তাদের দোহন করে মুনাফা করত। মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ বিরোধী ও উচ্চজাতি বিরোধী আন্দোলন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে দুর্বল করে দিত। একই সময়ে, বিশেষত মহারাষ্ট্রে, উচ্চ জাতির হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও উচ্চজাতি বিরোধী আন্দোলনের বিকল্প হিসেবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বৃদ্ধির চেষ্টা করত।

সাধারণভাবে, ভারতের বহু অঞ্চলে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকরা এবং ভূস্বামী ও মহাজনরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় সাম্প্রদায়িক প্রচারের জন্য উর্বর জমি সৃষ্ট হত। ১৯৩৬ সালে একজন আমেরিকান মন্তব্য করেছিলেন : "গ্রামাঞ্চলে প্রায় একটিও গভীর সাম্প্রদায়িক গোলযোগ নেই, যেখানে জটিল কারণসমূহের মধ্যে অর্থ-নৈতিক শোষণকে চিহ্নিত করা যায় না।"[১১]

উপরে যে ধরণের সামাজিক পরিস্থিতি আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ যেখানে শোষক ও শোষিত, নিপীড়ক ও নিপীড়িত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিল, সেখানে সামাজিক উত্তেজনা ও সংঘর্ষের সামাজিক অন্তর্বস্তু ছিল মুখ্যত শ্রেণীদের মধ্যে সংগ্রাম। প্রশ্ন হল, তারা কোন ধরণের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক অভিব্যক্তি অর্জন করবে। বহু ক্ষেত্রে, আধুনিক শ্রেণী ও রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবে তাদের সহজেই সাম্প্রদায়িক (ও পরে জাতিভেদাত্মক) পথে ঘুরিয়ে দেওয়া গিয়েছিল। তখন আর সামাজিক শোষণকে একশ্রেণীর হাতে আরেক শ্রেণীর শোষণ হিসেবে দেখা হয় নি, বরং হিন্দুদের হাতে মুসলিমদের শোষণ বা তার বিপরীত রূপে দেখা হয়েছিল। শোষকদের শ্রেণীগত বা সামাজিক চরিত্র অনুযায়ী সংজ্ঞা নিরূপণ করার পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে সংজ্ঞা স্থির করা হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা স্বচ্ছন্দে হিন্দু শোষক ও মুসলিম শোষকদের কথা বলত। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা উভয়েই কৃষিক্ষেত্রে শোষণ ও নিপীড়নের শ্রেণী চরিত্রের বিপরীতে তার সাম্প্রদায়িক চরিত্রের উপর জোর দিত। সুতরাং, এ কথা বলা হত যে মুসলিম কৃষক ও দেনাদাররা কৃষক ও দেনাদার বলে শোষিত হচ্ছে না, হচ্ছে তারা মুসলিম বলে।[১২] আর যদি কৃষি আইন বা ঋণ-মুকুব আইন প্রণীত হত, তবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাকে দেখাত হিন্দুদের উপর আক্রমণ হিসেবে, ভূস্বামী ও মহাজনদের উপর আক্রমণ বলে নয়, যেমন তারা করেছিল পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে।[১৩] বিশেষত, ১৯৩৮-এর পর থেকে মুসলিম লীগ হিন্দুদের হাতে মুসলিমদের সম্প্রদায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক শোষণের ধারণাকে মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার ও ব্যাপকভাবে প্রচার করার ক্ষেত্রে ইহুদীদের হাতে জার্মান ও ও অন্যান্য জনগণের অর্থনৈতিক শোষণ সংক্রান্ত নাৎসী ইহুদী-বিরোধী প্রচারকে হুবহু নকল করেছিল।[১৪]

সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগ্রাম অবশ্যই সব সময়ে, বা এমন কি সর্বাধিক ক্ষেত্রে, সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত হয় নি। কৃষক, শ্রমিক ও র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধি-জীবীরা বিশেষ করে ১৯১৮-র পর শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণীগত আন্দোলন ও সংগঠন সৃষ্টি করেছিলেন।[১৫] উপরন্তু, অনেক সময়েই গ্রামীণ ও শহুরে অস-ন্তোষ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ত। তবে একই সময়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে বাস্তব বা সম্ভাব্য শ্রেণী সংগ্রামের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে রূপা-ন্তর বা বিপথগমনও ঘটেছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব জাতীয় আন্দোলনে শোষিত

শ্রেণীদের আকাঙ্খা ও দাবীসমূহকে একীকরণ করতে ব্যর্থ হওয়া এবং বামপন্থীরা নিম্ন মধ্যশ্রেণীদের সহ শ্রমজীবী জনগণকে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব অনেক সময়ে সফল হয়েছিল।[১৬]

এটা লক্ষ্য করা দরকার, যে শ্রেণী সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিলেও, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জনগণের কোনো মৌলিক শ্রেণীগত দাবীকে এমন কি বিকৃতভাবেও তুলে ধরে নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিন্দু বা মুসলিম শোষণের কথা বললেও, জমিদারী উচ্ছেদ, দেনা পরিশোধ স্থগিত রাখার জন্য আইনী ব্যবস্থা, কৃষি শ্রমিক বা শহরের শ্রমিকদের জন্য উচ্চতর বেতন, ইত্যাদি কোনো দাবী তোলা হয় নি। একইভাবে, ঔপনিবেশিকতাবাদের ধাক্কায় যে মুসলিম তন্তুবায়বা ক্রমাগত সর্বনাশ ও যন্ত্রণাভোগ করাছলেন, তাদের স্বার্থে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ আহমেদ খান থেকে জিন্না পর্যন্ত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা নয়, জাতীয় কংগ্রেস। সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতৃত্ব এমন কি তার বিকৃত সাম্প্রদায়িক রূপেও শ্রেণী সংগ্রাম বৃদ্ধি করে নি বা জনগণকে সম্প্রদায়-সম্পর্কিত শ্রেণীগত দাবীর পিছনে জমায়েত করে নি।[১৭] এইদিক থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ও পূর্ববর্তী. প্রাক্-আধুনিক ধর্মীয় বা ধর্ম-অনুপ্রাণিত আন্দোলন, যথা ভারতে সংনামী ও শিখ থেকে ফরাসী আন্দোলন ও বিদেশে প্রথম যুগের খ্রীস্টীয় আন্দোলন থেকে তাইপিং আন্দোলনের মধ্যে নাটকীয় প্রভেদ ছিল। পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলি ধর্মীয় মতাদর্শগত পোশাকে শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং তাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেছিল। সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের সঙ্গে একই রকম প্রভেদ ছিল গ্রামাঞ্চলের স্বতঃস্ফূর্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলির, যেখানে জোর পড়ত জমিদার, মহাজন ও অন্যান্য বিত্তবানদের আক্রমণ করার উপর।[১৮] অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কেবল বিদ্যমান শ্রেণীগত অনুভূতিকে মধ্য ও উচ্চ-শ্রেণীদের এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করত। যেখানে পূর্বতন ধর্মীয় আন্দোলনগুলির রাজনীতি উঠেছিল শোষিত শ্রেণীদের জীবনের ক্ষেত্র থেকে, এবং তা তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ছিল, যদিও একটি বিকৃত রূপে, যেখানে গণসমাবেশের অন্যতম উপাদান ছিল ধর্ম. সেখানে সাম্প্রদায়িকতা-বাদের রাজনীতির উত্থান ঘটেছিল এই পরিমণ্ডলের বাইরে, এবং তা ছিল উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীদের এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী। যেমন, ১৯০৬-৭-এ বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর বিশদভাবে আলোচনা করে সুমিত সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

> "কিন্তু সামাজিক দুর্দশা ও অসন্তোষ যথেষ্ট অকৃত্রিম হলেও, একথাও জোরের সঙ্গে বলা দরকার যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে তাদের বিকৃত অভিব্যক্তি কৃষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্ফোরণের সমস্ত স্থায়ী মূল্য কেড়ে নিয়েছিল…বস্তুত, মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতারা আপাতঃভাবে কৃষক-

দের ব্যবহার করেছিল হিন্দুদের সঙ্গে চাকরী ও কাউন্সিলে আসনের জন্য তাদের লড়াইয়ে নিছক কামানের খাদ্য হিসেবে।"[১৯]

একথাও লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যে আমরা আগে শ্রেণীগত বিভাজনের সঙ্গে ধর্মীয় বিভাজনের যে সমাপতনের উল্লেখ করেছি তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিকাশ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ধনতন্ত্রের বিকাশের ধাঁচের ফল। যদি বহু এলাকায় হিন্দু বিত্তবান শ্রেণীগুলি মুসলিম জনগণকে শোষণ করে থাকে, তার কারণ এই নয় যে তারা হিন্দু ছিল বা মুসলিমদের উপর আধিপত্য বিস্তারের বা তাদের শোষণ করার একটি হিন্দু চক্রান্ত বা পরিকল্পনা বা ইচ্ছা ছিল। তারা আধিপত্যশালী হওয়া হিন্দু আধিপত্যের প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না।

যেমন, বঙ্গদেশে হিন্দু জমিদাররা জমির উপর নিয়ন্ত্রণ এই কারণে অর্জন করে নি যে তারা হিন্দু ছিল। বরং তার কারণ ছিল একটি ঐতিহাসিক উপাদান— নিম্নজাতি ও নিম্নশ্রেণীগুলিরই ইসলামে ধর্মান্তকরণ হয়েছিল, উচ্চজাতি ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের হয় নি। এমন কি বঙ্গদেশের মুসলিম শাসকদের অধীনেও গ্রামাঞ্চলের উচ্চতর স্তর ছিল প্রধানত হিন্দু। হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী ও কুসীদজীবীরা, ঔরংজেবের কর্মচারী ও অনুবর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ যে মুর্শিদকুলি খান, তাঁর অধীনেও উন্নতিলাভ করেছিল। তাঁর শাসনাধীনে জমিদারদের শতকরা ৭৫ ভাগ এর বেশী, এবং অধিকাংশ তালুকদার, ছিল হিন্দু।[২০] উপরন্তু, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের গোড়ার যুগের প্রভাবে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মাবলম্বী পুরোনো জমিদারদের এক বড় অংশের ধীরে ধীরে সৌভাগ্য হানি ঘটে এবং উচ্ছেদ হয়ে যায়। বস্তুত, আগে তাদের অনুপাত বেশী হওয়ায় হিন্দু জমিদারদের ক্ষেত্রেই তা বেশী হয়। কিন্তু এবার জমি নতুন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীদের হাতে পড়ে, এবং তারা ছিল প্রায় সম্পূর্ণ হিন্দু। এমন কি মুসলিম শাসকদের সময়েও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীরা ব্যাপকভাবে হিন্দুই ছিল।[২১] নতুনত্ব যা ছিল, তা হল ঔপনিবেশিক শাসন ও ঔপনিবেশিক নীতি, যা বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের জমি নিয়ন্ত্রণ করতে দিয়েছিল। মুসলিম জমিদারদের ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের একটি সম্পূরক কারণ ছিল মেয়েদের উত্তরাধিকারের নীতির ফলে তাদের জমিদারীর বিভাজন। এ সবের পিছনে 'হিন্দু' পরিকল্পনা কতটুকু ছিল তা আগে উল্লিখিত একটি তথ্য থেকেও বোঝা যায়। তা হল, এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও অধিকাংশ মুসলিম জমিদার তাদের জমিদারী তদারক করার জন্য হিন্দু নায়েব বা সহকারী নিয়োগ করত। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ১৮৮০ থেকে ১৮৮৫র মধ্যে, বেঙ্গল রেণ্ট বিল প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে, অধিকাংশ তরুণতর জাতীয়তাবাদী নেতা—সকলেই হিন্দু—কৃষিকর্মে রত প্রজাদের, যাদের অধিকাংশ ছিল মুসলিম, তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন, প্রধানত হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, অধি-

কাংশ উচ্চশ্রেণীভুক্ত মুসলিম, সেই সময়ে নিজেদের মুসলিম নেতা বলে দাবী করলেও, এবং পরে অনেকেই মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্যোক্তা হলেও, হয় বিলটির বিরোধিতা করেছিলেন অথবা তার প্রতি উদাসীন ছিলেন। বঙ্গদেশ ও বিহারের অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলিম জমিদার অবশ্যই বিলটির যে সমস্ত ধারা প্রজাদের পক্ষে ছিল সেগুলির বিরোধিতা করতে একজোট হয়েছিলেন। ১৯২৮-এর বেঙ্গল টেনান্সি (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে একই ধরণের জোট সৃষ্টি হয়েছিল।

উত্তর ভারতে, বিশেষত বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবে ব্যবসা ও মহাজনীর ক্ষেত্রে হিন্দুদের সংখ্যা অধিকতর হওয়াও একটি ঘটনা যার সূত্রপাত মধ্যযুগে। তার কারণ আংশিকভাবে ছিল এই, যে তুর্কী, পারসিক, ও অন্যান্য মধ্য এশীয় অভিজাত এবং ভাগ্যান্বেষীরা, যারা ভারতীয় মুসলিম উচ্চশ্রেণীগুলির সঙ্গে যুক্তভাবে ছিল তৎকালীন শাসক এলিটের আধিপত্যশালী অংশ, তাদের পক্ষে ঔপনিবেশিক বা ধনতান্ত্রিক ভবিষ্যত দেখতে পাওয়া কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। উদ্বৃত্ত আদায় করার জন্য প্রশাসন ও জমি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সে যুগে যে অবস্থানগুলি ছিল আধিপত্যশালী, তারা সেগুলি দখল করেছিল। সুতরাং তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের ব্যবসায় প্রবেশ করে নি, অথবা বাণিজ্যিক পুঁজিপতিদের ঐতিহ্য গড়েও তোলে নি। বরং তারা জোর দিয়েছিল জমিতে নিয়ন্ত্রণ কায়েম এবং প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে স্থান অর্জন করার উপর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবের শিখ শাসক এলিটদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এখানেও, ব্যবসায়ী ও মহাজনরা যে সব রকম পুরোনো জমিদার ও কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থান বিপন্ন করেছিল এবং গ্রাম ও শহরে প্রধান স্তর হিসেবে দেখা দেওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছিল, তা হিন্দু হিসেবে নয়। তারা তা করেছিল ঔপনিবেশিক রাজস্ব নীতি বিধানতান্ত্রিক নীতির ফলে, ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিকরণ ও উদ্বৃত্ত আহরণ ও আত্মসাৎকরণের ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে ব্যবসায়ী ও মহাজনরা যে মৌলিক ভূমিকা পালন করত তার ফলে। ঔপনিবেশিকতাবাদ চরিত্রগতভাবে উৎপাদনের চেয়ে সংবহনকে বেশী উৎসাহ দিত। যদি ঘটনাচক্রে অন্য এক সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলে মহাজন ও ব্যবসায়ীরা দুর্বল হয়ে পড়ত বা অপসৃত হত, তবে 'হিন্দু' অর্থনৈতিক আধিপত্য ঘটত না।[২২]

একইভাবে, ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে ভারত বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত হওয়ার ফলে যন্ত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের নিঃশুল্ক আমদানী ও কাঁচামালের রপ্তানী ঘটায় শহর ও গ্রামের কারিগররা ধীরে ধীরে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। এমন কি যারা বাঁচার জন্য লড়াই করে যায়, তারাও ক্রমে তাদের স্বাধীন অর্থনৈতিক অবস্থান হারিয়ে ফেলে এবং উত্তরোত্তর যারা তাদের অগ্রিম টাকা ও কাঁচা মাল দিত এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে নিয়ে যেত সেই সব মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের শোষণের অধীনস্থ

হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানেও, তথাকথিত মুসলিম আধিপত্যের যুগে, অর্থাৎ মধ্য-যুগেও, কারিগরদের বৃহদাংশ ছিল মুসলিম এবং ব্যবসায়ীরা ছিল অধিকাংশই হিন্দু, এই তথ্য অনস্বীকার্য।

এই পর্যালোচনা গুটিয়ে এনে বলা যায় : একথা সত্য নয় যে "মুসলিম উচ্চ-শ্রেণীগুলি স্থিরভাবে হিন্দুদের কাছে জমি হারাচ্ছিল।" তারা জমি ছাড়ছিল বাণিজ্য ও আর্থ ব্যবসাতে লিপ্ত ব্যক্তিদের কাছে, যারা ঘটনাচক্রে ছিল হিন্দু, কিন্তু যারা জমি দখল করছিল হিন্দু হিসেবে নয়, এবং যারা তা করেছিল ঔপ-নিবেশিকতাবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিণতির ফলস্বরূপ। অনুরূপভাবে, ঔপনিবেশিক অর্থনীতিই কৃষকের উপর প্রধানত হিন্দু মহাজনদের কাছে ঋণের নাগপাশ সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের জমি হারানোর জন্য দায়ী ছিল। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদকরা হিন্দু ব্যবসায়ীদের দয়ার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল বাধ্যতা-মূলক বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের ফলে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এবং আইনের কাঠামো ভূস্বামী ও কৃষকদের আদালত ও হিন্দু আইনজীবীদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করেছিল, এবং কারিগরদের তুলে দিয়েছিল হিন্দু ব্যবসায়ীদের খপ্পরে। সংক্ষেপে বলা যায়, **ঔপনিবেশিক ইতিহাস ব্যবসায়ী ও মহাজনদের বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের নিশ্চয়তা দিয়েছিল, কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাস সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে তারা অধিকাংশই হবে হিন্দু।**

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই ঐতিহাসিকভাবে প্রদত্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল। একটি সঠিক ও ইতিহাসাশ্রয়ী বোধের অভাবে মুসলিম প্রজা, দেনদার, কারুশিল্পী এবং সাধারণভাবে উৎপাদনকারীরা তাদের শোষক ও নিপী-ড়ক রূপে দেখত কেবল হিন্দু ভূস্বামী বা মহাজন বা ব্যবসায়ী বা আইনজীবীদের। সামাজিক বাস্তবতাকে উপরিতল থেকে বা বাইরে থেকে দেখার ফলে তারা ঔপনিবেশিক বাস্তবতাকে দেখতে পারত না, বা তাদের শ্রেণীগত নির্যাতনকারীরা যে ঔপনিবেশিকতাবাদ কর্তৃক সৃষ্ট এবং তারই অনুচর, তাও দেখতে পারত না। ফলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যখন তাদের শোষকদের হিন্দুত্বের উপর জোর দিত, তখন তারা প্রতিবাদী মত ব্যক্ত করতে পারত না।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের পক্ষে শ্রেণী বিভাজন ও ধর্মীয় বিভাজনের অধিক্রমণের আরো কয়েকটি পরিণতি ছিল। প্রথমত, এই ঘটনা বুঝিয়ে দেয়, কেন নিম্ন-শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদ অনেক সময়ে হিংস্রতার দিকে চলে যেত, আর তার বিপরীতে মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদ সত্ত্বেও উভয় পক্ষ বন্ধুত্বপূর্ণ সামা-জিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখত। জনগণের কাছে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সময়ে সময়ে শ্রেণী সংগ্রামের 'পরিবর্ত' ছিল। তদুপরি, ঔপনিবেশিক অনুন্নতির শিকার ও তার উৎপন্ন দ্রব্য, শহরে দরিদ্রদের এক বড় অংশ ছিল শ্রেণীচ্যুত, সামাজিক ভিত্তিহীন, লুম্পেন-স্তরের মানুষ, এবং এমন ধরণের মানুষ যাদের সামা-

জিক আক্রোশ এবং বঞ্চনার তীব্র বোধ অবধারিতভাবে অর্থহীন হিংস্রতা বা লুঠ-তরাজের প্রবণতায় অভিব্যক্তি লাভ করত। একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার, এবং অর্থনৈতিক চাহিদারও, বহিঃপ্রকাশের দ্বারের ভূমিকা নিখুঁতভাবে পালন করত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাদের কাছে ছিল যুগপৎ অর্থনৈতিক ও মানসিক সুযোগ এবং সমাজ ও তাদের সামাজিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অন্ধ প্রতিবাদ জ্ঞাপনের একটি মুহূর্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কেন প্রধানত শহরাঞ্চলের ঘটনা, এবং কেন তা তুচ্ছতম অজুহাতে ফেটে পড়ার প্রবণতা দেখাত, এটা তার অন্যতম কারণ। উল্লেখযোগ্য হল, এই বিকৃত শ্রেণী সংগ্রামসমূহে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হত সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরা। 'আক্রান্ত সম্প্রদায়ের' নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা বা তাদের যৎসামান্য সম্পত্তি প্রায় কখনোই আক্রান্ত হত না।[২৩]

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িকতাবাদ কেন এত শক্তিশালী ও বিপজ্জনক হতে পেরেছিল এই ঘটনা তার আংশিক ব্যাখ্যা করে। সেটি বুর্জোয়াদের মতাদর্শ হিসেবে তার 'ধার' সবসময়েই কম থাকবে। কিন্তু গণভিত্তি অর্জন করলে এবং এমন কি বিকৃত রূপ সত্ত্বেও শ্রেণী সংঘর্ষ তাকে যে বল ও নিষ্ঠা দিতে পারত তা অর্জন করলে সাম্প্রদায়িকতাবাদ এক হিংস্র শক্তিতে পরিণত হতে পারত।

তৃতীয়ত, এই ঘটনা আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করে, কেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছাড়া অন্য সময়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি গণ বা জনপ্রিয় আন্দোলন হতে পারত না, বা কেন হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যাপক হারে মুসলিম-বিরোধী অনুভূতির উদ্রেক ঘটানো যেত না, বা কেন সাধারণভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ দুর্বল ছিল। তার কারণ হল, হিন্দুরা খুব কম ক্ষেত্রেই মুসলিম শোষকদের বিপরীতে শোষিত শ্রেণীর স্থানে ছিল। এমন কি পাঞ্জাবে, যেখানে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ বেশ শক্তিশালী ছিল, সেখানেও তার শক্তি ছিল মধ্যশ্রেণীদের ভিতর, হিন্দু কৃষকদের মধ্যে নয়। তারা মুসলিমদের মধ্যে 'শত্রুকে' দেখতে পেত না, বরং তাকে দেখত হিন্দু মহাজনের বেশে। এই জন্যই, একনিষ্ঠ আর্যসমাজপন্থী, এমন কি কিছুটা পরিমাণে সাম্প্রদায়িকতাবাদী, ছোটু রাম, হরিয়ানা জাটদের সংগঠিত করেছিলেন মুসলিমদের বিরুদ্ধে নয়, 'অ-কৃষক' হিন্দুদের বিরুদ্ধে। যেমন অন্যত্র, তেমন পাঞ্জাবেও, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রায় কখনোই শ্রমিক, কৃষক ও হস্তশিল্পীদের শ্রেণীবোধের কাছে আবেদন করতে পারত না। তা পারত শুধু একদিকে বুর্জোয়াদের ঈর্ষা ও বঞ্চনার অনুভূতির উদ্রেক করতে, আর অন্য দিকে উচ্চশ্রেণীদের মধ্যে সম্পত্তি ও শ্রেণী অবস্থান হারাবার ভীতি সঞ্চার করতে। বস্তুত, এমন কি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগের পর, এবং তার হাতে বিরাট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ যে ব্যাপক হারে মুসলিম-বিরোধী অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে এত অসুবিধা বোধ করেছে, তার অন্যতম কারণ এই যে

আজকের ভারতে মুসলিমরা হিন্দুদের বিপরীতে শ্রেণীগত আধিপত্যের কোন স্থানে নেই। সুতরাং নাজী আন্দোলনে 'ইহুদীদের' যে ভূমিকায় দেখা হত, তাদের সেই ভূমিকায় দেখানো কঠিন। ভারতীয় জনগণের প্রায় কোনো অংশকেই দেখানো যাবে না যে মুসলিমরা তাদের শোষক, বা এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বী। এর ব্যতিক্রম কেবল বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকা, যেখানে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিকাশ ঘটতে পারে। অবশ্যই, সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যাবৃদ্ধি দেখাচ্ছে যে এটা অনতিক্রম্য বাধা নয়।

চতুর্থত, এই বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সফলভাবে রুখতে হলে জমিদারীপ্রথা, মহাজনী, ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কত প্রয়োজনীয় ছিল। ভারতের সর্বত্রই, কিন্তু বিশেষত পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ, এই দুটি মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির দিক থেকে এই সংগ্রাম ছিল দুর্বল। পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে এই দুর্বলতা জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সর্বনাশা ছিল। এই দুটি রাজ্যে প্রাদেশিক স্তরের কংগ্রেসী নেতৃত্ব, অন্তত আংশিকভাবে ভূস্বামী ও মহাজনদের বিশাল প্রভাবের ফলে, শুধু যে কৃষি সংস্কারের জন্য লড়তে এবং কৃষকদের সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তা নয়, বরং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ অথবা অ-জাতীয়তাবাদী দলগুলি ১৯২০-র ও ১৯৩০-এর দশকে যে ইতস্তত এবং নগণ্য কৃষক-ঘেঁষা আইন প্রণয়নের সূত্রপাত করেছিল তারা কখনো কখনো তারও বিরোধিতা করেছিল অথবা সে বিষয়ে দোদুল্যমান ছিল।[২৪] গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তার ফলে যে কোনো বামপন্থী বিকল্প দেখা দেবে, তাও ঘটে নি।[২৫] এই চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ছিল, এমন নয়। নেহরুর, কমিউনিস্টদের ও সমাজতন্ত্রীদের তৎকালীন রচনাবলী ক্রমাগত এই প্রসঙ্গে জোর দিত। ব্যর্থতা ঘটেছিল কাজের বা প্রয়োগের জগতে। মধ্যস্তরের রাজনৈতিক কর্মীরাও যে একথা স্পষ্ট বুঝেছিলেন তার একটি প্রমাণ ১৯৩৭-এর ৯ই এপ্রিল তদানীন্তন কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি জওহরলাল নেহরুকে মঙ্গল সিং এম.এল.এ.-র লেখা নীচের চিঠিটি :

> আপনাকে আমি ওয়ার্ধাতেই যে কথা বলেছিলাম—আমরা পাঞ্জাবে মুসলিমদের সঙ্গে আনতে পারি এবং ইউনিয়নিস্টদের পরাস্ত করতে পারি কেবলমাত্র যদি আপনি যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে যে কৃষি কর্মসূচী রূপায়ন করছেন পাঞ্জাবেও যদি সেই কর্মসূচীই গ্রহণ করা হয়। আমি ডক্টর সত্যপাল এবং অন্যান্যদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছি, এবং হয়ত আমরা একটি সন্তোষজনক পথ খুঁজে পাব, কিন্তু আপনি তো জানেন যে পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতৃত্বকে অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়। মনে হয় যেন আমাদের কিছু কিছু বড় নেতার পক্ষে মহাজন শ্রেণীর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন…। যদি আমরা কৃষিজীবীদের পক্ষাবলম্বনকারী একটি কর্মসূচী গ্রহণ

করি, তবে আমি নিশ্চিত যে মুসলিমরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে এবং আমরা পাঞ্জাবে বর্তমান ইউনিয়নিস্ট পার্টিকে পরাস্ত করতে, এমন কি চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সক্ষম হব।[২৬]

[দুই]

অপর একটি স্তরে সাম্প্রদায়িকতাবাদ দুটি শোষকশ্রেণী বা স্তরের মধ্যে অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা ও সুবিধার বৃহত্তম সম্ভাব্য অংশের জন্য সংগ্রামকে প্রকাশ করত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের (বা জাতের) হওয়ায় এই শ্রেণী বা স্তরগুলি তাদের পারস্পরিক সংগ্রামের পিছনে স্ব-ধর্মের জনগণের সমর্থন জমায়েত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতা-বাদকে ব্যবহার করত। জনগণ ছিলেন সাম্প্রদায়ভিত্তিক ছদ্মবেশে এই সংগ্রামের ঘুঁটি মাত্র। তবে এই শ্রেণীগুলি সচেতন ক্রিয়ার বলে এবং শূণ্য থেকে সাম্প্র-দায়িকতাবাদ সৃষ্টি করেনি। সাধারণভাবে তারা ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ব্যবহার করত কারণ তা ইতিমধ্যেই সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশের অংশ হিসেবে হাতের কাছে ছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, এবং অন্যান্য সময়েও, তারা একই উদ্দেশ্যে জাত, ভাষা ও অঞ্চলের ব্যবহার করেছে।

এ রকম সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের একটি উদাহরণ হল পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মুসলিম ভূস্বামীদের সংগ্রাম। দক্ষিণ পাঞ্জাবে (বর্তমান হরিয়ানা) অনুরূপ একটি সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল জাতের ভিত্তিতে, জাট ধনী কৃষক ও ভূস্বামীদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও বাণিয়া মহাজনদের মধ্যে। পূর্বোক্তরা তাদের লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার জন্য 'জাটতন্ত্রের' ব্যবহার করত। অন্যদল তার প্রতিশোধ নিত জাতের ভিত্তিতে ধনী জাটদের বিরুদ্ধে হরিজন কৃষি শ্রমিক ও প্রজাদের জাগ্রত করে। আরেক উদাহরণ হল পূর্ববঙ্গে হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলিম জোতদারদের সংগ্রাম।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের গোড়ার যুগ ভূস্বামীতন্ত্রের "আধা-সামন্ততান্ত্রিক" সামা-জিক শক্তিসমূহের সঙ্গে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্রকাশিত বুর্জোয়া সমাজ বিকাশের শক্তিসমূহের সংগ্রামকেও কিছুটা পরিমাণে লুকিয়ে রাখত। পরে তা ভূস্বামীদের কৃষি সংস্কারের ভয়কে আড়াল করে রাখত। তবে এই দিকগুলি চতুর্থ অধ্যায়ে অনেক প্রশস্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে।

[তিন]

একটি শোষক শ্রেণীর অভ্যন্তরে যে সংগ্রাম চলছে, তার অন্য কোনো ছদ্মবেশ ধারণ করাও একটি সুপরিচিত সামাজিক ঘটনা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক এবং

নিশ্চলতার পরিস্থিতি থাকলে। এ কথা বিশেষভাবে সত্য যে নতুন আসা লোকেরা অ-প্রসারমান বা নিশ্চল অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পুরোনো, গেড়ে বসা লোকজনের সঙ্গে লড়াই করে। এই সংগ্রামে নতুন আগমনকারীরা এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা উভয়েই এমন কোনো গোষ্ঠী গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে যার ফলে তাদের সমর্থনে ব্যাপকতর সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির সমাবেশ করা যায়। এরকম গোষ্ঠী নানা রূপ নিতে পারে। সাম্প্রদায়িক রূপ সেগুলির অন্যতম। দুর্ভাগ্যক্রমে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার এই দিকটি এখন পর্যন্ত যথাযথভাবে অধিত হয় নি। নিম্নবর্তী মন্তব্যগুলি তাই সাময়িকভাবে কৃত চরিত্রের।

অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িকতাবাদ নতুন ভূস্বামী ও সম্পত্তিচ্যুত ভূস্বামীদের মধ্যে সংঘাতের প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়, যেমন বঙ্গদেশে, বিহারে, ইউ. পিতে এবং পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবে তা পুরোনো ক্ষত্রী ও বাণিয়া হিন্দু মহাজন এবং নব-গঠিত মুসলিম ধনী কৃষক ও ভূস্বামী ও জাট মহাজনদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রকাশ করত। একথা বঙ্গদেশেও কিয়দংশে প্রযোজ্য—সেখানে মুসলিম জোতদার তথা মহাজন, হিন্দু মহাজনের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছিল। একইভাবে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও অনেক সময়ে ব্যবসায়ী ও দোকান-দারদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে লুকিয়ে রাখত। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯-এর বড় মন্দার সময়ে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে এই উপাদানটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীরা যে দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিল তা হল যে ক্রেতাদের নিজ ধর্মের দোকানদারদের পৃষ্ঠপোষণ করা উচিৎ। সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলির জন্য টাকা অনেক সময়ে দিত প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীরা, যারা লুম্পেন ও গুণ্ডাদের দিয়ে প্রকৃত লড়াই করাবার জন্য অর্থসংগ্রহ করত। যেমন, ১৯৩১-এ কানপুরের দাঙ্গার সূত্রপাত ছিল কানপুরের ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে। আরো আগে, ১৯০৫-এর পর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িক বৈরীতার অন্যতম উৎস ছিল বিদেশী পণ্য বিক্রেতা ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রবক্তাদের সংগ্রামের মধ্যে। অনুরূপভাবে, এ কথা বলা হয়েছে যে ১৯৩০-এর দশকে বঙ্গদেশে কৃষিক্ষেত্রে জঙ্গী মতবাদের উপর যে সাম্প্রদায়িক ঝোঁক চাপানো হয়েছিল তা ছিল হিন্দু ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফল।[২৭] দক্ষিণ পাঞ্জাবে ১৯২০-র ও ১৯৩০-এর দশকে গ্রামীণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অনেক সময়ে সম্প্রদায়গত জমি দখলের সংগ্রাম বা গবাদি পশুর মালিক যে কৃষক, তাদের সঙ্গে কসাইদের---যারা গরু চুরিতে উস্কানি দিত—মধ্যে সংগ্রাম-কে লুকিয়ে রাখত।[২৮]

১৯৩২-এর পর, এবং বিশেষত ১৯৩৬-এর পর, ভারতীয় ধনিকশ্রেণীতে নবাগতরা সর্বক্ষণ নিজেদের প্রতিযোগিতামূলক শক্তিকে রাজনৈতিকভাবে বাড়া-নোর জন্য খুঁটি খুঁজত। কেউ ব্যবহার করেছিল ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ,

অন্যথা ব্যবহার করেছিল জাতিভেদ প্রথা, এবং ভাষাগত ও প্রাদেশিক পরিচিতি ; বাছাই অনেক সময়ে নির্ভর করত হাতের কাছে কি আছে এবং কোনটাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায় তার উপর।

কখনো কখনো একথা বলা হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ হিন্দু বুর্জোয়াশ্রেণী এবং মুসলিম বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামেরও প্রতীক ছিল। এ কথা বলা হয় যে হিন্দুরা ও হিন্দু জাতগুলি আধুনিক ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার অর্জন করেছিল এবং তারা অন্যদের সেখানে প্রবেশ করতে দিত না। হিন্দু ধনিকশ্রেণী দেশে আধিপত্য বিস্তার করতে এবং মুসলিম ধনিক শ্রেণীকে দমন করতে চেয়েছিল। ফলতঃ, মুসলিম বুর্জোয়াদের হিন্দু বুর্জোয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল সেভাবেই, ঠিক যেভাবে হিন্দু বুর্জোয়ারা লড়তে বাধ্য হয়েছিল বৃটিশ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের এই তথা-কথিত মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা বা ন্যায্যতা প্রতিপাদন সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে-ছিলেন ১৯৪৩ সালে ডব্লু সি স্মিথ, যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুক্তি দেখিয়েছিল যে পাকিস্তানের দাবী মুসলিম জাতিগুলির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে প্রকাশ করছিল। স্মিথ যা বলেছিলেন তার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

> তাদের [ভারতীয় ধনিকদের] লক্ষ্য যথাসম্ভব কম বিরোধিতার মধ্যে সম্প্রসারণ ও শোষণ চালিয়ে যাওয়া ... । একটি বুর্জোয়া শ্রেণী হিসেবে, তারা তাদের প্রভাবাধীন মণ্ডলের মধ্যে বিকাশ করতে চায় এমন যে কোনো ভুঁই-ফোড় ও প্রতিদ্বন্দ্বী বুর্জোয়াদের গুঁড়িয়ে দেবেই। বৃটিশ বুর্জোয়ারা তাদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করেছিল নবজাত মুসলিম বা অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তারা সেভাবেই ব্যবহার করতে বাধ্য। এই পরি-প্রেক্ষিতে ১৯৪১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে হিন্দু মহা-সভার প্রস্তাব বোধগম্য ... । মুসলিম মধ্যশ্রেণী ধনতান্ত্রিক বিকাশের ঐ একই অপ্রতিরোধ্য সূত্রের তাড়নায় জন্ম নেয়, কিছু শক্তি লাভ করে ... এবং এই আধিপত্য থেকে মুক্তি চায়। তারা স্বাধীনতা চায় ঠিক যেমন এই অধিকতর বিকশিত গোষ্ঠী বৃটিশদের কাছ থেকে মরীয়া হয়ে স্বাধীনতা চায় ... । মুসলিম বুর্জোয়ারা প্রকৃতই "হিন্দু" একচেটিয়া ধনিক গোষ্ঠীর অধীনস্থ হওয়া বা অর্থ-নৈতিক অবদমন রুখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ"।[২৯]

এই ধরণের যুক্তি ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রাম এবং ঔপনিবেশের ধনিক শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের পার্থক্য দেখতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়াও, এই যুক্তি বিভ্রান্তিকর, কারণ ভারতীয় ধনিক শ্রেণীকে এইভাবে দেখা যায় না। এই যুক্তি ধরে নেওয়া হয় যে ধর্মে হিন্দু ধনিরা হিন্দুই থেকে যায় অথবা যে হিন্দু ছিল তা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিকভাবে তাদের শ্রেণী অবস্থানের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ছিল, অথবা তারা বিষয়গত বা মনোগতভাবে নিজেদের একটি গোষ্ঠীরূপে গঠনের ক্ষেত্রে

হিন্দুধর্মকে একটি পন্থা হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এর সবটাই ভ্রান্ত। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিল, এই অর্থে ছাড়া আর কোনো অর্থেই ভারতীয় ধনিকশ্রেণী হিন্দু ছিল না। কোনো স্তরেই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কোনো অংশ নিজেকে বিষয়গত বা মনোগতভাবে হিন্দু (বা পার্সী) বুর্জোয়া বলে বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেখে নি বা সেরকম ব্যবহার করে নি।[৩০] ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, তার হিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের নিয়েও, তার ব্যবসায়িক কাজে এবং শিল্প কোম্পানীতে বা চেম্বারস্ অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি ব্যবসায়িক সংগঠনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক আচরণ করে নি। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ধনিকদের অর্থনৈতিক কাজের স্তরে সমন্বয় ছিল, যথা কোম্পানী ডিরেক্টর স্তরে। নিঃসন্দেহে প্রশাসনিক ক্যাডার স্তরে প্রবেশে বাধাদায়ক উপাদান ছিল; কিন্তু তা ছিল ব্যবসায়িক সংগঠনের ও উচ্চতর স্তরে চাকরীর পরিবার-সম্পর্কিত ভিত্তির দরুণ। কিন্তু তা থেকে জাতিগত ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছিল, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা নয়। তাই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে ধনিকদের হিন্দু আখ্যা দিয়েছিল, কে. এম. আশরাফ তাদের সঠিকভাবেই ভারতীয় বলেছিলেন। তিনি মুসলিম ধনিকদের ব্যবহারকে ভারতীয় ধনিকদের ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, 'হিন্দু' ধনিকদের সঙ্গে নয়।[৩১] এমন কি ডব্লু. সি. স্মিথেরও এ প্রসঙ্গে কিছু সন্দেহ ছিল, এবং তিনি হিন্দু ধনিক কথা দুটি ঊর্ধ্বকমার মধ্যে রেখেছিলেন।

ভারতীয় বুর্জোয়াদের শ্রেণী হিসেবে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় বাজার টিকিয়ে রাখা ও তার প্রসার ঘটানো, এবং সাম্রাজ্যবাদকে বহিষ্কার করা, 'প্রতিদ্বন্দ্বী' 'মুসলিম' ধনিকদের দমন করা নয়। তারা সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধিতা করেছিল কারণ, সি. জি. শাহের কথায়, "অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের যে কোনো (এমন কি বুর্জোয়া) কর্মসূচী রূপায়ন করাই সাম্প্রদায়িক যুক্তের অনুবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।"[৩২] যদি শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন তাদের বিপন্ন করে তোলে তবে বিত্তবান একটি শ্রেণীরূপে ঐ আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়ারা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করতে পারে। কিন্তু তারা সে ধরণের কোনো শক্তিশালী আন্দোলনের সম্মুখীন হয় নি। অন্যদিকে, ভারতীয় জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তাদেরও স্বার্থ জড়িত ছিল সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের কর্তব্যে। আর সে কর্তব্য পালন করতে পারত কেবল ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য-বিরোধী আন্দোলন।

বস্তুত, ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর মধ্যে যে পরিমাণে গোষ্ঠীগত সংগ্রাম ছিল, তা হিন্দু ও মুসলিম, এই পরিচিতি ধরে ছিল না। অবশ্যই, কিছু ধনিক অন্যদের 'গ্রাস করেছিল'। কিন্তু সেটা তো ধনতন্ত্রের একটা মৌলিক চরিত্র। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে কোনো বিশেষ ধনিক বা ধনিক গোষ্ঠীকে মুসলিম হওয়ার

দরুণ বাধা দেওয়া বা দমন করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে, নবাগতদের পথে বাধা ছিল, যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের দুর্বল আর্থিক পরিস্থিতি। কিন্তু পুনরায়, এই বাধাগুলি বিশেষভাবে মুসলিমদের জন্য ছিল না; সেগুলি সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই সমপরিমাণে প্রভাবিত করত, যাঁরা ধনিকের স্তরে যেতে চেষ্টা করতেন, বিশেষত যদি তাঁরা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ধনিক পরিবারগুলির আত্মীয়তা ও জাতিভিত্তিক চক্রের বহির্ভূত হতেন। এ সবই ব্যাখ্যা করে, কেন ১৯৩০ দশকের শেষদিক ও ১৯৪০ দশকের গোড়ার দিকের আগে মুসলিম ধনিকরা সক্রিয়ভাবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করেন নি বা স্বতন্ত্র মুসলিম চেম্বার অফ কমার্স ইত্যাদি সৃষ্টি করেন নি। বরং তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ সর্বভারতীয় বা আঞ্চলিক ব্যবসায়িক সংগঠনগুলিতে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতেন।

ডব্লু. সি. স্মিথ বলতে চেয়েছেন যে 'হিন্দু' বুর্জোয়াদের মুখপাত্র ছিল হিন্দু মহাসভা।[৩৩] কিন্তু আমরা জানি যে এক ক্ষুদ্র সংখ্যক হিন্দু ধনিক গোষ্ঠী মহাসভাকে সমর্থন করে। ভারতীয় ধনিকদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন করত জাতীয় কংগ্রেস বা লিবারাল ফেডারেশনের রাজনীতিকে। আর. স্মিথ কোনো স্তরেই কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী চরিত্রকে অস্বীকার করেন নি। ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর [illegible] প্রধান অংশকে হিন্দু হিসেবে দেখতে হলে জাতীয় কংগ্রেসকে একটি হিন্দু সংগঠন [illegible] ধরে নিতে হবে, যেমন করেছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা।

সুতরাং আবারও একটা "ভ্রান্ত চেতনা" জড়িত ছিল, কারণ বাস্তব জীবনে কোনো হিন্দু বা মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল না। কিন্তু তা যদি জীবন থেকে না এসে থাকে তবে তা কোথা থেকে এল? তা এল এই জন্য যে একটি শ্রেণীতে যারা দেরীতে এসেছে বা নতুন এসেছে, ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিতদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তাদের পক্ষে কঠিন, এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে তারা, এবং বিদ্যমান প্রতিযোগীরাও, বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং এবং শিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিতদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নয় 'ঘুঁটি' চালার জন্যও খোঁজ করে।

বিংশ শতাব্দীর ভারতের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ধনিক যাঁরা মুসলিম ছিলেন এবং বম্বে ব্যতীত অন্যত্র দেরীতে এসেছিলেন—আরও, নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ বশতঃ—তাঁরা তাঁদের সৃষ্ট নয়, ইতিমধ্যেই বিদ্যমান যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা, এবং যা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সহৃদয় সমর্থন পাচ্ছিল এবং দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার বিষয়গত সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন।[৩৪] তাঁরাই সে সময়ে প্রকাশ্যে নিজেদের 'মুসলিম ধনিক' বলে জাহির করেছিলেন এবং অধিকতর শক্তিশালী অন্যান্যদের হিন্দু ধনিক এবং মুসলিম-বিরোধী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

এই বিকাশের বিভিন্ন দিক সাবধানে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ভারতীয় ধনিকদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে সামাজিক গঠনের দিক থেকে হিন্দু ছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উপাদানের ফলে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা 'হিন্দু' পরিকল্পনার দৌলতে নয়। কিছু মুসলিম ধনিক, যাঁরা তাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাবাদের ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা প্রথমোক্তদের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসেবে দেখতেন তাঁরা হিন্দু বলে নয়, তাঁরা অধিকতর বলশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত বলে। অবশ্যই, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে 'ঘুঁটি' হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এই অধিকতর বলবান ধনিকরা হিন্দু হওয়ার ঐতিহাসিক 'আপতন'-এর দরুন। কিন্তু যদি সুপ্রতিষ্ঠিত ধনিকরাও মুসলিম হতেন, তবে পরে আসা এবং দুর্বলতর মুসলিম ধনিকরা শিয়া-সুন্নী, কাদিয়ানী-খাঁটি মুসলিম, আঞ্চলিক বা অন্য কোনো ধরণের হৈ চৈ তুলতে পারতেন। সাম্প্রতিক কালে, অন্যান্যরা, যাঁরাও পরে এসেছেন, তাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবাদের কাছে আবেদন করার জায়গায় না থাকলে নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির আপৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাঙালী, অসমীয়া, গুজরাটি, মাড়ওয়ারী, পাঞ্জাবী, তামিল, উত্তর ভারতীয়, অ-মুল্কি ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। খোদ পাকিস্তানে, দুর্বলতর ধনিকরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের আঞ্চলিক ও ধর্মীয় উপগোষ্ঠী পরিচিতির ভিত্তিক নানা আখ্যায় ভূষিত করেছেন। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই পরে আগতরা অন্যান্য 'ঘুঁটি'ও ব্যবহার করেছেন, যথা দুর্নীতি, জাত, ভাষাবাদ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও দলকে, কখনো কখনো এমন কি জাঠ দলকেও সমর্থন করা।

পার্সি ধনিকরাও একটি সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী হলেও, তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় হিন্দু আধিপত্যের ভূতের কথা তোলেন নি। এমন কি, বম্বের সফল মুসলিম ধনিকরাও ১৯৪০-এর দশকের আগে তা তোলেন নি। একই কারণে, দুর্বলতর মুসলিম ধনিকরা কোনো স্তরেই উভয়েই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের "প্রতিনিধিত্বকারী" এই ভিত্তিতে পার্সি ধনিকদের সঙ্গে হাত মেলানোর কথা ভাবেন নি। লক্ষ্যণীয়, যে মুসলিম ধনিকদের সাম্প্রদায়িক অংশ যখন মুসলিম জনগণকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের পিছনে জমায়েত করতে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে সিদ্ধান্ত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা হিন্দু ধনিকদের দুর্বল করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয় নি, বরং নেওয়া হয়েছিল জাতীয় আন্দোলনকে, এমন কি তার নিশ্চিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ অংশগুলিকে, যাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন গান্ধী, নেহরু, কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা; এবং সমগ্রভাবে জাতীয় বুর্জোয়াদের; দুর্বল করার জন্য। তাছাড়া, একদল ধনিক নিজেদের মুসলিল ধনিক বলে বর্ণনা দিলেই বাকিরা হিন্দু ধনিক হয়ে যায় না। বাকিদের পরিচিতিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এধরণের নেতিবাচক পদ্ধতিতে নয়। এখানে একটা সমান্তরাল ঘটনার উপমা

কার্যকরী হতে পারে। আসাম, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র বা তামিলনাড়ুর কিছু ধনিক নিজেদের অসমীয়া, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয় বা তামিল বলে ঘোষণা করলেই বাকিরা অসমীয়া-বিরোধী, পাঞ্জাবী-বিরোধী, মহারাষ্ট্রীয়-বিরোধী বা তামিল-বিরোধী হয়ে যায় না। একইভাবে, বঙ্গের কিছু শ্রমিক নিজেদের তপশীলি জাতির শ্রমিক রূপে দেখলেই বাকিদের পরিচিতির সংজ্ঞা উচ্চজাতি ভুক্ত বা তপশীলি জাতি বিরোধী শ্রমিক হয় না।[৩৫]

সুতরাং, এখন পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল তার সংক্ষিপ্তসার হল যে ১৯৩০-এর দশকের শেষদিক পর্যন্ত ভারতীয় ধনিকদের হিন্দু বা মুসলিম হিসেবে ভাগ করার কোনো বিষয়গত যৌক্তিকতা ছিল না। ততটুকু যৌক্তিকতাও ছিল না, যা থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বৃটেনে, ইতালীতে বা ভারতে আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির, কারণ মুসলিম বুর্জোয়াদের মুসলিম হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করার মত কোনো সাধারণ স্বার্থ ছিল না, যেমন ছিল মধ্যশ্রেণীদের ক্ষেত্রে, যেখানে সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারী চাকরী প্রাপ্তির সুযোগের উন্নতি সাধন সম্ভব ছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও তৎসংলগ্ন সংরক্ষণ, রক্ষাকবচ, ইত্যাদি থেকে মুসলিম ধনিকদের বিশেষ লাভ হত না, বরং তাঁরা সব কিছু হারাতে পারতেন যদি হিন্দু ও পার্সি ধনিকরাও সাম্প্রদায়িকতাবাদী হয়ে যেতেন।

অবস্থাটা পাল্টে গেল ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে, যখন থেকে মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের লক্ষ্য গ্রহণের দিকে সরে যেতে থাকল। মুসলিম ধনিকরা সাধারণ স্বার্থ বা সংহতি অর্জন করতে পারতেন কেবল একটি একচেটিয়া মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্ট হত এবং হিন্দু ধনিকদের বর্জনের জন্য মুসলিম ধনিকদের পিছনে তার সমগ্র ভার ফেলা হত। মুসলিম ধনিকরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগত পরিচিতি অর্জন করতে ও সেই হিসেবে মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে পারতেন কেবল একটি একচেটিয়া ও পক্ষপাতমূলক রাষ্ট্রীয় সমর্থনের দিশা উপস্থিত হত। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাবাদ বুর্জোয়া মতাদর্শের চরিত্র অর্জন করল কেবল একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপিত হওয়ার পর। তার আগে পর্যন্ত তা ছিল প্রধানত পেটি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণী স্বার্থের মতাদর্শগত অভিব্যক্তি। ঐ স্তরে মুসলিম ধনিকরা নিজেদের 'মুসলিম' এবং অন্যান্য ভারতীয় ধনিকদের থেকে স্বতন্ত্র বলে ঘোষণা করলেন। যদিও ১৯৩১ সালে বম্বেতে এবং ১৯৩২ সালে কলকাতায় আসন্ন সাংবিধানিক পুনর্বিন্যাসের সময়ে অতিরিক্ত আসন দাবী করার উদ্দেশ্যে কমবেশী কাগুজে সংগঠন হিসেবে মুসলিম চেম্বার অফ কমার্স স্থাপিত হয়েছিল, স্বতন্ত্র মুসলিম ব্যবসায়িক সংগঠন সৃষ্টির দিকে প্রকৃত পদক্ষেপ নেওয়া হয় ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে। তার আগে পর্যন্ত মুসলিম ধনিকরা ধনিক শ্রেণীর ব্যক্তিগত অংশীদার রূপে ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ও তার আঞ্চলিক বা ব্যবসা-ভিত্তিক শাখাগুলিতে সক্রিয় ছিলেন। জিন্নার

পৌনঃপুনিক খোঁচা সত্ত্বেও, প্রথম অল-ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ মুসলিম চেম্বারস অভ কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয় কেবল ১৯৪৪-এর শেষে, এবং তার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৪শে এপ্রিল ১৯৪৫, যখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে, বা অন্তত একটি যুক্ত-রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অংশরূপে পাকিস্তান সৃষ্টি প্রায় নিশ্চিত একটি ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

এই ঘটনা বিকাশ পাকিস্তানের জন্য আন্দোলনের এবং নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপরেও কতকগুলি অনিবার্য ফ্যাশিস্ট চরিত্র প্রদান করেছিল। পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের বহিষ্কার নতুন রাষ্ট্র ও তার মতাদর্শের ভিত্তি হতে বাধ্য ছিল। তা না হলে, মুসলিম ধনিকরা কীভাবে লাভবান হতেন? তাঁদের তো তখনো আর্থিক ও অন্যভাবে অধিকতর শক্তিশালী হিন্দু ধনিকদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে হত। হয় হিন্দুদের আইনত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করতে হত, অথবা তাঁদের দৈহিকভাবে ঠেলে বার করে দিতে হত। একবার পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার পর যে জিন্না আন্তরিকভাবে একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে পেরেছিলেন,[৩৬] তা কেবল দেখায় যে তিনি পুরোপুরি বোঝেন নি, তিনি কোন্ চরিত্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিদেব বন্ধন মুক্ত করেছিলেন ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। (অবশ্যই, সাম্প্রদায়িক একচেটিয়া অধিকারের জন্য অনুরূপ দাবী দুর্বল মুসলিম বণিক, দোকানদার, মহাজন, পেশা-দার এবং মধ্য ও নিম্নমধ্য শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য অংশের থেকেও এসেছিল। তদুপরি, ফ্যাসিস্ট চারিত্রগুলি সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে অন্যভাবেও অন্তর্নিহিত ছিল।)

এক অর্থে, পরিস্থিতি ছিল প্রকৃতই দ্বান্দ্বিক। রক্ষাকবচ, চাকরী সংরক্ষণ ইত্যাদি, যাতে ধনিকদের লাভ করার বিশেষ কিছু ছিল না, তার থেকে স্বতন্ত্র-ভাবে একটি বাস্তবিক বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচী ও মতাদর্শ ছাড়া মুসলীম লীগ বড় আকারে ধনবাদী সমর্থন আশা করতে পারত না; একই সঙ্গে, একবার মুসলিম ধনিকরা লীগকে সমর্থন করলে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে তার অগ্রগতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। তার পক্ষে আর একটি স্বতন্ত্র, সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবী প্রসঙ্গে রফা করা সম্ভব ছিল না, এমন কি তার ফলে কেবল ঐ রাষ্ট্রের এক পোকায় কাটা সংস্করণ পেলেও না।

টীকা

১। সি. জি. শাহ ম্যার্ক্সিসম্ গান্ধীসম্ স্ট্যালিনিসম্, পৃঃ ১৮৫। আমরা একথা লক্ষ্য করতে পারি যে আধুনিক-পূর্ব সমাজসমূহে কৃষিক্ষেত্রে নিযাতনের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম ধর্মীয় প্রতীক, স্লোগান ও মতাদর্শকে ঘিরে তাদের জমায়েত করা ছিল এক সাধারণ ঘটনা।

২। এস. ই. গ্রান্ট-ডাফ ও অন্যান্য বৃটিশ ইতিহাসবিদ্‌রা অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ ছিলেন, যদিও

সে কারণে যে অধিকতর সঠিক ছিলেন তা নয়। তাঁরা মারাঠাদের সংগ্রামকে মুসলিম-বিরোধী এবং অন্যান্য মারাঠা দলপতিদের পেশওয়া-বিরোধী সংগ্রামকে ব্রাহ্মণ-বিরোধী বলে বর্ণনা করেছিলেন।

৩। দ্রষ্টব্য. সি. স্মিথ, মডার্ণ ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৯৪।

৪। হুমায়ুন কবীর, মুসলিম পলিটিকস ১৯০৬-৪৭ অ্যাণ্ড আদার এসেস্. পৃঃ ২৩ ; সুফিয়া আহমেদ, মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল ১৯০৩-১৯০৮, পৃঃ ৪৪৩-৪৪ ; কামারুদ্দীন আহমাদ. এ সোসাল হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, পৃঃ ৪৩ ; রিপোর্ট অফ দ্য বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়্যারি কমিটি ১৯২৯-৩০, পৃঃ ১৯৫ , রামকৃষ্ণ মুখার্জি, "দ্য সোসাল ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ বাংলাদেশ", পৃঃ ৪০৩। একই সময়ে লক্ষ্যণীয় যে হিন্দুরা 'সম্প্রদায়' হিসেবে নিষাতনকারী ছিলেন না ; হিন্দুরা কম নির্যাতিত হতেন না। সব মুসলিম আবার প্রজা ছিলেন না। খাজনা আদায়কারী মুসলিম, প্রধানত মধ্যস্বত্বভোগী রূপে, সংখ্যায় যথেষ্ট ছিলেন। পূর্ববঙ্গে ১৯১১ সালে হিন্দু খাজনা আদায়কারীদের সংখ্যা ছিল ৭১,১৫৪ এবং মুসলিম খাজনা আদায়কারীদের সংখ্যা ছিল ৫৪,০৫৯। সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া, ১৯১১, ৫ম খণ্ড, ২য় অংশ (সারণী), ৩৭৯। অন্যদিকে, এজেন্ট, জমিদারীর ম্যানেজার, করণিক, খাজনা সংগ্রহকারী ইত্যাদির মধ্যে হিন্দু ও মুসলিমদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৮,৩১৮ এবং ৭,৪৭১। ঐ. পৃঃ ৩৮০ (এই পরিসংখ্যানগুলির জন্য আমি আমার ছাত্র এ ওয়াই. ... লিমের কাছে কৃতজ্ঞ।। সমগ্র গ্রাম বাংলার জনসংখ্যার সামাজিক চিত্র ছিল নিম্নরূপ (রামকৃষ্ণ মুখার্জী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০৫):

পর্যায়	মোট পরিবারের শতাংশরূপে	
	হিন্দু	মুসলিম
ছোটো জমিদার, জোতদার, ধনী কৃষক	৫	৩
স্বয়ং-সম্পূর্ণ কৃষক	৩৭	৪৪
ভাগচাষী, কৃষি-শ্রমিক	৫৮	৫৩
মোট	১০০	১০০

৫। ১৯৩০-৩১-এ পূর্ববঙ্গের তিনটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এই দিকটির এক তথ্যবহুল ও উপলব্ধি-সমৃদ্ধ বিশ্লেষণের জন্য তনিকা সরকার, "কমিউনাল রায়টস ইন বেঙ্গল" দ্রষ্টব্য। তনিকা সরকারের সিদ্ধান্ত: "সুতরাং যা মূলগতভাবে ছিল কৃষিভিত্তিক জ্যাকেরী বা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক মদৎপুষ্ট সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শহরের দরিদ্রদের আক্রোশ, তা ত্রুটি-পূর্ণ রাজনৈতিকরণের দরুণ সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল", পৃঃ ২৯৮। আরো দ্রষ্টব্য. সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮০-৮১ ; ৮৭, ৪৪৩ ও তৎপরবর্তী ; জে. এইচ. ব্রমফিল্ড, এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুরাল সোসাইটি : টোয়েন্টিয়েথ, সেঞ্চুরী বেঙ্গল, পৃঃ ৩২৮।

৬। জওহরলাল নেহরু, অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, পৃঃ ১৪০। এছাড়া দ্রষ্টব্য, উর্মিলা শর্মা, "সোসাল অ্যাণ্ড ইকনমিক্ আস্পেক্টস্ অফ সেপারেটিসম্ ইন দ্য পাঞ্জাব ১৮৪৯-১৯৪৭", পৃঃ ১১ ও তৎপরবর্তী ; সত্য রাই, পার্টিশন অফ দ্য পাঞ্জাব, পৃঃ ২০ ও তৎপরবর্তী। দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবের জন্য দ্রষ্টব্য জেলা স্তরের তথ্যের ভিত্তিতে প্রেম চৌধুরী রচিত প্রবন্ধ "হিন্দু-মুসলিম রিলেশনস ইন সাউথ-ইস্ট পাঞ্জাব"। এখানে একটি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়েছিল হিন্দু ভূস্বামী ও মুসলিম প্রজা এবং অন্য দুটি ক্ষেত্রে মুসলিম ভূস্বামী ও হিন্দু প্রজা। কয়েকটি ক্ষেত্রে বিবদমান দলগুলি ছিল হিন্দু দেনাদার কৃষক ও মুসলিম মহাজন।

৭। উর্মিলা শর্মা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য় অধ্যায় এবং পৃঃ ৪৪-৫, ১০৪-০৬।

৮। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, ১৯৩৮-এ হিন্দু মহাসভার প্রতি ভি. ডি. সাভারকরের সভাপতির ভাষণ : "পাঞ্জাব ও অন্য কয়েকটি প্রদেশে ল্যাণ্ড এলিয়েনেশন অ্যাক্ট জাতীয় পদক্ষেপ হিন্দুদের অর্থনৈতিকভাবে চুরমার করে দিতে চায়···।" হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, পৃঃ ৩৪-৫।

৯। কে. এন পানিক্কর, "পেজাণ্ট রিভোল্টস ইন মালাবার ইন দ্য নাইনটিনথ অ্যাণ্ড টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীস", পৃঃ ৬০১ ও তৎপরবর্তী। এছাড়া দ্রষ্টব্য, ডব্লু. সি. স্মিথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২২৬-২৭ ; এবং কে. বি কৃষ্ণ, দ্য প্রব্লেম অফ মাইনরিটিস, পৃঃ ২৬৫-৬৭।

১০। কে বি. কৃষ্ণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৮-৬৯ ; ডব্লু. সি. স্মিথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯৫ , সি- ম্যানশারড, দ্য হিন্দু-মুসলিম প্রব্লেম ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫৭-৯, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

১১। সি. ম্যানশারড, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৪। এছাড়া দ্রষ্টব্য, সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৫৫ ও তৎপরবর্তী। অন্যদিকে, ভারত সরকার ১৯২৮ সালে লক্ষ্য করে যে : "গ্রামাঞ্চলে যেখানে তাদের দিগন্ত একই কৃষি স্বার্থ দ্বারা আবদ্ধ, সেখানে দুই সম্প্রদায় সাধারণভাবে একত্রে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বাস করে", অনিতা সিং. "নেহেরু অ্যাণ্ড দ্য কমিউনাল প্রব্লেম ১৯৩৬-১৯৩৯"-এর পৃঃ ৪৮-এ উদ্ধৃত।

১২। যথা, ১৯৩৬-এ লাহোরে প্রচারিত একটি সাম্প্রদায়িক লিফলেট ঘোষণা করে যে "মুসলমানের স্থাবর সম্পত্তি দিনে দিনে হিন্দুদের হাতে চলে যাচ্ছে, এবং তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাই উপার্জন করুক না কেন তা কোনো না কোনো রূপে অন্য সম্প্রদায়ের শক্তিবৃদ্ধি করতে চলে যায়", সি ম্যানশারড পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৬-তে উদ্ধৃত।

১৩। যথা, অমৃতসরে একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক সভা ১৯২৮-এ একটি প্রস্তাব পাশ করে ঘোষণা করে যে মহাজন রেজিস্ট্রেশন বিল "হিন্দু স্বার্থের প্রতি মারাত্মক···। তা হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত কাম নির্বাহের বিনষ্টকরণ ঘটাবে।" উর্মিলা শর্মা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৫-এ উদ্ধৃত।

১৪। আজকের দিনে ধনী কৃষক—ধনবাদী কৃষক নাম কৃষি-শ্রমিক সংঘাতকে জাতের রূপ দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে। ধনী কৃষকরা তা করে যাতে তারা নিজেদের জাতের দরিদ্র ও কৃষকদের নিজেদের পিছনে টেনে আনতে পারে। কোনো কোনো আপাতঃ জঙ্গী রাজনৈতিক নেতারা তা করেন যাতে তারা গ্রামীণ উচ্চশ্রেণীদের সমালোচনা না করে বা তাদের বর্বরতার উদ্রেক না ঘটিয়ে নীচু জাতেদের সমর্থন জয় করতে পারেন। নীচু জাতের বহু উচ্চশ্রেণীভুক্ত নেতারা তা করেন নীচু জাতেদের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান প্রভেদ লুকিয়ে রাখার এবং এইভাবে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নকে নিজেদের শ্রেণীগত লক্ষ্যের কাজে লাগাবার জন্য। অনুরূপভাবে, আজকাল আমরা অসমীয়া বা বাঙালীদের হাতে জনজাতির জনগণের শোষণ, বা বাঙালীদের হাতে অসমীয়াদের শোষণ, ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা প্রচার শুনতে পাই।

১৫। আধুনিক ভারতে, নীল বিদ্রোহ ও পাবনার কৃষক অসন্তোষ থেকে আরম্ভ করে ১৯২০-র দশকের ও ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে যুক্ত প্রদেশের কৃষক আন্দোলন ও ১৯৩০-এর দশকে বিহারের কৃষক আন্দোলন হয়ে বঙ্গদেশে তেভাগা আন্দোলন, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা আন্দোলন ও পাতিয়ালার মুজারা আন্দোলন পর্যন্ত অধিকাংশ কৃষক-আন্দোলনই ধর্মনিরপেক্ষ আকৃতি গ্রহণ করেছিল।

১৬। পাশ্চাত্যে সাম্রাজ্যবাদী, জাতিবৈষম্যবাদী ও জাতিদাম্ভিক মতাদর্শ যে ভূমিকা পালন করেছিল, অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামকে বিকৃত করেছিল, ও তার পরিবর্ত হিসেবে এসেছিল, এখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সেই ভূমিকাই পালন করেছিল।

১৭। অন্যদিকে, গ্রামের গরীব মানুষের সংগ্রামের সম্মুখীন হলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাদের প্রবণতা ছিল তাদের বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার।

১৮। ১৯০৭-এর বঙ্গদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসমূহ প্রসঙ্গে সুমিত সরকার বলেন : „দেওয়ানগঞ্জ ও ফুলপুরে গ্রামের সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত ছোঁয়াচ লেগেছিল, এবং সরকারী রেকর্ড সাধারণভাবে "দরিদ্র কর্তৃক ধনীদের লুণ্ঠন" গোছের কথা বলেছিল, যেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিন্দু কৃষকরা লুণ্ঠকাজে অংশ নেয়, এবং মুসলমান ও মাড়োয়ারী-দের উপর "প্রায় বাঙালীদের সম পরিমাণে" ডাকাতি করা হয়।" পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৫৯। তাছাড়া দ্রষ্টব্য, মালাবারের জন্য কে. এন পানিক্কর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পাঞ্জাবের জন্য উর্মিলা শর্মা পূর্বোক্ত গ্রন্থ ৫ম অধ্যায় ও পৃ. ৬৪, বঙ্গদেশের জন্য তনিকা সরকার, "কমিউ-নাল রাইটস ইন বেঙ্গল"।

১৯। সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৬০। ঐ গ্রন্থের পৃ ৪৬২-৬৪ ও দ্রষ্টব্য। তাছাড়া, বর্তমান গ্রন্থের ৪র্থ ও ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২০। এন কে. সিনহা, দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃঃ ৪। দ্বিতীয় খণ্ডে সিনহা উল্লেখ করেছেন যে ঐ সময়ে ৯০ শতাংশ জমিদারী ছিল হিন্দুদের হাতে, আর নিম্ন-তর রায়তদের অধিকাংশ ছিলেন মুসলিম। কানুনগোদের দপ্তরও প্রায় একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হত পৃঃ ২২৯।

২১। ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯।

২২। বর্তমানে ক্রমেই গ্রামাঞ্চলে "বাণিজ্য" আধিপত্য ধনী কৃষক আধিপত্যের সামনে পিছু হটছে। তার ফলে "আধিপত্যশালী" জাতগুলির চরিত্রেও পরিবর্তন আসছে। কিন্তু এই পরিবর্তনকে প্রাথমিকভাবে জাতের বিচারে দেখা যায় না।

২৩। উদাহরণস্বরূপ দেখুন তনিকা সরকার, "কমিউনাল রায়টস ইন বেঙ্গল"। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে দাঙ্গাকারীদের লক্ষ্য ছিল দেনার খত ও দেনা বা ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য আইনী নথিপত্র, পরিবারের সদস্যরা, বিশেষত মেয়ে ও শিশুরা, খুব কমই আক্রান্ত হয়। এছাড়া, বর্তমান অধ্যায়ের ১৮ নং টীকায় উল্লিখিত গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য।

২৪। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল ইলেক্টোরাল পলিটিক্স অ্যাণ্ড ফ্রীডম স্ট্রাগল ১৮৬২-১৯৪৭; সত্য রাই, রোল অফ পাঞ্জাব লেজিস্লেচার ইন দ্য ফ্রীডম স্ট্রাগল। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সুভাষ চন্দ্র বসু সহ স্বরাজপন্থীরা জমিদার-পন্থী বেঙ্গল টেন্যান্সি (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯২৮, সমর্থন করার ফলে কংগ্রেসী, কংগ্রেস-সেবী ও কৃষকের প্রতি সহানুভূতিশীল মুসলিম নেতারা ও ঐ ধরণের মুসলিম জনমত জাতীয় কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে (বইটির ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে কংগ্রেস কৃষকের পক্ষে কিছু কিছু কাজ করেছিল, কিন্তু তার মাত্রা যথেষ্ট ছিল না এবং তার সংগ-ঠন ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

২৫। যেমন, পাঞ্জাবে বাম-নেতৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলন প্রধানত মধ্য পাঞ্জাবের শিখ কৃষকদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তা পশ্চিম পাঞ্জাবে অনুপ্রবেশ করতে পারে না।

২৬। এ আই. সি সি. পেপারস্, পি ১৭/১৯৩৭, পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে নেহেরুর পত্রবিনিময়। এছাড়া হুমায়ুন কবীর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২ দ্রষ্টব্য।

২৭। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩, ৫৮-৫৯।

২৮। প্রেম চৌধুরী, "হিন্দু-মুসলিম রিলেশনস ইন সাউথ-ইস্ট পাঞ্জাব" দ্রষ্টব্য।

২৯। ডব্লু. সি. স্মিথ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১১-১২।

৩০। ব্যক্তিগতভাবে কোনো ধনিকের কথা স্বতন্ত্র। ব্যক্তিবিশেষ, এমন কি ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো ধনিকের গভীর ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস ও আচরণের ধাঁচ থেকে

থাকতে পারে। কয়েকজন ইহুদী ধনিক হিটলারকে সমর্থন করেছিলেন ; তার অর্থ এই নয় যে ইহুদী ধনিকরা গোষ্ঠীগতভাবে নাজী ছিলেন বা ঐক্যবদ্ধ কোনো 'ইহুদী' বুর্জোয়াসি বিদ্যমান ছিল।

৩১। কে. এম আশরফ, হিন্দুস্থানী মুসলিম রিয়াসত পর এক নজর, পৃঃ ৬৭।

৩২। সি. জি. শাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৮। জওহরলাল নেহরুও এটা স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন। তাঁর অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, পৃঃ ৪৭৭ দেখুন।

৩৩। ডব্লু. সি. স্মিথ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১১।

৩৪। এটা আরেকবার দেখাচ্ছে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ একবার চালু হলে স্বয়ংক্রিয়। যেখানেই রাজনৈতিক শূন্যতা, বা তার বৃদ্ধির উপযোগী সামাজিক পরিস্থিতি থাকে, তা সেখানেই ঢুকে পড়ে।

৩৫। বাস্তবে, ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে একদল রেল শ্রমিক নিজেদের মুসলিম ও অন্যদের হিন্দু বলে অভিহিত করেন। তার অর্থ এই নয় যে রেলের শ্রমিকশ্রেণী মুসলিম শ্রমিকশ্রেণী ও হিন্দু শ্রমিকশ্রেণী, এই দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিভক্ত ছিল।

৩৬। ১১ই অগাস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সংবিধান সভায় প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণে জিন্না বলেছিলেন : "আপনারা যে কোনো ধর্ম বা জাত বা বিশ্বাসের অনুগামী হতে পারেন—তার সঙ্গে রাষ্ট্রের কাজের কোনো সম্পর্ক নেই···। আমরা এই মৌলিক নীতি থেকে আরম্ভ করছি যে আমরা সবাই একটি রাষ্ট্রের নাগরিক, এবং সমান নাগরিক···। এখন, আমি মনে করি, যে এটা আমাদের সবসময়ে আদর্শ হিসেবে সামনে রাখা উচিত ; এবং আপনারা দেখবেন যে কালক্রমে হিন্দুরা আর হিন্দু থাকবেন না, এবং মুসলিমরা আর মুসলিম থাকবেন না, ধর্মীয় অর্থে নয়, কারণ তা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে"। স্পীচেস্ অ্যাণ্ড রাইটিংস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৩-০৪।

৪

সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা

[এক]

ব্যাপকতর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল প্রতিক্রিয়ার এক চূড়ান্ত রূপ, যা রাজনীতিতে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার ভূমিকা থেকেও বেরিয়ে আসে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল আধুনিক যুগে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার এক প্রধান অস্ত্র, যাকে 'সবকটি রণাঙ্গনে লড়তে হত এবং কোনো ছাড় দিলে চলত না'। সাম্প্রদায়িক নেতারা ও দলগুলি সাধারণভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন এবং দেশের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির প্রতিনিধিত্ব করতেন বা তাদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে যুক্ত ছিলেন। এর ফলে অনিবার্যভাবে তাঁরা বিদেশী শাসকদের সঙ্গে হাত মেলাতেন কারণ তারাও বিদ্যমান ঔপনিবেশিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো টিঁকিয়ে রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থসমূহ হয় ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে মদত দিয়েছিল অথবা অসচেতনভাবে তা গ্রহণ করেছিল, কারণ, জনগণের সংগ্রামগুলিকে বিকৃত করার, জনগণ তাঁদের সামাজিক অবস্থার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি বোঝার পথে বাধা সৃষ্টি করার, এবং তাঁদের প্রকৃত জাতীয় ও সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ ও বিষয়সমূহ এবং সেগুলিকে ঘিরে গণ-আন্দোলন থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদের। সাম্প্রদায়িকতাবাদ কায়েমী স্বার্থকে নিজ নিজ সুবিধাভোগী অংশগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলিকে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও ধর্মীয় পরিচিতির ছদ্মবেশে লুকিয়ে রাখতে দিত এবং তাদের স্বার্থের জন্য কেবল নৈতিক ও মতাদর্শগত আচ্ছাদন নয়, উপরন্তু ধর্মীয় ভাবাবেগ অনুপ্রাণিত জনপ্রিয় গণসমর্থন অর্জন করতে

দিত।[১] যেখানে শ্রেণী পরিচিতি সাম্প্রদায়িক পরিচিতির মধ্যে ঢুকে থাকত এবং শ্রেণী সংগ্রামকে দেখানো হত সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগ্রাম রূপে, সেখানে উচ্চশ্রেণীগুলি শোষিতের শ্রেণী সংগ্রামসমূহকেও নিজেদের উদ্দেশ্য ও শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহার করতে পারত। এইভাবে, ভূস্বামীরা তাদের খাজনা-প্রদানকারী কৃষকদের কাছ থেকে, এবং মহাজনরা ঋণগ্রস্থ কারিগর ও কৃষকদের কাছ থেকে তাদের শোষণের বাস্তবতাকে লুকিয়ে রাখত এবং তার পরিবর্তে জোর দিত শোষক ও শোষিতের মধ্যে "সাম্প্রদায়িক" (বা "জাতভিত্তিক") ঐক্যের উপর। তারা তাদের শ্রেণী স্বার্থের প্রতি হুমকির মোকাবিলা করতে সক্ষম হত শ্রেণী সংঘাতের পরিবর্ত হিসাবে সম্প্রদায়গত সংহতিকে সামনে এনে।

সাম্প্রদায়িকতাবাদ উচ্চ শ্রেণীদের এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের নতুন মধ্য শ্রেণীগুলির কোনো কোনো অংশের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করতে ও তাদের রাজনীতিকে ব্যবহার করে নিজেদের কাজ হাসিল করাও সম্ভবপর করত।[২]

পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী—মধ্য শ্রেণীগুলি—ছাড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদের মূল সামাজিক ভিত্তি এসেছিল কে. এম. আশরফের বর্ণানুযায়ী যারা জাগীরদার গোষ্ঠী—ভূস্বামী, জমিদার, ও সাধারণভাবে অভিজাত সম্প্রদায়—এবং মহাজন, আমলাতান্ত্রিক এলিট (কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীবৃন্দ) এবং, কোনো কোনো অঞ্চলে, ব্যবসায়ীরা। উপরন্তু, সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্ব আসত প্রধানত সমাজের এই সমস্ত অংশ থেকে। নেতৃস্থানীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন প্রাক্তন রাজকর্মচারী, বড় ভূস্বামী, খেতাবধারী ও বড় ব্যবসায়ী। এমনকি ১৯৩০-এর এবং ১৯৪০-এর দশকেও, যখন মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিবিদ্‌রা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সামনের সারিতে এসেছেন, তখনও জাগীরদারী এবং আমলাতান্ত্রিক অংশেরই আধিপত্যের ঝোঁক দেখা যায়।[৩] এগুলিই আবার ছিল সেই সব সামাজিক শ্রেণী, স্তর ও গোষ্ঠী, যাদের অবস্থান সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল ছিল, এবং ফলতঃ যারা বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত ছিল। তবে সেই সঙ্গে এই সমস্ত সামাজিক স্তরগুলি ঔপনিবেশিকতাবাদের মূল সামাজিক ভিত্তি হিসাবে থাকত, এ কথা ছাড়াও পরবর্তী একটি অধ্যায়ে দেখানো হবে যে ঔপনিবেশিক শাসকরা নিজেদের কারণবশতঃই সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করত।

১৮৮৫-র পর বহু দশক ধরে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিবর্গ, উভয়েরই আত্মরক্ষার দ্বিতীয় স্তর। কিন্তু কালক্রমে তা ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের মুখ্য রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত হাতিয়ারে পরিণত হল। একটি অ-সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে, বাঁচার লড়াই ছিল হিংস্র, এবং তার জঙ্গী শ্রেণীগত ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আকার গ্রহণ করার ঝোঁক দেখা দিত। বিদেশী শাসকরা এবং ভারতীয় কায়েমী স্বার্থসমূহ উভয়েই সাম্প্রদায়িকতাবাদ

ব্যবহার করত জনপ্রিয় আন্দোলনগুলিকে বিপথগামী করার জন্য, জাতীয় এবং শ্রেণীগত ঐক্য রুখবার জন্য, এবং নির্বাচনী ও অন্যান্য রাজনৈতিক গণসমাবেশের যুগে নিজেদের সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তি প্রশস্ততর করার জন্য। সুতরাং সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী—পদাতিক—এবং যারা তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করত, এবং সংগঠিত করত এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে লাভবান হত, তাদের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ ছিল। অত্যন্ত মৌলিক অর্থে, **সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও জাগীরদারী উপাদানসমূহের নির্দেশাধীনে পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শ।**[৪]

যদিও সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদ্ভব হয়েছিল, এবং তা গড়াগড়ি খেত, পেটি বুর্জোয়াদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে, কিন্তু তার দ্রুত বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা যায় অংশত ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ও কায়েমী স্বার্থ তাদের স্বীয় রাজনীতির পিছনে গণ-সমর্থন সংহত করার জন্য তা ব্যবহার করতে ইচ্ছুক থাকার ঘটনা দিয়ে। তা না হলে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বাড়তে বাড়তে তেমন দানবীয় আকার ধারণ না করতেও পারত। একথা বিশেষভাবে সত্য ১৯৩০-এর দশকের প্রসঙ্গে, জাতীয় কংগ্রেসের র‍্যাডিকাল রূপান্তরের দরুণ, বিশেষত তার কৃষি কর্মসূচীর দরুণ, ১৯৩০-৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৩৭-এর নির্বাচন থেকে তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তার দরুণ, এবং বামপন্থীদের বৃদ্ধি ও শক্তিশালী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের উত্থানের দরুণ। ঐ সময়ে বৃটিশ শাসকরা ও ভারতীয় জাগীর-দারী গোষ্ঠীরা প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে পড়ে এবং র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী শক্তিদের সংহতি নাশ করা এবং ভূমি সংস্কারের বিপদ এড়ানোর জন্য একমাত্র স্থায়ীত্বসম্পন্ন ও শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি সমর্থনের পন্থা গ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা আবার, তাদের ক্ষীয়মান জন-প্রিয়তা এবং জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী শক্তিদের পক্ষে সমর্থনের জোয়ার দেখে ভূসম্পত্তি সম্পন্ন, জাগীরদারী উপাদানসমূহ এবং বণিকশ্রেণীর কোনো কোনো অংশের উপর আরো বেশী করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

[দুই]

যেমন, যুক্তপ্রদেশে গোড়া থেকেই মুসলিম লীগে নবাব, জমিদার ও ভূতপূর্ব আম-লাদের আধিপত্য ছিল। ১৮৭০ এবং ১৮৮০-র দশকে হিন্দু ও মুসলিম ভূস্বামী এবং রাজকর্মচারীরা একত্রে রক্ষণশীল রাজনীতির বিকাশ ঘটিয়ে তাঁদের সামা-জিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে ও তার উন্নতি সাধন করতে চেষ্টা করে-ছিলেন। ১৮৮০-র দশকের শেষ দিকে সৈয়দ আহমদ খান, ভিজার রাজা শিব-

প্রসাদ, বেনারসের রাজা ও অন্যান্যদের সাহায্যে যুক্তপ্রদেশের জাগীরদারী ও আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীদের, যাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল এবং যারা উত্থিত আধুনিক মধ্যশ্রেণীদের ও গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন দেখে ভীত হচ্ছিল, তাদের নিয়ে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ ও শ্রেণীভিত্তিক কংগ্রেসবিরোধী জোট সংগঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। জাগীরদারী গোষ্ঠীদের সরকারী চাকরী ও আইনসভায় মনোনয়নের পদ্ধতি চালু রাখার দাবীর বিপরীতে কংগ্রেস উভয় ক্ষেত্রেই সকলের জন্য প্রতিযোগিতামূলক চাকরী ও নির্বাচনের দাবী করেছিল।[৫] চিরাচরিত নেতৃত্ব এবং জন্মভিত্তিক ও জমির মালিকানাভিত্তিক উৎকর্ষের নীতির নামে জাগীরদারী গোষ্ঠীদের ধর্মনিরপেক্ষ ও শ্রেণীগত যুদ্ধপ্রস্তুতির এই প্রয়াস দানা বেধে উঠতে পারে নি।

তখন জাগীরদারী গোষ্ঠীদের এমন এক মতাদর্শের দরকার হল যা তাদের ব্যাপকতর সামাজিক ভিত্তি অর্জন করতে এবং তাদের অবনতি প্রাপ্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও অবস্থান রক্ষার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আবেদন করতে সক্ষম করবে। যদিও তাদের ভাগ্যের অবনতি ছিল ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ঔপনিবেশীকরণ, তবু তারা ঔপনিবেশিকতা বিরোধী নীতি অবলম্বন করতে পারত না কারণ তারা তাদের বিদ্যমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানও রক্ষা করতে পারত কেবল ঔপনিবেশিক সরকারের সাহায্যে, যা জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী ও আধুনিক মধ্যশ্রেণীদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছিল। তখন সৈয়দ আহমদ মুসলিমদের মধ্যে জাগীরদারী গোষ্ঠীদের মুসলিম হিসাবে সংগঠিত করতে আরম্ভ করলেন, যাতে ভূস্বামী ও আমলা রূপে তাদের যে শ্রেণীস্বার্থ, তাকে রক্ষা ও তার উন্নতিসাধন করা যেত ধর্ম ও 'সম্প্রদায়' (কৌম)-এর নামে। বিকাশমান জাতীয় আন্দোলনের প্রতি রক্ষণশীল জাগীরদারী বিরোধিতাকে মুসলিম বিরোধিতা বলে ঘোষণা করা হল। এইভাবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বিকশিত হল জাগীরদারী ও আমলাতান্ত্রিক সামাজিক শ্রেণী ও স্তরগুলির রাজনীতি রূপে। ১৯০৭ এ অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ছিল এই দিকে আরেকটি প্রচেষ্টা। তখন থেকে জাগীরদারী গোষ্ঠীরা সম্প্রদায়গত ক্ষমতা, সাম্প্রদায়িক চাকরী সংরক্ষণ এবং স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য লড়াই চালায়, তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। তারা প্রকাশ্য শ্রেণী চরিত্রে তা এমনকি ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫-এর সীমিত ভোটাধিকারের অধীনেও করতে পারত না।

একই সঙ্গে, ১৯৩৭ পর্যন্ত, যুক্তপ্রদেশের জাগীরদারী গোষ্ঠীরা আইনসভার ভিতরে এবং বাইরে, উভয় ক্ষেত্রেই, ধর্ম নিরপেক্ষ, রাজনৈতিক ও শ্রেণীগতভাবেও সংগঠিত ছিল। হিন্দু ও মুসলিম ভূস্বামী এবং তালুকদাররা ভূস্বামীদের দুটি সংগঠনে একত্রে কাজ করত। সে দুটি হল আউধ অ্যাসোসিয়েশন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউ.পি.। তারা একত্রে কাজ করত প্রথম

অসহযোগ আন্দোলন প্রতিরোধ করতে ব্রিটিশদের দ্বারা সংগঠিত আমন সভা-গুলিতে, এবং পরে, ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে আইনসভার ভূস্বামীদের দলে, যেখানে ভূস্বামী হিসাবে কাজ করে তারা সফলভাবে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে পেরেছিল—বিশেষত প্রজাস্বত্ব ও খাজনা সংক্রান্ত আইনের সম্পর্কে।

কিন্তু ১৯৩৭-এর পর, যখন তারা দেখল যে প্রকাশ্যে ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষা সম্ভব নয় এবং ভূস্বামীদের রাজনৈতিক দলগুলি, প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রচণ্ডভাবে পরাজিত হয়ে, আর তাদের স্বার্থরক্ষার ক্ষমতা হারিয়েছে, তখন তারা প্রায় সামগ্রিকভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঘুরে গেল।[৬] একই সময়ে, কংগ্রেসের কৃষি সংস্কার কর্মসূচী, যার মধ্যে ছিল খাজনা কমানো, প্রজাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং জমিদারী উচ্ছেদ, তা তাদের মৌলিক স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলল। এক র‍্যাডিকাল অর্থ নৈতিক প্রচারাভিযানকে ঘিরে গণসংযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম জনগণকে সংগঠিত করার কংগ্রেসী প্রচেষ্টা এই বিপদকে তীব্রতর করে তুলেছিল। এই প্রত্যাশিত বিপদের মোকাবিলা করতে তারা নিরাপত্তার জন্য অন্য রাজনৈতিক প্রণালী খোঁজে। যুক্তপ্রদেশের মুসলিম ভূস্বামীরা ন্যাশনাল এগ্রিকাল্‌চারাল পার্টিগুলিকে ভেঙে দিয়ে দলবদ্ধভাবে মুসলিম লীগে চলে যায় এবং তাঁদের কায়েমী স্বার্থের প্রতি গ্রামীণ হুমকি প্রতিরোধে তাকে এক সক্রিয় সংগঠন হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম হন। এই স্তরেই মুসলিম লীগ যুক্তপ্রদেশে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও এই প্রক্রিয়ায় তা আরো বেশী মাত্রায় একটি উচ্চ শ্রেণীর, জাগীরদারী সংগঠনে পরিণত হয়।[৭]

এই সংগঠন ১৯৩৭ থেকে কংগ্রেস প্রস্তাবিত ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপগুলিকে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে যায়, যদিও সেগুলি ছিল যে কোনো মাপকাঠি অনুযায়ী খুবই নিরীহ।[৮] এই বিরোধিতার ফলে মুসলিম লীগ মধ্যশ্রেণী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কারণ তাদের অনেকেরই ছোট বা বড় জমিদারীতে ভাগ ছিল।

অনুরূপভাবে, যুক্তপ্রদেশের বহু সংখ্যক হিন্দু জমিদার ও তালুকদার ১৯৩৭-এর পর হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। তাঁদের মহাসভার প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য মহাসভার সভাপতি ভি. ডি. সাভারকর ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে কোনো "স্বার্থপর" শ্রেণীগত টানা-হ্যাঁচড়ার নিন্দা করেন।[৯] আগেও, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে, যুক্তপ্রদেশের হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ী-মহাজনরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করতে শুরু করেছিলেন, যদিও তখনও কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলের অস্তিত্ব ছিল না।

পাঞ্জাবেও মুসলিম লীগ মূলতঃ নির্ভর করত বড় ভূস্বামীদের উপর। কিন্তু ভূস্বামীরা মোটামুটিভাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টিকে সমর্থন করত। ঐ দল পশ্চিম ও মধ্য পাঞ্জাবের মুসলিম ভূস্বামী, মধ্য পাঞ্জাবের শিখ ভূস্বামী, দক্ষিণ পাঞ্জাবের (বা

হরিয়ানার) এবং কাংড়ার হিন্দু ভূস্বামী, এবং সমগ্র পাঞ্জাবের বড় জমির মালিক ও আমলাতান্ত্রিক এলিটকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, এবং তাদের স্বার্থকে সফলভাবে রক্ষা করেছিল হিন্দু, শিখ ও মুসলিম প্রজাদের, এবং হিন্দু-মহাজন-ব্যবসায়ীদের, উভয়েরই হাত থেকে। ইউনিয়নিস্ট পার্টি একদিকে ছিল বৈভবশালী ভূম্যধিকারীদের শ্রেণীগত দল, অতএব আধা-অসাম্প্রদায়িক, আর, অন্যদিকে, তা পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলিম ভূস্বামীদের আধা-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং দক্ষিণ পাঞ্জাবের জাট ভূস্বামী ও ধনী কৃষকদের জাতিভেদপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিকেও স্পষ্ট ভাষা দিত। ফলে, ১৯৩৭ পর্যন্ত মুসলিম লীগ পাঞ্জাবে বেশ দুর্বল থেকে যায়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত দেশজোড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধির প্রভাবে, লীগের সঙ্গে ইউনিয়নিস্ট পার্টির সংযোগ বাড়তে থাকে। মুসলিম ভূস্বামীদের প্রতি লীগের সমর্থন এই সংযোগের আরো সুবিধা করে দেয়। উপরন্তু, ভূস্বামীরা এবং উচ্চ পর্যায়ের আমলাতন্ত্র ক্রমেই অনুভব করছিল যে ইউনিয়নিস্ট পার্টি যেহেতু একটি প্রাদেশিক দল, তাই তার পক্ষে আর তাদের কংগ্রেসী র‍্যাডিকালিজমের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে যারা মুসলিম, তারা ধীরে ধীরে লীগের দিকেই চলে যায়, পশ্চিম পাঞ্জাবে ও মধ্য পাঞ্জাবের ক্যানাল কলোনীগুলিতেও। ১৯৪৪-৪৫-এর মধ্যে লীগ ইউনিয়নিস্টদের কাছ থেকে হায়াৎ, নূন, দৌলতানা, ও মামদোত ইত্যাদি প্রভাবশালী পরিবারগুলিকে নিজের পক্ষে আনতে পেরেছিল, যেমন পেরেছিল নেতৃস্থানীয় পীর এবং সাজ্জাদা নাবিনিস, যাদের ধর্মস্থানের সঙ্গে বড় জোত যুক্ত ছিল, তাদের টানতে। লীগ যে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে ইউনিয়নিস্ট পার্টিকে তুমুলভাবে পরাস্ত করতে পেরেছিল, অংশত তা ছিল ভূস্বামী ও ধর্মীয় প্রধানদের ব্যাপক সমর্থনের ফল।

একইভাবে, ১৯২০-র দশকের মধ্যভাগ থেকে হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি পাঞ্জাবের হিন্দু শহরে ব্যবসায়ী ও মহাজনদের মুখপাত্রে পরিণত হয়, যারা হিন্দুদের স্বার্থ বিপন্ন, এই ধুয়ো তুলে কৃষক ও ভূস্বামীদের তারা যে শোষণ করত তা রোধ করার জন্য প্রস্তাবিত কৃষি আইনসমূহের তীব্র বিরোধিতা করত। যদিও পাঞ্জাব কংগ্রেস সামাজিকভাবে বেশ রক্ষণশীল এবং ব্যবসায়ী-মহাজন জোটের স্বার্থের প্রতি সংবেদনশীল ছিল, তবু তারা তাদের স্বার্থরক্ষা করতে রাজি ছিল না এবং করতে পারত না, কারণ তাদের ভিতরে এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্য থেকে বামপন্থীরা তাদের চাপ দিত। ফলে এই শ্রেণী ও স্তরগুলি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দিকে তাকায়, ও তাদের একটি বৃহৎ এবং স্থায়ী সামাজিক ভিত্তি তৈরী করে দেয়।

বাংলাদেশে প্রথমে হিন্দু ও মুসলিম জমিদাররা আইন প্রণয়নের ফলে বিপন্ন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাদের জমিদারী অধিকারসমূহ রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে হাত মেলায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, মুসলিম জমি-

দাররা এবং অন্যান্য অভিজাত বা জাগিরদারী ব্যক্তিরা নতুন প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগে যোগদান করে। তারা এর আগে বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করেছিল। ১৯১৫-র পর, এবং ১৯২০-র দশকে, যখন প্রধানত হিন্দু জমিদার ও তাদের মুসলিম প্রজাদের মধ্যবর্তী মুসলিম জোতদার ও অন্যান্য 'নির্ভরশীল' মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রজা সমিতি গঠন করে, তখন মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সমিতি একরকম জমিদারী-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে ও প্রজাদের কিছু কিছু স্বার্থরক্ষা করে, যদিও, যে সামাজিক স্তর তাকে সমর্থন করত, তারা সমস্ত কৃষকের স্বার্থের বিরোধী ছিল, এবং তাদের তথাকথিত অবাঙালী বংশপরম্পরার নামে মুসলিম কৃষক ও কারিগরদের চেয়ে উচ্চ সামাজিক অবস্থান দাবী করত। (এই জন্য, তারা অনেকে সামাজিক সম্মানের চিহ্ন হিসাবে তাদের ছেলেমেয়েদের আরবী, ফার্সী, বা কমপক্ষে উর্দু শেখাতে চেষ্টা করত)। যদিও সমিতির কার্যকলাপ ছিল হিন্দু জমিদার বিরোধী, এবং সমিতি আধা-সাম্প্রদায়িক প্রচার করে থাকত, তবু তা মূলগতভাবে একটি সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী ছিল না। ১৯৩৫-এ, তার বামপন্থীদের চাপে, তার নাম পাল্টে রাখা হয় কৃষক প্রজা পার্টি (কে.পি.পি.)। তার বামপন্থীরা জমিদারী উচ্ছেদ সহ অধিকতর স্পষ্ট এবং র‍্যাডিকাল কৃষি কর্মসূচী গ্রহণের জন্যও চাপ দিতে থাকে। এর ফলে অধিকাংশ জমিদার ও অন্যান্য জাগীরদারী ব্যক্তিবর্গ দল ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগদান করে। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে ভূস্বামী আধিপত্যাধীন মুসলিম লীগ এবং কি.পি.পি-র মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। উভয়ে হাত মেলায় ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী করে একটি লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য। হক মন্ত্রীসভা কৃষকের প্রতি অনেকগুলি অনুকূল আইন প্রণয়ন করে, যদিও ভূস্বামী অধ্যুষিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব তাকে অসহায় করে ফেলায় ধীরে ধীরে তার কৃষিক্ষেত্রের র‍্যাডিকাল মতবাদ ফুরিয়ে যায়। ফজলুল হকের উপর জমিদারদের প্রভাব যত বাড়তে থাকে, তিনি ততই সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েন। হক তাঁর নিজের দলের যে সব সদস্যরা কৃষকের পক্ষে ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক আক্রমণ করেন, এবং অভিযোগ করেন যে তাঁরা "হিন্দু" কংগ্রেসের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন। তবু, ভারতের অন্যান্য অংশের বিপরীতে, বাংলাদেশে মুসলিম লীগের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটি সতেজ বামপন্থী অংশ ছিল, যারা জাগীরদারী গোষ্ঠীদের বিরোধিতা করত, কিন্তু যারা নিজেদের সাম্প্রদায়িকতাবাদের শৃংখলে আবদ্ধ থাকার ফলে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় হতে পারত না এবং বারংবার সাংগঠনিকভাবে দক্ষিণপন্থীদের হাতে পর্যুদস্ত হত। একথাও লক্ষণীয় যে সাংগঠনিক দ্বন্দ্বে জিন্না ও কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্ব অপরিবর্তনীয়ভাবে জমিদার দরদী নাজিমুদ্দিনকে সমর্থন করতেন, জোতদারপন্থী হক, বা কৃষক সমর্থক আবুল হাশিম, বা এমনকি মধ্য শ্রেণীদের মুখপাত্র উদারনৈতিক সোহরাওয়ার্দীকেও না।

যদিও হিন্দু মহাসভা বাংলাদেশে একটি বড় শক্তি হিসাবে দেখা দেয় নি, জমিদারী প্রভাবের দরুণ বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের বড় অংশের মধ্যে কৃষি সংস্কারের বিরোধিতা করার প্রবৃত্তি ছিল। বামপন্থীদের প্রভাবে বাংলার কংগ্রেস একটি র‍্যাডিকাল কৃষি কর্মসূচী গ্রহণ করলেও, তা বাস্তবায়িত করার সময়ে তারা পিছপা হত। ১৯৩৭-এ কংগ্রেস ও কে.পি.পি. যে একসঙ্গে আসতে পারল না, তার অন্যতম কারণ হল কে.পি পি.-র প্রস্তাবিত কৃষি আইন সমর্থনে কংগ্রেসের অনীহা। হিন্দু জমিদাররা কে.পি পি.-র কৃষি আইনকে হিন্দু স্বার্থের উপর আক্রমণ বলে দেখানোর মাধ্যমে তার বিরোধিতা করার সবরকম চেষ্টা করে। তারা ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থনও করে নি।

সবশেষে আমরা একথার উল্লেখ করতে পারি যে মুসলিম লীগের চেয়ে হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি কেন রাজনৈতিকভাবে দুর্বলতর ছিল তার একটি কারণ হল এই, যে হিন্দু ভূস্বামীদের একাংশ শ্রেণীগত আত্ম-রক্ষার যে রণনীতি অনুসরণ করেছিল তা মুসলিম ভূস্বামীদের অনুসৃত রণনীতি থেকে ভিন্ন ছিল। প্রায় সমস্ত মুসলিম ভূস্বামী এবং অধিকাংশ হিন্দু ভূস্বামী সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে সমর্থন করত কারণ তারা বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সংঘর্ষে না যাওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিল এবং ভূস্বামীদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করত। কিন্তু হিন্দু ভূস্বামীদের একাংশ, প্রধানত ছোটো জমিদাররা, কংগ্রেসকে সমর্থন করত ও তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের উপর নির্ভর করত। ১৯২০-র দশকের মধ্যে হিন্দু জনগণের মধ্যে কংগ্রেস এত বিরাট সমর্থন লাভ করেছিল যে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলিকে কোনোভাবে সমর্থন করা ঐ ভূস্বামীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্ষতিকর হত। উদাহরণস্বরূপ, বিহারের মুসলিম জমিদাররা যেখানে লীগের পক্ষে চলে যায়, হিন্দু জমিদারদের একাংশ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন করে।

পরে দেখানো হবে, হিন্দু মহাসভার আপেক্ষিক দুর্বলতার আরেকটি কারণ হল, হিন্দুদের মধ্যে জাগীরদারী উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল কম। হিন্দুদের মধ্যে আধুনিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং বুর্জোয়ারা দ্রুত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আধিপত্যের স্থানে উঠে যায়। মুসলিমদের মধ্যে তখনও জাগীরদারী ও আমলাতান্ত্রিক উপাদানের আধিপত্য কায়েম ছিল। এই অর্থে, 'মুসলিম' মধ্যশ্রেণীর পশ্চাদপদ চরিত্র বা দুর্বলতা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা-বাদের বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল।

[তিন]

এই অধ্যায়ের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদভিমুখী শক্তিদের প্রতিনিধিত্বকারী ছিল, এবং সাধারণভাবে, সাম্প্রদায়িক দল ও ব্যক্তিরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনায় প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান গ্রহণ করত।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এবং ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সমস্ত র‍্যাডিকাল শক্তির বিরোধিতা করত। ভারতীয় জনগণ যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি গ্রহণ করার ও তার জন্য নিজেদের পরিবর্তনের বাস্তব সমস্যার মোকাবিলা করেছিলেন, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তখন অপরিবর্তনীয়ভাবে সে সবের বিরোধিতা করেছিল ধর্মীয় পুনর্জাগরণের ধ্বজা তুলে। তারা মেয়েদের ও নিম্ন জাতের মধ্যে সমসাময়িক উত্থানের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিল। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উঁচু জাতের কর্তৃত্বকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরত, আর মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রবণতা ছিল আজলাফের উপর আশরাফের সামাজিক আধিপত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা। হিন্দু, মুসলিম ও শিখদের মধ্যে ধর্মীয় এলিটরা যেখানে প্রকাশ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার জন্য লড়েছিল, সেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদ তার অধিকতর আধুনিক অনুবর্তীদের সংস্কারবাদী উদ্যমে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিত, কারণ সামাজিক ধর্মীয় সংস্কারের কোনো প্রয়াস সাম্প্রদায়িকতাবাদের সমর্থকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার প্রবণতা দেখাত। যথা, সৈয়দ আহমদ খানের গোড়ার দিকের ধর্ম সংস্কার ও নারী উন্নতি প্রচেষ্টার ধার ভোঁতা করে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদ। অনুরূপভাবে, ১৯৩০-এর দশকে, বিভিন্ন মুসলিম শিক্ষাসম্বন্ধীয় ও সংস্কারমূলক সমাজ শুকিয়ে যায়। যে আর্যসমাজপন্থীরা সক্রিয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে যোগ দেন, তাঁদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসাহ ক্ষীণকণ্ঠ হয়ে পড়ে। এমন কি ভি. ডি. সাভারকারের সামাজিক-ধর্মীয় র‍্যাডিকালবাদকেও পোষ মানিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদ।

প্রথম অধ্যায়ে, এবং পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী সংগঠন ও নেতারা খুব কমই সেই সব সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে চিন্তিত হতেন, যেগুলি তাঁদের 'সম্প্রদায়'-এর ব্যাপক সংখ্যক জনগণকে প্রভাবিত করত বা অর্থনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত ছিল। তাঁদের এমন কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিল না যা এমনকি তাঁদের সমধর্মাবলম্বীদের ও সমস্যা সমাধানের সহায়ক হত। বস্তুতঃ, তারা জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো বস্তুগত প্রশ্ন উত্থাপন করা বা আলোচনা করা থেকেই সরে থাকত। তাদের কর্মসূচী, বা তারা যে সমস্ত দাবী পেশ করত, তা নিছক প্রথাগতভাবে ছাড়া প্রায় কখনোই শ্রমিক, কৃষক, কারিগর, বা এমনকি নিম্ন মধ্যশ্রেণীর ও চাহি-

দার সঙ্গে প্রায় কখনোই প্রাসঙ্গিক ছিল না। এরা একমাত্র লাভবান হত সরকারী চাকরীতে সংরক্ষণের দাবী থেকে, এবং তাও অল্পসংখ্যক মানুষকে লাভবান করলেও, এমনকি মধ্যশ্রেণীর বেকারত্বের সমস্যারও সমাধান করত না, এবং তার থেকে প্রকৃত লাভ হত উচ্চ শ্রেণীর মানুষের। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তেমন কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কর্মসূচীর অনুপস্থিতিকে লুকিয়ে রাখত সাম্প্রদায়িক গরম বুলির ধোঁয়ার আড়ালে।

কায়েমী স্বার্থের ক্ষতি করবে, অর্থনৈতিক কাঠামোর এমন কোনো অর্থবহ পরিবর্তনকেও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অনিবার্যভাবে বিরোধিতা করত। যেমন, হিন্দু মহাসভা সক্রিয়ভাবে ভূমি সংস্কারের, এবং ভূস্বামী বিরোধী, ধনিক বিরোধী আন্দোলনেরও, বিরোধিতা করত। তারা কৃষক ও ছোটো ভূম্যধিকারীদের সাহায্যার্থে মহাজন বিরোধী সমস্ত আইনেরও বিরোধিতা করত। অনুরূপভাবে, মুসলিম লীগ সাধারণতঃ ভূস্বামী বিরোধী পদক্ষেপের বিরোধিতা করত। যেমন, ১৯৩৮-এ যুক্তপ্রদেশে তারা ভূস্বামীদের সঙ্গে মিলে কংগ্রেস প্রস্তাবিত টেনান্সি বিলের বিরোধিতা করেছিল। বাংলাদেশে তারা ১৯৩৭-এর আগে কৃষক প্রজা পার্টির কৃষি সংস্কার কর্মসূচীর বিরোধিতা করেছিল এবং ১৯৩৭-এ ঐ দল লীগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তার নতুন মিত্রের র‍্যাডিক্যাল, কৃষকের অনুকূল অংশকে দমন করেছিল। একবার জোতদার গোষ্ঠীরা যে র‍্যাডিকালপন্থার প্রতিনিধি ছিল তার ক্ষমিবৃত্তি হওয়ার পর বাংলাদেশের মুসলিম লীগ কৃষি প্রসঙ্গে তার দিশায় বেশ রক্ষণশীল হয়ে পড়ে এবং, শেষ পর্যন্ত, কার্যত তার কৃষকের অনুকূল অংশগুলিকে দল থেকে বিতাড়িত করে। আমরা আরো লক্ষ্য করতে পারি যে কৃষক প্রজা পার্টির এবং লীগের যে অংশগুলি কৃষকের প্রতি অনুকূল ছিল, তারা পূর্ববঙ্গের শ্রেণী পরিস্থিতিকে সাম্প্রদায়িক রং চাপাতে চেষ্টা করার ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের রাজনীতিতে ভূস্বামী জোতদার আধিপত্য কায়েম হয়। প্রয়োগক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে কৃষিক্ষেত্রের র‍্যাডিকালপন্থার কাজে যোজন করা সম্ভব ছিল না। বরং তার বিপরীত ঘটনাই ঘটেছিল। পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ কৃষিক্ষেত্রে সমাজ কাঠামোতে ভূস্বামী আধিপত্য সমর্থন করেছিল। তারা প্রজাদের বিরুদ্ধে ভূস্বামীদের স্বার্থের পক্ষে বলিষ্ঠভাবে লড়াই করেছিল। এমনকি যখন মহাজন বিরোধী আইন প্রণয়নের সমর্থন করেছিল, তখনও লীগ যে সমস্ত ভূস্বামী মহাজনে পরিণত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কৃষকের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করেছিল। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে ; মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার নামে যে দাবীগুলি করত, ১৯৩৭ পর্যন্ত তার একটিও মুসলিম দরিদ্র-দের সম্পর্কিত ছিল না।

সাধারণভাবে, সাম্প্রদায়িক নেতারা উচ্চশ্রেণীদের রক্ষণশীল ভাবনার দিকে তাকাতেন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করতেন।

জিন্না বারংবার উচ্চশ্রেণীদের ভয় দেখাতেন এই ভবিষ্যৎ বাণী করে, যে কংগ্রেসের নীতি "শ্রেণীগত তিক্ততার" দিকে নিয়ে যাবে। তিনি সতর্ক করে দেন যে "ক্ষুধা ও দারিদ্র সম্পর্কে এত কথা বলার উদ্দেশ্য জনগণকে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী ধারণার দিকে নিয়ে যাওয়া।" তিনি নেহরুকে "লাল কলম" ব্যবহার করার দায়ে অভিযুক্ত করেন।[১০] হিন্দু মহাসভাও "শ্রেণীযুদ্ধের"ধারণার বিরুদ্ধে "সমাজের" কম বড় রক্ষক ছিল না।[১১]

অবশ্যই, ১৯৪৪-এর পর লীগের বহু নেতাই উত্তেজক বুলি হিসাবে র‍্যাডিকাল কথাবার্তা ব্যবহারে রাজী ছিলেন। কিন্তু তা করা হয়েছিল লীগের ভূস্বামী ভিত্তি, এবং সাংগঠনিকভাবেও ভূস্বামী আধিপত্য সুনিশ্চিত করার পর, যার ফলে তখন আর ভূস্বামীদের ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনো বিপদ ছিল না।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কায়েমী স্বার্থের এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষত কৃষিক্ষেত্রের কাঠামোর রক্ষা কীভাবে করত তার অন্ত দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, তার ফলে অনেক সময়ে হিন্দু, শিখ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা দেখা যেত। দ্বিতীয়ত, তা তাদের রাজনীতি এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থ ও নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গমস্থল সৃষ্টি করে দিত।

[চার]

সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ছাড়াও, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ছিল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল, যদিও, অবশ্যই, রাজনৈতিক ও রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া ভারতে যে রূপ গ্রহণ করেছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল কেবল তার অন্যতম।[১২]

হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উভয়েই এমন রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে যা ছিল মূলগতভাবে গণতন্ত্র ও সামাজিক সমতা বিরোধী। এ বিষয়ে একটি মৌলিক ধারণা ছিল যে গণতন্ত্র এবং সামাজিক সমতা হল পাশ্চাত্যের ধারণা, যা ভারতীয় সামাজিক কাঠামো এবং যুগ যুগ ধরে বিকশিত ভারতীয় জনগণের ঐতিহ্যের সঙ্গে বেমানান।

সামাজিক সমতা প্রসঙ্গে এই যুক্তিকে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করেছিলেন সৈয়দ আহমদ খান ও অন্যান্যরা, যতদিন না গণ সমাবেশের রাজনীতি সৃষ্ট হল এবং এই যুক্তিকে গোপনীয়তার পথ নিতে বাধ্য করল। সাম্প্রদায়িক এবং অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্ত করে সৈয়দ আহমদ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে আইন প্রণয়নকারী কাউন্সিলগুলিতে প্রতিনিধিত্বের জাতীয়তাবাদী দাবীর বিরুদ্ধে বিতর্ক করেন। তিনি অনুরোধ করেছিলেন উচ্চ শ্রেণীগুলির সদস্যদের সামাজিক অব-

স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মনোনয়নের পদ্ধতির জন্য। এইভাবে, ১৮৮৭-র শেষে তিনি বলেছিলেন :

"ভাইসরয়ের কাউন্সিলের পক্ষে এটা খুবই প্রয়োজনীয়, যে তার সদস্যরা যেন উচ্চ সামাজিক অবস্থানের ব্যক্তি হয়। আমি আপনাদের প্রশ্ন করি—আমাদের অভিজাতদের কি ভাল লাগবে, যে নিচু জাতের বা তুচ্ছ উৎপত্তি এমন কোনো ব্যক্তি, সে বি.এ. বা এম.এ. পাশ হলেও, এবং তার প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকলেও, তাঁদের উপরে কর্তৃত্বের অবস্থানে থাকবে এবং তাঁদের জীবন ও সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন আইন প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন হবে ? কখনোই না ! কারোরই তা ভাল লাগবে না। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে একটি আসন হল বিরাট সম্মান ও প্রতিপত্তির স্থান। শুভ জন্ম যার, এমন একজন মানুষ ছাড়া আর কাউকে ভাইসরয় তাঁর সহকর্মীরূপে গ্রহণ করতে, ভ্রাতারূপে ব্যবহার করতে, এবং ডিউক ও আর্লদের সঙ্গে একত্রে ভোজন করতে হতে পারে এমন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করতে পারেন না।"[১৩]

তিনি যখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চতর সরকারী কৃত্যকে প্রবেশের বিরুদ্ধে তর্ক করেন, তখন সাম্প্রদায়িক ও বাঙালী-বিরোধী প্রাদেশিক অনুভূতির প্রতি আবেদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল ঐ একই সামাজিক উন্নাসিকতা। তিনি দাবী করেন : "ভাল পরিবারের মানুষ কখনোই নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদের, যাদের সাধারণ উৎপত্তিসম্পর্কে তাঁরা ভালভাবে অবহিত, তাদের কাছে নিজেদের জীবন ও সম্পত্তি দিয়ে আস্থা রাখতে চাইবেন না।" তা ছাড়াও দেশ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য তৈরী ছিল না :

"এখন, আমি জানতে চাই, মুসলিমরা কি উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার প্রসঙ্গে—যা উচ্চতর পদে নিয়োগের জন্য আবশ্যক—এমন অবস্থানে উপনীত হয়েছে, যা তাদের হিন্দুদের সমস্তরে রাখে, না তা হয় নি ? অতি অবশ্যই না। এবার, আমি আমাদের প্রদেশের মুসলিম ও হিন্দু, উভয়কে একত্রে নিয়ে, তাদের প্রশ্ন করি, তারা কি বাঙালীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে, না পারবে না ? অতি অবশ্যই না···। একবার ভেবে দেখুন, ফলাফল কি হবে যদি সমস্ত নিয়োগ করা হত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। সমস্ত জাতির উপর, কেবল মুসলিমদের উপর নয়, বরং উচ্চ মর্যাদাশালী রাজাদের এবং যে বীরত্বব্যঞ্জক রাজপুতরা যারা পূর্বপুরুষের তরবারির কথা ভোলেন নি তাঁদেরও শাসনকর্তা হিসাবে রাখা হবে, এক বাঙালীকে, যে একটা রান্নার কাজের জন্য ছুরি দেখলেও হামাগুড়ি দেবে চেয়ারের নীচে··। সুতরাং যদি আপনারা কেউ—সম্রান্ত ঘরের মানুষরা ; ধনী ব্যক্তিরা, মধ্যশ্রেণীর মানুষরা, অভিজাত পরিবারের মানুষ যাঁদের ঈশ্বর দিয়ে-

ছেন মর্যাদাবোধের অনুভূতি—আপনারা যদি স্বীকার করে নেন যে দেশ গোছাতে থাকবে বাঙালী শাসনের জোয়াল পরে, এবং দেশের জনগণ বাঙালীদের জুতো চাটবে, তবে, ঈশ্বরের নামে, তিনি লাফ দিয়ে ট্রেনে চেপে বসে পড়ুন, এবং মাদ্রাজ চলে যান… ।"[১৪]

ইম্পিরীয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচনের প্রশ্নে ফিরে এসে সৈয়দ আহমদ বলেন :

"সাধারণভাবে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে একজনও মুসলমান আসন দখল করতে পারবেন না। গোটা কাউন্সিল জুড়ে থাকবে শুধু বাবু অমুক চন্দ্র চক্করবর্ত্তি। আবার, আমাদের প্রদেশের হিন্দুদের জন্য কি ফল হবে, যদিও তাদের পরিস্থিতি মুসলিমদের চেয়ে উন্নত ? কি ফলাফল হবে সেই সব রাজপুতদের জন্য, যাদের পূর্বপুরুষদের তরবারি আজও রক্তে ভেজা ?"[১৫]

যে মুসলিমরা জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন, সৈয়দ আহমদ খান, মুহম্মদ শফী ও অন্যান্যরা তাঁদের সমালোচনা করেছিলেন বিত্তহীন এবং নিম্নতর বা দরিদ্রতর শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলে। অন্যদিকে, "রাইসরা", যাঁরা "জাতির নেতৃবর্গ বলে পরিগণিত", তাঁরা কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন।[১৬]

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সাম্প্রদায়িক যুক্তি ছিল যে তা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের দিকে যাবে, কার্যত যার অর্থ হবে সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ "সম্প্রদায়ের" আধিপত্য। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই যুক্তি উত্থাপন করত সর্বভারতীয় স্তরে, চিরকালীন সংখ্যালঘু স্তরে থাকা মুসলিমদের উপর হিন্দুদের কার্যকর ক্ষমতা ও স্থায়ী আধিপত্য রোধ করার নামে। আর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রায় হুবহু একই কথা বলত সেই সব প্রদেশে, যেখানে মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আবারও, এই যুক্তির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন সৈয়দ আহমদ খান, যদিও এই ক্ষেত্রে তাকে অন্তিম স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তী সাম্প্রদায়িক নেতারা। সৈয়দ আহমদ শুরু করেছিলেন এই মৌলিক সাম্প্রদায়িক অনুমান থেকে, যে হিন্দুরা ও মুসলিমরা ভিন্ন ধর্মের অনুগামী হওয়ায় তাদের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ছিল, সুতরাং, তারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে গঠিত ছিল (কোয়াম, যা জাতি বা নেশন হিসাবেও অনূদিত হয়)। এই প্রারম্ভিক অনুমান থেকে তিনি ১৮৮৩ সালে প্রথম যুক্তি দেখান, ইম্পিরীয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিল প্রসঙ্গে ভাষণ প্রদানক্রমে, যে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্বায়ত্বশাসনের নীতি, যার অর্থ "সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বদান", তা ভালভাবে খাটাতে পারে ইংল্যাণ্ডে যেখানে "সামাজিক-রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে ইংল্যাণ্ডের সমগ্র জনসমষ্টি কেবল একটিমাত্র সম্প্রদায় গঠন করে"; কিন্তু তা আদৌ কার্যকর হতে পারে না ভারতে, "যেখানে আজও জাতের প্রভেদ বহাল

ভবিষ্যতে রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন জাতির মিলন হয় নি, যেখানে ধর্মীয় প্রভেদ আজও হিংস্র…"। এখানে "বৃহত্তর সম্প্রদায় ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায়ের স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করবে"।[১৭] তিনি আবার ১৮৮৭-তে, জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারাভিযান কালে, ভারতে গণতন্ত্রের অনুপযোগিতার প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন। তিনি আবার এই মৌলিক সাম্প্রদায়িক অনুমান করেন যে একটি নির্বাচনে "সমস্ত মুসলিম নির্বাচকরা একজন মুসলিম সদস্যের পক্ষে ভোট দেবেন এবং হিন্দু নির্বাচকরা দেবেন একজন হিন্দু সদস্যকে।" তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মুসলিম সদস্যদের চারগুণ হিন্দু সদস্য থাকবেন। আরও ধরে নিয়ে, যে হিন্দু সদস্যরা কেবলমাত্র "হিন্দু" স্বার্থ দেখবেন এবং তাঁদের ক্ষমতা ব্যবহার করবেন অহিন্দুদের উপর আধিপত্যের জন্য, তিনি শেষ করেন: "আর মুসলমান কীভাবে তার স্বার্থ রক্ষা করবে? এ যেন হবে একটা পাশা খেলার মত, যেখানে একজনের হাতে ছিল চারটে আর অন্যজনের হাতে একটামাত্র পাশা।"[১৮] ১৮৮৮-তে এই যুক্তির পুনরাবৃত্তি করে তিনি বলেন, যে কোনো নির্বাচনী ব্যবস্থা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করবে "বাঙালীদের, বা বাঙালী ধরণের হিন্দুদের" হাতে। তার পরিণতি হবে মুসলিমদের "চরমতম অবমাননাকর এক পরিস্থিতিতে" পড়া, এবং হিন্দুরা তাদের উপর "দাসত্বের বলয়" চাপিয়ে দেওয়া।[১৯] ১৯০৬ থেকে এই যুক্তি ছিল সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও রাজনীতির অন্যতম প্রধান অংশ। যথা, ১৯০৬-এ মিন্টোর কাছে আগা-খাঁর নেতৃত্বাধীন ডেপুটেশনের মেমোর্যাণ্ডাম জোর দিয়েছিল গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানদের ভারতীয় সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই করে নেওয়ার উপর, কারণ অন্যথায় সেগুলি গ্রহণ করার সম্ভাব্য ফল হত মুসলিমদের স্বার্থ "সহানুভূতিবিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠের দয়ায়" ফেলে রাখা।[২০]

এই অবস্থানের যুক্তি অপ্রতিরোধ্যভাবে নিয়ে যেতে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও দেশভাগের দিকে, কারণ স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র যদি স্থায়ী হিন্দু আধিপত্য ও মুসলিমদের সঙ্গে চিরন্তন "দুর্ব্যবহার" ঘটাবার দিকে যেত, তবে একমাত্র পরিণতি যা ঘটতে পারত তা হল ব্রিটিশ শক্তির উপর নির্ভরতা এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য তাকে চিরস্থায়ী করা, অথবা দুটি ধর্মভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র গঠন।[২১] শতাব্দীর গোড়ায় দ্বিতীয়টি অসম্ভব হওয়ায় তখনকার মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ব্রিটিশ শাসনকে শ্রেয় মনে করত ও সমর্থন করত। যখন ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ফলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অনিবার্য হয়ে পড়ল, তখন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা পাকিস্তানের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

১৯৩৭-এর পর এম. এ. জিন্না পৌনঃপুনিকভাবে, দীর্ঘ সময় ধরে, এবং তাঁর প্রায় সব প্রধান বক্তৃতায় সৈয়দ আহমদ খানের যুক্তিকে তুলে ধরেছিলেন এবং

আরো সম্প্রসারিত করেছিলেন। বস্তুত, তা তাঁর বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও প্রচারের ভিত্তিপ্রস্তরে পরিণত হয়। যারা, ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারীতে তিনি আলিগড়ে বলেন: ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্র ভারতে মানানসই ছিল না কারণ দুটি দেশের রাজনীতিতে মৌলিক প্রভেদ ছিল। ভারতে "আমাদের আছে একটি চিরস্থায়ী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা, এবং বাকিরা হল সংখ্যালঘু, যারা দৃশ্যমান ভবিষ্যৎ-কালে কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হওয়ার আশা রাখতে পারে না।" সংখ্যা-লঘুদের জন্য রক্ষাকবচ সমৃদ্ধ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র এই সমস্যার উত্তর নয়, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা, তারা সাম্প্রদায়িক আচরণ করতে বাধ্য। সংখ্যালঘুদের একমাত্র উত্তর হল "ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট অংশ" দাবী করা, অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব-কারী সরকারের ব্যবস্থার বাইরে ঐ দাবী করা।[২২] ১৯৩৯-এর নভেম্বরে, "ভারতে গণতন্ত্রের প্রশ্ন" বিষয়ক এক বিবৃতিতে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন: "গণতন্ত্রের অর্থ হতে পারে কেবল গোটা ভারত জুড়ে হিন্দু রাজ।" এমনকি বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোও "সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক শাসনের আধিপত্য ও সর্বোচ্চতা" কায়েম হতে দিয়েছিল। তিনি বিতর্কের এলাকা ব্যাপকতর করেছিলেন চিরাচরিত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে এর অন্তর্ভুক্ত করে: "সাড়ে তিন কোটি ভোটদাতাদের, যাদের ব্যাপক অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত, যারা বহু শতাব্দীর পুরোনো, নিকৃষ্টতম ধরণের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনযাপন করে, যারা একে অপরের প্রতি সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে আগাগোড়া শত্রুভাবাপন্ন, তাদের কথা মাথায় রাখলে এই সংবিধান যেভাবে কাজ করেছে তা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে ভারতে একটি গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকার চালু রাখা অসম্ভব।"[২৩] ১৯৪০-এর মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংক্রান্ত যুক্তি রূপান্তরিত হয়েছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বে। তিনি দাবী করেন যে "পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ভারতের জন্য সম্পূর্ণভাবে অনুপযুক্ত এবং ভারতে তা চাপিয়ে দেওয়া হল রাষ্ট্রজীবনে রোগ বিশেষ"। অতঃপর তিনি বলেন: "সুতরাং, যদি একথা স্বীকার করা হয় যে ভারতে একটি সংখ্যাগুরু ও একটি সংখ্যালঘু জাতি রয়েছে, তবে এ কথা বেরিয়ে আসে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতির ভিত্তিতে সৃষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থার অনিবার্য অর্থ হবে সংখ্যাগুরু জাতির শাসন।" কংগ্রেস, "মূলতঃ একটি হিন্দু সংস্থা", এই কারণেই গোড়া থেকেই ভারতের জন্য "একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সরকার" আদায় করতে তার সমগ্র প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।[২৪] ১৯৪০-এ ও তারপর জিন্না এই সমস্ত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদী পথ ধরে যুক্তির বিকাশ ঘটালেন। তিনি বারংবার দাবী করলেন যে গণতন্ত্রের অর্থ জাতীয় ইচ্ছার অভিব্যক্তি। যেখানে দুটি জাতি আছে যাদের মধ্যে কোনোরকম একতা নেই সেখানে গণতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব নয়। একমাত্র উত্তর হল দেশভাগ ও পাকিস্তান।[২৫]

হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলিম সাম্প্রদায়িক যুক্তির পুনরাবৃত্তি করতেন, মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন সব প্রদেশ এবং এলাকার সম্পর্কে। আইনসভায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার অর্থ হবে মুসলিম আধিপত্য এবং হিন্দুদের চিরন্তন হীনতর অবস্থা, এই দাবী করে তাঁরা মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলিতে আইন সভায় মুসলিম প্রতিনিধিত্ব হ্রাসের যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করতেন। তাঁরা স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে সিন্ধু প্রদেশ সৃষ্টি করার বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তা সেখানকার হিন্দুদের একটি ছোট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করত এবং এর ফলে তারা তাদের "ক্ষমতা" "হারাত"। সর্বভারতীয় স্তরে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাজের নকল করে পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হিন্দু (এবং শিখ) সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই তত্ত্ব খাড়া করেছিল যে সরল গণতন্ত্র সংখ্যালঘুদের প্রতি বিপজ্জনক এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করার জন্য ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের উপর অধিকতর নির্ভরতা প্রদর্শন করা যেতে পারে। ফলতঃ, তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের বিরোধিতা করেছিল। সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উভয় ক্ষেত্রেই তারা সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচের নামে গভর্নরদের সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকে সমর্থন করেছিল। তারা অবশ্য সারা দেশের জন্য যুগ্ম নির্বাচকমণ্ডলী ও গণতন্ত্রের দাবী সমর্থন করেছিল। তবে তার কারণ ছিল, তাদের সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস, যে গণতন্ত্র হিন্দু আধিপত্যের দিকে যাবে। কিছুটা পুনরাবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও বলা যায় যে এই যুক্তির মূলে ছিল দুটি মৌলিক সাম্প্রদায়িক অনুমান: (১) হিন্দু ও মুসলিমদের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল; এবং (২) হিন্দুরা (বা মুসলিমরা) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সব সময়ে একত্রে একটি সুদৃঢ় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করবে—আইন সভার সমস্ত হিন্দু (বা মুসলিম) সদস্যরা রাজনৈতিক, সামাজিক, মতাদর্শগত বা কর্মসূচীগত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একটি সুদৃঢ় সংসদীয় জোটরূপে কাজ করবেন—এবং, তাঁরা হিন্দ (বা মুসলিম) হওয়াই হবে তাঁদের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র।

১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উভয়েই সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ভোটাধিকার সম্প্রসারণের বিরোধিতা করেছিলেন, অংশত এই কারণে, যে তা হলে ব্যাপক জনগণ উৎসাহিত হতেন এমন প্রসঙ্গ সামনে আসত। নাগরিক অধিকারের সম্পর্কেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দ্ব্যর্থক। যে সময়ে নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এক্যপ্রচিত্তে বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রামে রত ছিলেন, তখন সৈয়দ আহমদ খান প্রকাশ্যেই লিটনের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আক্রমণকে সমর্থন করেছিলেন। পরবর্তী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এ বিষয়ে অনেক বেথেঢেকে কাজ

করতেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য, তাঁরা নাগরিক অধিকারের জন্য কোনো প্রচারাভিযান চালান নি, এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐ অধিকার সমূহের পৌনঃপুনিক সংক্ষিপ্তকরণের বিরুদ্ধে কোনো খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হন নি। অধিকাংশ সময়ে, তাঁরা ঐ সংক্ষিপ্তকরণের পর্ব ব্যবহার করতেন ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দরদাম করার জন্য।

সাম্প্রদায়িক দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের গণতন্ত্র বিরোধী চরিত্রের আরও বহিঃপ্রকাশ ঘটত দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি তাঁদের সমর্থনে। হিন্দু মহাসভার ১৯৪০-এর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ভি. ডি. সাভারকর হিন্দু রাজন্যবর্গের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন ও ঘোষণা করেন যে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, "যে তাঁদের কর্তব্য কেবল হিন্দু আন্দোলনের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ নয়, তার নেতৃত্ব দেওয়ার দাবী করছিলেন", এবং "তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত স্বার্থ বাস্তবে সমগ্র-হিন্দু আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত"। যদি হিন্দু রাজন্যবর্গ "হিন্দু আন্দোলনের নেতৃত্ব'' দিতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, তবে তার জন্য দোষ সম্পূর্ণ তাঁদের নয়। "কংগ্রেস হিন্দুরা'' কেবল তাঁদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনেই ব্যর্থ হয় নি, উপরন্তু তারা "হিন্দু রাজ্যগুলিকে অবজ্ঞার সঙ্গে দেখেছিল ভারতের প্রগতির পথে একটি বাধা হিসাবে, যাকে যত দ্রুত অপসারণ করা হবে ততই জাতির পক্ষে ভাল হবে।'' সাভারকর হিন্দুদের আহ্বান করেন মুসলিমদের উদাহরণ অনুসরণ করতে (অর্থাৎ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের) যাঁরা "ভারতের সামান্য কয়েকটি মুসলিম রাজ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন'' এবং যাঁরা "সেগুলিকে দেখতেন মুসলিম শক্তির সংগঠিত কেন্দ্ররূপে, এবং তাদের নিজাম ও নবাবদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টাও করতেন।''[২৬]

অনুরূপভাবে, ভাই পরমানন্দ ১৯৩৮ সালে দাবী করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি স্থির করা উচিত রাজন্যবর্গের। তিনি আরও বলেন: "রাজন্যবর্গ আমাদের আপনজন এবং আমাদের রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ।''[২৭] হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা নেপালকেও একটি হিন্দু রাষ্ট্ররূপে আপন করে নেয়, যার শাসকের ভবিতব্য ছিল হিন্দুদের নেতা ও ত্রাতা—"আশা" —হওয়ার "মহান ও মহিমান্বিত অদৃষ্ট" পূরণ করা, "হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের রক্ষাকর্তা" এবং "হিন্দু শক্তির অধিনায়ক'' হওয়ার কর্তব্য পালন করা।[২৮]

এ বিষয়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা পিছিয়ে ছিলেন না। এমন কি এম. এ. জিন্না "যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রে, রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে এই দাবীর বিরুদ্ধে মুসলিম দেশীয় শাসকদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলেছিলেন।"[২৯] বি. শিব রাও তাঁর রচনায় ধরে রেখেছেন, রাজন্যবর্গ, যার মধ্যে ছিলেন হিন্দু রাজারাও, কীভাবে ১৯৩০-এর দশকের শেষ

দিকে মুসলিম লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন, যার কারণ ছিল তাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সমর্থিত গণ-আন্দোলনগুলি।

চেম্বার অফ প্রিন্সেস-এর চ্যান্সেলার নবনগরের জামসাহেব যেমন যুক্তরাজ্যের নির্বাচনের জন্য মুসলিম লীগ ও চেম্বারের মধ্যে মৈত্রী প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে বলেন: "আমি কেন লীগকে সমর্থন করব না? শ্রী জিন্না আমাদের অস্তিত্ব সহ্য করতে রাজি, কিন্তু শ্রী নেহরু রাজন্যবর্গের অবলুপ্তি চান।"৩০ দেখার মত বিষয় হল যে পাকিস্তান সংক্রান্ত সব কটি পরিকল্পনাকেই দেশীয় রাজন্য-শাসিত রাজ্যগুলি যেমন ছিল তেমন রেখে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

রাজন্যবর্গকে সমর্থন করার অন্যতম পন্থা ও অজুহাত ছিল, কংগ্রেস কেবল-মাত্র একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, এই অভিযোগ করা। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কংগ্রেসকে কেবল কাশ্মীর ও রাজকোটের মত "হিন্দু" রাজ্যদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার এবং "মুসলিম" রাজাদের বাদ রাখার ও হায়দ্রাবাদ এবং ভূপালের মত "মুসলিম" রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য গণ-আন্দোলনকে সমর্থন করতে অস্বীকার করার দায়ে অভিযুক্ত করে।৩১ অন্যদিকে, মুসলিম লীগ অভিযোগ করে যে কংগ্রেস কেবল নিজাম ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে আক্রমণ করত এবং কাশ্মীর, যার শাসক ছিলেন হিন্দু, তার ঘটনাবলী সম্পর্কে নীরব থাকত।৩২

সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও দলগুলির গণতন্ত্র-বিরোধী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক লক্ষ্যণীয় দিক ছিল ভি. ডি. সাভারকার, এম. এ. জিন্না এবং এম. এস. গোল-ওয়ালকারকে যথাক্রমে হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কর্তৃক তাদের স্থায়ী সভাপতি বা প্রধান পদে গ্রহণ করা। এই সংগঠনগুলি কম-বেশী সমসাময়িক "নেতা" বা ফুরার নীতি অনুযায়ী কাজ করত।

[পাঁচ]

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিহিত ছিল, সর্বাগ্রে, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দল-গুলির ঔপনিবেশিকতাপন্থী ভূমিকাতে। ভারতীয় সমাজের তৎকালীন প্রধান দ্বন্দ্বের, অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরি-প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অনেক সময়ে মৌলিকভাবে ঔপনিবেশিকতাপন্থী ও রাজানুগত অবস্থান গ্রহণ করেন ও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কোনো অবস্থাতেই তাঁরা সক্রিয় ঔপনিবেশি-কতা বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেন নি। সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় তাঁরা ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, সবচেয়ে ভাল অবস্থায় তার

সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে যান। এই অধ্যায়ের প্রথমেই যেমন দেখানো হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল সেই যান, যার মাধ্যমে পেটি বুর্জোয়া রাজনীতিকে ঔপনিবেশিকতাবাদের আজ্ঞা পালনের জন্য হাজির করা হয়েছিল।

(১) নেতিবাচকভাবে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, জাতীয়তাবাদীদের এমন কি সবচেয়ে নরমপন্থী পর্বেরও বিপরীতে (১৮৮০-১৯০৫-এ) ঔপনিবেশিকতাবাদের কোনো সমালোচনা বা বিশ্লেষণ করেন নি।[৩৩] সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা অবশ্য সময়ে সময়ে ব্রিটিশ শাসকদের সমালোচনা করতেন, তবে তাঁরা কোনো পর্যায়েই ব্রিটিশ শাসনের একটি মৌলিক ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী বিশ্লেষণ করেন নি বা এমন কোনো দাবী তোলেন নি যা মূলগতভাবে ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে দুর্বল করবে।

একইভাবে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এমন কি তাঁদের নিজস্ব ধারণা অনুযায়ীও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য কোনো আন্দোলন বা সংগ্রাম সংগঠিত করেন নি। ১৯৩০-এর দশকে দেশ যখন ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক চেতনা লাভ করল, যখন দেশে এক সাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আবহাওয়া দেখা দিল, বিশেষত যখন তা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখা দিল, এবং যখন একথা স্পষ্ট বোঝা গেল যে ব্রিটিশ শাসনের দিন হাতে গোনা যাচ্ছে, তখন সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য হলেন। এমন কি এ কাজও তাঁরা করলেন অতীব দুর্বলভাবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধাচরণের কোনো চেষ্টা করেন নি, তার অবসানের জন্য কোনো পদক্ষেপতো অবশ্যই গ্রহণ করেন নি। তাঁরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোনো গণ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংগঠিতও করেন নি, বা তেমন কোনো সংগ্রামে অংশগ্রহণও করেন নি। বস্তুত, তাঁরা তাঁদের নিজেদের সাম্প্রদায়িক দাবীদাওয়ার জন্যও তা করেন নি।[৩৪] তাঁরা সর্বদাই রাজনৈতিক পরজীবীর মত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিদের রাজনৈতিক কাজ ও সংগ্রামের ফল ভোগ করতেন। যখন, খুব বিরল ক্ষেত্রে, গণ সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল, তখন তা হয়েছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নয়, জাতীয়তাবাদীদের অথবা অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে। যথা, ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের প্রথম গণ সংগ্রাম, "উদ্ধার দিবস", পরিচালিত হয়েছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রধান "গণ সংগ্রাম" সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেহারা নিয়েছিল, বিশেষত ১৯৪৬-৪৭-এ। এবং এই দাঙ্গা পরিচালিত হয়েছিল অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে। অনুরূপভাবে, আর.এস.এস. যুদ্ধের সময়ে সন্তর্পণে তার শক্তি ও জঙ্গীভাব "অক্ষুণ্ণ" রেখেছিল, যাতে পরে তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়।

১৯৩০-এর এবং ১৯৪০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ধরে নিয়েছিল যে ইংরেজরা ভারতীয়দের রাজনৈতিক ছাড় দেবে, হয়ত শেষ পর্যন্ত ভারত ত্যাগ করে চলেও যাবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলি এই প্রক্রিয়ায় কোনো

অবদান রাখে নি। এমন কি, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সৃষ্টিও মুসলিম লীগ কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ফসল নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদী শক্তিদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট গৌণ ফসল মাত্র। "জিন্না যে দরজার মধ্য দিয়ে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন, তা ঠেলে খুলে দিয়েছিল অন্যরা।" সাধারণভাবে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতিবিদ্ ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকে কিছু আদায়ের জন্য লড়াইয়ের বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন না, তাঁর প্রাথমিক চিন্তা ছিল, জাতীয়তাবাদীরা সংগ্রামের মাধ্যমে যা ছাড় আদায় করতে পেরেছিলেন, তা থেকে কতটা আদায় করা যায়। জাতীয়তাবাদীরা কবে, এবং কীভাবে ঐ ছাড় আদায় করেছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর কোনো চিন্তা ছিল না। চিরকাল অপেক্ষা করার ধৈর্য—এবং রাজনীতি —তাঁর ছিল।[৩৫]

এই কারণে, একথা উল্লেখ করা জরুরী, যে সাম্প্রতিক কিছু কিছু লেখকের দাবী অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা বা হিন্দু জাতীয়তাবাদ, মুসলিম জাতীয়তাবাদ, ইত্যাদি রূপে দেখা যায় না। ইন্দোনেশিয়া, ইরান, বা কোনো কোনো আরব দেশের মত সাম্প্রদায়িকতাবাদ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধি ছিল না। এই সব দেশে রাজনৈতিক সংগ্রাম তার সংজ্ঞা লাভ করেছিল ধর্মীয় পরিভাষায় কিন্তু তা পরিচালিত ছিল ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে। ভারতে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ রাজনীতির সংজ্ঞা দিয়েছিল ধর্মীয় পরিভাষায়, কিন্তু তাদের রাজনীতি পরিচালিত ছিল অন্য ভারতীয়দের বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে নয়। তাদের সংগ্রাম ছিল অন্য 'সম্প্রদায়ের' বিরুদ্ধে। তারা যে পরিত্রাণ চেয়েছিল তা ছিল অন্য ধর্মের অনুগামীদের হাত থেকে। তারা যে শোষণকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করেছিল তাও ছিল ঐ অন্য ধর্মের অনুগামীগণ কৃত। এমন কি চাকরীর জন্য লড়াই, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রক্ষাকবচ এবং আইনসভায় আসন সংরক্ষণের জন্য লড়াইও পরিচালিত ছিল বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে নয়, বরং অন্য ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। তাদের দাবীগুলি পেশ করা হয়েছিল জাতীয়তাবাদীদের কাছে, এবং তাদের রাজনীতির ধার ছিল জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, তারা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দিকে সাধারণভাবে ফিরত সমর্থন ও আনুকূল্যের আশায়, এবং তার সঙ্গে সহযোগিতা করত। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদের পর্যায়ে পড়ে না। জাতীয়তাবাদ, যত রক্ষণশীলভাবেই হোক না কেন, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসনাধীন জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ তুলত। সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল রাজানুগত্যের পর্যায়ভুক্ত কারণ তা উপনিবেশের জনগণকে বিভক্ত করত, জাতীয় ঐক্যের বিকাশে বাধা দিত, এবং ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ফাটল ধরাত, ও এইভাবে, বিষয়গত দিক থেকে, ঔপনিবেশি-

কতাবাদের স্বার্থে কাজ করত এবং তাদের দিত উপনিবেশগুলি আঁকড়ে থাকার জন্য একমাত্র যুক্তি, অর্থাৎ, "বিবদমান সম্প্রদায়গুলির" মধ্যে শান্তি রক্ষা করার অজুহাত।

(২) জওহরলাল নেহরু যেমন বলেছিলেন, "তার [সাম্প্রদায়িকতাবাদের] প্রকৃত চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা হল জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ;"৩৬ অর্থাৎ, ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট, প্রকৃত বিদেশী আধিপত্য বিরোধী সংগ্রাম তখন চলছিল, তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সম্পর্ক। এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই, যে এই সম্পর্ক ছিল অতীব নেতিবাচক, যা গোখেল ১৯০৯ সালেই দেখেছিলেন, পাঞ্জাবে হিন্দু সভা গঠনের উল্লেখ করে তিনি ওয়েডেরবার্ণকে লেখেন : "এই আন্দোলন খোলাখুলি মুসলমান-বিরোধী, যেমন মুসলিম লীগ খোলাখুলি হিন্দু-বিরোধী, এবং উভয়েই জাতীয়তাবাদ-বিরোধী।"৩৭

এমন কি, তারা যখন চলমান জাতীয় সংগ্রামের রাজনৈতিক ফলাফলে লাভবান, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তখনো, বিশেষত ১৯৩৪-এর পর, ঐ আন্দোলনে কোনো ভূমিকা পালন করে নি। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা ছাড়াও, তারা অনেক সময়ে প্রকৃত ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলন ও তার নেতৃস্থানীয় সংগঠন, জাতীয় কংগ্রেসের, বিরোধিতা করেছিল। এই কথা বিশেষভাবে সঠিক যে, ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচার করেছিল এবং কংগ্রেসকে তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যে পরিণত করেছিল। তাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদের স্বীয় মোড়কের উপর নির্ভর করে তারা কংগ্রেসকে নিন্দা করেছিল হিন্দুপ্রেমী বা মুসলিমপ্রেমী বলে যার রাজনৈতিক লক্ষ্য নাকি ছিল মুসলিমদের দমন করে রাখা বা হিন্দুদের বলি দেওয়া। কংগ্রেসের উপর এই আক্রমণ ও তার ফলে ব্রিটিশ-বিরোধী অনুভূতিকে দুর্বল করা—বিশেষত তরুণদের মধ্যে—এবং তাদের মুসলিম-বিরোধী বা হিন্দু-বিরোধী খাতে প্রবাহিত করা ছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদের পক্ষ থেকে ঔপনিবেশিকতাবাদের জন্য এক প্রধান সেবামূলক কাজ করে দেওয়া।

(৩) বহুক্ষেত্রে, বিশেষত ১৯৩৭-এর আগে সাম্প্রদায়িক দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরা বিদেশী শাসকদের সক্রিয় সমর্থন ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল।

(৪) একটি প্রধান ক্ষেত্রে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ঔপনিবেশিকতাবাদের সেবা করত নিছক তার অস্তিত্বের মাধ্যমে। একবার ভারতে জাতীয় আন্দোলন ও ব্রিটেনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর, যা হয়েছিল ১৯১৮-র মধ্যে, এবং বিশেষভাবে ১৯৩৭-এর পর, ব্রিটিশ শাসকদের ভারতীয় জনগণ ও ব্রিটিশ জনগণ উভয়েরই কাছে ভারতে তাদের শাসন কায়েম রাখার ন্যায্যতা দেখাতে হত। হয়ত তাদের নিজেদের কাছেও তা দেখাতে হত। কারণ, তা ভারতীয় ও ব্রিটিশ মনের উপর তাদের আধিপত্যের জন্য তা আবশ্যক ছিল।

পূর্বতন ঔপনিবেশিক মতাদর্শ, ছিল যে ভারত একটি রাষ্ট্র নয়, তার জনগণ নিজেদের শাসন করতে অক্ষম, এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের সভ্য করার ও বিকাশ ঘটানোর কর্তব্য রয়েছে, তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মধ্যে তার শক্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। অতঃপর, ঔপনিবেশিকতার তাত্ত্বিকরা ক্রমবর্ধমান হারে বিদেশী শাসনকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবী করে এই যুক্তিতে যে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য একজন সৎ "আম্পায়ার" বা একটি তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন। নচেৎ তারা পরস্পরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। বিশেষত দরকার ছিল সংখ্যাগুরু 'সম্প্রদায়ের' আধিপত্য ও শোষণ থেকে সংখ্যালঘু 'সম্প্রদায়গুলিকে' রক্ষা করার। এইভাবে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কীর্তিকলাপ ক্রমেই ঔপনিবেশিকতাবাদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রতিরক্ষার প্রধান, ও শেষ পর্যন্ত একমাত্র উপাদানে পরিণত হল। উপরন্তু, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এ বিষয়ে সরকারী মতাদর্শকে গ্রহণ এবং তাকে শক্ত করা, দুই-ই করেছিল।

(৫) সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক ভিত্তি ও তার মৌলিক মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক অবস্থান থেকেও ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রতি প্রকাশ্য বা সংগোপন সমর্থন ঘটেছিল। ভূস্বামী ও অন্যান্য জায়গীরদারী উপাদান এবং আমলাদের সুবিধাভোগী সামাজিক অবস্থান সংরক্ষিত হতে পারত কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সমর্থনে। সমাজ পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েও তাকে ভয় পেয়ে তাদের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সমর্থনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ফলে তারা প্রকাশ্যে ভূস্বামী ও আমলারূপেই কাজ করুক আর গোপনে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরূপেই করুক, তাদের রাজনীতি অনিবার্যভাবে আনুগত্যের রাজনীতি ছিল।

অনুরূপভাবে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিবিশেষ ও অংশবিশেষ সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ব্যবহার করত চাকরী, শিক্ষাগত সুযোগসুবিধা, ইত্যাদির জন্য সংগ্রামে তাদের অবস্থা ভাল করার জন্য, এবং এজন্য তাদের সরকারী সহযোগিতা দরকার ছিল। বস্তুত, মনোনয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে চাকরী, কণ্ট্র্যাক্ট, শিক্ষাগত সুযোগসুবিধা, প্রশাসনিক ক্ষমতার অংশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলার ক্ষমতার দরুণ ঔপনিবেশিক প্রশাসন পেটি বুর্জোয়াদের বড় বড় অংশদের ক্রয় করার, অর্থাৎ দলে টানার ও কিনে নেওয়ার প্রভূত ক্ষমতা রাখত। তারা এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে রাজী ছিল বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সহযোগিতা এবং জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করতে রাজী থাকার, এবং বিশেষ আবেগপ্রবণ রাজনীতির এক বিকল্প স্রোতকে উৎসাহ দিয়ে এবং তার উন্নতিসাধন করে তরুণদের জাতীয়তাবাদী পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে রাজী থাকার বিনিময়ে, ঐ গোষ্ঠীদের উন্নততর শর্ত দিয়ে।

স্বল্পমেয়াদী হিসাবে এই সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী ধারায় যোগ

দেওয়ার চেয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে অধিকতর কাম্য শর্ত লাভ করতে পারত। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা দক্ষভাবে কাজ করতে পারত কেবল ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায়, বা অন্তত তারা সহ্য করলে তবেই। কোনো অবস্থাতেই তারা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মূলত সংঘর্ষ বা বৈর সম্পর্কে উপনীত হতে পারত না।

ঔপনিবেশিক সরকারের পক্ষ নেওয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদের মৌলিক মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক অবস্থান এবং রণনীতির যুক্তিতেও নিহিত ছিল। ঐ যুক্তি জোর দিত যে হিন্দু ও মুসলিমদের মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থ ছিল স্বতন্ত্র ও পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ, এমনকি বৈরীতাপূর্ণ, প্রধান শত্রু হল অন্য 'সম্প্রদায়', আধিপত্য ও প্রভুত্বের হুমকি ঔপনিবেশিকতাবাদের কাছ থেকে আসে না, আসে অন্য 'সম্প্রদায়ের' কাছ থেকে, এবং 'সম্প্রদায়ের' রাজনৈতিক সংগঠনের চাহিদাও ওঠে অন্য 'সম্প্রদায়ের' সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ও তার মোকাবিলা করতে, ঔপনিবেশিকতার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। যদি ভারতীয় রাজনীতি হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসকদের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে এবং মূল শত্রু হয়ে থাকত হিন্দু বা মুসলিমরা, তবে এ তো অনিবার্য ছিল যে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাতে চেষ্টা করবে। উপরন্তু, যদি প্রধান বিপদ আসত অন্য 'সম্প্রদায়' থেকে, তবে তৃতীয় পক্ষ, যারা শাসক দলও ছিল বটে, তাদের তো বিপন্ন 'সম্প্রদায়'কে রক্ষা করতে ও ভারসাম্য বজায় রাখতে ভারতে থাকতে হতই। রক্ষাকবচ ও সংরক্ষণের রাজনীতির জন্যও দরকার ছিল এক তৃতীয় পক্ষের হাজিরা, যারা ঐগুলির বাস্তবায়ন ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করত। যদি বা শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত ভবিষ্যতের চিন্তা করা হত, তা হলেও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মনে করত যে তাদের উচিত বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে পক্ষপাতিত্ব প্রার্থনা করা, যাতে স্বাধীন ভারতে ক্ষমতার জন্য শেষ পর্যন্ত যে যুদ্ধ হবে তাতে তাদের 'সম্প্রদায়ের' অবস্থা আরো শক্তিশালী হয়।[৩৮]

এ প্রসঙ্গে মুসলিম সাম্প্রদায়িক অবস্থানকে কে. কে. আজিজ বেশ ভালভাবে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন :

> "তা [অর্থাৎ, একটি অনুগত রাজনৈতিক অবস্থান] ছিল পশ্চাদপদ ও নিঃসহায় একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সবচেয়ে নিরাপদ কর্মপন্থা। হয় তারা হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারত, যা তারা করবে না, অথবা তারা শাসকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে পারত। বর্তমান ও ভবিষ্যত, উভয় শাসকদেরই বিরোধী করে দেওয়া হত এক মূঢ়তা, যার তীব্রতা হ্রাস করা পর্যন্ত হয়নি···। ব্রিটিশরা তাঁদের সঙ্গে যেমন ন্যায্যভাবে ব্যবহার করেছিল বা করছিল, তার প্রশংসা অধিকাংশ মুসলিমরা করেছিলেন। হিন্দুদের ও ব্রিটিশদের মধ্যে

তাঁরা পরবর্তী গোষ্ঠীকেই বেছে নিয়েছিলেন, এবং ভোটের উপর দেখেছিলেন যে এই নীতি ফলপ্রসূ ছিল··। ব্রিটিশরা দেশ শাসন করত এবং তাদের হাতে ছিল ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার। সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলিমরা চেয়েছিলেন সুরক্ষা, এবং ব্রিটিশরাই কেবল তাঁদের তা দিতে পারত"।[৩৯]

বহু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী এই যুক্তিকেই ঘুরিয়ে বলতেন যে হিন্দুদের উচিত সরকারকে তুষ্ট রাখা, যাতে মুসলিমরা রাজানুগত্যের রাজনীতির দরুণ উপকৃত না হয় এবং হিন্দুরা তাদের জাতীয়তাবাদের দরুণ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। অপেক্ষাকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন মানুষ এই যুক্তিকে ভালভাবে গ্রহণ করেন নি। ফলে অধিকাংশ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী এর অন্য এক ঈষৎ ভিন্ন রূপ ব্যবহার করতেন। যেহেতু হিন্দুরা দুই শত্রুর সম্মুখীন এবং যেহেতু ইংরেজরা ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য, তাই হিন্দুদের ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধে শক্তির অপচয় করা ঠিক হবে না। সে কাজ তার কংগ্রেসকে করতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। হিন্দুদের উচিত মুসলিমদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ও চূড়ান্ত যে সংগ্রাম হবে সে জন্য শক্তি সঞ্চয় করে রাখা।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অন্যান্য কারণেও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরোধিতা করতেন। তা হলে সমস্ত ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের উপর জোর পড়ত, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ঘটত এবং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের ভিত্তি গভীরভাবে দুর্বল হয়ে পড়ত। ১৯১৯-২২-এ ঠিক তাই হয়েছিল, যখন খিলাফত প্রসঙ্গের ফলে বহু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছিলেন এবং অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। তার ফলে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি এবং মুসলিমদের উপর তাদের প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল। ১৯২২-২৬-এ সরকার বিরোধী শক্তিশালী আকালী আন্দোলন শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ভাগ্যের উপর একই রকম মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। পরে, আকালী দলের অনেকগুলি অংশ সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতি গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এটা লক্ষ্যণীয় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের পৃষ্ঠপোষকের ফলে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদকে যথাযথভাবে তোষণ করতে পারে নি এবং তাকে তার ফলে অনেক সময়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান নিতে হত, যার ফলে পাঞ্জাবে শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদ পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হতে পারে নি এবং আকালী দলের বড় বড় অংশ জাতীয়তাবাদী ধারার মধ্যেই থাকার ঝোঁক দেখাত। শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদ পূর্ণরূপে ফুটে উঠতে পেরেছিল কেবল ১৯৪৭-এর পর। একই কারণে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সংগ্রামেরও বিরোধিতা করতেন কারণ সেগুলির মধ্যে ধর্মীয় গণ্ডী অতিক্রম করে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে দুর্বল করে দেওয়ার প্রবণতা থাকত।

এই স্তরে, এ কথা হয়ত আবার জোর দিয়ে বলার দরকার আছে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ঔপনিবেশিকতা-ঘেঁষা রাজনীতি তাঁদের ব্যক্তিগত মতামতের

বিষয় ছিল না, ছিল তাঁদের প্রকাশ্য রাজনীতির বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা অনেকেই অধিকাংশ রাজনীতি সচেতন ভারতীয় পরাধীন জনগণের অংশ হিসেবে যে গ্লানি বোধ করতেন তার অংশীদার ছিলেন।[৪০] ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের সভাপতির ভাষণে এম. এ. জিন্না লীগ সাম্রাজ্যবাদের মিত্র, এ কথা অস্বীকার করতে গিয়ে যেমন বলেছিলেন :

> "আমি বলি যে মুসলিম লীগ কারো মিত্র হতে যাচ্ছে না, কিন্তু মুসলিমদের স্বার্থসিদ্ধি হলে এমন কি শয়তানেরও মিত্র হতে পারে। এমন নয়, যে আমরা সাম্রাজ্যবাদের প্রেমে পড়েছি ; কিন্তু রাজনীতিতে দাবার ঘুঁটি যেমনি সাজানো, তেমনি ভাবেই খেলতে হবে।"[৪১] একইভাবে, ১৯৩৩-এ হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে ভাই পরমানন্দ প্রতিনিধিদের বলেন : "ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিমদের মধ্যে এক প্রকাশ্য মৈত্রী আছে··· । আমরা এমন এক পর্বে উপস্থিত হয়েছি যেখানে কংগ্রেস ও তার হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং আইন অমান্যের মাধ্যমে স্বরাজের তত্ত্ব মাঠ থেকে বেরিয়ে গেছে··· । হিন্দুদের জন্য ভবিষ্যৎ হতাশা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন··· । আমার ভিতরে আমি বুঝতে পারছি যে নতুন ভারতের রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠানগুলিতে প্রথম সম্প্রদায়রূপে হিন্দুদের মর্যাদা ও দায়িত্বশীল অবস্থান স্বীকৃত হলে তারা স্বেচ্ছায় গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।"[৪২]

সুতরাং, এ পর্যন্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ করে বলা যায় যে একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী মনোগতভাবে সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা না হলেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকতাবাদের মিত্র বা হাতিয়ার হওয়ার দিক থেকেই সাম্প্রদায়িকতাবাদ সর্বাধিক প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

[ছয়]

মুসলিম উচ্চশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাগীরদারী সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক উপাদানসমূহের অধিকতর প্রভাবের দরুণ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ গোড়া থেকেই খোলাখুলি ঔপনিবেশিকতা-পন্থী রাজনীতি গ্রহণ করেছিল। ঔপনিবেশিক সরকারকে সমর্থন করা ও তার প্রতি আনুগত্য প্রচার করা ছিল সৈয়দ আহমদ খানের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনেরই অন্যতম কাজ। ১৮৭৮-এ তিনি লিটনের দমনমূলক ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টকে উদারনৈতিক পদক্ষেপ বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৮৮৩-তে, তিনি মুসলিমদের ইলবার্ট বিলের পক্ষে আন্দোলন না করতে বলেন, কারণ ইউরোপীয়রা সক্রিয়ভাবে তার বিরোধিতা করছিলেন।

তিনি গোড়া থেকে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছিলেন, প্রথমে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিমদের শ্রেণীভিত্তিক জোটের মাধ্যমে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা-বাদের মাধ্যমে। সর্বক্ষণ, তিনি প্রচার করেছিলেন যে মুসলিম স্বার্থের সেরা রক্ষাকর্তা ব্রিটিশ শাসকরা। তিনি বৃটিশদের খিলাফৎউল্লাহ্ বা মর্তে ঈশ্বরের প্রতি-নিধি বলে বর্ণনা করেছিলেন যারা মুসলিমদের আনুগত্যের জন্য পুরস্কৃত করবে।[৪৩]

এই প্রথম যুগে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ছিল না। বরং, সৈয়দ আহমদ ও অন্যরা মনে করতেন যে এই স্তরে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনই বিধ্বংসী ও সরকার-বিরোধী হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখাবে বা অন্তত সর-কারী মানসে রাজদ্রোহিতার সন্দেহের উদ্রেক করবে। ফলে তাঁরা মুসলিমদের তাঁদের কাজেকর্মে সমস্ত রাজনীতি পরিহার করে অ-রাজনৈতিক ও আন্দোলন-বিমুখ থাকতে, অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে বলেছিলেন।[৪৪] সৈয়দ আহমদ কোনো স্তরেই মুসলিমদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন নি। পরে, তরুণ ব্যক্তিদের চাপে, ১৯০৩ সালে যুক্তপ্রদেশের গভর্নরের সরকারী অফিসে হিন্দীর ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশের প্রশ্নে একটি আন্দোলনবিমুখ মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সৈয়দ আহমদের উচ্চশ্রেণীভুক্ত উত্তরাধিকারীবা এই প্রয়াস ব্যর্থ করে দেন। গোড়ার যুগের অন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও সক্রিয়ভাবে রাজানুগত ছিলেন এবং ১৮৮৮ থেকে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। স্বদেশী আন্দো-লনের সময়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা খোলাখুলিভাবে সরকারের পক্ষাব-লম্বন করেন এবং আন্দোলনের মুসলিম সমর্থকদের 'কুৎসিত বেইমান' এবং 'কংগ্রেসী দালাল' বলে নিন্দা করেন।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন এবং মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের পর যখন মুসলিমদের আর সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন একদল বিত্তবান ভূস্বামী, প্রাক্তন-আমলা ও অন্যান্য উচ্চশ্রেণীভুক্ত মুসলিম একটি রাজা-নুগত ও রক্ষণশীল রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করলেন। তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মধ্যে বিকাশমান আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের ও মুসলিম ছাত্রদের কংগ্রেস এবং জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করা ঠেকানো। এই সংগঠন বিশেষ মুসলিম স্বার্থের রণধ্বনি তোলে, বিশেষ করে সরকারী চাকরী ও আইনসভার ক্ষেত্রে, যা রক্ষা করা যেত কেবল ঔপনিবেশিক কর্তৃ-পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে। লীগ ছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ও সর-কারের যৌথ প্রয়াস—একটি 'সরকারী দল'।

১৯১১-র পর মুসলিম লীগ ক্রমেই জাতীয়তাবাদের ও কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট এবং রাজানুগত্য ও দাস-মানসিকতার বিরোধী তরুণতর সদস্যদের প্রভাবাধীন হতে থাকে। ফলে উচ্চশ্রেণীর রাজানুগত ব্যক্তিদের সঙ্গে তরুণতর, অধিকতর

মধ্যশ্রেণীভুক্ত জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। ১৯১৬-এ আসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্মৌ চুক্তি। এই তরুণ মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা ১৯১৮-এ মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কারের নিন্দাতেও কংগ্রেসের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পর্ব। ভূস্বামী-সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং প্রাক্তন-আমলারা ক্রমেই নিজেদের মুসলিম লীগ, খিলাফৎ আন্দোলন এবং কংগ্রেস থেকে সরিয়ে নেয়। আর লীগ খিলাফৎ কমিটির ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়, কারণ লীগের নেতারা—এবং কংগ্রেসের বহু পুরোনো নেতাও—জেলে যাওয়া ও আত্মত্যাগের নতুন জঙ্গী গণরাজনীতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছিলেন না। কিন্তু ১৯২২-এ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবিত হয় এবং তা থেকে জঙ্গী ও জাতীয়তাবাদী উপাদানসমূহ বের করে দেওয়া হয়। আবার, উচ্চশ্রেণীর নেতারা এগিয়ে এলেন—সঙ্গে তাদের ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ়তর করার নীতি। তবু, সাইমন কমিশন বয়কট করার প্রশ্নে লীগ দু'টুকরো হয়ে গেল। এম.এ. জিন্নার নেতৃত্বে একাংশ কমিশন বয়কট করল, আর মুহম্মদ শফীর নেতৃত্বে আরেক অংশ তার সঙ্গে সহযোগিতা করল। তবে ঐ সময়ে লীগের পিছনে সামান্যই গণ সমর্থন ছিল। জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা তখনো ছিলেন একটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ১৯৩০-৩১-এর আইন অমান্য আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলন ঘোষণা করে যে তা ছিল সংখ্যালঘুদের উপর আধিপত্য কায়েম করার একটি হিন্দু প্রচেষ্টা। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের এই পর্যায় সামগ্রিকভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পিছনে ঠেলে দিল, এবং তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, ও অন্যান্যরা ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে ক্রমবর্ধমানহারে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের মূল ধারায় প্রবেশ করতে থাকেন। আইন অমান্য আন্দোলনেই, কংগ্রেস, জামিয়াত-উল-উলামা-ই-হিন্দ, খুদা-ই-খিদমৎগার ও অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্বে হাজার হাজার মুসলিম কারাবরণ করেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সাধারণভাবে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে।[৪৫]

অধিকাংশ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে গোল টেবিল বৈঠকগুলিতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি আনুগত্যের এই মনোভাব উৎকৃষ্টভাবে ব্যক্ত হয় ১৯৩১-এ "এম্পায়ার রিভিউ"-র জন্য মৌলানা শওকৎ আলী রচিত প্রবন্ধটিতে। মৌলানা শওকৎ আলী ছিলেন খিলাফৎ আন্দোলনের যুগে ব্রিটিশ বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বিখ্যাত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম। হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার সম্ভাবনা অস্বীকার করে তিনি মুসলিম-ব্রিটিশ বন্ধুত্বের জন্য আবেদন করেন:

"আমাদের উভয়ের পরস্পরকে প্রয়োজন। আমরা হাতে হাত মেলাবো এবং ইসলাম ব্রিটেনের পাশে দাঁড়াবে, একজন ভাল ও সম্মানিত বন্ধু, একজন বীর যোদ্ধা ও দৃঢ় মিত্র হিসাবে···। হিন্দুরা ও মুসলিমরা হাজার বছর একসঙ্গে ছুটি থাকলেও কৃষ্টির মিলিত হয়ে এক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।"[৪৬]

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলির সঙ্গে হাত মেলান। গান্ধী সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করে স্বাধীনতার প্রসঙ্গকে সামনে আনার যতরকম চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা তা সবই ব্যর্থ করে দেন।[৪৭] এইভাবে তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসকদের অমূল্য সাহায্য করেছিলেন। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে, হাউস অফ কমন্সে একটি সভায় আগা খান, কবি মহম্মদ ইক্‌বাল এবং ইতিহাসবিদ্ শাফাৎ আহমদ খান জোর দেন "হিন্দু ও মুসলিম রাজনৈতিক, এমন কি, বস্তুত, সামাজিক স্বার্থের মিলন সাধনের অসাধ্যতার" এবং "ভারতকে ব্রিটিশ প্রতিনিধি ব্যতীত কখনো অন্য কোনোভাবে শাসন করার অবাস্তবতার" উপর।[৪৮]

১৯৩৫-এর মধ্যে মুসলিম লীগ আপেক্ষিক অনুল্লেখ্যতায় নিমজ্জিত হয়েছিল। অধিকাংশ তরুণতর মুসলিম বুদ্ধিজীবী আকৃষ্ট হয়েছিলেন কংগ্রেস, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল বা কমিউনিস্ট পার্টির দিকে। বাংলাদেশে অনেকে যোগদান করলেন ধর্মনিরপেক্ষ ও র‍্যাডিকাল কৃষক প্রজা পার্টিতে। কিন্তু ১৯৩৬-এর পর এম. এ. জিন্নার নেতৃত্বে লীগ পুনর্গঠিত হয়। লীগ নিম্নমধ্য শ্রেণীদের এবং যুবসমাজের মধ্যে তার সামাজিক ভিত্তি প্রশস্ততর করতেও চেষ্টা করে। ফলতঃ, তার পক্ষে প্রকাশ্যে রাজানুগত্যের রাজনীতির অনুবর্তী হওয়া বা স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করতে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। এবার সাম্প্রদায়িকতাবাদের ঔপনিবেশিকতাবাদের সম্পর্কে অনেক স্বাধীন অবস্থান নিতে হল। জিন্না এখন বারবার বললেন, যথা ১৯৩৭-এ, যে "মুসলীম লীগ ভারতের পরিপূর্ণ জাতীয় গণতান্ত্রিক স্ব-শাসনের পক্ষে দাঁড়ায়", বা, ১৯৪০-এ, "আমরা দ্বিধাহীনভাবে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে"।[৪৯] কিন্তু অধিকতর পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি চলতে থাকে।[৫০] সর্বোপরি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধার এখন পরিচালিত হল সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে; লীগ নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে সমালোচনা করতেন তার প্রধান কারণ তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন। জিন্না ও লীগ ব্যাপকভাবে কংগ্রেস সম্পর্কে কুৎসা রটানোর অভিযানে নেমে পড়লেন এবং মুসলিম ও ব্রিটিশ জনমতের কাছে তাকে হিন্দু সংগঠন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেন। অবশ্যই, লীগ এ কাজে কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিল, বিশেষত বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে সৃষ্ট বেকারত্বের জন্য। উপরন্তু, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বশাসন দাবী করা হলেও, প্রয়োগক্ষেত্রে প্রস্তাব করা হয় যে ব্রিটিশ-

দের ভারত ছাড়লে চলবে না, যাতে মুসলিমরা "হিন্দুদের দয়ায়" পড়ে না থাকে।[৫১] ১৯৩৭-এ, গভর্নরদের ক্ষমতা প্রসঙ্গে বিতর্কে মুসলিম লীগ এই যুক্তিতে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করে যে সংখ্যালঘুদের হিন্দু আধিপত্য থেকে রক্ষা করার জন্য ঐ ক্ষমতাগুলির প্রয়োজন ছিল।

কোনো অবস্থাতেই, লীগ স্বশাসন অর্জনের জন্য কোনো রাজনৈতিক কাজ-কর্ম বা আন্দোলন করে নি, এবং কোনোভাবেই ঔপনিবেশিক শাসনকে দুর্বল করে নি বা আক্রমণ করেনি, অথবা তার সঙ্গে কোনোরকম প্রকাশ্য সংঘর্ষে নামে নি। কালক্রমে, লীগের মধ্যে একটি ছোটো ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী ও র‍্যাডি-ক্যাল শাখার বিকাশ ঘটেছিল বটে, কিন্তু লীগের নেতৃত্বের উপর কখনোই তার খুব একটা প্রভাব ছিল না। বরং, লীগের রক্ষণশীল, ঔপনিবেশিকতাপন্থী আধি-পত্যশালী নেতৃত্ব এই ছোটো ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী গোষ্ঠীর অস্তিত্বকে ব্যবহার করেছিল তাদের অন্যথায় প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে কিছুটা গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। সর্বোপরি, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, লীগ ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছিল তাদের ভারতে থেকে যাওয়ার প্রধান, ও শেষ অবধি একমাত্র অজু-হাত। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ বলে যে তারা স্বাধীনতার প্রশ্ন আলোচনা করতে পারবে না, যতদিন না কংগ্রেস ও লীগ এক জায়গায় আসতে পারে। জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি ছিলেন না যতক্ষণ না তার নেতৃত্ব অগ্রীম স্বীকার করতেন যে কংগ্রেস একটি হিন্দু সংগঠন, লীগ সমস্ত মুসলিমদের প্রতিনিধি, এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরের মুসলিমরা কারো প্রতিনিধিত্ব করতেন না। এই শর্তগুলি ছিল এমন যে কোনো জাতীয়তাবাদী সংগঠনই কখনো তা গ্রহণ করতে পারত না। অতএব ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ঠাণ্ডাভাবে বলতে পার-তেন যে কংগ্রেস সমগ্র ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করত না এবং ভারত যে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল না তার কারণ ভারতীয় "সম্প্রদায়গুলির" মধ্যে মতভেদ।"[৫২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, যখন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে নামে, তখন মুসলিম লীগ নেতৃত্ব তার সদস্যদের যুদ্ধ প্রয়াস সমর্থন করতে অনুমতি দেন। কোনো অবস্থাতেই লীগ যুদ্ধ প্রয়াসে বাধা দিতে কোনো চেষ্টা করে নি। জিন্না কংগ্রেস ও সরকারের দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, এবং যুদ্ধের শুরুতেই ভাইসরয়কে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন যে (ভাইসরয়ের ভাষায়) "কংগ্রেসকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করলে" তাঁর সমর্থন থাকবে।[৫৩] কংগ্রেস দাবী করছিল অবিলম্বে স্বাধীনতার ঘোষণা। লীগ দাবী রাখল যে সাংবিধানিক অগ্রগতি সম্পর্কে "দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের" অগ্রিম সম্মতি ছাড়া কোনো ঘোষণা করা চলবে না।[৫৪] পরে, লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করাকেই পূর্বশর্ত হিসাবে রাখল। এই শর্ত-গুলি হয়ে দাঁড়াল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষার প্রাণকেন্দ্র।

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর মেনে নিতেও চায় নি, এবং তারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার নামে যুদ্ধে রত অবস্থায় ব্রিটিশ, ভারতীয় ও বিশ্ব জনমতের কাছে ভারতীয় দাবী গ্রহণে অস্বীকৃত বলেও প্রতিপন্ন হতে চায় নি। লীগ নেতৃত্ব তাদের এই উভয় সংকট কাটিয়ে সাম্প্রদায়িক মতভেদের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সম্ভব করে দিলেন।[৫৫] একই সঙ্গে, মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ১৯৪২-এর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনকে নিন্দা করলেন এই বলে, যে তা নাকি যতটা ব্রিটিশ-বিরোধী, তার চেয়ে বেশী মুসলিম-বিরোধী, কারণ তা পাকিস্তানের জন্য দাবীকে পাশে সরিয়ে দিয়েছিল। লীগ বাংলাদেশ, সিন্ধু প্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লীগ মন্ত্রীসভা কায়েম করার জন্যও ঔপনিবেশিক শাসক-দের সাহায্য নিয়েছিল।

১৯৩৭-৪৭, এই গোটা যুগ ধরে মুসলীম লীগ একবারও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটিও বিক্ষোভ বা রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করে নি, এমন কি তার নিজস্ব দাবীর পক্ষেও নয়। ১৯৩৭-এর পর লীগ অনেকগুলি প্রচারধর্মী আন্দোলন করেছিল, কিন্তু সবকটিই পরিচালিত ছিল কংগ্রেস সর-কারদের বিরুদ্ধে, এই ধরণের প্রসঙ্গে: স্কুলে 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া, সর-কারী বাড়িতে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন, ওয়ার্ধা শিক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি। তার প্রথম বড আন্দোলন ছিল ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে, যখন কংগ্রেস মন্ত্রীসভাদের পদত্যাগ উদ্‌যাপন করতে উদ্ধার দিবস পালন করা হয়। এই ঘটনায় ব্রিটিশ প্রশা-সন লীগকে প্রায় প্রকাশ্য সাহায্য দেয়। লীগের একমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হয় ১৬ই অগাস্ট ১৯৪৬, যখন পাকিস্তান আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করা হয়। ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা ইতিমধ্যে করে দেওয়ায়, লীগ এবার শাসকদের না চটিয়ে বীরত্বব্যঞ্জক কাজকর্ম করতে পারত। লীগের কাউন্সিল তখন ঘোষণা করল যে "মুসলিম ভারত কোনো সাফল্য অর্জন না করেই সমঝোতা ও সাংবিধানিক পন্থার মাধ্যমে ভারতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমা-ধান বার করার সমস্ত প্রয়াস নিঃশেষ করে ফেলেছে", এবং "কংগ্রেস যেহেতু ব্রিটিশদের প্রশ্রয়ে ভারতে বর্ণ-হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর···তাই মুসলিম জাতির এখন পাকিস্তান আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ধরার সময় এসেছে···।" এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করে জিন্না বললেন: "আমরা এক অতীব বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মুসলিম লীগের সমগ্র জীবন-ইতিহাসে এর আগে কখনো আমরা সাংবিধানিক পন্থা ও সাংবিধানিক আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো-ভাবে কিছু করি নি··· । আজ আমরা সংবিধানসমূহ ও সাংবিধানিক পদ্ধতি-সমূহকে বিদায় জানিয়েছি।"[৫৬] কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের আহ্বান হওয়া তো দূরের কথা, এ ছিল সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের ঘোষণা। তার ফল ছিল কলকাতায় রক্তাক্ততম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—প্রথম দু'দিনে যার ফলে মৃতের সংখ্যা

৫০০০-এ পৌঁছয়—এবং উপমহাদেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক গণহত্যার ধারাবাহিকতার সূচনা করা।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদও গোড়া থেকে রাজানুগত ছিল। তার প্রবক্তারাও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাছ থেকে 'হিন্দুদের' জন্য "ছাড়" পাওয়ার দিকে তাকিয়ে সহযোগিতার কথা বলেছিলেন। তা অবশ্য তার রাজানুগত্যের রাজনীতিতে অনেক কম প্রকট ও বেশী সাবধানী ছিল, কারণ হিন্দুদের মধ্যে মধ্য-শ্রেণীদের ও জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক গুরুত্ব ও প্রভাব অনেক বেশী হওয়ায় তার অনুবর্তীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রভাবের সম্ভাবনা অনেক বেশী ছিল। তাছাড়া, ব্রিটিশ সরকার হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে অনেক কম ছাড় ও সামান্য সমর্থন দিয়েছিল, কারণ তারা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের উপর গভীর-ভাবে নির্ভর করত ও সহজে একই সঙ্গে উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদকে তুষ্ট করতে পারত না।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ পরোক্ষভাবে তার যাত্রা শুরু করে ১৮৮০-র ও ১৮৯০-এর দশকে পাঞ্জাবে এক তেজীয়ান গো-রক্ষা আন্দোলনেব মাধ্যমে, যা দ্রুত যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন মূলতঃ পরিচালিত ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে; অন্যদিকে, ব্রিটিশ ফৌজী ছাউনীগুলিতে ব্যাপক হারে গো-হত্যা করে যাওয়ার স্বাধীনতা থেকে যায়।

হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঔপনিবেশিকতাপন্থী ও কংগ্রেস বিরোধী নীতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন ১৯০৯ সালে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের অন্যতম প্রথম তাত্ত্বিক। ১৯০৯-এ পাঞ্জাব হিন্দু সভার প্রতিষ্ঠাতা, রাই বাহাদুর লাল চাঁদ, কংগ্রেসকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, যেগুলি পরে একসঙ্গে প্রকাশিত হয় "সেলফ-অ্যাবনেগেশন ইন পলিটিক্স" পুস্তিকায় (১৯৩৮-এ পুনর্মুদ্রিত)। তিনি কংগ্রেসকে হিন্দুদের "স্ব-আরোপিত দুর্ভাগ্য" এবং "নিছক হিন্দু স্বার্থের জন্য দুর্বলতার এক উৎস" বলে বর্ণনা করেন। তিনি পত্রপত্রিকা-সমূহকে কংগ্রেসী প্রভাবের দরুণ "খাঁটি হিন্দু দায়িত্ব" তুলে নিতে অস্বীকার করার দায়ে অভিযুক্ত করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে কংগ্রেস মুসলিম-তোষণ করত এবং মুসলিমরা বিরক্ত হবে ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তা গঠন রুদ্ধ হবে এই ভয়ে "হিন্দু স্বার্থ" রক্ষা করতে অস্বীকার করত। ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তা গঠন ছিল এমন এক লক্ষ্য, যা নাকি কংগ্রেস "আত্মাহুতির মূল্যেও" ঘটাতে প্রস্তুত ছিল। লাল চাঁদ লেখেন যে হিন্দুরা বিগত পঁচিশ বছর ধরে যে বিষ পান করেছে" তার ফলে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। হিন্দুদেব বাঁচানো সম্ভব কেবল যদি তারা বিষ "রেচন" করতে ও "পাপ" দূর করতে প্রস্তুত থাকে। যদি সরকার মুসলিমদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়, যেমন ছিল, তবে তার দোষ কংগ্রেসের, কারণ কংগ্রেস "ঐক্যের যূপকাষ্ঠে"

হিন্দু স্বার্থকে বলি দিয়েছিল। লাল চাঁদ বলেন : "যদি গোড়া থেকেই হিন্দুরা স্বতন্ত্রভাবে ও স্বাধীনভাবে তাদের নিজেদের স্বার্থকে সাহায্য করত এবং তাদের বিশেষ শ্রেণীগত সুবিধা দাবী করত তবে ফল হত ভিন্নতর···।" সরকারকে মুসলিমদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্ম দোষ দেওয়া যায় না : "পাপের উৎসের গভীরে যাওয়া হবে না কেন ? কেন স্বীকার করা হবে না যে সরকার মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কারণ কংগ্রেস অসম্ভব দাবী করতে শুরু করেছে। লর্ড ডাফ্‌রিন যেমন বলেছিলেন, "কংগ্রেস চায় ফিটনগাড়ীতে বসে সূর্যের রথকে পথ দেখাতে", এবং যেমন লর্ড মর্লি বলেন, কংগ্রেস "হাতে চাঁদ পেতে চায়"। বস্তুত, লালচাঁদ বলেন, ১৮৮৫-তে তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কংগ্রেস রাজনৈতিক দাবী করতে শুরু করেছে যথা ইণ্ডিয়া কাউন্সিলেব বিলুপ্তি, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার, সামরিক ব্যয় হ্রাস, আইনসভাগুলিতে বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য, যেগুলি সরকারকে বিচলিত করেছে। "এ ছিল উন্মাদ ঔদ্ধত্য· যা তার নেতাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দিকে নিয়ে গিয়েছিল, এবং তার ফল ছিল দুভাবে সর্বনাশা।" যথা, লাল চাঁদ দাবী করলেন, হিন্দুদের সর্বনাশা অবস্থার "প্রকৃত কারণ" ছিল "কংগ্রেস, তখনকার মত হিন্দু রাজনীতিকে সম্পূর্ণ দাবিয়ে রাখত এবং তার অসম্ভব দাবী ও দ্বন্দ্ববোধক অবজ্ঞার দ্বারা হিন্দুদের থেকে সরকারী সহানুভূতি বিচ্ছিন্ন করেছিল এবং বাস্তবে তাকে রূপান্তরিত করেছিল এক চাপা ক্রোধবিশিষ্ট বৈরীতায়।" ১৯০৫-এর পর কংগ্রেস এই ত্রুটিকে বাড়িয়ে তুলেছিল উপনিবেশগুলির* অনুরূপ স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করে। এই দাবীকে "কাণ্ডজ্ঞানহীন" চীৎকার বলে বর্ণনা করে লালচাঁদ বলেন যে তাব ফল ছিল "যে সম্প্রদায় প্রয়োগক্ষেত্রে এই দাবী নিয়ে আন্দোলনরত তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে অহেতুক ঠেলে দেওয়া ও তাদের প্রতি বিরক্ত করে তোলা।" লাল চাঁদ উপদেশ দেন, সঠিক পথ হওয়া উচিত ছিল অন্যরকম। একটি স্বাধীন গণতন্ত্রে একটি জনগণেব নেতারা সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে "অভদ্র, অনমনীয় ও সম্পূর্ণ স্বার্থপর" হতে পারেন, কিন্তু বিদেশী সরকারের অধীনে অবস্থা ভিন্নতব। "সামনের লক্ষ্য হল পিছনের গণতন্ত্রের (এইরূপ!) জন্য অধিকতর সুবিধা আদায় করা ও তার স্বার্থরক্ষা করা, এবং তা অর্জন করার জন্য বিরোধ-নিবারক মনোভাব নিয়ে এগোনো সম্পূর্ণরূপে আবশ্যক। নেতাকে···কিছু বিষয়ে সরকারকে ছাড় দিতে স্বীকৃত হতে ও প্রস্তুত থাকতে হবে।" এই স্তরে হিন্দুদের জন্য সঠিক নীতি হল তাঁদের অতীত রাজনীতির পুনর্বিবেচনা করা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যেন হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধে লিপ্ত তৃতীয় পক্ষকে—অর্থাৎ সরকারকে—নিরপেক্ষ করে দেওয়া

* অর্থাৎ ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ। এই দেশগুলিতে শ্বেতাঙ্গরা বসতি স্থাপন করেছে। এগুলি প্রসঙ্গে কলোনী কথাটির ব্যবহার ভারতের প্রসঙ্গে ব্যবহারেব সমার্থক নয়। লালচাঁদ স্পষ্টতই পূর্বোক্ত দেশগুলিকেই উপনিবেশ বলেছেন।—অনুবাদক

ও সম্ভব হলে দলে টানা যায়। কংগ্রেসকে শোধরানোর পথে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে না। ঐ সংগঠন হিন্দু কংগ্রেসও হবে না, স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যও ত্যাগ করবে না। যেহেতু "ভারতীয় আদর্শ ও ঔপনিবেশিক ধাঁচের সরকারের জন্য কাণ্ডজ্ঞানহীন চেঁচামেচি" ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, তাই কংগ্রেসকে ত্যাগ করা, তাকে **"শেষ"** করে দেওয়া আবশ্যক।[৫৭]

১৯১৮-র আগে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা নিজেকে সংহত করতে ব্যর্থ হয়। ১৯১৮-২২-এ তা পিছু হঠে, এবং সংগঠিতভাবে এগিয়ে যায় কেবল ১৯২৩-এ, যখন হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় অধিবেশন ছোটখাটোভাবে তার এক পুনরুত্থান ঘটায়। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ছিল এক দুর্বল সংগঠন, যাতে বহু জাতীয়তাবাদীও জড়িত ছিলেন। অধিকতর সক্রিয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা শুদ্ধি ও সংগঠনের কাজে হাত লাগান। এঁদের প্রচার ও কার্যকলাপ সরকার বিরোধী ছিল না, ছিল মুসলিম বিরোধী। সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন গভীরভাবে হিন্দু মহাসভাকে দুর্বল করে দিল। ইতিপূর্বে, স্বরাজ্য পার্টির আধা-সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা তা থেকে ভেঙে বেরিয়ে সরকারকে প্রতিসংগত সহযোগিতা দিতে চেয়েছিলেন। ফলে, ১৯২৮-এর পর হিন্দু মহাসভার সামনের সারিতে উঠে এলেন নতুন একদল নেতা। তাঁরা সরকারীভাবে কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনীতি থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে রাখলেন। পাঞ্জাবের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, এ বিষয়ে সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভা গৃহীত বয়কট সিদ্ধান্ত অমান্য করেই। মহাসভার ১৯৩৩-এর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ প্রদানকালে ভাই পরমানন্দ এই কাজকে সাধুবাদ জানান ও ঘোষণা করেন যে বয়কট ছিল, 'হিন্দু' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুর্ভাগ্যজনক।[৫৮] বহু বিবৃতিতে তিনি বলেন যে সরকারের বিরোধিতা করে সরকারী শুভদৃষ্টি হারানো হিন্দুদের অনুচিত হবে, বিশেষত এইজন্য যে সরকার দৃঢ়ভাবে ক্ষমতাসীন এবং কৃপা করার ক্ষমতা তখনও তার কাছেই ছিল।[৫৯] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আজমীরে তিনি হিন্দুদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছিলেন।[৬০] ১৯৩৮-এ, লাল চাঁদের পুস্তিকার নতুন সংস্করণে তাঁর মুখবন্ধে তিনি লেখেন যে :

> "এগুলিতে (লালচাঁদের পত্রগুচ্ছে) একটি কথাও নেই যা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়…। আমার কাছে এই পত্রগুচ্ছ বিশেষ গুরুত্ববহ। কারণ আমি আমার যৎসামান্য ক্ষমতা অনুযায়ী এই দর্শন প্রচার করেছি, একরকম ভয়হীন দৃঢ়তার সঙ্গে…। দুয়েকটি চিঠিতে তিনি সরকারী চাকরী প্রসঙ্গে কংগ্রেসী ঔদাসীন্যের নিন্দা করেছিলেন এবং এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন যে ঔপনিবেশিক ঢঙের সরকার সম্পর্কিত কংগ্রেসী আদর্শ অবাস্তব। ঔপনিবেশিক ধরণের সরকার প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি কংগ্রেসের বর্ত-

মান পদ্ধতি ও আদর্শ, অর্থাৎ অসহযোগ এবং পূর্ণ স্বাধীনতা প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য।"[৬১]

এন. সি. কেলকার তাঁর দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী অতীতসহ অপেক্ষাকৃত মোলায়েম ভাষায় অনুরূপ ভাব প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩২-এ হিন্দু মহাসভার সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে "হিন্দুদের হিন্দুরূপে প্রকৃত অসহযোগের পথে ততটাই যাওয়া উচিত, যতটা যেতে প্রস্তুত থাকবে প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।"[৬২] ঐ সময়ের আরেক বড় মহাসভা নেতা, বি. এস. মুঞ্জে, ১৯৩৩-এর মে মাসে সরকারের সঙ্গে "গঠনমূলক সহযোগিতার" জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন।[৬৩] যে প্রথম গোলটেবিল বৈঠককে সমস্ত জাতীয়তাবাদীরা বয়কট করেছিলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তলার সারি আরো খোলাখুলিভাবে রাজানুগত্য প্রকাশ করে। যেমন, লাহোরের পাঞ্জাব হিন্দু যুবলীগ ১৯৩৩-এর মে মাসে বলে: "আমরা মনে করি, এখন সময় নয় মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের তার বেশি ব্রিটিশদের ও ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যের।"[৬৪]

১৯৩৭-এর পর হিন্দু মহাসভা বিনায়ক দামোদর সাভারকারের নেতৃত্বাধীন হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘও (আর এস.এস.) অন্যতম প্রধান সাম্প্রদায়িক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। দুটির কোনটিই এখন আর খোলাখুলিভাবে রাজানুগত ছিল না, এবং এমনকি একরকম জাতীয়তাবাদের কথাও বলত ও ভারতকে স্বাধীন করতে চাইত। সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাবাদ জাতীয়তাবাদের ভেক ধরতে পারত, এই বাস্তব ব্যতীত, এই সংগঠনগুলি মূলগতভাবে রাজানুগত্য, বা অন্তত অ-জাতীয়তাবাদী কাঠামোর ভিতর থেকে যায়। সরকারের তথাকথিত মুসলিম-ঘেঁষা নীতি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তারা ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা কোনোরকম সংগ্রাম পরিচালনা করে নি। আর, তারা তীব্রভাবে আক্রমণ করত কংগ্রেস ও কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলিকে। যেমন, ১৯৩৮-এ হিন্দু মহাসভার সভাপতির ভাষণে সাভারকার কংগ্রেসকে হিন্দু-বিরোধী বলে আক্রমণ করেন এবং বলেন যে "কংগ্রেসকর্মীরা প্রতি পদে হিন্দু স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কিন্তু মুসলিম লীগের কাছে একপায়ে খাড়া হয়ে থাকে।" তিনি হিন্দুদের বলেন যে কংগ্রেস "একটি হিন্দু-বিদ্বেষী ও জাতীয়তা-বিরোধী সংগঠনে" পরিণত হয়েছে, তাই তাঁরা যেন কংগ্রেসকে বয়কট করেন।[৬৫] ১৯৪০-এ, মহাসভার কাছে তাঁর সভাপতির ভাষণে সাভারকার হিন্দুদের কাছে "বৃটিশ সরকারের সমস্ত রকম যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে" আবেদন করেন এবং "কিছু মূর্খ", যারা এই নীতিকে "সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা বলে নিন্দা করে" তাদের কথা কানে না তুলতে

বলেন।[৬৬] হিন্দু মহাসভার অন্যান্য নেতারাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সরকারের দিকে "প্রতিবেদনশীল সহযোগিতা"-র হাত বাড়িয়ে দেন।[৬৭]

আর.এস.এস.-এর সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের সম্পর্ক ছিল অধিকতর জটিল ও কৌশলী। আর.এস.এস. গঠিত হচ্ছিল মধ্যশ্রেণীভুক্ত তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের একটি জঙ্গী সংগঠনরূপে। বাধ্যতামূলকভাবে তাকে একটি র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী অবস্থান গ্রহণ করতে হয়েছিল, কিন্তু তার রাজনীতি মুসলিম লীগের চেয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের তাঁবে কম ছিল না। প্রথমত, তার নেতারাও কংগ্রেসকে পয়লা শত্রু হিসেবে দেখতেন, যাকে যে কোনোভাবে দুর্বল করতে ও ধ্বংস করতে হবে। ১৯৩৯-এ কংগ্রেসের নেতাদের পরোক্ষে বিশ্বাসঘাতক বলে এম. এস. গোলওয়ালকার বলেন: "অদ্ভুত, ভারী অদ্ভুত, যে বিশ্বাসঘাতকদের জাতীয় বীর রূপে সিংহাসনে বসানো হয় এবং দেশপ্রেমিকদের উপর কলঙ্ক নিক্ষেপ করা হয়।"[৬৮] দ্বিতীয় অংশে গোলওয়ালকার উল্লেখ করছিলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে। তিনি বলেন যে কংগ্রেসের সৃষ্টি করেছিলেন হিউম, ওয়েডেরবার্ণ ও কটন। "জাতীয় সচেতনতা ধ্বংস করার হাতিয়ার রূপে" ; এবং তা "অন্তত তাঁদের নিরীখে, সফল হয়েছে। জাতীয়তার নামে আমাদের 'নির্জাতীয়করণ' তার চূড়ান্ত পরিণতির সন্নিকটে এসে পড়েছে।"[৬৯] কংগ্রেস নেতাদের গোলওয়ালকার বারংবার উল্লেখ করেন "এই জীবগুলি [যারা] নিজেদের উপর জনগণকে 'নেতৃত্ব' দেওয়ার বোঝা তুলে নিয়েছিল", এবং বিশ্বাসঘাতক জয়চাঁদ, মানসিংহ, চন্দ্ররাও মোবে প্রমুখের ধাঁচের মানুষ হিসাবে, যাদের মত তাদেরও আছে "একই রকম নীচতা, স্বার্থপরতা" এবং যাদের মত তারাও [কংগ্রেস নেতারা] কাজ করছেন "আমাদের সর্বনাশের" জন্য এবং "নেহাৎ নিজেদের জনসমক্ষে রাখার জন্য জাতির প্রতি অসৎ হচ্ছেন"। তিনি "এই স্ব-ঘোষিত 'জাতির পুনরুজ্জীবনদাতাদের' অবক্ষয়ের" কথা বলেন এবং "জাতীয়তা-বিরোধী কাজে" জাতীয় শক্তির অপচয়ের নিন্দা করেন।[৭০]

১৯৪৭-এ, গোলওয়ালকারের কংগ্রেস বিরোধী বিষোদ্গার নতুন জায়গায় উঠে যায়। কংগ্রেসের নেতাদের সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় যে তারা 'হিন্দুকে' বলেছেন:

> মুসলিমদের দস্যুবৃত্তি ও অত্যাচার ও অগ্রাহ্য করতে, এমন কি মাথা হেঁট করে মেনে নিতে। বস্তুতঃ, তাকে বলা হল: "মুসলিমরা অতীতে তোমার প্রতি যা করেছে এবং এখন যা করছে তা ভুলে যাও। যদি তোমার মন্দিরে উপাসনা করা, পথে দেবতাদের নিয়ে শোভাযাত্রা করা মুসলিমদের বিরক্ত করে, তবে তা কোরো না। **যদি ওরা তোমার স্ত্রী-কন্যাদের কেড়ে নিয়ে যায়, তবে যেতে দাও। ওদের বাধা দিও না। তা হবে হিংসাত্মক কাজ।**"[৭১] (জোর আরোপিত)

হিংসাত্মক কাজের উল্লেখ শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে দেয় যে, গোলওয়ালকারের লক্ষ্য ছিলেন গান্ধী। ঐ একই বক্তৃতার আরেকটি অনুচ্ছেদে গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরো প্রকাশ্য ও হিংস্র : "যাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া কোনো স্বরাজ নয়' তাঁরা এইভাবে আমাদের সমাজের প্রতি বৃহত্তম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাঁরা এক মহান্ ও প্রাচীন জনগণের জীবন প্রতিভাকে হত্যা করার সর্বোত্তম অপরাধ করেছেন।"[৭২]

দ্বিতীয়ত, আর.এস.এস. নিজে কোনো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন বা সংগ্রাম পরিচালনা করেই নি, এবং তার পরিবর্তে চূড়ান্ত রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা পালন করেছিল, উপরন্তু, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তারা তাদের প্রভাবাধীন জাতীয়তাবাদী বোধসম্পন্ন তরুণদের ঘটমান জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে যোগদান করা থেকে বিরত করেছিল। বস্তুত, তার তরুণ জাতীয়তাবাদ-মনস্ক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের অনড় রেখে দেওয়া, বিশেষত ১৯৪২-এর অতি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে, এবং পরে আবার ১৯৪৫-৪৬-এ, ছিল ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সেবায় এক প্রধান কাজ। তরুণদের বলা হয়েছিল যে আর.এস.এস., ভবিষ্যতে যখন প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হবে, তখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য তার শক্তি সঞ্চয় করে রাখছে। এই দিকটি সামগ্রিকভাবে খুব ভালভাবে দেখিয়েছেন একজন লেখক, যিনি ১৯৪২-এ আর.এস.এস.-এর স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন, যদিও বর্তমানে তিনি তার এক প্রধান সমালোচক :

> "নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক না কেন, যে যুবকরা আর.এস. এস-এ এসেছিল তারা সময়ে সময়ে চাঞ্চল্যবোধ করত, হয়ত দেশে বিদ্যমান সাধারণ সংগ্রামী আবহাওয়ার দরুণ। তাদের বলা হয়েছিল : 'আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সুযোগ আসবে। আমাদের উচিত, সেই সময়ের জন্য আমাদের শক্তি সঞ্চয় করে রাখা।' বক্তৃতার আগুনখেকো ভাষা এবং মুসলিমদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে তারুণ্যের জঙ্গী মেজাজের মোক্ষণ ঘটানো হত। এইভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী অনুভূতি প্রবাহিত হত মুসলিম-বিরোধী ক্রিয়ার খাতে।"[৭৩]

গয়াল এর পর বলেছেন যে "যুবসমাজের মধ্যে বিকাশমান ব্রিটিশ-বিরোধী অনুভূতি ভোঁতা করে দেওয়ার" এবং তাকে মুসলিম বিরোধী খাতে ঘুরিয়ে দেওয়ার এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ আর.এস.এস.-এর বিরুদ্ধে কোনোরকম বড় পদক্ষেপ নেয় নি, যদিও তার নেতারা শিক্ষাশিবির ইত্যাদি স্থানে সময়ে সময়ে বৃটিশ বিরোধী বক্তৃতা দিতেন। তবে সেখানেও মৌখিক অগ্নিবাণ বর্ষিত হত মূলত মুসলিমদের বিরুদ্ধে।[৭৪]

১৯৪২-৪৪-এ আর.এস.এস.-এর ভূমিকা ভালভাবে বেরিয়ে আসে, তার সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিশ্লেষণ ও তার প্রতি আচরণ থেকে।[৭৫] স্বরাষ্ট্র দপ্তরে

৭ই আগস্ট ১৯৪২ তারিখের এ.এস. স্বাক্ষরিত একটি নোট বলে যে যদিও আর.এস.এস.-এর কার্যকলাপ আপত্তিকর এবং ক্ষিপ্তবৎ, তবে তা হল আসলে "পুরোনো ইতিহাস", এবং যতক্ষণ তারা আইন অমান্যের হুমকিকে সমর্থন করছে না, ততক্ষণ তাদের কার্যকলাপকে কোনোরকম গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে না। সি.আই.ডি.-র "রিপোর্ট অন আর.এস.এসেও অফিসারস্ ট্রেনিং ক্যাম্প"-এর সংক্ষিপ্তসার আরেকটি নোট অনুযায়ী ৩ মে ১৯৪২ গোলওয়ালকার বলেছিলেন যে "সংঘ চালু করা হয়েছে কেবল মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নয়, ঐ রোগ সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য"। সংঘ স্বরাজ চায়, কিন্তু "তারা তাদের শক্তি নষ্ট করবে না, বরং তা সঞ্চয় করবে ও যথাসময়ে তা ব্যবহার করবে"।[৭৬] আর.এস.এস. প্রসঙ্গে আরেকটি হোম ডিপার্টমেণ্ট নোট বলেছিল : "কংগ্রেসী গোলমালের সময়ে সংঘের সভাগুলিতে বক্তারা সদস্যদেব বলেন কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে সরে থাকতে, এবং সাধারণভাবে এই নির্দেশ পালন করা হয়েছিল।"[৭৭]

আগে, অর্থাৎ ২ ডিসেম্বর ১৯৪০, কংগ্রেসের একক সত্যাগ্রহ অভিযান যখন তুঙ্গে, তখন আর.এস.এসের পক্ষে অভয়ংকর ও অন্য নেতাদের এবং বম্বের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিবের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নোট অনুযায়ী অভয়ংকর আর.এস.এসেব পক্ষে পোষাক, কুচ.কাওয়াজ ইত্যাদি প্রসঙ্গে সরকারী নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। "তিনি আরো প্রতি-শ্রুতি দেন যে সংঘ তার সদস্যদের বৃহত্তর সংখ্যায় সিভিক গার্ডে যোগ দিতে উৎ-সাহ দেবে। এই বোঝাপড়া হয়েছিল যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যরা সিভিক গার্ডে যোগদান করলে সিভিক গার্ডের প্রতি তাদের দায়িত্বকে সার্বভোম বলে গ্রহণ করবেন।" সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস সরকারের মুখ্য সচিবকে লেখা ৭ই জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখের একটি নোটে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরোর আর. টটেনহ্যাম উল্লেখ করেন যে প্রস্তাব করা হয়েছে, গোলওয়ালকারকে শতর্ক করে দেওয়া হোক "এই সংগঠনের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে, কিন্তু দেখা গেছে যে তিনি নিজেই না চটাতে ব্যতিব্যস্ত, তাই আমরা এই প্রস্তাব ধরে না এগোবার সিদ্ধান্ত নিলাম"। ২১ জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখের একটি চিঠিতে পাঞ্জাবের মুখ্য সচিব ভারত সর-কারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মুখ্য সচিবের কাছে উল্লেখ করেন যে "বর্তমানে তার কাজকর্মের জঙ্গী দিকটি খুব শক্তিশালী নয়" এবং খুব সজাগভাবে বলেন যে আর.এস.এস. থেকে বিপদ আসতে পারে তার সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম থেকে, যা শান্তি ও উদ্বেগশূন্যতার বিঘ্ন ঘটাতে পারে। ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪, বম্বের স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান যে বম্বে সরকারের মতে নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা চাপানো অনাবশ্যক এবং (পোষাক ও ড্রিল প্রসঙ্গে) বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করাই যথেষ্ট, "কারণ সংঘ নিষ্ঠার সঙ্গে

নিজেকে আইনের চৌহদ্দির মধ্যে রেখেছে এবং বিশেষত, আগস্ট ১৯৪২-এ যে গোলমাল দেখা দিয়েছিল তাতে কোনোরকম ভাবে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে।'' মধ্য প্রদেশের প্রাদেশিক প্রশাসন ছিল একমাত্র প্রশাসন যারা ১৯৪৪-এর মার্চ মাসে আর.এস.এস. দমনের সুপারিশ করেছিল। তারা তা করেছিল মুখ্যতঃ এই কারণে যে তার সাম্প্রদায়িকতাবাদ হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষে উস্কানী দিতে পারে, এবং এইজন্য, যে তার মুসলিম প্রতিরূপ, খাকসারদের, দমন করা হয়েছিল।[৭৮] ১৯শে জুন ১৯৪৬ তারিখের আরেকটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নোট বলেছিল: "শোনা যাচ্ছে ১৯.৫.১৯৪৬-এ রোটাকে অনুষ্ঠিত এক গোপন বৈঠকে নাগপুরের দাদাভাই বলেছেন যে সংঘের সংগ্রাম বৃটিশদের বিরুদ্ধে নয়, বরং মুসলিমদের বিরুদ্ধে ।''

শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদও কম ঔপনিবেশিকতাবাদ-পন্থী ছিল না। কেন্দ্রীয় খালসা দিওয়ান-ও প্রকাশ্যে রাজানুগত রাজনীতি গ্রহণ করেছিল। দিওয়ান, তথা শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদ ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আকালী আন্দোলনের যুগে গভীর পরাজয় বরণ করেছিল। কিন্তু আকালী আন্দোলন ভেঙে পড়ার পর আকালী দল স্বয়ং ধীরে ধীরে কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যাদের কিছু কিছু উত্তরোত্তর সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করে, আর অন্যরা, পরম্পরাগত শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, যাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুন্দর সিং মাজিথিয়ার মত ব্যক্তি, তারা রাজানুগতো অগ্রণী ছিল— তারা এমন কি আকালী আন্দোলনের তুঙ্গেও রাজানুগত ছিল। মাস্টার তারা সিংয়ের নেতৃত্বাধীন আকালীদের সাম্প্রদায়িক অংশ পাঞ্জাবের কৃষকদের দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্য ও তাঁদের নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অতীতের ফলে "বাধাপ্রাপ্ত" হতেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁরা তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় ইতস্তত করতে থাকেন, রাজানুগত সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে হাত মেলান, সহযোগিতামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন, ও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে রাজন্য-বর্গ ও সরকারপন্থী রাজনীতি অবলম্বন করেন।

[সাত]

প্রতিক্রিয়া হিসাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদের আর কয়েকটি দিকও লক্ষ্য করা উচিত। যদিও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতাবাদ নাকি পরস্পরের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল, রাজনৈতিক প্রয়োগক্ষেত্রে কিন্তু তারা পৌরসভা, জেলা বোর্ড, আইনসভা ও প্রাদেশিক সরকারে, এবং ভূস্বামীদের ও পেশাদারদের সংগঠনে নির্দিষ্ট আইন, প্রশাসনিক ও আর্থব্যবস্থা প্রসঙ্গে একে অপরের সঙ্গে শ্রেণীভিত্তিক ও অসাম্প্রদায়িকভাবে

সহযোগিতা করেছিল। সাম্প্রদায়িক স্বত্বাকে প্রায় কখনোই শ্রেণী বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের পথ রোধ করতে দেওয়া হয় নি। বিশেষত, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অনেক সময়েই ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করতে হাত মেলাতো। যে কোনো ক্ষেত্রেই, তাদের রাজনীতি শেষোক্তের সুনজরে সমান্তরাল পথে অগ্রসর হত। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতেও তারা অনেক সময়ে হাত মেলাত। উপরন্তু, দেখার মত বিষয় হল, সাম্প্রদায়িক নেতারা ও সংগঠকরা তাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রতিপক্ষদের খুব কমই আক্রমণ করে তাঁদের বিষ রেখে দিতেন কংগ্রেস ও তার নেতাদের জন্য। তাঁরা অবশ্যই তাঁদের হিন্দু ও মুসলিম অনুগামীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বাড়িয়ে তুলতেন।

ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের সদাশয় দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় একত্রে মিলিত হতে অল্পই ইতস্তত করতেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, সিন্ধুপ্রদেশে ও বাংলাদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কংগ্রেস বিরোধী মন্ত্রীসভা গঠনে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বা আধা-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীদের সাহায্য করতেন।

একথাও পুনরায় বলা যায় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের একটি মাত্র। কখনো তা জাতিভেদপন্থী বা আঞ্চলিকতাবাদী রূপও ধারণ করত। অন্য সময়ে তা প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়াশীল রূপ নিত এবং প্রকাশ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্থদের পক্ষ সমর্থন করত। একই কারণে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, বিশেষত উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িক পর্বে, সাম্প্রদায়িক স্বত্বা ত্যাগ করে ব্যক্তিগত বা শ্রেণী স্বার্থের প্রয়োজন থাকলে অন্য কোনো স্বত্বা গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন। ফ্রান্সিস রবিনসন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সম্পর্কে যা বলেছেন তা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য ছিল :

> "তাঁরা এমন প্রশস্ত প্রাদেশিক, শ্রেণীভিত্তিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থসমূহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যার অনেকগুলিই কোনো সাম্প্রদায়িক বিভাজন জানত না। এই নির্দিষ্ট স্বার্থসমূহের উন্নতিসাধনের প্রয়াস বিভিন্ন মুসলিম রাজনীতিবিদ্ যখন উপযোগী হত তখন মুসলিম স্বত্বা গ্রহণ করলেন, আর যখন তার উপযোগিতা শেষ হত তখন তা ফেলে দিতেন। মুসলিম হওয়া যতটা ছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের অঙ্গ তার চেয়ে বেশী ছিল তাঁদের রাজনৈতিক তুণে একটি উপযুক্ত অস্ত্র···তাঁরা ইসলামীয় বিষয়সমূহের উপর সুবিধামত জোর দিয়েছেন, যখন সুবিধাজনক নয় তখন সেগুলিকে অগ্রাহ্য করেছেন।"[৭৯]

উপরন্তু, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, বিশেষত ১৯৩৭-এর পর, বিশেষ ধরণের লোকজনকে আকর্ষণ করত, অর্থাৎ যাদের রাজনীতির দিকে ঝোঁক ছিল, কিন্তু যারা রাজানুগত্যের রাজনীতি অনুসরণ করতে চায় নি তবু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে ভয়ও পেত, তাদের। ১৯৩৭-উত্তর হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক

গোষ্ঠী দলগুলির অদ্ভুত জঙ্গীভাব তাদের রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক তৃষ্ণা মেটাতো কিন্তু শক্তিশালী বিদেশী কর্তৃপক্ষের রোষ অর্জনও করত না।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল ও গোষ্ঠীদের মৌলিক ঔপনিবেশিকতাবাদ-পন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র এই ইঙ্গিতও দেয়, কেন জাতীয়তাবাদী শক্তিরা তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি বা তাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারে নি। সাধারণ প্রথা, কোনো না কোনো জাতীয়তাবাদী নেতাকে দোষ দেওয়া, কারণ তিনি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ঠাণ্ডা করার এক "সুবর্ণ সুযোগ'' হাতছাড়া করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে, অন্তত ১৯৪০ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে সব নির্দিষ্ট রক্ষাকবচ, সংরক্ষণ ইত্যাদির দাবী করেছিলেন তা এমন কিছু ছিল না যা জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে মিলিয়ে নেওয়া যেত না। সমস্যা উঠল যখন মূল্য হিসেবে চাওয়া হল যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন, জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার লক্ষ্য কার্যত ছেড়ে দিতে হবে বা কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনকে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ছেড়ে দিতে হবে। এই মূল্য সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্রেই নিহিত ছিল।

[আট]

বক্তব্য গুটিয়ে এনে বলা যায়: একটি সামাজিক আন্দোলনে বা রাজনৈতিক ধারায় অংশগ্রহণকারীদের, কর্মীদের, নেতাদের, এবং যে সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীরা ঐ আন্দোলন থেকে লাভবান হবে তাদের মধ্যে প্রভেদ থাকতে পারে। একটি আন্দোলনের বা একটি মতাদর্শের সামাজিক শিকড় থাকে সেই স্তর ও শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তিদের মধ্যে যারা, যাই হোক না কেন, এই আন্দোলন বা অনুরূপ আন্দোলন ও মতাদর্শদের বিকাশ ঘটাবে বা সমর্থন করবে কারণ তাদের স্বার্থে তাই প্রয়োজন। যেমন, জাতীয়তাবাদী, কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ প্রথম ক্ষেত্রে একজন হিউম বা মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি বিশেষ বা বুদ্ধিজীবী এবং অন্য দুটি ক্ষেত্রে আইনজীবী, মধ্যশ্রেণীভুক্ত র‍্যাডিকাল ও বুদ্ধিজীবীরা বা সংগঠিত রাজনৈতিক দল উপস্থিত থেকে তাদের সূত্রপাত না ঘটালে ও নেতৃত্ব না দিলেও হত। তাদের সূত্রপাত যেই ঘটাক না কেন বা যেই নেতৃত্ব দিক না কেন, যতক্ষণ তারা প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বা ভূস্বামী-বিরোধী বা ধনিক-বিরোধী দাবী ও লড়াই তুলে ধরত, তাদের সামাজিক শিকড় থাকত সমগ্র জাতির মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে বা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ, প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শ্রেণীগুলি ও মধ্যশ্রেণীদের অংশ ছাড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদের অস্তিত্ব থাকতে পারত কিন্তু তা ভারতে একটি প্রধান রাজনৈতিক

শক্তি হয়ে উঠতে পারত না, কারণ তা শ্রমিক, কৃষক, এবং মধ্যশ্রেণীদের ব্যাপক অংশের কোনো প্রকৃত দাবী বা লড়াইকে তুলে ধরে নি। অবশ্যই, একবার পূর্ববর্তী সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ব্যবহারযোগ্য বলে আবিষ্কার করার পর তারা বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতি ও সাধারণ মানুষের কোনো কোনো অংশের পশ্চাদ্‌পদ চেতনাকে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িকতাবাদের পিছনে সামাজিক সমর্থন জড়ো করেছিল। এইভাবে, ব্যাপক সাম্প্রদায়িক অনুগামীদের যেখানে জমায়েত করা হয়েছিল ভয়, ধর্ম, ইত্যাদির সাহায্যে, সেখানে সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব ও তাঁদের পিছনে দাঁড়ানো প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শ্রেণী ও স্তরগুলি এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ব্যবহার করেছিলেন গণতন্ত্র, সামাজিক পরিবর্তন ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার জন্য। এই হল নেহরুর উক্তির পূর্ণ অর্থ: "আর এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই দেশে হানা দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতাবাদের আচ্ছাদনে। সৎ সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল ভীতি; ছদ্ম সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া।"[৮০]

টীকা

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে জনগণকে রাজনীতির বাইরে রাখা ক্রমেই কঠিনতর হয়ে পড়ে। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিগুলি আর দৃশ্যমান সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল রূপ গ্রহণ করতে পারত না, জনগণকে তাদের চিন্তাজগত বহির্ভূতও রাখতে পারত না। সাম্প্রদায়িকতাবাদ তাদের দুটি লক্ষ্যই অর্জন করতে দিয়েছিল। এটা তাদের দিয়েছিল একটি মুখোশ এবং একটি গণভিত্তি।

২। বাস্তব বা সম্ভাব্য সর্বনাশের সম্মুখীন ভূস্বামীরা, এবং উচ্চতর আমলাতন্ত্রে ও পেশাক্ষেত্রে চাকরী ইত্যাদির সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণে মধ্যশ্রেণীদের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত ছিল তা এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে।

৩। যেমন, ১৯৪২-এ, মুসলিম লীগ সেন্ট্রাল কাউন্সিলের ৫০৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৬৩ জন ছিলেন ভূস্বামী। কে পি সাঈদ—পাকিস্তান-দ্য ফরমেটিভ ফেজ, ১৮৫৭-১৯৪৮, পৃঃ ২০৭। একথা হিন্দু মহাসভার ক্ষেত্রেও সঠিক।

৪। উপরন্তু প্রস্তুতির বাস্তব কাজের ভার নিতে হত পেটি বুর্জোয়া ব্যক্তিদেরই, কারণ জাগীরদারী ও আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিদের জীবনযাপনের চরিত্র যে জনগণ ও মধ্যশ্রেণীদের রাজনৈতিকভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হবে, তাদের সঙ্গে সামাজিক প্রভেদ সৃষ্টি করে দিত। একথাও মনে রাখতে হবে যে পেটি বুর্জোয়াদের অনেকে সামাজিক ও অর্থ নৈতিকভাবে জাগীরদারী গোষ্ঠীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। অন্যদিকে, ভূম্যধিকারী যে স্তর ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছিল তারা ক্রমেই তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থান দৃঢ়তর করার জন্য সরকারী চাকরীর দিকে তাকাচ্ছিল এবং এইভাবে পেটি বুর্জোয়াদের দলে প্রবেশ করছিল।

৫। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য সৈয়দ আহমদ খান, রাইটিংস অ্যাণ্ড স্পীচেস্, পৃঃ ২০৯-১০।

৬। যুক্তপ্রদেশ বিধানসভার মোট আসনের মধ্যে যেখানে কংগ্রেস জেতে ১৩৩টি, আগ্রা ও আউধের ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল পার্টিদ্বয়—ভূস্বামীদের দল—জয়লাভ করে ২৫টিতে,

যার মধ্যে ৬টি ছিল ভূস্বামীদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ আসন। মুসলীগ লীগ জেতে ৩০টি আসন এবং নির্দলরা ৩৮টি। লিবারালরা পায় ১টি. আর হিন্দু মহাসভা কোনো আসন লাভে অকৃতকার্য হয়। পি ডি রীভ্‌স্: "চেঞ্জিং প্যাটার্নস্ অফ পলিটিকাল অ্যালাইন-মেন্ট ইন দ্য জেনারাল ইলেকশন্‌স্ টু দ্য ইউনাইটেড প্রভিন্সেস লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলী, ১৯৩৭ অ্যাণ্ড ১৯৪৬", পৃঃ ১১৪-১৫।

৭। একই সঙ্গে, মুসলিম কৃষক, শ্রমিকশ্রেণী ও তরুণতর বুদ্ধিজীবীদের অংশ কংগ্রেসের এবং বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলির দিকে সরে যাচ্ছিল।

৮। ১৯৩৭-এ বামপন্থী কংগ্রেসকর্মীরা যুক্তপ্রদেশে মুসলিম লীগের সঙ্গে মৈত্রীর বিরোধিতা করেছিলেন তার অন্যতম কারণ ছিল যে এই মৈত্রী কৃষি সংস্কারকে বিপন্ন করবে।

৯। ভি ডি. সাভারকার, হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, পৃঃ ১৪১-৪২।

১০। এম এ. জিন্না, স্পীচেস্ অ্যাণ্ড রাইটিংস, খণ্ড ১, পৃঃ ২৮, ৩২ ও ৪২। গণ প্রচারের স্তরে লীগের লেখকরা কংগ্রেস ও নেহরু সম্পর্কে আরো উচ্চগ্রামে "লাল আতঙ্ক" ছড়াতেন। এ বিষয়ে দেখুন ডব্লু. "সি স্মিথ, মডার্ণ ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৩২২।

১১। ইন্দ্রপ্রকাশ, "এ রিভিউ…", পৃঃ ২০৪-এ ভাই পরমানন্দের উক্তি। অনুরূপভাবে ১৯৩৮-এ বি. এস. মুঞ্জে ঘোষণা করেন যে কংগ্রেসের কিছু কিছু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নেতা সাম্য-বাদের পক্ষে ছিলেন, যেখানে, "রুশ সাম্যবাদের গোড়ার কথা ধর্মকে ধ্বংস করা হওয়ার দরুণ· হিন্দু মহাসভা সাম্যবাদকে দেখে…"আজ সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর সামনে হাজির বৃহত্তম বিপদ' হিসাবে।" তিনি দাবী করেন যে হিন্দু মহাসভা "একদিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক হিসাবে আর অন্যদিকে সাম্যবাদের দানবকে আঘাত করার ও পর্যুদস্ত করার উপযোগী হাতিয়ার রূপে সহজে ব্যবহার্য সংগঠন হিসাবে সবসময়েই থাকবে।" ঐ, পৃঃ xvii-xix।

১২। ১৯৩৩ এ জওহরলাল নেহরু যেমন বলেছিলেন: "সাম্প্রদায়িকতাবাদের আড়ালে এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেশে হানা দিয়েছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় অপরকে যে ভয় পায় তার সুযোগ নিয়েছে।" নি রচ, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৬৪।

১৩। সৈয়দ আহমেদ খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৪।

১৪। ঐ, পৃঃ ২০৮-৯। মাদ্রাজের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানের আসন্ন জাতীয় কংগ্রেস অধি-বেশনের পরিপ্রেক্ষিতে। সৈয়দ আহমদ খাবার বলেছিলেন যে বৃটেনে পরিচালিত সর-কারী কৃত্যকের পরীক্ষায় "সমস্ত সামাজিক স্তরের মানুষ, ডিউক ও আর্লদের ছেলেদের দরজী ও নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদের ছেলেদের, সমানভাবে এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেওয়া হয়।" কিন্তু একটা বাঁচাবার উপাদান ছিল: "যারা ইংল্যাণ্ড থেকে আসে, তারা আসে এমন একটি দেশ থেকে, যা আমাদের দৃষ্টির অগোচর, বহু দূর দেশ, ফলে আমরা জানি না, তারা লর্ড ও ডিউকদের ছেলে না দর্জীদের ছেলে।" ঐ, পৃঃ ২০৭-৮।

১৫। ঐ, পৃঃ ২১০।

১৬। ঐ, পৃঃ ১৮১, ২৪৪: অনিতা সিং, "নেহরু অ্যাণ্ড দ্য কমিউনাল প্রব্লেম ১৯৩৬ ১৯৩৯", পৃঃ ১৯-২০। আরো দেখুন অনিল শীল, দি এমার্জেন্স অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্‌ম্, পৃঃ ৩২৭।

১৭। সৈয়দ আহমদ খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৬-৫৭।

১৮। ঐ, পৃঃ ২১০। এই চিন্তার গোড়ায় ছিল আরেকটি সাম্প্রদায়িক অনুমান: হিন্দু ও মুস-লিমদের স্বার্থ কেবল বিকিরণশীলই ছিল না, পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ছিল অতএব তারা "ক্ষমতায় সমান" থেকে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারে না। সৈয়দ আহমদ

বলেছিলেন, "তাদের একজন আরেকজনকে জয় করবে এবং নীচে নামিয়ে দেবে, এটা আবশ্যক।" ঐ, পৃঃ ১৮৪-৮৫।

১৯। ঐ, পৃঃ ২৪২।

২০। রাম গোপাল, ইণ্ডিয়ান মুসলিমস : আ পলিটিকাল হিস্ট্রী (১৮৫৮-১৯৪৭), পৃঃ ২০।

২১। কারণ, জাতীয় কংগ্রেস যদি সবকটি মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাবী মেনে নিত, তাহলেও ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যে সেগুলি পূরণ করা হবে বা রক্ষিত হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

২২। এম. এ. জিন্না, পূর্বোক্ত, খণ্ড ১, পৃঃ ৪২।

২৩। ঐ, পৃঃ ৮৯।

২৪। ঐ, পৃঃ ১১৭-১৮। এছাড়া দেখুন পৃঃ ১২৩।

২৫। ঐ, পৃঃ ১১৬-১৮, ১২৩-২৪, ১৩৯-৪০, ১৫১-৫২, ১৬১-৬২, ২১৭-১৯, ২৩৯-৪০, ২৫৩ ও অন্যত্র। গণতন্ত্রকে এইভাবে ক্রমান্বয়ে হেয় করা পাকিস্তানে ভয়ংকর ফল সৃষ্টি করেছিল। নেতৃত্ব, কর্মীবৃন্দ ও জনগণের এই ধরণের এক গণতন্ত্রবিরোধী মতাদর্শে সামাজিকরণ ছিল ১৯৪৭-এর পর পাকিস্তানে গণতন্ত্র এত সহজে ডুবে যাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রতিতুলনায়, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ১৮৮৫তে তার গোড়াপত্তনের সময় থেকেই গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতার মূল্যবোধের জন্য লড়াই করেছিল ও তার নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে তার আভ্যন্তরিকরণ ঘটিয়েছিল।

২৬। ভি ডি সাভারকার, হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, পৃঃ ১৭১-৭২। সাভারকার আরো বলেন : "বাস্তবে হিন্দু রাষ্ট্রগুলি হল সংগঠিত সামরিক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক হিন্দু শক্তির প্রায় এক-মাত্র কেন্দ্র এবং অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু জাতির নিয়তি গঠনে আমাদের বর্তমানে সাধ্য অন্য যে কোনো উপাদানের চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয় এবং অনেক নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে বাধ্য।" পৃঃ ১৭২। আবারও : "হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ও হিন্দু মানসম্মানের রক্ষাকর্তা রূপে তারা হিন্দুদেশের সংরক্ষিত শক্তি, হিন্দু বলের সংগঠিত কেন্দ্র গঠন করে…।" হিন্দু সংগঠন, পৃঃ ২১৪।

২৭। ইন্দ্র প্রকাশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ xxiv। হিন্দু মহাসভা তার নাগপুর অধিবেশনে ভারতীয় রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করে হিন্দু, রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ ও গোলমাল পাকিয়ে তোলার নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ১৯৩৮, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৪০।

২৮। ভি ডি. সাভারকার, হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, পৃঃ ২-৩, ১৭৩, ২৩১ ; হিন্দু সংগঠন, পৃঃ ২১৫-১৬।

২৯। বি আর টমলিনসন, দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য রাজ, ১৯২৯-১৯৪২, পৃঃ ১৩৯।

৩০। বি. শিভা রাও, "ইণ্ডিয়া, ১৯৩৫-১৯৪৭", পৃঃ ৪২০।

৩১। ভি. ডি সাভারকার, হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, পৃঃ ৭৮, ৯১-৯২।

৩২। এম. এ. জিন্না, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫-৭৬।

৩৩। বহু লেখক, এমনকি, বিস্ময়করভাবে, ডব্লু. সি স্মিথ (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৪) সহজেই ধরে নেন যে ১৯০৭-এ মুসলিম লীগের রাজনৈতিক পন্থা এবং ১৮৮৫-র পর নরমপন্থী জাতীয়-তাবাদীদের পন্থা ছিল অনুরূপ—যে উভয়েই ছিলেন নরমপন্থী, এবং লীগ ২০ বছর পরে নরমপন্থীদের রাজনীতির পুনরাবৃত্তি করছিল। বাস্তবে, এই দুটি রাজনীতি ছিল মূলগত-ভাবে ভিন্ন। নরমপন্থীরা ঔপনিবেশিকতার একটি মৌলিক অর্থ নৈতিক সমালোচনা করে-ছিলেন ও তা জনপ্রিয় করেছিলেন এবং গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দাবী উত্থাপন করেছিলেন, এবং ফলতঃ, রাজানুগত্যের কথা বলা সত্ত্বেও, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী ছিলেন। ১৯০৭-এ মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে সেরকম সমস্ত ঔপনিবেশি-

কতা-বিরোধিতা অনুপস্থিত ছিল। তার রাজনীতি পরিচালিত ছিল, যত মোলায়েমভাবেই হোক না কেন, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে নয়, বরং কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

৩৪। কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। (১) বহুক্ষেত্রে, যখন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা গোহত্যা বিরোধী আন্দোলন করত তখন তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের গোহত্যার বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ ফৌজের জন্য সেনা ছাউনীতে গোহত্যার বিরুদ্ধে নয়। বস্তুত, গোহত্যা এবং গো-রক্ষা সমিতিরা সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয় নি, বরং সাম্প্রদায়িকতাবাদ হঠাৎ গো-রক্ষার উদ্যোগ বাড়িয়ে তুলেছিল। (২) ১৯১১-তে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে অস্বীকার করেছিল। (৩) সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে ভাষার বিরোধিতা করত তা ইংরেজী ছিল না, ছিল পারসিক বা উর্দু বা হিন্দী।

৩৫। অবধারিতভাবে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অস্বীকার করত যে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ যে ছাড় দিয়েছে তার জন্য জাতীয়তাবাদী রাজনীতি দায়ী ছিল। যেমন, ১৯৩৮ সালে ভাই পরমানন্দ ১৩ অগাস্ট ১৯১৭-র ঘোষণাকে ব্রিটিশদের উপর রাষ্ট্রপতি উইলসন ও তার জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার প্রভাব বলার পর লেখেন : "এই ঘোষণা পূরণ করতেই ব্রিটিশ সরকার ছোটো ছোটো ধাপে ধাপে ভারতীয় জনগণের জন্য স্বশাসন বিস্তৃত করার পদক্ষেপ নিচ্ছেন।" অতএব, "সীমিত হলেও, এই যে সাংবিধানিক অগ্রগতি, এর জন্য কংগ্রেসের প্রতি আমরা ঋণী নই।" ইন্দ্র প্রকাশ, পূর্বোক্ত, মুখবন্ধ, পৃঃ xxxv-xxxvii।

৩৬। জওহরলাল নেহরু, নি র চ, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৬৫।

৩৭। বি এন. পাণ্ডে, দ্য ব্রেক আপ অফ বৃটিশ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১২-এ উদ্ধৃত।

৩৮। আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ আবার সক্রিয়ভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিদের মদৎ দিত ও তাদের প্রতিপালন করত। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক নির্ভরতা, সহায়তা ও বোঝাপড়ার সম্পর্ক। তার অর্থ একথাও, যে সময়ে সময়ে উভয়ের মধ্যে কড়াভাবে দর কষাকষি হত।

৩৯। কে. কে. আজিজ, পৃঃ ৭৩-৭৫।

৪০। এই দ্বিত্ব কেবল ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আমাদের সামনে আছে চিয়াং কাই-শেকের বিখ্যাত উদাহরণ। তিনি তীব্র বিদেশী-বিরোধী অনুভূতিপ্রাপ্ত ছিলেন, যা এমনকি তাঁর বই, "চায়নাস্ ডেস্টিনী"তেও অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। অথচ, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবনের প্রধান পর্বের জন্য একজন মৎসুদ্দি বা সাম্রাজ্যবাদের চরের ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাস্তবে, কিছু কিছু ভারতীয় সাম্প্রদায়িক নেতারা ছিল এক পূর্বে দৃঢ় জাতীয়তাবাদী, যথা, ভি. ডি সাভারকার, ভাই পরমানন্দ, কে. বি. হেগড়েওয়ার, এম. এ. জিন্না, খালিকুজ্জামান, মৌলানা শওকৎ আলী এবং হসরৎ মোহানী।

৪১। এম. এ. জিন্না, পূর্বোক্ত, খণ্ড ১, পৃঃ ৭৮।

৪২। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ১৯৩৩, খণ্ড ২ পৃঃ ২০৪-৬।

৪৩। দ্রঃ, তাঁর রাইটিংস অ্যাণ্ড স্পীচেস্, বিশেষত পৃঃ ১০২ ও তারপর, পৃঃ ১৮০ ও তারপর, ২০২ ও তারপর, ২১০ ও তারপর, ২৪৩। অবশ্যই, তিনি এই রাজানুগত্যের কাঠামোর বাইরেও মুসলিমদের উন্নতির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণ করে, যদিও এই শিক্ষাগত প্রয়াসেরও আনুগত্যের একটা দিক ছিল।

৪৪। দ্রঃ, বদরুদ্দিন তৈয়াবজীর প্রতি সৈয়দ আহমদের চিঠি : "আমি সংক্ষেপে বলব যে সাধা-

রণ নিয়ম হিসাবে যে কোনো রাজনৈতিক প্রশ্ন যা আলোচিত হতে পারে তা মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি বিপজ্জনক ও তাদের অনিষ্টকর, এবং তাদের কোনো রাজনৈতিক কংগ্রেসে অংশ নেওয়া উচিত নয়।" ঐ পৃঃ ২৪৩। আরো দেখুন আবিদ হুসেন, দ্য ডেস্টিনী অফ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস, পৃঃ ৩৮-৩৯।

৪৫। কে কে আজিজ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০। এছাড়া দেখুন এম এন ইসলাম বেঙ্গল মুসলিম পাবলিক ওপিনিয়ন অ্যাস রিফ্লেক্টেড ইন দ্য বেঙ্গলী প্রেস ১৯০১-১৯৩০, পৃঃ ৯৮-৯।

৪৬। কে. কে. আজিজ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩-এ উদ্ধৃত।

৪৭। নেহরুর বক্তব্য অনুসারে: "গান্ধীজি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রতিটি সাম্প্রদায়িক দাবী মেনে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, তা যত অযৌক্তিক ও অতিরঞ্জিতই হোক না কেন, এই শর্তে যে তাঁরা স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁকে পূর্ণ সমর্থন দেবেন। সেই শর্ত ও প্রস্তাব গৃহীত হল না এবং একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে পথে যে বাধা, তা সাম্প্রদায়িকতাবাদও নয় বরং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া।" নি রচ, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৬৭।

৪৮। দ্য স্টেটসম্যান, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩২-এর সংবাদ, নেহরু, নি. রচ, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৬৩-তে উদ্ধৃত।

৪৯। এম এ জিন্না, পূর্বোক্ত, খণ্ড ১ পৃঃ ২৬ ও ১৪৬।

৫০। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের রাজানুগত্য অবশ্য সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ রূপ নিতে পারত। যেমন, কংগ্রেসের প্রতি ব্যাপক মুসলিম সমর্থনের বিপদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করতে গিয়ে জিন্না ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে ভাইসরয় লিনলিথগোকে বলেন যে কেন্দ্রে ইংরেজদের যেমন ক্ষমতা ছিল তাই হাতে রাখা উচিত এবং ইংরেজরা যদি কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে মুসলিমদের 'রক্ষা' করে তবে মুসলিমরা কেন্দ্রে ইংরেজদের 'রক্ষা' করবে। এস গোপাল, জওহরলাল নেহরু-আ বায়োগ্রাফি, খণ্ড ১, পৃঃ ২৪০।

৫১। ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারীতে জিন্না বেশ 'লাজুক'ভাবে বলেন যে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ইংরেজদের ভারতে থাকতে হবে। জিন্না-লিনলিথগো কথোপকথনের রিপোর্ট আছে জেটল্যাণ্ডের প্রতি লিনলিথগো, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯, জেটল্যাণ্ড পেপারস খণ্ড ১৫, ৫ নং রীল।

৫২। এ বিষয়ে ঔপনিবেশিক নীতির উপর অধিকতর পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫৩। জিন্নার সঙ্গে ১২ জানুয়ারী ১৯৪০-এ এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লিনলিথগোর নোট, সেক্রেটারী অফ স্টেটের প্রতি ১৬ জানুয়ারী ১৯৪০-এ লিনলিথগোর চিঠির সঙ্গে পরিশিষ্ট আকারে যুক্ত, লিনলিথগো পেপারস, ৯ নং রীল।

৫৪। ঐ।

৫৫। লীগ ঔপনিবেশিক সরকারের জন্য কি কাজ করে দিচ্ছে জিন্নাও সে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না। জানুয়ারীর সাক্ষাৎকারে তিনি ভাইসরয়কে বলেন যে তাঁর শর্ত মেনে নিলে বড়জোর কংগ্রেস লীগের সঙ্গে চুক্তি করবে না। সেক্ষেত্রে, তিনি বলেন, ব্রিটিশরা কিছু হারাবে না, অর্থাৎ, ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে তাদের কোনো ছাড় দিতে হবে না। ঐ। ১৯৪১-এ লীগের অধিবেশনে তাঁর ভাষণে তিনি বলেন: "বৃটিশ সরকারের উচিত কংগ্রেস তাদের যে সর্বাধিক সম্ভব বিপাকে ফেলতে চেয়েছিল, তা থেকে বাঁচাবার জন্য মুসলিম লীগের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করা।" তিনি আরো বলেন "তাদের হৃদয়ের অন্তরতম কোণে বৃটিশ জনগণ মুসলিম লীগের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।" এম. এ. জিন্না, পূর্বোক্ত, খণ্ড ১, পৃঃ ২৬২।

৫৬। এস. এস. পীরজাদা, ফাউণ্ডেশনস অফ পাকিস্তান…, খণ্ড ২, পৃঃ ৫৫৭-৫৮ ও ৫৬০-এ উদ্ধৃত।

৫৭। জোর বর্তমান লেখক কর্তৃক আরোপিত।
৫৮। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ১৯৩৩, খণ্ড ২, পৃঃ ২০৪।
৫৯। নেহরু, নি. রচ, খণ্ড ২, পৃঃ ২০৪-এ উদ্ধৃত।
৬০। এই অধ্যায়ের টীকা ৪২ দেখুন।
৬১। লাল চাঁদ, সেল্‌ফ অ্যাবনেগেশন ইন পলিটিকস পৃঃ ii, v-vi।
৬২। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ১৯৩২, খণ্ড ২, পৃঃ ৩২৬।
৬৩। ঐ, ১৯৩৩, খণ্ড ১, পৃঃ ৪২৫।
৬৪। নেহরু, নি. রচ, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৬৮-তে উদ্ধৃত।
৬৫। ভি ডি. সাভারকার, হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন পৃঃ ৭৭ ও তারপর। তিনি বহুবার এই অভি-যোগের পুনরাবৃত্তি করেন, যথা, ১৯৪২-এ। ঐ পৃঃ ২৯৮।
৬৬। ঐ পৃঃ ২০৭ ও তারপর। তিনি আরো দাবী করেন যে 'বস্তুত, যুদ্ধের গোড়ায় হিন্দু মহাসভা উত্থাপিত দাবীগুলিকে সরকার বহুলাংশে পূরণ করেছেন" ঐ, পৃঃ ২১৭। গোপনে, সাভারকার ১৯৩৯-এর অক্টোবরে ভাইসরয়কে বলেন যে হিন্দুদের ও ব্রিটিশদের বন্ধু হওয়া উচিত, এবং প্রস্তাব করেন যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করলে হিন্দু মহাসভার কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে থাকা উচিত। ভাইসরয় কর্তৃক প্রতি লিনলিথগো, ৭ অক্টো-বর ১৯৩৯ জেটল্যাণ্ড পেপারস, খণ্ড ১৮, রীল নং ৬। এ ছাড়া দেখুন প্রভা দীক্ষিত, কমিউনালিসম এ স্ট্রাগল ফর পাওয়ার, পৃঃ ১৮৪-৮৫।
৬৭। প্রভা দীক্ষিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৬।
৬৮। এম এস গোলওয়ালকার, উই, পৃঃ ৬।
৬৯। ঐ, পৃঃ ২০।
৭০। ঐ, পৃঃ ৭০-৭২।
৭১। এম. এস গোলওয়ালকার, বাঞ্চ অফ থটস, পৃঃ ১৫০।
৭২। ঐ পৃঃ ১৫২। গান্ধীর প্রতি উল্লেখের ধারাবাহিকতায় গোলওয়ালকার বলেন: "একদা, সেকালের এক উল্লেখযোগ্য হিন্দু ব্যক্তিবিশেষ, একটি জনবহুল প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেছিলেন: 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া কোনো স্বরাজ নেই এবং এই ঐক্য অর্জন করার সহজতম পথ হল সমস্ত হিন্দুদের মুসলিম হয়ে যাওয়া'।" ঐ, পৃঃ ১৫১।
৭৩। ডি আর গয়াল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, পৃ. ৮৭। জাতীয়তাবাদ, এবং গান্ধী, নেহরু ও সুভাষ বসুর সঙ্গে সংঘের যোগসূত্রের মনগড়া কাহিনী শুনে, যা সংঘের উচ্চতর কর্মীরা সদস্য বৃদ্ধি অভিযানে বেরিয়ে প্রচার করতেন তা শুনে সংঘের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এমন এক ১৪ বছর বয়স্ক আর.এস.এস স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আমি গয়াল বর্ণিত আর.এস.এস.-এর তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচারে সঠিকতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি।
৭৪। ঐ, পৃঃ ৬৭।
৭৫। আর এস এস-এর রাজনীতি বিশ্লেষণে তার প্রাক্তন সদস্যদের জবানবন্দী বা সি আই ডি. রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করতে হয় কারণ তার কাজকর্ম গোপনীয়তায় ঢাকা ছিল। তার সমস্ত প্রচার, এমনকি শাখাগুলিতেও, ছিল মৌখিক। আর এস.এস-এর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত নীতি ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে বা এ বিষয়ে তার নেতাদের উক্তির কোনো পুস্তিকা বা বই ছিল না।
৭৬। রিপোর্টটি বক্তৃতানুসারে আরো বক্তা, পি সি সহস্রবুধে, একনায়কতন্ত্র, জার্মানীর ফুয়েরার নীতি ও মুসোলিনীর লীডার নীতির প্রশংসা করেছিলেন।
৭৭। হোম ডিপার্টমেন্ট (পলিটিকাল) প্রসিডিংস, এফ ২৮/৮/৪২-পল (১)।
৭৮। ঐ, এফ ২৮/৩/৪৩-পল (১)।
৭৯। ফ্রান্সিস রবিনসন, সেপারেটিসম্ আমঙ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্, পৃঃ ৩৫৩-৫৫।
৮০। জওহরলাল নেহেরু, নি রচ., খণ্ড ৬, পৃঃ ১৬৪।

৫

মতাদর্শগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের ভূমিকা ঃ ১

বহু সংখ্যক মতাদর্শগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। অনেক সময়েই সেগুলি ছিল তাকে অগ্রসর করার যন্ত্রপাতি ও সহায়ক শর্তাবলী। তাদের কিছু কিছু সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের হাতিয়ার ও পথ হিসাবেও কাজ করেছিল। কিছু কিছু ছিল সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের মৌলিক অঙ্গ। বস্তুত, কোনো কোনো লেখক সাম্প্রদায়িকতাবাদের কারণ হিসাবে এমন কিছু মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেন, যা হল সাম্প্রদায়িক চেতনার কতকগুলি দিক গ্রহণ করে নেওয়ার মতো। সাম্প্রদায়িক চেতনা বা তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদান সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যাখ্যা করে না; সেগুলি তার কারণ নয়। সেগুলিই একত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদ গঠন করে, এবং তাদের নিজেদেরই ব্যাখ্যা করা দরকার। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কারণের তত্ত্বসমূহে সেগুলি যে কারণ হিসাবে গৃহীত, তা দেখিয়ে দেয়, যাঁরা নিজেরা অন্যভাবে অ-সাম্প্রদায়িক, বা এমনকি সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী, তাঁরাও কত ব্যাপকভাবে, যদিও সাধারণতঃ অজ্ঞাতসারে, সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ গ্রহণ করেন। একটি উদাহরণ হয়তো এই বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলবে। বর্তমান অধ্যায়ে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে মতাদর্শগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি আলোচিত হয়েছে, অথবা অনুরূপ যে সমস্ত উপাদানকে অনেক সময়ে কারণ হিসাবে দেখানো হয়, তার প্রায় কোনোটিই ১৯৪৭-এর পর পাঞ্জাবে সক্রিয় ছিল না। বরং ১৯৪৭-এর আগে হিন্দু এবং শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে, এবং সময়ে সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরও বিরুদ্ধে, ঐক্যবদ্ধ ছিল। অথচ, এই দুই সাম্প্রদায়িকতাবাদ পরস্পরের বিরুদ্ধে ১৯৫০-এর এবং ১৯৬০-এর দশকে উগ্রভাবে

বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্পষ্টতই, সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদ্ভবের মূল কারণ তার সামাজিক উৎসে নিহিত রয়েছে।

এই মতাদর্শগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি প্রকৃতিগতভাবে কারণসম্পর্কীয় নয় বলার অর্থ একথা নয় যে তারা সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান ও বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। শুধু বলতে চাওয়া হচ্ছে যে সামাজিক কারণের অনুপস্থিতিতে তারা কখনোই সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্ম দিতে পারত না। প্রথমত, যেখানে একটি রাজনৈতিক-মতাদর্শগত ঘটনাব সামাজিক কারণ স্পষ্টতই দৃশ্যমান, সেখানেও এই সমস্ত উপাদানগুলিকে বুঝতে হবে ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কবতে হবে, এবং তাদের ব্যাপকতর যোগাযোগগুলি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেমন, উদাহরণস্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনগুলিতে বা শ্রেণীসংগ্রামসমূহে। এই প্রয়োজনীয়তা অধিকতব, যথা সাম্প্রদায়িকতাবাদের ক্ষেত্রে, যেখানে সামাজিক কার্য-কারণই ধোঁয়াটে এবং সহজবোধ্য নয়। দ্বিতীয়ত, যদিও এই উপাদানগুলি নিজে থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদের "সঙ্ঘটন" করতে পারত না, তা হলেও, তার সামাজিক উৎস থাকলে তারা নিয়ামক, বা অতিনির্ধারণকারী ভূমিকা পালন করতেও পারে।

১. জাতীয় চেতনার ব্যর্থতা

সাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধিতে একটি প্রধান উপাদান ছিল দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় চেতনার ধীর গতি, অসম এবং ত্রুটিপূর্ণ বিকাশ ও প্রসার। যে দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ভারতীয় জনগণকে একটি জাতি বা "জনগণে" পরিণত করবে, তার গোড়াপত্তন হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি ছিল এই জাতি-গঠনের (nation-in-the-making) ঘটনাটি। তা আবার এই ঘটনা ঘটার অন্যতম শক্তিশালী উপাদান ছিল। জনগণ কি পরিমাণে সচেতন হতে পারলেন যে তাঁরা একটি জাতির অংশ, যার মৌলিক স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল তার উপর এই ঘটনার শক্তি আংশিকভাবে নির্ভর করত। এই জাতিত্বের চেতনা—একটি জনগণ হওয়ার চেতনা—কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি থেকে যান্ত্রিকভাবে বেরিয়ে আসত না। তাকে হতে হয়েছিল নিজেদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে আবিষ্কার করার এক কঠোর, যন্ত্রণাদায়ক পথ। কিন্তু তার চরিত্রগতভাবেই, এই জাতি গঠনের প্রণালী ছিল এবং আজও রয়েছে, অতিমাত্রায় পার্থক্যমূলক প্রণালী। উপরন্তু, নতুন সামাজিক শ্রেণী ও স্তর গঠন এবং জনগণের উপর ঔপনিবেশিকতার প্রভাবও পার্থক্যমূলকভাবে ঘটেছিল। তার ফলে স্থান ও কাল,

উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে, এবং বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষাভিত্তিক এলাকা, ইত্যাদির মানুষের মধ্যে জাতীয় এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার অশান্ত অসম বিকাশ ঘটেছিল। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বকে প্রধান যে কর্তব্যগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার অন্যতম ছিল ভারতীয় জনগণকে একটি সাধারণ **জাতীয় চেতনা** প্রদান করা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা।

জাতীয় নেতৃত্ব যে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলি দুর্বলতা ছিল। তারচেয়েও বড় কথা হল, তাঁরা এই কর্মসূচীকেও জনগণের মধ্যে এমন তীব্র ও ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারেন নি, যা তাঁদের মনোগতভাবে, তাঁদের চেতনায়, সেই বিষয়গত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দেবে, যা হল তাঁদের সাধারণ স্বার্থের বিকাশমান একতা এবং ঔপনিবেশিকতা উচ্ছেদের এবং সমাজ বিকাশের পথ পরিষ্কার করার সংগ্রামে তাদের একটি জাতিতে পরিণত হওয়া।

আরো বিশেষ ও নির্দিষ্ট ছিল মুসলিম নিম্ন মধ্যশ্রেণীগুলিকে ও জনগণকে সংগঠিত করা এবং রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করাতে ব্যর্থতা। সেই কাজ সফলভাবে করা যেত কেবল তাঁদের একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে দেখানো যে সাম্প্রদায়িক পরিচিতি মিথ্যা এবং জাতীয় ও শ্রেণীগত পরিচিতি বাস্তব কারণ সেগুলি তাঁদের সামাজিক স্বার্থের প্রতিফলন এবং স্বার্থসিদ্ধি করে। সাধারণভাবে, জাতীয়তাবাদীরা সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম সংগঠিত করেন নি। নবগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন, কিষানসভা, ও অন্যান্য গণসংগঠন এবং বামপন্থী পার্টি ও গোষ্ঠীরাও জাতীয় নেতৃত্বের এই ব্যর্থতার অংশীদার ছিলেন। এখানে একটি যান্ত্রিক ও একপেশে উপলব্ধি জড়িত ছিল। মনে করা হত, যে একটি আধুনিক অর্থনীতির বিকাশ এবং ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব স্বয়ংচালিতভাবে জাতীয় এবং শ্রেণী সচেতনতার বিকাশের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু নতুন পরিচিতি এবং সচেতনতা লাভ করা একটি সচেতন প্রক্রিয়া হতে হয়, যা এক প্রশস্ততর এবং তীব্রতর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রক্রিয়ার অংশ। মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক বাস্তবতাকে ধরতে পারে না। তারা বিষয়গত সামাজিক বাস্তবতা এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে অবহিত হয় কেবল মতাদর্শের স্তরে। "মানুষ কী বিশ্বাস করে আর তারা কী করে থাকে তা হল স্ব-স্ব লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার অগণিত সংগ্রামে বহু রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব আনয়ন ও সংগঠনের প্রণালীর ফল। সামাজিক বিভাজন [এবং জাতীয় বিভাজনও], সামাজিক

পৃথকীকরণের প্রত্যক্ষকরণ, কখনোই আমাদের সচেতনতায় সরাসরি প্রদত্ত হয় না। সামাজিক পৃথকীকরণ বিভাজনের মর্যাদা পায় মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ফল হিসাবে।"[১] যেহেতু আধুনিক অর্থনীতি ও রাজনীতি মানুষকে ব্যাপকতর যৌথ পরিচিতির ভিত্তিতে সংগঠিত হতে বাধ্য করে, তাই জাতীয়তা ও শ্রেণীর ভিত্তিতে সেরকম সংগঠন না হলে তা অন্য কোনো ভিত্তিতে হবে, যথা ধর্ম, ধর্মীয় গোষ্ঠী, ভাষা, অঞ্চল, 'রেস', নবগোষ্ঠী ভিত্তিকতা, জাতপাত এমনকি পেশা ও কাজের ধরণ।

অনুরূপভাবে, জাতীয়তাবাদীরা জনগণের কাছে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আবেদন করেছিলেন তার জাতীয়তা-বিরোধী চরিত্রের ভিত্তিতে। কিন্তু সেরকম জাতীয়তাবাদী আবেদন যে জনগণের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারেনি, তার কারণ হল জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির অভাব, অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক বিদ্যমানতার অনুপস্থিতি। জনগণের এক বৃহদংশের ক্ষেত্রে, এমন কোনো বিদ্যমান চেতনা ছিল না, যার কাছে আবেদন করা যেত। অন্যদিকে তাঁরা যে ধর্মীয় উপাদানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তার ফলে সাম্প্রদায়িকতা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হত। সুতরাং কেবল জাতীয়তাবাদের নামে আবেদন করা যথেষ্ট ছিল না, বরং জাতীয় চেতনার প্রজনন ও প্রসার ঘটানো আবশ্যক ছিল।

ফলতঃ, ভারতীয় সমাজের কতকগুলি এলাকায় ও কতকগুলি অংশে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশ ঘটেছিল নতুন জাতীয় চেতনা ও শ্রেণী চেতনা বিকাশের ব্যর্থতার দরুণ। এতদনুসারে, সামাজিক পরিবর্তনের অবস্থায় প্রাচীন পরিচিতি ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলি যথেষ্ট না হওয়ায় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যাপকতর গোষ্ঠী ও দ্রুত রাজনৈতিকরণের প্রয়োজনীয়তার অবগতি ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদ (সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা) ও শ্রেণীর প্রকৃত চেতনা দিয়ে সেই শূন্যতা পূরণ করা হল না, বরং, বহু ক্ষেত্রেই, হল সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের পরিচিতি দিয়ে। সেগুলি নিজেদের ভিত্তি স্থাপন করেছিল পুরাতন, সুপরিচিত ও সহজবোধ্য ধর্মীয় বা জাতভিত্তিক সম্বন্ধের উপর। নবজাগ্রত রাজনৈতিক উপলব্ধি প্রবাহিত হওয়ার যথাযোগ্য প্রণালী সরবরাহ করায় জাতীয়তাবাদী ব্যর্থতা অনিবার্যভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে (এবং জাতিবাদকে) ঐ উপলব্ধিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার সুযোগ দিয়েছিল, বিশেষ করে জনগণের রাজনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ অংশগুলির মধ্যে। জাতীয়তা, জাতিত্ব ও শ্রেণীর নতুন ঐক্য ও পরিচিতিসমূহ ছিল জনগণের প্রয়োজনীয়; কিন্তু বাস্তব জীবনে জাতীয়তা ও শ্রেণীর ঐক্য, যৌথ পার্টিচাত বা সাংগঠনিক নীতি অনেক সময়ে জনগণের মধ্যে যথাসময়ে গভীরভাবে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের অনুপস্থিতিতে, জনগণ ব্যাপকতর ঐক্য, যোগাযোগ এবং পরিচিতির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, যেগুলি তাঁদের

পরিবর্তনশীল ঔপনিবেশিক জগতকে বুঝতে ও তার সঙ্গে তুল্যমূল্যভাবে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে দেবে। অনিবার্যভাবে, তাঁরা নতুন রাজনৈতিক জীবনের জন্যও অতীতের চেতনার কিছু কিছু দিকের সাহায্য অবলম্বন করেন, যেগুলি পূর্বতম সাংস্কৃতিক পরিভাষাভিত্তিক, এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আগে থেকে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার নীতি ও সংগঠনের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। অবশ্যই, এর ফলে কোনো প্রাচীন ঐক্য বা পরিচিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং এক নতুন সাম্প্রদায়িক (বা জাতভিত্তিক) চেতনার সমৃদ্ধি হয়েছিল। তা এই প্রাচীনতর চেতনার ভেক ধরেছিল, এবং তার কয়েকটি দিকের প্রতি আবেদন করেছিল। সুতরাং, যেখানে জাতীয়তাবাদ অগ্রসর হতে পারত না, সেখানে ধর্ম ও জাত, মানুষের দুটি পুরোনো সহায়, হতে পারত। এই দিক থেকে সাম্প্র-দায়িকতাবাদকে দেখা যায় জাতীয় এবং শ্রেণীগত চেতনা বিস্তারের জন্য একটি সঠিক এবং দৃঢ় মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করায় বিফলতার শাস্তি হিসাবে।

এটা লক্ষ্যণীয় যে যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জোয়ার আসত, যখন আশার দিন দেখা যেত, তখন সাম্প্রদায়িকতাবাদ পিছু হঠত, আর যখন এই সংগ্রামে ভাটা দেখা দিত এবং আশা ব্যর্থ হত তখন তা জোয়ারের মত এগিয়ে যেত। এইভাবে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তিনটি প্রধান ঢেউয়ের সময়ে সাম্প্রদায়িকতা ছিল সুপ্ত। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত বছরগুলি ছিল সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, উভয়েরই সুখকর সময়। ১৯২৬-এর পর বামপন্থার উত্থান, ট্রেড ইউনিয়নদের এবং যুব আন্দোলনের বৃদ্ধি, এবং সাইমন কমিশন বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন আবার জনগণকে উদ্দীপিত করে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কমিয়ে দেয়। ১৯৩০-৩৪-এ আইন অমান্য আন্দোলন গোটা দেশে ঝড় বইয়ে দেয়। হিন্দু ও মুসলিম সকলেই ব্যাপক সংখ্যায় এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িক দলগুলি ও নেতারা হয় কার্যত অবসর গ্রহণ করেন অথবা ইতস্ততভাবে জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেন। আইন অমান্য আন্দো-লন সর্বপ্রথম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সমৃদ্ধ নতুন দুটি বড় অঞ্চলকে গ্রাস করে—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর। তদুপরি, ১৯২০-র দশকের শেষে ও ১৯৩০-এর দশকে ক্রমবর্ধমানভাবে হিন্দু, শিখ ও মুসলিম যুবক ও শ্রমিকরা, এবং অনেক এলাকায় কৃষকরা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য তাকাচ্ছিলেন কমিউনিস্ট-দের, সমাজতন্ত্রীদের, নওজোয়ান ভারতসভার, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের, এবং নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর দিকে। মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, আর.এস.এস. এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সংগঠনদের প্রভাব ছিল ন্যূনতম। বস্তুত, এই সময়ে তাদের কোনোটিই এমনকি নিম্ন মধ্যশ্রেণীদের মধ্যেও কোনো গণভিত্তির অধি-

কারসম্পন্ন ছিল না। ১৯৪২-এও, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রতি মুসলিম লীগের দৃঢ় বিরোধিতা সত্ত্বেও কোনো সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হয় নি।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সক্রিয় হত কেবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন তার নিষ্ক্রিয় পর্যায়গুলিতে অবতীর্ণ হলে। ১৯২২-এর পর, এবং ১৯৩৪-এর পর, আইনসভায় কাজ এবং গঠনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ সত্ত্বেও, জাতীয় নেতৃত্ব জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্য খুব কমই বহির্গমন পথ সরবরাহ করতে পেরেছিলেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে এমন কি সেরকম পথও ছিল না। এক বছরে স্বরাজ আসার স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে যাওয়ায় আশাহত, বিক্ষুব্ধ ও মোহমুক্ত হওয়ায় জনগণ দেখলেন যে তাঁরা, এক ইতিহাসবিদের ভাষায় "সেজেগুজে তৈরী হয়েছেন কিন্তু যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।" তার ফলেই সাম্প্রদায়িক তিক্ততা মাথা তোলার জন্য উপযোগী শর্তাবলী সৃষ্ট হয়েছিল। এই স্তরে সরকার, বিত্তবান শ্রেণীগুলি এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলরা মধ্যশ্রেণীদের রাজনীতির উপর সাম্প্রদায়িক রং চড়াতে সফল হয়েছিল এবং জনগণের নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য যে প্রাথমিক ও সহজাত সংগ্রাম, এবং তাঁদের যে নবজাগ্রত রাজনৈতিক আবেগ, তাকে বিপথগামী করে সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত করতে পেরেছিল। উপরন্তু, ১৯২২-এর পরের সংসদীয় রাজনীতি, যা সীমিত সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকারের উপর ভিত্তি করেছিল, তার ফলে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার কার্যত একচেটিয়া অধিকার ছিল মধ্যশ্রেণীদের ও ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত এলিটদের। ফলে মধ্যশ্রেণীগুলি কার্যত সংসদীয় নেতাদের ভবিষ্যতের বিচারকে পরিণত হয়েছিল।[২] এইবার দলে দলে 'হিন্দু', 'মুসলিম', 'শিখ' ও 'খ্রীস্টান' নেতারা জাতীয়তাবাদীদের ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে উদ্ভূত হলেন। তা সত্ত্বেও, অসহযোগ আন্দোলনের বিলীয়মান রেশ এতই শক্তিশালী ছিল যে সাম্প্রদায়িক নেতাদের সামাজিক ভিত্তি আবদ্ধ ছিল সমাজের মধ্য ও উচ্চ স্তরের কিয়দংশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে।

১৯৩১-এ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার ফলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা আবার মঞ্চে উপস্থিত হতে পারলেন। এই পর্যায়েই ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব ঘোষণা করল যে সাংবিধানিক অগ্রগতি হওয়ার আগে যে মূল রাজনৈতিক প্রসঙ্গের সমাধান করতে হবে তা হল সাম্প্রদায়িকতাবাদ। গোলটেবিল বৈঠকগুলিতে তারা বাছাই করা সাম্প্রদায়িক নেতাদের বিচরণের সুযোগ করে দিল; এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব ফাঁদে পা দিলেন। ১৯৩৬-৭ সালে নেহরু ও অন্যান্য নেতাদের সক্রিয় গণ প্রচার অভিযান আবার জনগণকে জাগ্রত করল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০-এর সংসদীয় রাজনীতির অনিবার্যভাবে অনেক বেশী নিষ্ক্রিয় পর্বে, যখন তীব্র রাজনৈতিক মতাদর্শগত কাজ সঙ্গে আসেনি, তখন সাম্প্রদায়িক শক্তিরা কিছুটা পরিমাণে বাড়তে পেরেছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের, এবং আর.এস.এস.-এরও প্রকৃত অর্থে দ্রুত উত্তরাঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল কেবল

১৯৪২-এর পর যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন দমন করা হল, কংগ্রেস নেতৃত্ব জেলের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেন, কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিক ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধকে কীভাবে সমর্থন করতে হবে এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের চরিত্র কীরকম, তার ভ্রান্ত উপলব্ধির ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণ আন্দোলনের নেতৃত্বে আসতে এবং সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সংগ্রাম সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, এবং ভারতীয় উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন মধ্যশ্রেণীগুলি যুদ্ধসংক্রান্ত চাকরী, কণ্ট্র্যাক্ট ও চড়া মুনাফার ফসল ঘরে তোলার জন্য জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে বর্জন করেছিল।

জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করার ও প্রসার ঘটানোর প্রয়াসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও লক্ষ্য করতে হবে। তা ছিল জনগণের মধ্যে এক নতুন, আধুনিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং এই প্রয়াসের অংশ হিসাবে তাদের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মেজাজ ছড়িয়ে দেওয়া। তার কারণ হল, বিদ্যমান, পরম্পরাগত, ধর্ম ও জাতভিত্তিক সংস্কৃতি এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক ও অনুরূপ অন্যান্য রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা দেখাতো। এই জন্যই, যখন জাতীয়তাবাদীদের কোনো কোনো অংশ, খিলাফৎপন্থী উলেমা, জঙ্গী আকালীরা এবং কিছু গোড়া হিন্দু, সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধিতা করেছিলেন পূর্বতন, অ-সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় চেতনার কাছে আবেদন করে, তখন তাঁরা সফল হতে পারেন নি। বরং, তাঁরাই সাম্প্রদায়িকতাবাদের বন্দী হয়ে পড়লেন। তাঁরা পুরানো সংস্কৃতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতাবাদের পথ খোলা রাখলেন।

উপরন্তু, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার এক সক্রিয় প্রয়াসের উপর ভিত্তি করে হওয়ার দরকার ছিল। তা স্বয়ংচালিতভাবে—'সময় কালে'—দেখা দিত না, যেমন বিশ্বাস করেছিলেন কিছু যান্ত্রিক বস্তুবাদী। তাঁরা মনে করতেন যে তা হত শিল্প-বিকাশ, শিক্ষা, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলন এবং নির্বাচনী বা নির্বাচন-সংক্রান্ত নয় এমন রাজনৈতিক কার্যকলাপের মত 'আধুনিকীকরণের শক্তি'র ফলে। আসলে বরং আধুনিক সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের জন্য সংগ্রামের অবর্তমানে এই সমস্ত আধুনিকীকরণের শক্তিগুলিকেও থামিয়ে দেওয়া যায়, কারণ সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা তখন 'পাল্টা আঘাত' করে। একথা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে কংগ্রেসী এবং বামপন্থী নেতারা সক্রিয়ভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য সচেষ্ট থাকলেও, তাঁরা কোনো স্তরে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে একটি সক্রিয় ও গণ রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম বা প্রচার অভিযান সংগঠিত করেন নি। যদিও তাঁরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে দেখেছিলেন, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত একটি শক্তিধর শত্রু হিসাবে দেখা হয় নি। ততদিনে বড় বেশী দেরী হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন যে জাতীয়তা-

বাদ এবং শ্রেণী সচেতনতা যত বিকাশপ্রাপ্ত হবে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ততই নিজের অন্তর্নিহিত মিথ্যা ও সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তির ফলে মৃত্যু মুখে পতিত হবে। এখানে যা জড়িয়ে ছিল, তা হল বাস্তবতার সঙ্গে জনগণ কর্তৃক তার মনোগত অবধারণের সম্পর্কের এক নির্মিত্তবাদী রূপ। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ যেহেতু জনগণের স্বার্থের প্রতিফলন করে না, তাই জনগণ তার দ্বারা গুরুতরভাবে প্রভাবিত হবেন না, বিশেষত যদি অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ সামনে আসে সেক্ষেত্রে তো নয়ই।[৩] তাঁরা আরো বিশ্বাস করতেন যে শ্রেণী সচেতনতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভা, ইত্যাদির বিকাশ স্বয়ংচালিতভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে উচ্ছেদ করে দেবে। প্রয়োগক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক চেতনার রূপান্তর ঘটানোর সচেতন প্রয়াসের অনুপস্থিতিতে, এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভার সক্রিয় সদস্যরাও ধার্মিক মনোভাব, জাতপাতের চেতনা, ইত্যাদি পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্মরণে রেখেছিলেন, সাম্প্রদায়িক আবেদনের প্রতি উন্মুক্ত ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে সাম্প্রদায়িক আবেগের শিকারে পরিণত হতেন।

বাস্তবে, একবার সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের পত্তন হলে, সক্রিয়ভাবে তার বিরোধিতা না করলে তা আপন বলে বিকশিত হতে থাকতো। একবার বিকশিত হলে তাকে তোষণ করা যেত না, বিরোধিতা করতেই হত। তখন, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কোনোরকম ছাড় না দেওয়ার নীতি মুসলিম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীদের বাড়তে সাহায্য করত, আর তাদের কোনোরকম গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা দিলে তীব্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত। তাছাড়া, এই সুবিধা কেবল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের লালসা বাড়িয়ে তুলত, ফলে যাদের তুষ্ট করা হল সেই গোষ্ঠীরা ও নেতারা ক্রমেই আরো উগ্রপন্থীদের সামনে হঠে যেত। সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের দুর্বলতার একটি অংশ হল কংগ্রেসকে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে দৃঢ়ভাবে স্বতন্ত্র রাখার ব্যর্থতা। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগ নেতা ও সদস্যদের কংগ্রেসে যোগদান করতে দেওয়া হত। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত, সাম্প্রদায়িকতাবাদের মোকাবিলা করার পরিবর্তে কংগ্রেস বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও দলের মধ্যস্থ করতে চেষ্টা করত, এবং সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে, ও তাদের মধ্যে, আপস-মীমাংসার আয়োজন করত। কানপুর দাঙ্গা তদন্ত কমিটির ভাষায় :

> কংগ্রেস এই প্রয়াসগুলিতে যে স্থান অধিকার করেছিল তা হল মধ্যস্থের স্থান, এবং নিহিতার্থে উভয় পক্ষের চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তাদের স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেস যত মীমাংসার আশায় তাদের আঁকড়ে ধরে ছিল, ততই জাতির পক্ষে সাম্প্রদায়িক

বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তার নিজের যে অনস্বীকার্য অধিকার ছিল তা ত্যাগ করেছিল। ফলে, সাম্প্রদায়িক বিষয়ে প্রকৃত নেতৃত্বের জন্য প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য সমরের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে চূর্ণ করে দেওয়ার পরিবর্তে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উপর অধিকতর গুরুত্ব ও মর্যাদা অর্পণ করেছিল। এই পন্থা শেষ অবধি নিষ্ফল হতে বাধ্য ছিল, কারণ সমাজের অপেক্ষাকৃত স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিদের নিজেদের মতামত জোরের সঙ্গে তুলে ধরার এবং সংগঠিতভাবে উভয় পক্ষের সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের ক্ষতিকর কার্যক্রম দমন করার সুযোগই এই পথে আর রইল না।"[৪]

পববর্তীকালেও, অর্থাৎ ১৯৩৬-এর পরে, যখন সাম্প্রদায়িক শক্তিদের মাঝে মধ্যস্থতা করা এবং তাদের তোষণ করার নীতি ত্যাগ করা হল, তখনও মুসলিম লীগের সঙ্গে আপস-মীমাংসা চলে, এবং লীগ ও তার বৃদ্ধি প্রতিরোধে বলিষ্ঠ সংগ্রামের চেষ্টা খুব কমই হয়েছিল। বাস্তবে, কংগ্রেস মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক স্তরে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি জীবন্ত ও কার্যোপযোগী রণ-নীতি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের আরেকটি মাত্রা ছিল। প্রাথমিক-ভাবে, ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রসার হয়েছিল হিন্দু উঁচু জাতের বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীগুলির মধ্যে। তার ফলে, জাতীয়তাবাদের একটি প্রধান স্রোত পরম্পরা-গত হিন্দু উচ্চজাতির সংস্কৃতির উপাদানসমূহের ('সুমহান ঐতিহ্য') সঙ্গে বিভিন্ন বলে পরিচিত হয়ে পড়েছিল। অবশ্যই, অন্যান্য স্রোত এই ঐতিহ্য থেকে ভেঙে বেরোনোর এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং আরো স্পষ্টভাবে সাংস্কৃতিক স্তরেও আধুনিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদান আত্মভূত করার প্রবণতা দেখাতো। কিন্তু মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, উপজাতির জনগণ এবং নীচুজাতের হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরম্পরায় জাগ্রত হয়েছিলেন, যেগুলির চরিত্র অনেক সময়ে ছিল স্থানীয় ('ক্ষুদ্র ঐতিহ্য'), যদিও, মুসলিমদের এক নিজস্ব 'মহান ঐতিহ্য' ছিল। ফলে, তাঁরা অনেকে জাতীয় আন্দোলনের এক বৃহৎ অংশের উচ্চবর্ণ সাংস্কৃতিক পরিভাষার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করতেন। তাঁদের কেউ কেউ জাতীয় আন্দোলনের বামপন্থী অংশের দিকে বা বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলির দিকে ফেরেন। আরো অনেকে জোট বাঁধেন সাম্প্রদায়িক, জাতিবাদী, এবং উচ্চবর্ণ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে ঘিরে। ফলে, জাতীয় আন্দো-লনের পক্ষে আবশ্যক ছিল নিজের উচ্চবর্ণ হিন্দু সাংস্কৃতিক উপাদানকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণভাবে তার পরম্পরাগত সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী দিক-গুলির সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির স্বাস্থ্যকর একীকরণের উপর ভিত্তি করা।

বিভিন্ন পরম্পরায় এই দ্বিভাজনের অন্যতম ফল ছিল এই যে হিন্দুদের মধ্যে,

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও সত্বর আবিষ্কার করল যে "মহান্ ঐতিহ্য" চাপিয়ে দেওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টা হিন্দু সাম্প্রদায়িক পরিচিতি গঠনের প্রয়াসকে টুকরো টুকরো করে ফেলার প্রবণতা দেখায়, ফলে তারা উত্তরোত্তর হিন্দু সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে থাকে সবচেয়ে অস্পষ্ট ভাষায়, বিশেষত যখন চেষ্টা হত স্থান, অঞ্চল, জাত ও শ্রেণীগতভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য প্রশস্ততর ভিত্তি অর্জন করার।

অনুরূপভাবে, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারবাদীরা যখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি গ্রহণ করতেন তখন তাঁদের সংস্কারপন্থী আগ্রহে জল মেশাতেন, এমনকি তা ত্যাগ করতেন, কারণ সংস্কার অনিবার্যভাবে তাঁদের গোঁড়াদের সঙ্গে সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যেত এবং তাঁদের গণভিত্তি সংকীর্ণ করে দিত। যেমন, উত্তর ভারতে এক বড় সংখ্যক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী-রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের কাছে এসেছিলেন আর্যসমাজের মাধ্যমে, কিন্তু তাঁরা দ্রুত রক্ষণশীল মূর্তি-উপাসক সনাতনপন্থীদের খুশী রাখার জন্য প্রকাশ্যে আর্য সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক মত-বাদ প্রচার করা বন্ধ করে দেন। আজ উত্তর ভারতের এক সাধারণ দৃশ্য ব্যক্তি-গতভাবে আর্যসমাজপন্থী এবং তার ফলে মূর্তিপূজার বিরোধী আর.এস এস. নেতৃ-বর্গ কর্তৃক সারারাতব্যাপী ভাগবতী জাগরণ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করা। অনুরূপ-ভাবে, এ কথা সুবিদিত যে সৈয়দ আহমদ খান একবার মুসলিমদের নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করতে মনস্থির করার পর তাঁর ধর্মসংস্কারমূলক ক্রিয়া ত্যাগ করে-ছিলেন, এমন কি মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে অস্বীকার করা ইত্যাদি সামাজিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল প্রথার রক্ষক হয়েছিলেন। কবি ইকবালও একবার প্রকাশ্যে সাম্প্র-দায়িক রাজনীতি গ্রহণের পর তাঁর র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ও মতাদর্শগত অবস্থান ছেড়ে দিয়ে গোঁড়া আন্দোলনসমূহকে সমর্থন করতে আরম্ভ করেন।

এই আলোচনার সমাপ্তিতে বলা যায় : নতুন, আধুনিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি নতুন জাতীয় চেতনা সৃজনে জাতীয়তাবাদী প্রসাসের অযোগ্যতার ফলে সাম্প্রদায়িক ও জাতিবাদী মতাদর্শ আর চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং তার ফলে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের সংহতিনাশ হয়েছিল, আর, জাতি গঠনের পথের (বা জাতীয় সংহতি) অসম্পূর্ণ, অসম এবং মন্থর প্রক্রিয়া এবং সাম্প্রদায়িকতা-বাদের মধ্যে এক ধরণের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছিল। একদিকে, এই প্রক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে অংশত সাহায্য করেছিল, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ আংশিকভাবে এই অসম্পূর্ণতার জন্য দায়ী ছিল।

২. হতাশা, ভীতি এবং সংখ্যালঘু মানসিকতা

হতাশা ও ভীতি ঃ ঔপনিবেশিকতা এবং ধনতন্ত্র ভারতীয় সমাজের বহু অংশের, জমিদার, কৃষক, মধ্যশ্রেণীসমূহ ও কারিগর, মধ্যে যে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাবোধের লালন করেছিল, তা ছিল অযৌক্তিক মতাদর্শসমূহ বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধাজনক। জনগণ বোধ করতেন এক ধোঁয়াটে অভাববোধ, অর্থ নৈতিক কষ্ট, হতাশা, অসন্তোষ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক আক্রোশ। তাঁদেব বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে, এবং সময়ে সময়ে তাঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা এবং ক্রমেই গভীরতর উদ্বেগজনক অনুভূতি তাঁদের মন ভরিয়ে ফেলেছিল। ১৯৩০-এর এবং ১৯৪০-এর দশকে মন্দা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এই অনুভূতিগুলিকে তীব্রতর ও গভীরতর করেছিল।

এটা বিশেষভাবে সত্য ছিল মধ্যশ্রেণীগুলি সম্পর্কে তারা সর্বক্ষণ তাদের অর্থনৈতিক স্থান এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি হুমকির, এবং তাদের পরিচিতি ক্ষয়ের ও এমনকি তা হারানোর বিপদের সম্মুখীন ছিল। তাদের জগতটাই যেন তাদের চারদিকে ভেঙে পড়ছিল। উচ্চতর জাতিগুলির ক্ষেত্রে মর্যাদাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতিব্যবস্থার আংশিক ভাঙন ও কিয়দংশে একই কাজ করেছিল।

হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা এবং উদ্বেগের এই সাধারণ আবহাওয়াতে অনাস্থা, ভয় এবং চেপে রাখা হিংস্রতা ও ঘৃণার অনুভূতির বাহুল্য হওয়া ছিল সহজ। বস্তুত, এরকম এক সমাজে, এবং এমন এক পরিস্থিতিতে, হিংস্রতা উপরিতলের খুব কাছেই থাকত। জাত, ধর্ম, অঞ্চল ও ভাষা প্রতিশ্রুত সংহতির একটা নির্দিষ্ট আবেদন ছিল, কারণ তারা উদ্বেগ হ্রাস করতে পারত।[৫]

কেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম, শিখ এবং খ্রীষ্টানরা নয়, এমনকি হিন্দুরাও এই উদ্বেগ সমানভাবে বোধ করত, এবং ভয় ও হিংস্রতার আবহাওয়া অনুভব করত। এ দিক থেকে মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভয়ের মনস্তত্বের ভূমিকা। বঞ্চিত হওয়ার, অতিক্রান্ত হওয়ার, 'হেরে যাওয়ার', বিপন্ন হওয়ার, কর্তৃত্বাধীন হওয়ার, অবদমিত হওয়ার, মার খাওয়ার, এমন কি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার—নিজের পরিচিতি, এমন কি প্রাণ হারানোর—ভয় ছিল ব্যাপক।

রাজনৈতিকভাবে গতিশীল পরিস্থিতিতে এই সমস্ত অসন্তোষ, ভয় ও ক্রোধ—প্রকাশ পেয়েছিল জাতীয় ও অন্যান্য গণ আন্দোলনে। পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী এইসব আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তা দেখাচ্ছিল এবং অনেক সময়ে সেগুলির প্রধান সৈন্যবাহিনী ছাড়াও, প্রধান সংগঠক ছিল। জাতীয় কংগ্রেস, এবং কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি র‍্যাডিক্যাল বামপন্থী দল ও গোষ্ঠী,

এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা নিম্ন মধ্যশ্রেণীদের এই হতাশার উপরেই জাঁকিয়ে বসতে পারত এবং তা করত।

কিন্তু জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের তিনটি ঢেউয়ের—১৯২০-২২, ১৯৩০-৩৪, ১৯৪২-৪৩—পরিসমাপ্তি জনগণের, বিশেষত পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর, ইতিমধ্যেই হতাশাগ্রস্ত অস্তিত্বে রাজনৈতিক হতাশা ও অসহায়তা যোগ করেছিল।[৬] সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা পেটি বুর্জোয়াদের ও অন্যান্য সামাজিক স্তরের বাস্তব জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ, হতাশা ও ভয়কে ব্যবহার করতে পেরেছিল অন্যান্য ভারতীয় গোষ্ঠীদের—সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যাদের এই বঞ্চনা ইত্যাদির জন্য দায়ী সাব্যস্ত করেছিল—আক্রমণ করার জন্য। নিম্ন মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি, ব্যক্তি হিসাবে বা একটি শ্রেণীর সদস্য হিসাবে নিরাপত্তা পেতে বা পরিচিতি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে এবং জাতীয় আন্দোলনের ভাটার ফলে, ধর্মীয় বা জাতিভিত্তিক গোষ্ঠীতে নিরাপত্তা খুঁজেছিল, এই আশায় যে পুরোনো পরিচিতি বজায় রাখার ছদ্মবেশে সে একটি নতুন পরিচিতিও অর্জন করবে।

সাম্প্রদায়িক নেতারা জনগণ অনুভূত উদ্বেগ ও ভয়ের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল। বাস্তবে, এই উদ্বেগ ও ভয় ছিল তাদের চূড়ান্ত মতাদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক খুঁটি, এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে আক্রমণ করার প্রধান রূপ ছিল ঐ উদ্বেগ ও ভয়ের উদ্রেক করা এবং সেগুলিকে নিজের পক্ষে পরিচালনা করা। তারা এই ধোঁয়াটে উদ্বেগ ও ভয়কে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করত এবং এই নৈতিক শিক্ষা প্রচার করত যে একটি নির্দিষ্ট "সম্প্রদায়ের" সদস্যদের সংগঠিত হতে এবং কাজ করতে হবে অভিন্নরূপে। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ক্রমাগত মুসলিমদের উপর হিন্দু আধিপত্য এবং সংখ্যাধিক্যে অদম্য হিন্দুদের দ্বারা তাদের অবদমিত, বিধ্বস্ত এবং উন্মুলিত হওয়ার এবং তাদের সংস্কৃতি ও ধর্মের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ার ও সেগুলি উৎখাত হওয়ার কথা বলে যেত। এই কথা অবশ্য অনেক কাল ধরেই বলা হচ্ছিল। ১৯০৭ সালে "মুসলিমদের দাসের স্তরে নেমে যাওয়ার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্রের সম্ভাবনা ·· এবং সংখ্যালঘুরা তাদের পরিচিতি হারানোর বিপদ"[৭] প্রসঙ্গে বিকার-উন্মূলক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২৬ সালে বাংলাদেশের "মোসলেম দর্পণ" শতর্ক করে দিয়েছিল যে সরকারী সাহায্য না থাকলে ২৩ কোটি হিন্দু "৭ কোটি মুসলিমকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।"[৮] কিন্তু আধিপত্য ও দমনের এই উপাদান ১৯৩৭-এর পর মুসলিম লীগের চরমপন্থী বা ফ্যাসীবাদী পর্বের প্রচারের মূল বিষয়ে পরিণত হয়। এই বিষয়কে ঘিরে ১৯৩৭-এর পর এম. এ. জিন্না লীগকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁর রাজনৈতিক প্রচারাভিযান গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণসমূহ ও অন্য বক্তৃতা ও বিবৃতিগুলিকে ব্যবহার করতেন এই ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার প্রতি আবেদন করতে, এবং বারংবার এই কথা বুঝিয়ে

পত্র "প্রতাপ"-এর সম্পাদক হুঁশিয়ার করে দেন : "হিন্দুরা যদি এখনি জেগে না ওঠে তবে তারা শেষ হয়ে যাবে।"[২২] ১৯২৪ সালে হিন্দু মহাসভার প্রতি তাঁর ভাষণে শঙ্করাচার্য ডঃ কুরতাকোটি ঘোষণা করেন যে হিন্দুরা যদি আন্তরিকভাবে শুদ্ধি বা ধর্মান্তকরণের কাজ শুরু না করে তবে "দশটি দশকের মধ্যে আপনারা এই পৃথিবীর উপর কোনো হিন্দু খুঁজে পাবেন না।"[২৩] ১৯২৫ সালে হিন্দু মহা-সভায় সভাপতির ভাষণে লালা লাজপত রাই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে হিন্দুরা হয়ত "অহিংসার ভ্রান্ত ধারণার অতিমাত্রায় বশবর্তী" হয়ে পড়তে পারে, যা অন্য-দের, অর্থাৎ মুসলিমদের, "আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে এবং আমাদের অপমান করতে ও ধ্বংস করতে প্রেরণা দেবে।[২৪] একই বছর, তিনি বম্বেতে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে বলেন : "হিন্দু সম্প্রদায় যদি রাজনৈতিক হারাকিরি করতে না চায় তবে তাদের সাম্প্রদায়িক দক্ষতার জন্য প্রতিটি তন্ত্রী সঞ্চালন করতে হবে।" বস্তুত, মুসলিমরা হিন্দুদের "খেয়ে ফেলবে ও হজম করবে" এমন বিপদ ছিল।[২৫] ১৯২৬ সালে হিন্দু মহাসভার গৌহাটি অধিবেশনের সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি সতর্ক করে দেন যে হিন্দুরা যদি যথাযথ পদক্ষেপ না নেয় "তবে আমরা অদূর ভবিষ্যতে মরে যেতে বাধ্য।"[২৬] সভাপতির ভাষণে মদন মোহন মালব্য "মৃত্যুপথযাত্রী হিন্দু জাতিকে সর্বনাশ থেকে" বাঁচাবার কথা বলেন।[২৭] ১৯২৭-এ মহাসভার সভাপতির ভাষণে বি. এস মুঞ্জে "হিন্দুদের কিংবদন্তীর মত কোমল স্বভাব ও পোষমানা ভাবের" কথা বলার পর ঘোষণা করেন যে মুসলিমরা "তাদের আগ্রাসী স্বভাব নিয়ে" স্বপ্ন দেখছে 'কোমল স্বভাব হিন্দুকে এমন এক ধাক্কা মারতে, যাতে তাকে বিলুপ্তির ঢালু পথের সামনে মাথা বাড়িয়ে ফেলে দেওয়া যায়। এইভাবে তারা সমগ্র হিন্দু ভারতকে তাদের আত্মভূত করার স্বপ্ন দেখছে।"[২৮] পরে, ১৯৩৮-এ, মুঞ্জে লেখেন যে "যতদিনে পূর্ণ স্বরাজ আসবে", সম্ভাবনা রয়েছে যে তার মধ্যে হিন্দুদের "গলাদ্ধকরণ করে তাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলা হবে"।[২৯]

ভি.ডি. সাভারকার তাঁর সভাপতির ভাষণগুলিতে পৌনঃপুনিকভাবে ভারতীয় মুসলিমরা আফগানিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশের সঙ্গে চক্রান্ত করে ঐ দেশ-গুলিকে ভারত দখল করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়ার বিপদের উল্লেখ করেছিলেন।[৩০] উপরন্তু, ১৯৩৭-এ তিনি বলেন যে মুসলিমরা "হিন্দুস্থানের হিন্দু-দের ও অন্যান্য অ-মুসলিম অংশগুলির কপালে আত্ম-অবমাননার ও মুসলিম আধিপত্যের ছাপ দিয়ে উল্কি পরিয়ে দিতে চায়", এবং "হিন্দুদের নিজ বাসভূমিতে ভূমিদাসের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে চায়।"[৩১] ১৯৩৮-এ তিনি বলেন যে হিন্দুদের এই ভয়গুলি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়ার পথে : "আমরা হিন্দুরা আমাদের গোটা দেশ জুড়ে যথার্থই ভূমিদাসত্বে পর্যবসিত হয়েছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে,

যথা বঙ্গদেশে ও সীমান্তপ্রদেশে আমাদের জীবন ও সম্পত্তি পর্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিপন্ন, নারীত্বের সম্মানের কোনো নিরাপত্তা নেই।"[৩২]

১৯৩৮ সালে ভাই পরমানন্দ হুঁশিয়ার করে দেন যে কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচীর "অনিবার্য ফল হবে হিন্দুদের জাতিগত ও জাতীয় আত্ম-বলিদান।"[৩৩] ১৯৩৯-এ এম. এস. গোলওয়ালকার ঘোষণা করেন যে সংখ্যালঘুদের দাবীগুলি গৃহীত হলে "হিন্দু জাতীয় জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে'। তিনি সমসাময়িক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদকে "আমাদের বুকে আমাদের সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত শত্রুদের জাপটে ধরার এবং তার ফলে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করার" জন্য নিন্দা করেন।[৩৪] ১৯৪৭-এর দ্রুত পরিবর্তনশীল সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া হিন্দুদের আসন্ন বিপদ ও তাদের বর্তমান অপমানজনক পরিস্থিতির উস্কানীমূলক ও উত্তেজক ভাষায় চিত্রায়ণে গোলওয়ালকারের বিষমাখা কথা পূর্ণোদ্যমে বেরিয়ে আসে। কংগ্রেস নেতৃত্ব ও তাঁদের নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন :

> "তাঁরা যেহেতু মুসলিমকে তার বিচ্ছিন্নতাবাদ ভুলে যেতে বলতে সাহস পাননি, তাই তাঁরা সহজে বশ মানে এমন হিন্দুর ঘাড়ে পড়ে তাঁদের সমস্ত প্রচার করতে থাকেন । হিন্দুকে বলা হল মুসলিমদের সমস্ত বিধ্বংসী কাজ ও অত্যাচার অগ্রাহ্য করতে, এমন কি নম্রভাবে তা মেনে নিতে । হিন্দুকে বলা হল যে সে সামর্থহীন, তার কোনো তেজ নেই, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার শক্তি নেই এবং এ সব তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে মুসলিম রক্ত রূপে⋯ । যাঁরা ঘোষণা করেছিলেন "হিন্দু মুসলিম ঐক্য ছাড়া কোনো স্বরাজ নয়", তাঁরা এইভাবে আমাদের সমাজের প্রতি বৃহত্তম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাঁরা এক মহান্ ও প্রাচীন জনগণের জীবনী-শক্তি হত্যা করার জঘন্যতম পাপ করেছেন।"[৩৫]

অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ছিল অপর পক্ষ "আমাদের" মুছে ফেলবে বা নিয়ন্ত্রণ করবে এই সার্বিক ভয়ের ফল।[৩৬] ছোটো ছোটো বিষয়, যেমন গো-হত্যা, মসজিদের সামনে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা, দোল উৎসবের সময়ে রঙীন জল ছোঁড়া, এবং পিপ্পলী বৃক্ষ কাটা হয়ে দাঁড়াল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার উপলক্ষ, কারণ সে সব মানুষের ভয়ের, বিশেষত পেটি বুর্জোয়া পরিচিতি, অহংভাব ও নিরাপত্তাহীনতার সমস্যাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সেগুলি হয়ে পড়ল "আধিপত্যের প্রতীক", সেগুলিকে ছেড়ে দেওয়া বা সহ্য করা নাকি দেখাতো যে "আমরা" দুর্বল এবং অপরের আধিপত্যের জন্য প্রস্তুত। পেটি বুর্জোয়ারা জীবন কর্তৃক দৈনিক ক্ষয়প্রাপ্ত অহংভাবকে ক্রমাগত গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিল। ফলে তারা সর্বক্ষণ তাদের "শক্তি", "সাহস" ও 'পৌরুষ" প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিত ও তার সম্মুখীন হত। সাম্প্রদায়িক প্রচারের ধ্রুব সুর ছিল : অতীতে অত্যুচ্চ স্থান থেকে পতন, বর্তমানে অন্যের আধিপত্যের চ্যালেঞ্জ, নিরাপত্তার জন্য

এবং অন্য "সম্প্রদায়ের" হুমকির মোকাবিলা করার জন্য "সম্প্রদায়ের" শক্তি ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, এবং কেবল ঐ হুমকির সমান মোকাবিলা করলেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। একইভাবে, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা এমন কিছু ঐতিহাসিক পর্বের মহিমার বলিষ্ঠ প্রচার বা এমন কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রকে বীর বলে আখ্যা দেওয়ার জন্য দায়ী ছিল, যাদের সঙ্গে তারা একাত্মবোধ করতে পারত। তফাৎ ছিল শুধু এই, যে পেটি বুর্জোয়া হিন্দু স্বর্ণযুগ ও বীরদের খুঁজত ভারতীয় ইতিহাসে, আর পেটি বুর্জোয়া মুসলিম একই কারণে "ঐতিহাসিক ইসলামের" উল্লেখ করত।

সংখ্যালঘুদের সন্ত্রস্ত মানসিকতাঃ আর সব দিক ছাড়াও, সংখ্যালঘুরা তারা ধর্মীয়, ভাষাভিত্তিক বা জাতীয়তাবাদী যাই হোক না কেন, একটি বোধগম্য, এমনকি হয়ত ন্যায়সঙ্গত ঝোঁক দেখায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করার এবং ভয় পাওয়ার যে তাদের সংখ্যাগত দুর্বলতর অবস্থানের ফলে তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বার্থহানী হতে পারে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যাধিক্যের শক্তি প্রয়োগ করে সংখ্যালঘুদের আঘাত করতে বা আত্মভূত করতে পারে। বাস্তব ঘটনা হল যে একটি গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে মুসলিমদের মত শক্তিশালী সংখ্যালঘুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই আশঙ্কা যত অযৌক্তিক হোক না কেন, তা ছিল।

উপরে দেখানো হয়েছে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের এই স্বাভাবিক সংখ্যালঘুত্বজনিত ভীতির মানসিকতা নিয়ে কাজ করত এবং ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক করত ও তাতে ইন্ধন জোগাতো। বিশেষ করে, তারা তর্ক করত যে স্ব-শাসন ও গণতন্ত্রের জন্য জাতীয়তাবাদীদের দাবী সংখ্যাগুরু কর্তৃক শাসনের নীতিকে কার্যকর করবে এবং তা অনিবার্যভাবে চিরস্থায়ী হিন্দু আধিপত্য ও তার ফলশ্রুতিস্বরূপ স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতে মুসলিমদের জন্য এক নিরানন্দ ভবিষ্যতের দিকে যাবে, কারণ মুসলিমরা চিরস্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছ থেকে ন্যায্য ও সমান আচরণ আশা করতে পারত না।[৩৭] সুতরাং, বহু বছর ধরে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা নানারকম বিশেষ রক্ষাকবচ ও সুযোগ-সুবিধার জন্য লড়াই করেছিল। কিন্তু তাদের অবস্থানের যুক্তি অনিবার্যভাবে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবীর দিকে ঠেলে দিয়েছিল, কারণ একথা যদি স্বীকার করা হত যে হিন্দুরা, যারা স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে, তারা মুসলিমদের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ হতে বাধ্য, তবে শেষ পর্যন্ত কোনো রক্ষাকবচ, কোনো সুবিধাই মুসলিমদের রক্ষা করতে পারত না। আর, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতে ঐ রক্ষাকবচ ও সুবিধাগুলিও যে সংরক্ষিত হবে, কে তার নিশ্চয়তা দিতে পারত?

এখানেই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশেষ দায়িত্ব। এরকম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের দিক থেকে কথায় ও কাজে প্রমাণ করে দেওয়া যে

সংখ্যালঘিষ্ঠের এই ভয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি তাদের অবিশ্বাস ভিত্তিহীন। যখনই, কোনখানে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা তা করেছে, সংখ্যালঘিষ্ঠের ভয় ভীতি সাধারণ-ভাবে চলে গেছে বা খুবই কমে গেছে। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের কর্তব্য ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠের আশঙ্কার বাস্তব উৎসগুলির মূর্ত বিশ্লেষণ করা, তার মিথ্যা দিক-গুলির স্বরূপ উদঘাটন করা এবং সংখ্যালঘুকে তার নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞ-তার মাধ্যমে তার পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সাহায্য করা। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের আরো কর্তব্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণ উভয়কেই তাঁদের আশঙ্কা, হতাশা ও ভয়ের প্রকৃত চরিত্র দেখানো এবং সাম্প্র-দায়িক বিশ্লেষণ ও সমাধানের মিথ্যা চরিত্র প্রকাশ করা। আরো নির্দিষ্টভাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের কাজের ধারার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের একথা বুঝতে সাহায্য করা দরকার ছিল যে তাঁদের ধর্ম ও বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্রগুলি নিরাপদ থাকবে, এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্ম একটি উপাদান হওয়া উচিৎ নয় এবং হবেও না।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধারাবাহিকভাবে তার ঠিক বিপরীত ভূমিকা পালন করেছিল। সংখ্যালঘুদের ভয় কমানোর বদলে তারা হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম-ভীতি ও তাদের প্রতি ঘৃণার মানসিকতা তৈরী করেছিল। তারা হিন্দুদের দুর্ব-লতা ও তার ফলে মুসলিমদের হাতে তাদের অধীনতা, ধর্মান্তকরণ ও চূর্ণ হওয়ার বিপদের তত্ত্ব প্রচার করেছিল। তারা সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট নিরাপত্তার শর্ত মেনে নেওয়ার নীতির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধীনতার ভয় অপসারণের সক্রিয় বিরো-ধিতা করেছিল। জাতি-গঠনের প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘুদের সক্রিয় অংশীদার হতে উৎ-সাহ দেওয়ার পরিবর্তে তারা হিন্দুত্ব, সংখ্যালঘুদের হিন্দুকরণ এবং ভারত হিন্দুজাতি হওয়ার তত্ত্বগুলি প্রচার করেছিল। এইভাবে তারা মুসলিমদের ভীতির মানসিক-তাকে তীব্রতর করতে সাহায্য করেছিল ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও রাজ-নীতিকে আপাতঃভাবে গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করেছিল।

বিশেষভাবে, হিন্দু মধ্যশ্রেণীদের কিছুটা মহানুভবতা দেখানোর দরকার ছিল, কারণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন দেখানো হয়েছে, মুসলিম মধ্যশ্রেণীদের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তার অভাব বোধ, এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদের সৃষ্টি প্রধানত চাক-রীর জন্য, এবং আইনসভা ও পৌর কমিটিগুলিতে আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাই প্রধানত দায়ী ছিল; এবং ঐ অনুভূতি দূর করাই আবশ্যক ছিল। কিন্তু হিন্দু মধ্যশ্রেণীরাও, বিশেষত উত্তরাঞ্চলে, সাম্প্রদায়িকতাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিল। তারা যে খুব কম উদারতা দেখিয়েছিল তা নয়। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব মুসলিম মধ্য-শ্রেণীদের অনাস্থা, ভয় ও নিরাপত্তাহীন অনুভূতি বিতাড়নের জন্য সময়োচিত সুযোগ সুবিধা দিতে চাইলে তারা অনেক সময়ে সংগঠিতভাবে তার প্রতিরোধ করেছিল।[৩৮]

রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে এই জন্য, যে দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু, এবং তারাও সেখানে সংখ্যালঘুর সবরকম ভীতির মানাসিকতায় ভুগত। আর এখানে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাদের অনুভূতির প্রতি বিশেষ সুবিবেচনা করে নি, ও তার ফলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বৃদ্ধিকে উৎসাহ দিয়েছিল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফল হল যে এক বড় সংখ্যক হিন্দু ও মুসলিম অনাস্থা, ভয় এবং অধীন হওয়ার অনুভূতির অংশীদার হয়ে উঠেছিল।

৩. ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের কাজে ও চিন্তায় হিন্দুত্বের সংশ্লেষ

কংগ্রেসের দিশা ও কর্মসূচীর মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সত্বেও জাতীয়তাবাদী চিন্তা, প্রচার ও আন্দোলনের অনেকাংশের জোরালো হিন্দুত্বের সংশ্লেষ এবং হিন্দু ধর্মের সংশ্লিষ্ট চিন্তার মাধ্যমে সেগুলি ছড়িয়ে পড়ার ফলে মুসলিমরা সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী তার থেকে বিকর্ষিত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝোঁক দেখাতেন। এই চিন্তাগুলি মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ঠেলে দিত। তাঁরা অনুভব করতেন যে এমন ধরণের জাতীয় আন্দোলনের সাফল্যের অর্থ হবে 'ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুদের সর্বোচ্চ স্থান'।

এটা বিশেষভাবে সত্য যে ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত চরমপন্থী চিন্তা ও প্রচারের মধ্যে জোরালো হিন্দু ধর্মীয় উপাদান ছিল। বহু চরমপন্থী, জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনকে অভিন্ন বলে দেখতেন, ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাদ রেখে কেবল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলতেন, ভারতের ঐক্যের কথা বলতেন হিন্দু ঐক্যের ভাষায়, এবং জাতীয়তাবাদকে দেখতেন একটি ধর্ম রূপে—যে ধর্ম অনিবার্যভাবে হত হিন্দুধর্ম।[৩৯] তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদে একটি হিন্দু মতাদর্শগত প্রভাব দিতে, বা কমপক্ষে তার দৈনন্দিন রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটি হিন্দু বাক্‌-রীতি দিতে চেয়েছিলেন।

এ বিষয়ে বাংলা, হিন্দী, উর্দু, এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লেখা এক ধরণের আধুনিক সাহিত্য, যার বক্তব্য ছিল অংশত সাম্প্রদায়িক, সেগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সাহিত্যের প্রতিনিধি ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরের দিকের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি; যেগুলি পরে এই ধরণের ভারতীয় সাহিত্যের মূল রূপ হয়েছিল। বঙ্কিম মুসলিমদের বিদেশী হিসাবে দেখিয়েছিলেন, এবং জাতীয়তাবাদ বা ভারতীয়ত্ব বা দেশজ সবকিছুর হিন্দুদের সঙ্গে অভিন্ন রূপ কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প, কবিতা ও নাটকে বঙ্কিম ও তাঁর মত অন্য

লেখকরা সচরাচর মুসলিমদের অত্যাচারী ও লম্পট স্বৈরতন্ত্রীর ভূমিকায় ফেলতেন আর হিন্দুদের চরিত্র অঙ্কন করতেন হয় স্বাধীনতা সহ ইতিবাচক মূল্যবোধের জন্য সংগ্রামরত বীর, অথবা, মুসলিম শাসকদের সঙ্গে সংহতি দেখালে, বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী রূপে। এই ধরণের সাহিত্য, যার মধ্যে মুসলিম স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত থাকত, তা অনিবার্যভাবে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করত এবং বিকাশমান জাতীয় আন্দোলন থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতা দেখাত।[৪০]

অবশ্যই, একজন বুদ্ধিজীবী বা লেখক, লেখকের অধিকার বলে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন, বিশেষত যখন জাতি-গঠনের প্রক্রিয়া তার প্রাথমিক স্তরে। বঙ্কিম ও অনুরূপ অন্যান্য লেখকদের পথ দেখাবার জন্য কোনোশক্তিশালী জাতীয়তা বোধ ছিল না।[৪১] তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, পরে, উদাহরণস্বরূপ, বঙ্কিমকে কীভাবে ব্যবহার করা হল। তাঁকে একেবারে ভুল কারণবশতঃই মহান্ জাতীয়তাবাদী লেখক আখ্যা দেওয়া হল। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে ইতিহাসের প্রকৃত উপলব্ধির ভিত্তিতে রচিত খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। তাঁর ভূমিকা নিজের যুগে ও নিজের লেখার নিরীখে যত না প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ছিল, তার চেয়ে বেশী হল সেগুলিব "সাম্প্রদায়িক" অংশগুলিকে যেভাবে উৎকট স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাব সেবায় গৃহীত হল তার ফলে।

এটা লক্ষ্যণীয় যে বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে যখন এক আধুনিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী আবিভাব ঘটতে আরম্ভ করল ও তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রসার ঘটল তখন তারা বঙ্কিমের মুসলিমদেরনেতিবাচক চিত্রাঙ্কন সত্বেও তাঁকে এক মহান্ বাঙালী লেখকরূপে গ্রহণ করতে শুরু করল। কিন্তু আধা-সাম্প্রদায়িক হিন্দু লেখকরা দাবী করলেন যে ঐ চিত্রাঙ্কণের জন্যই তিনি মহান্। ফলে, জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা ধীরে ধীরে রাজভক্ত ও সাম্প্রদায়িক মুসলিম লেখকদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন।

তিলকও তাঁর হিন্দু ধর্মীয় ভাবসম্পন্ন গণেশ পূজা এবং শিবাজী উৎসব প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে হিন্দুত্বের সংশ্লেষ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। একথা সত্য যে তিলকের মৌলিক বাজনৈতিক প্রচার ও আন্দোলন সংগঠিত হত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় কেন্দ্র করে, এবং তাতে হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ আবেদন থাকত না, এবং নিশ্চিতভাবেই অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের ক্ষেত্রে যতটা থাকত তার চেয়ে তা কম হত, এবং উৎসবগুলি সংগঠিত করায় তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল "জনগণকে একত্রিত করার ও তাঁদের কাছে কথা বলার সুযোগ সন্ধান"।[৪২] শিবাজীর মাহাত্ম্য প্রচার সম্পর্কে তিলক পরে বলেছিলেন যে তিনি এই কাজ করেছিলেন শিবাজী মহারাষ্ট্রে জনপ্রিয় বীর ছিলেন

বলে। তিনি বলেছিলেন, উত্তর ভারতে তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের সাধারণ নায়করূপে আকবরকে বেছে নিতেন।[৪৩] কিন্তু তিলকের রাজনীতি, মতাদর্শ ও আন্দোলনের পদ্ধতি সাম্প্রদায়িক না হলেও—এবং তাঁর উপর আরোপিত "সাম্প্রদায়িকতা"-র এক বৃহদাংশ হল ভি. চিরলের মত সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের, এবং পরে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের, ব্যাপকভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর ফল—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ঐ হিন্দুত্বের সংশ্লেষের ফলে তারা হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতাবাদ সৃষ্টি করত এবং মুসলিমদের বিরূপ মনোভাবাপন্ন করার প্রবণতা দেখাত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রাই প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা তাঁদের রাজনৈতিক বক্তৃতা ও রচনায় হিন্দু প্রতীক, বাক্‌-রীতি ও পুরাণকে ব্যবহার করতেন। ভারতকে অনেক সময়ে মাতৃ-দেবী বলে উল্লেখ করা হত, বা কালী, দুর্গা ও অন্যান্য হিন্দু দেবীদের সঙ্গে তুলনা করা হত। প্রথম যুগের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা গীতা ও কালীর নামে শপথ নিতেন, এবং কেউ কেউ এই হিন্দু রঙে বিপ্লবী চরিত্রও দেখেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বহু নেতা বয়কট আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্য তাতে একটি ধর্মীয় রং চড়াতে চেয়েছিলেন।[৪৪]

১৮৯০-এর দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই হিন্দুত্বের সংশ্লেষ বিশেষভাবে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, কারণ ঠিক ঐ বছরগুলিতেই নবজাত শিক্ষিত মুসলিম স্তরটিতে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে, ঐ হিন্দুত্বের সংশ্লেষ শিক্ষিত ও রাজনৈতিক সচেতনতা প্রাপ্ত মুসলিমদের মনে অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক ঘটায়। যে আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী অভিভাষণ ধর্মীয় পরিভাষার মোড়কে এসেছিল, তার প্রতি তাঁরা সন্দিহান ছিলেন, এবং ফলতঃ তাঁরা জাতীয় কংগ্রেসকে একটি হিন্দু আন্দোলনের প্রতিভূ রূপে দেখেছিলেন। ফলে তা তাঁদের মতাদর্শগত বিকর্ষণ করার প্রবণতা দেখায় এবং তাঁদের কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান কঠিন হয়ে ওঠে। এস. আবিদ হুসেন যেমন দেখিয়েছেন, এই হিন্দুত্বের সংশ্লেষ তাঁদের মধ্যে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে "সাধারণ অসন্তোষ, আতঙ্ক ও সংশয়" এবং "ভয় ও সন্দেহের আবহাওয়া" সৃষ্টি করেছিল। তার আগে পর্যন্ত, মুসলিমদের কাছে "কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের এক বিরাট আকর্ষণ ছিল"। কিন্তু এই পর্বে, "মুসলিমদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে পড়ে এবং গভীরভাবে প্রতিহত হয়।"[৪৫]

সমসাময়িক এক মুসলিম বুদ্ধিজীবী, যিনি অন্যথায় সতেজ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ছিলেন, তিনি এই বোধগুলিকে যে ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন

তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি দেওয়া যায়। ১৯১২ সালে কমরেড পত্রিকায় "সাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মোহাম্মদ আলি লেখেন :

"একটি ধর্মবিশ্বাস হিসেবে হিন্দুধর্মের অনুপ্রেরণা যাই হোক না কেন, শিক্ষিত হিন্দুরা তাকে রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য জমায়েত হওয়ার প্রতীকে পরিণত করেছে…। নতুন রাজনৈতিক সূত্রের জন্য অতীত ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে ; এবং এক স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রক্রিয়ায় "জাতিত্ব" এবং "দেশপ্রেম" ক্রমে হিন্দুধর্মের সঙ্গে জড়িত হতে আরম্ভ করে। "স্বরাজের" রণধ্বনি নিয়ে হিন্দু "সাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক" লাফিয়ে উঠেছে… সে অবশ্যই "ভারত", এবং "রাজ্যভিত্তিক জাতিত্ব" ধরণের কথাগুলির ব্যবহার জানে ; এবং সেগুলি তার পরিজ্ঞাত ও ব্যবহৃত শব্দাবলীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু তা হলেও, মুসলিমরা তার চেতনায় ভর করে আছে এক গোলমেলে অপ্রাসঙ্গিকতা হিসেবে ; সে তার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেবে, যদি কোনো এক বিবাট অভিনিষ্ক্রমণ বা আরো বিরাট ভূতাত্ত্বিক দুর্ঘটনার ফলে সে তাদের থেকে নিষ্কৃতি পেত…। রক্ষণশীল মুসলিম, এক অগ্রসর হিন্দুধর্ম যা স্ব-শাসনের স্বপ্ন দেখছিল এবং গণতন্ত্রের বেশভূষায় সজ্জিত তার প্রাচীন দেবতাদের নিয়ে খেলা করছিল, তাকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল…। তার মনে হল যেন তার সঙ্গে একজন বহিরাগত, একজন অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপকারি কিম্ভূতকিমাকার হিসেবে আচরণ করা হচ্ছে, যে ভারতীয় ইতিহাসের ধারায় উদ্দেশ্যহীনভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। তার দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল কর্মজীবন থেকে বিচিত্র ঘটনা উৎপাটন করে তাকে সেগুলির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে বলা হল…। সাম্রাজ্য হারাবার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল যেন সে তার আত্মসম্মানও হারাচ্ছে। হিন্দুদের মধ্যে "সাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক"রা তার সঙ্গে কাঠগড়ার কয়েদীর মত ব্যবহার করল, এবং জোর গলায় জাহির করল যে ভারতের ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় সে এক অসম্ভব উপাদান।"[৪৬]

কমরেড-এ আর একটি প্রবন্ধে, ১৯১১-র অগাস্টে, মহম্মদ আলি লিখেছিলেন যে মুসলিমদের :

"দেশপ্রেমিক ভারতীয় হিসেবে জীবন নির্বাহ করার ও কাজ করার এবং তাঁরা একটি সচেতন অংশ হবেন এমন এক জাতীয়তার জন্য কাজ করার সমস্ত উচ্চাভিলাষ আছে। কিন্তু কিছু ভারতীয় রাজনীতিবিদ্ ও সংবাদপত্র কর্তৃক আবিষ্কৃত নতুন চরিত্রের "জাতীয়তাবাদ", তাঁদের যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমিকা দিতে চায় তাতে তাঁরা ভীত। সে এক জাতীয়তাবাদ, যার সহানুভূতি ও আকাঙ্খা ঘোষিতভাবে হিন্দু, যা হিন্দু মতের প্রতীক, রণধ্বনি ও বিশ্বাসের মন্ত্র সৃষ্টি করেছে, এবং যা নিজের বলবর্ধক শক্তি আহরণ করে হিন্দু ধর্ম ও পুরাণ থেকে।"[৪৭]

এই হিন্দু সংশ্লেষের অন্যতম ফল হল, যে, বহুসংখ্যক শিক্ষিত মুসলিম জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে থাকলেন বা তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হলেন এবং সাম্রাজ্যবাদী লেখকবৃন্দ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদদের প্রচারের সহজ শিকারে পরিণত হলেন। তা সত্ত্বেও, রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবী জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেও ছিলেন, এবং মুসলিমদেব মধ্যেও জাতীয়তাবাদী বোধের প্রসার ঘটতে থাকে।

১৯০৯-এর পরবর্তীকালে, হিন্দুত্বের সংশ্লেষ এতটা প্রকটভাবে ফুটে ওঠে নি, এবং মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ এক জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও, ইতিমধ্যে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তা ছাড়াও, কংগ্রেসের আন্দোলনের অনেকটা জুড়ে, বা অন্তত কংগ্রেসের রাজনৈতিক অভিব্যক্তির পরিভাষায়, একটা অস্পষ্ট হিন্দু রং ছড়িয়ে ছিল।

এই দিক থেকে গান্ধীব ধর্মীয় পরিভাষা ও প্রতীকেব ব্যবহাব তার নিজস্ব অবদান রাখে। অবশ্যই, গান্ধীর রাজনীতি ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিবপেক্ষ ও জনগণের প্রতি তাঁর মৌলিক আবেদনেব ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক, কখনোই তা ধর্মীয় ভিত্তিতে করা হয়নি। তিনি প্রকৃতই নতুন ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় চেতনার দিকে তাকিয়েছিলেন। তবু, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ধর্মীয় ভাষায় গঠিত ছিল। তিনি অনেক সময়ে হিন্দু পরিভাষা ও প্রতীক ব্যবহার করতেন, যদিও তিনি সেগুলি যেভাবে ব্যবহার করতেন তা অন্য ধর্মের অনুগামীদের প্রতি প্রায় কখনোই আপত্তিকর হত না। স্বাধীনতাকে রামরাজ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা হল গান্ধী কর্তৃক ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ। তিনি গো-সংরক্ষণ এবং অন্যান্য বহু হিন্দু ভাব ধারাও ব্যবহার করতেন, যদিও, গো-সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল অন্যান্য সমসাময়িক আক্রমণাত্মক, সাম্প্রদায়িক ভাষ্য থেকে খুবই ভিন্ন ধরণের। একইভাবে, অহিংসা ও সত্যের তিনি যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যে সিক্ত ছিল। "রাজনীতিকে আত্মিকতা পূর্ণ করা" এবং "অন্তরীণ কণ্ঠ" ইত্যাদি সম্পর্কিত তাঁর ধারণাও রাজনীতিকে ঘিরে এক ধর্মীয় দ্যুতি সৃষ্টি করার প্রবণতা দেখাত।

উপরন্তু, যেন হিন্দু ধর্মভাবের অভিযোগের উত্তরে, তিনি মুসলিম, শিখ ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনুরূপ ধার্মিকতাকে উৎসাহ দিতেন। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীরা হিন্দু, মুসলিম, প্রভৃতির উপর যে ধর্মের সংশ্লেষ আরোপ করতেন, তিনি তার সঙ্গেও আপোসরফা করার ঝোঁক দেখাতেন। সুতরাং, তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা হয়ে দাঁড়াল বহু ধর্মভাবের সঙ্গমের প্রতিনিধিস্বরূপ, বা, মোহাম্মদ আলির বর্ণনা অনুসারে যা ছিল "ধর্মসমূহের যুক্তসভা।"[৪৮] গান্ধীর পদ্ধতির সমান্তরাল ছিল, উদাহরণস্বরূপ, আবুল কালাম আজাদের ব্যবহার, যিনি প্রথম যুগে মুসলিমদের মধ্যে একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মভাবের উন্নতিবিধান করতেন।[৪৯]

এই ধারার পরিণতি ছিল খিলাফৎ আন্দোলন, যা একটি ধর্মীয় প্রসঙ্গের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাব প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনগুলিকে সফল কবার উদ্দেশ্যে ফতোয়া ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুশাসনেব পূর্ণ ব্যবহার কবেছিল।

গান্ধী ছাড়াও, সুভাষচন্দ্র বসুর মত অন্যান্য নেতারা এবং কংগ্রেসের সাধাবণ কর্মীরা স্বচ্ছন্দে হিন্দু প্রতীক, পুরাণ, হিন্দু ধর্মীয় কল্পনাপ্রসূত শব্দালঙ্কার এবং বৈশিষ্ট্যমূলক প্রকাশভঙ্গির ব্যবহার করতেন এবং দৈনন্দিন রাজনৈতিক প্রয়োগ-ক্ষেত্রে ধর্মকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন বলে অনুভব করতেন। এর ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল জহরলাল নেহরু, বিভিন্ন মার্ক্সবাদী দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিসমূহ, এবং মুষ্টিমেয় কিছু উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ্। তাই এটা কাকতালীয় নয় যে ১৯৩০-এর দশকে তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বামপন্থী জাতীয়তাবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, রক্ষণশীল, হিন্দুত্বের সংশ্লেষযুক্ত জাতীয়তাবাদের দ্বারা নয়।[৫০]

অনিবার্যভাবে, এই হিন্দুত্বের সংশ্লেষ কিছুমাত্রায় ১৯৩৭-৩৯-এর কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির কার্যপদ্ধতির মধ্যেও প্রবেশ করেছিল, বিশেষত নিম্নতর কর্মীদের স্তরে। ১৯৩৭-এর পর মুসলিম লীগ এই হিন্দুত্বের সংশ্লেষকে ব্যবহার করেছিল কংগ্রেস ও কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির বিরুদ্ধে এক পরাক্রান্ত রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আক্রমণ আরম্ভ করতে এবং মুসলিম জনগণ ও মধ্যশ্রেণীদের যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করতে। কংগ্রেস নেতৃত্ব যথাযোগ্যভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যেমন, লীগ নেতৃত্ব কংগ্রেস কর্তৃক 'বন্দে মাতরম' গানটির ব্যবহার নিয়ে অনেক গোলমাল কবেছিল। তারা তা আক্রমণ করে এই ভিত্তিতে, যে গানটি প্রতিমা উপাসনাকব, এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তা 'আনন্দমঠে' রচনা করেছিলেন একটি মুসলিম বিরোধী কাহিনীর প্রেক্ষাপটে। বহু কংগ্রেস নেতারা বুঝেছিলেন যে লীগের এই আক্রমণ মূলতঃ সাম্প্রদায়িক হলেও, এর মধ্যে কিছু সারবত্তা ছিল।[৫১] তবু তাঁরা পরিস্থিতি যথাযথভাবে শুধরে নিতে ব্যর্থ হলেন। ১৯৩৯-এ তাঁরা কংগ্রেসের ব্যবহারের জন্য প্রথম দুই স্তবক ছাড়া বাকিটা অবশ্য বাদ দিয়ে দিলেন অংশত কংগ্রেস সদস্যদের একাংশের চাপে। উল্লেখযোগ্য' দেরীতে হলেও, ত্রুটি সংশোধন করা হল ১৯৪৭ সালে, স্বাধীন ভারতে।

জাতীয় আন্দোলনের ধর্মনিরপেক্ষ দিকগুলিকে অন্য অনেক উপাদানও বিকৃত করে দিয়েছিল। এক বৃহৎ সংখ্যক জাতীয়তাবাদী নেতা দ্বৈত সামাজিক-রাজনৈতিক দায়িত্ব পরিগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন একধারে তাঁদের সমধর্মাবলম্বীদের চৌহদ্দির মধ্যে ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কারক এবং প্রশস্ততর জাতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে রাজনৈতিক নেতা। এই দ্বিত্ব আরম্ভ হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের থেকেই, বা তারও আগে। এমনকি দাদাভাই নওরোজী ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত ছিলেন একাধারে এক সতেজ ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী

এবং একজন পার্সি সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কারক। গান্ধীও অনেক সময়ে হিন্দু সমাজের সংস্কার কর্তার বেশ ধারণ করতেন। এর ফলে জাতীয়তাবাদী নেতারা অনেক সময়ে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে "আমরা" কথাটা বলতেন বিভিন্ন অর্থে। কখনো তার অর্থ ছিল হিন্দু বা মুসলিম, আর কখনো বা ভারতীয়। তত্ত্বগতভাবে বলা যেত, যে একজন ব্যক্তির একজন ভাল ভারতীয় এবং ভাল হিন্দু বা ভাল মুসলিম হওয়াতে কোনো অন্যায় নেই। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে তা কেবল তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেই প্রযোজ্য ছিল। একটি বহু-ধর্মবিশিষ্ট দেশে, যেখানে সাম্প্রদায়িক শক্তিরা সরকারের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে সক্রিয় ছিল, সেখানে ঐরকম দ্বৈত প্রকাশ্য ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল না, সুতরাং তা ছিল অবাঞ্ছিত। তা অনিবার্যভাবে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করত, সাম্প্রদায়িক নেতারা অবাধে যার সুযোগ নিত।

এই দ্বৈত সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা বড়জোর রাণাডে, গান্ধী বা মৌলানা আজাদের মত ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি করত। এর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফল হত কংগ্রেস নেতাদের প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা—একদিকে সংগঠন ও শুদ্ধি, আর অন্যদিকে তাবলিঘ ও তাঞ্জিম। যে কোনো ক্ষেত্রেই, জাতীয় সংহতির প্রতি তার দিশা ছিল : "ভাল-হিন্দু—ভাল-মুসলিম বন্ধুত্ব"।

অনেক বেশী ক্ষতিকর ছিল জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে "সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী" বা এমনকি নিছক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উপস্থিতি। "বহু কংগ্রেসকর্মী ছিলেন তাঁর জাতীয়তাবাদী বেশভূষার অন্তরালে একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী।"[৫২] কংগ্রেস নেতৃত্ব খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের, বা যাঁদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক গঠনে বড় মাত্রায় সাম্প্রদায়িকতাবাদ উপস্থিত ছিল তাঁদের, কংগ্রেসে যোগদান করতে, এমনকি স্থানীয় থেকে সর্বভারতীয় স্তর পর্যন্ত কংগ্রেসে নেতৃপদ দখল করতে অনুমতি দিতেন। এরকম সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীরা এক শিবির থেকে আরেক শিবিরে যেতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতেন না। তাঁরা অনেক সময়ে কংগ্রেস ত্যাগ করতেন এবং সাম্প্রদায়িক মঞ্চ থেকে তার বিরোধিতাও করতেন। কিন্তু অল্পদিন পরই, তাঁদের সাম্প্রতিক রাজনীতি বা এমনকি তদানীন্তন সাম্প্রদায়িক বা আধা-সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ কোনোভাবে বর্জন না করেই তাঁদের আবার কংগ্রেসের মধ্যে ও নেতৃত্বে ফিরিয়ে নেওয়া হত। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত, বহু নেতা একই সঙ্গে কংগ্রেসের এবং হিন্দু মহাসভার বা মুসলিম লীগের সদস্য ও নেতা হতেন।[৫৩] ১৯৩৮ সালে প্রথম কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির সদস্যদের দলে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ, উভয় রাজ্যেই, বহু কংগ্রেস নেতা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে চাকরী, বা সাংবিধানিক আলোচনা বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে "হিন্দুদের দিক"-এর পৃষ্ঠপোষক হতেন। একটি মঞ্চে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ও আরেকটিতে হিন্দু

স্বার্থের রক্ষক হতেও কোনো অসুবিধা বোধ করতেন না। কিন্তু একজন সাম্প্রদায়িক মুসলিম যেখানে মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিতে যোগদান করতেন, অতিমাত্রায় তীব্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই কেবল ১৯৩০-এর দশকে হিন্দু মহাসভা বা আর. এস. এস.-এ যোগদান করতেন। সাধারণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রবণতা হত কংগ্রেসে থেকে যাওয়ার। তার ফলে মুসলিমদের মধ্যে অস্বস্তি দেখা যেত। এটা হত বিশেষ করে স্থানীয় স্তরে, যেখানে ঐ হিন্দু বর্ণচ্ছটা সবচেয়ে দৃশ্যমান হত, যদিও উপরেও তা অনুপস্থিত ছিল না।[৫৪] 'ট্রিবিউন', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'লীডার', ইত্যাদি বহুসংখ্যক সংবাদপত্র, এবং আরো ব্যাপক সংখ্যক হিন্দী, উর্দু, বাংলা ও মারাঠী সংবাদপত্র, যেগুলি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বলে পরিচিত ছিল এবং জাতীয়তাবাদী প্রচারের মুদ্রিত ভাষ্যের মূল বাহন ছিল, সেগুলি একই সঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দাবীর জন্যও লড়াই করত। তারা একটি স্তম্ভে সকল ভারতীয় জনগণের মুখপত্র, আরেকটিতে হিন্দুদের স্বার্থের রক্ষাকর্তা ও তার জন্য যোদ্ধা ছিল। যথা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে তাদের সম্পাদকীয়গুলি, যেমন আরো অনেক জাতীয়তাবাদীর বক্তৃতা এবং রচনাগুলিও, দৃঢ়ভাবে দাঙ্গার নিন্দা করত, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রচার করত, এবং সাধারণতঃ দাঙ্গার সূত্রপাত করার জন্য মুসলিমদের দোষ দিত।[৫৫] তাদের খবর সরবরাহ ও মন্তব্য অনিবার্যভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দিকে একতরফাভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হত। এই সংবাদপত্রগুলি (এবং নেতারা) এক নিশ্বাসে জাতীয়তাবাদ প্রচার করত এবং তার পরই অভিযোগ করত যে হিন্দুরা মুসলিমদের কাছে সরকারী চাকরী হারাচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দুরা প্রাণ হারাচ্ছে। এই ধারণা, যে একজন মুসলিমের তুলনায় একজন হিন্দুর চাকরী বা জীবন যাওয়া একজন হিন্দুর কাছে বেশী চিন্তার বিষয় হবে—এটাই এক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিত। সাধারণ মুসলিম পাঠক বা শ্রোতা এমন ধরণের জাতীয়তাবাদের সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হলে, নেতাদের জেকিল ও হাইড ভূমিকার পৃথকীকরণে ব্যর্থ হলে এবং তার ফলে তিক্ত হয়ে উঠলে তাদের দোষ দেওয়া যেত না।

কংগ্রেস নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে, বিশেষ করে স্থানীয় ও মধ্যস্তরের নেতৃত্বের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করতে ও তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আরো ব্যাপক ব্যর্থতা ছিল হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকৃত, সক্রিয়, ধ্রুব ও নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক সংগ্রাম করার এবং ধ্যান ধারণার স্তরে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে।

অবশ্যই, এই প্রস্তাবনা ভুল, যে, উল্লিখিত হিন্দুত্বের সংশ্লেষের দরুন, ও আগে আলোচিত অন্যান্য দুর্বলতার দরুণ জাতীয় কংগ্রেস একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে

পরিণত হয়েছিল এবং জাতীয় আন্দোলনকে একটি হিন্দু জাতীয় আন্দোলন বলে চরিত্রায়ণ করা যায়। এগুলি আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্মের 'কারণ'ও ছিল না। বরং, এগুলি ছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান ও বৃদ্ধি রোধ করায় ব্যর্থতার কারণ। এর ফলে মুসলিমদের কংগ্রেসের পক্ষে নিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু, তা সরকার ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাতে এক শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দেয়। তারা তা দক্ষভাবে ব্যবহার করে মুসলিম জনগণের ও মধ্যশ্রেণী-গুলির বৃহদাংশকে জাতীয় আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখে এবং তাঁদের মধ্যে এই বোধ প্রবিষ্ট করায় সক্ষম হয় যে জাতীয় আন্দোলনের সাফল্যের পরিণতি হবে হিন্দু আধিপত্য। এমন কি, গান্ধীকেও দেখানো যেত, সমস্ত হিন্দুদের নেতৃত্বদান-কারী একজন হিন্দু হিসাবে।

এই হিন্দুত্বের সংশ্লেষের ফলে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মতাদর্শগত বিরো-ধিতা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ, তা কেবল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই অনুপ্রেরণা দেয় নি, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকেও অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তা মুস-লিম জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও এক মুসলিম বর্ণচ্ছটা বিস্তারে সাহায্য করেছিল।

এই অংশের আলোচনা শেষ করার আগে আর কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের স্পষ্টীকরণ আবশ্যক।

(১) ধর্ম এবং পরম্পরাগত ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বাক্-রীতির ব্যবহার, বা অতীতের মহিমাকীর্তন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল না। এ ছিল গ্রীক ও ইতালীয় থেকে আইরিশ এবং ইন্দোনেশীয় পর্যন্ত উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনগুলির এক সাধারণ চরিত্র। এগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল জনগণের কাছে জাতীয়তাবাদের নতুন মতাদর্শ নিয়ে পৌঁছবার[৫৬] এবং শোষিত ও কর্তৃত্বা-ধীন জনগণের মধ্যে আত্ম-সম্ভ্রম ও আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সহজ পন্থা হিসাবে। এমনকি, সোভিয়েত নেতৃত্বও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জনগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে গিয়ে অতীতের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং পরম্পরাগত (প্রাক্ ১৯১৭) প্রতীক ও বাক্-রীতি ব্যবহার করেছিলেন। বস্তুতঃ, ভারতে অতীতের কাছে আবেদন করার প্রথার সূচনা করেছিলেন নরম-পন্থী পর্বের সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্ব। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীই প্রথম ১৮৭৭-৭৮-এ তাঁর বক্তৃতাগুলিতে জাতীয় বীররূপে শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংয়ের মহিমাকীর্তন করেছিলেন। আর চরমপন্থী পর্বের অধিকতর হিন্দুত্বের সংশ্লেষযুক্ত নেতৃত্বও তা করেছিলেন গ্রীক, ইতালীয় এবং আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সচেতন অনুকরণ হিসাবে। আত্ম-সম্ভ্রম, আত্মবিশ্বাস ও কিছুটা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের জন্ম দেওয়া ভারতে আরো বেশী প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ সেগুলি ধ্বংস করা ছিল ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও মতাদর্শের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

তবু, উচিত ছিল ধর্মীয় পরিভাষা ও প্রতীক থেকে সরে থাকার এবং জাতী-

য়তাবাদের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোনো রকম সংযোগের সক্রিয় বিরোধিতা করার। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অধিকাংশ অন্যান্য জাতীয় আন্দোলন থেকে ভিন্নতর হওয়ার দরকার ছিল, কারণ ভারতীয়রা অন্য ধরণের জাতি ছিল। তিলক, অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যরা যেভাবে ইতালী ও গ্রীসের অনুবর্তী হয়েছিলেন তা না হওয়া আবশ্যক ছিল, কারণ ভারতের মত এক বহু-ধর্ম, বহু-জাত ও বহু-সংস্কৃতি বিশিষ্ট দেশের পক্ষে একটি ধর্ম, জাত, সংস্কৃতি বা ঐতিহাসিক পরম্পরাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবী করা সম্ভব ছিল না। তার পক্ষে অতীতের কাছে আবেদন করে নতুনকে গড়ে তোলা বা অতীতকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা বা পুনরুজ্জীবিত করাব ভান কবার মূল্য দেওয়া সম্ভব ছিল না।[৫৭] এখানে, জাতীয়তাবাদ ও জাতিকে এক নতুন ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবেই দেখানো আবশ্যক ছিল। এখানে, অতীত জাতীয়তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার তত্ত্ব নয়, নতুন, জাতি গঠনের বিকাশের ধারণাকে জোরের সঙ্গে প্রচার করার দরকাব ছিল।

এখানে জাতীয় নেতৃত্বের কর্তব্য শুধু ভিন্ন ছিল না, ছিল কঠোরতর ও কঠিন-তর। দরকার ছিল প্রচণ্ড ধৈর্য, মতাদর্শগত স্বচ্ছতা, এবং সাহসিকতার। এখানে, মানুষকে জাতীয়তাবাদের নতুন প্রেরণায় গড়ে তোলার জন্য অতীত চেতনা, ধর্মীয় চেতনার কাছে আবেদন করা যেত না। তা করা যেত কেবল জনগণের জীবন ও সমস্যাব সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাব যোগসূত্র প্রকাশ কবাব মাধ্যমে। এখানে আবেদন হওয়ার দরকার ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক। এখানে জাতীয়তাবাদেব দরকার ছিল "মূল্যবোধেব তন্ত্রে একটি মৌলিক পরি-বর্তন।" এখানে, একটি জাতীয় আন্দোলনকে ভিত্তি করতে হত ঔপনিবেশিক-তাবাদ ও ভারতীয় জনগণেব মধ্যে মৌলিক কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের সঠিক উপলব্ধিতে, এবং সম্পূর্ণরূপে আধুনিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর উপর, যেমন কবেছিলেন নরমপন্থীরা এবং যেমন করছিলেন নেহরু ও বামপন্থীরা ; চরমপন্থীরা, বা পরে রক্ষণশীলবা যে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন বা "সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের" কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করলে হত না। পরবর্তী ক্ষেত্রে জনগণ অপরিবর্তনীয়ভাবে বিভক্ত হতেন, কাবণ তা ছিল মৌলিক, ও সম্ভবত অনিবার্যভাবে, উত্তর ভারতের আধিপত্যশালী উচ্চবর্ণ হিন্দুধর্মের "মহান্ ঐতিহ্য" থেকে আহরিত। কালক্রমে তা জন্ম দিয়েছিল বা দিত আঞ্চলিকতা, জাতপাত ও উপজাতিকতাবাদের। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, যাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রথম দেখা দিয়েছিল, তারা ঐ "মহান্ ঐতিহ্য" ভিত্তিক সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একাত্ম করতে পারতেন, কিন্তু অন্য ধর্মের অনু-বর্তীরা, নীচু জাতের মানুষ, এবং উপজাতিরা যখন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভাবে জাগ্রত হতেন, তখন তাঁরা জাগরিত হতেন অন্য সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়

পরম্পরাতে। যে কোনো জাতীয়তাবাদ, যা জাতের গঠনতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বা উঁচু জাতের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করত, তাঁরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। তখন হয় জাতীয়তাবাদ নিজেকে তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আত্মিক গঠনের উপযোগীভাবে রূপান্তরিত করত, অথবা তাঁরা সাম্প্রদায়িক, জাতিবাদী বা অন্যান্য ধরণের বিভাজক রাজনীতি গ্রহণ করতেন। এমন কি, মেয়েদের পক্ষে এমন কোনো আন্দোলনের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল না, যা তাঁদের চূড়ান্ত মর্যাদাহানি এবং কর্তৃত্বাধীন রাখার এক সংস্কৃতির মহিমা কীর্তন করত ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করতে চাইত।

(২) অন্য যে কোনো আন্দোলনের মত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনও একটি বড সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যা ছিল, রাজনীতির "গণ-করণ" সঙ্গে সঙ্গে জনগণের পশ্চাদপদ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শগুলিকেও নিয়ে আসার প্রবণতা দেখাত। একজন সাম্প্রতিক লেখক যেমন দেখিয়েছেন যে জাতীয়তাবাদীরা "ব্যাপক জনগণের কাছে আসার চেষ্টা স্বভাবতই একটি হিন্দু (বা মুসলিম অথবা শিখ) বাক্-রীতি গ্রহণ করত"।[৫৮]

ধর্ম-ভিত্তিক সংস্কৃতি, ধর্মীয় রাজনৈতিক বাক্-রীতি, শব্দচয়ন, ইত্যাদির পুনরুত্থান ছিল অর্থে জাতীয় আন্দোলনের গণতন্ত্রীকরণের একটি দিক। যতদিন জাতীয় আন্দোলন কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেমন উনবিংশ শতাব্দীর নরমপন্থী পর্বে, ততদিন তা রাজনৈতিক বাক্-রীতি থেকে ধর্মকে বাদ রেখে এবং সম্পূর্ণরূপে আধুনিক জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ গঠনের চেষ্টা করে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারত। কিন্তু আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি যত নিম্ন মধ্যশ্রেণীদের দিকে নেমে যায়, যাদের অধিকাংশ ছিলেন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ও বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ ও সীমিত, তত তার মতাদর্শগত আধুনিকতায় সমঝোতা শুরু হয়। নিম্ন মধ্যশ্রেণীগুলি আন্দোলনের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর উপর নিজেদের পশ্চাদপদ ও সংকীর্ণ চরিত্র চাপিয়ে দিতে থাকে।[৫৯] আন্দোলন যখন জনগণের কাছে পৌঁছয়, তখন তার ভাষায় ধর্মীয় বাক্-রীতি, পুরাণ ও প্রতীক প্রবেশ করে, কারণ ভারতীয় জনগণের ভাষায়, সংস্কৃতিতে জীবনধারায় ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বস্তুত, এখানে ছিল ক্লাসিক উভয়সংকট, বা একটি দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি। যথাযথ মতাদর্শগত ভিত্তি ব্যতীত গণভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা বিপজ্জনক হতে পারত। অন্য দিকে, সংগ্রাম ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়া হবে কী ভাবে? জনগণকে ছাড়া সংগ্রাম কীভাবে সংগঠিত হবে? আর জনগণকে কি আনা যেত, কিছুটা পরিমাণে তাঁদের বিদ্যমান সচেতনতাকে না এনে?

সুতরাং ভারতে আধুনিক গণ রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে দরকার ছিল, এবং জরুরী ছিল, একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণ, যা একই সঙ্গে

চিরাচরিত সংস্কৃতির মানবিক ও যুক্তিযুক্ত উপাদানগুলিকে অন্তর্গত করে নিত।[৬০] অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে ভারতের বেশী প্রয়োজন ছিল এক সর্বাঙ্গীন র‍্যাডিকালবাদের, যার ভিত্তি হত সামাজিকভাবে র‍্যাডিকাল গণ মতাদর্শ। কেবল রাজনৈতিক র‍্যাডিকালবাদ যথেষ্ট ছিল না। অন্যথায়, এমনকি গণ রাজনীতিরও, জনগণের বিদ্যমান পশ্চাদ্পদ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, এই প্রতিক্রিয়াশীল দিকটি ছিল যে তারা সামাজিকভাবে পশ্চাদ্পদ মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃঢ়তর করত, এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করাব পরিবর্তে আরো বিভক্ত করত।[৬১]

এই উদ্দেশ্যে নতুন চেতনা সৃষ্টি করার চেয়ে বিদ্যমান চেতনার ভিত্তিতে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা সবসময়েই সহজতর ছিল। র‍্যাডিকাল পদ্ধতি অধিকতর মন্থর, ক্লান্তিকর ও কঠিন দেখে, এবং তৈরী সচেতনতার কাছে আবেদন করতে না পেরে, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের কিছু কিছু অংশ, বিশেষত চরমপন্থী পর্বে, বিদ্যমান ধর্মীয় চেতনার কাছে আবেদন করা সহজতর বলে মনে করেছিলেন। এবং কিয়দংশে তা করেছিলেন। অথবা, বলা যায়, তাঁরা তৎক্ষণাৎ একটি জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি ও গঠন করে ভারতকে ধীরে ধীরে একটি জাতিতে পরিণত করার জন্য, এবং কালক্রমে অধিকতর অগ্রসর ও আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী বার্তাকে ধর্মীয় ভাষার মোড়কে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, যত অসচেতন ভাবেই হোক না কেন, এই প্রক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জাতিবাদের জন্য স্থান রেখে দেওয়া হল, এমনকি তাঁদের নিজেদের চিন্তা ও রচনা সাম্প্রদায়িকতাবাদের বন্দী হয়ে পড়ল। এক দিক থেকে উঠতি বামপন্থী নেতৃত্বও পরম্পরাগত নেতৃত্বের এই ব্যর্থতার অংশীদার ছিল। কেরালার মত কোনো কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া তারাও সক্রিয়ভাবে জনগণের মধ্যে আধুনিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রচার করে নি, সাংস্কৃতিক বিপ্লব তো আরম্ভ করেই নি। তারাও তাদের অনুবর্তীদের সক্রিয়ভাবে সাম্প্রদায়িক ও জাতিবাদী শক্তি ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে নি, সম্ভবত এই আশায় যে শ্রেণী সংগঠন ও সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সরাসরি ধীরে ধীরে ঐ সবের অবলুপ্তি ঘটাবে।

(৩) কিন্তু, ধর্মীয় চেতনা এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে এক স্পষ্ট প্রভেদ করতে হবে। ধর্মীয় কাহিনী, প্রতীক, বাক্‌-রীতি ইত্যাদির ব্যবহার সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল না, যদিও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তা সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্য জমি তৈরী করত বা দরজা খোলা রাখত, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা দুর্বল করে দিত। তা সাম্প্রদায়িকতাদের অন্যতম কারণও ছিল না। সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান হয়েছিল অন্য কারণে, যদিও আমরা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দেখব যে তা নিজের

প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার করত। সেই পরিমাণে,জাতীয়তাবাদে ধর্মীয় চেতনার অনুপ্রবেশ সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধির প্রতি সহায়ক ছিল।

শুধু গান্ধী নয়, তিলককেও সাম্প্রদায়িক শিবিরভুক্ত বলা যায় না, যদিও হিন্দু সংস্কৃতির এবং অতিমাত্রায় সংকীর্ণ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রতি তিলকের আবেদন মুসলিমদের বৈরীতা সৃষ্টি করেছিল এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক বোধকে উৎসাহ দিয়েছিল ও ফলতঃ ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল। বিশেষত, ১৯১৮ পরবর্তী জাতীয়তাবাদীদের ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের সংশ্লেষ সংক্রান্ত সমগ্র সমালোচনা যথাযথ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রাখতে হবে। তারা হিন্দু রাজনৈতিক বাক্-রীতি যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল অরবিন্দ ঘোষ বা বিপিনচন্দ্র পালের ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৮৭০-এর পর থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আখ্যা দেওয়া অবাস্তব। একথাও বলা ভুল যে গান্ধীর যুগে জাতীয়তাবাদের অন্যতম মৌলিক উপাদান ছিল "হিন্দুধর্মের গোঁড়া ও পুনরুত্থানবাদী ধারা"। গান্ধী, এবং নেহরু ও বামপন্থীরা তো বটেই, সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা মুক্ত ছিলেন। গান্ধীর কথা যখন ধর্মের ভাষায় ছিল—যা ছিল সমালোচকদের দাবীর চেয়ে অনেক কম—তখনও তাঁর আবেদন ছিল আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিসমূহের কাছে।[৩২] গান্ধীর পর্বে কোনো আন্দোলনই কোনোভাবে হিন্দু ধর্ম বা ধর্মীয় আবেদনকে ব্যবহার করে নি। ১৯১৮-র পর জাতীয়তাবাদের মতাদর্শগত সংজ্ঞা বা তার কর্মসূচীতে কোনো অর্থেই ধর্ম ব্যবহৃত হয় নি। একথা ঠিক যে জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের এবং জাতীয় সচেতনতার স্রষ্টা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হিন্দুরা ছিলেন ব্যাপক আধিপত্যশালী। একথাও সত্য যে তাঁদের সকলকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সর্বোচ্চ মানদণ্ডে মাপা যায় না। কিন্তু একথাও সমধিক সত্য যে রাজনীতিতে তাঁরা হিন্দু হিসাবে সক্রিয় ছিলেন না। তাঁরা এক মূলগতভাবে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের সীমাবদ্ধতা ছিল শ্রেণীভিত্তিক, কিন্তু সম্প্রদায়গত বা ধর্মীয় ভিত্তিক নয়।[৩৩] তার সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতা যে বাস্তব ছিল এবং ছদ্মবেশী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বা হিন্দু "জাতীয়তাবাদ" ছিল না, তা পরে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়, যখন, ১৯৪৭-এর পর, কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত এক পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান গ্রহণ করেছিল এবং গভীর ত্রুটি সত্ত্বেও, মোটামুটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠন গড়ার কাজ আরম্ভ করেছিল।

টীকা

১। অ্যাডাম প্রসেওরস্কি, "দ্য প্রসেস অফ ক্লাস ফর্মেশন", পৃঃ ২৭-২৮।

২। সংসদীয় সাফল্যের জন্য মধ্যশ্রেণীদের ও এলিট ভূস্বামীদের উপর নির্ভরশীলতা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের লড়াই করার ক্ষমতাও দুর্বল করে দিয়েছিল। কানপুর দাঙ্গা তদন্ত কমিটি এটা দেখিয়েছিল : "কাউন্সিলে প্রবেশ করার কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে তাদের উপর গণচেতনার প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে, কংগ্রেসের পক্ষে সামগ্রিকভাবে ও সর্বান্তকরণে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে···। সমস্যাটির জটিল চরিত্র, রাজনৈতিক নেতাদের আগে থেকে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকা, এবং নির্বাচনী প্রচারের চাহিদা, সব মিলে কংগ্রেসের পক্ষে খোলাখুলি ও প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে পাল্লা লড়া প্রায় অসম্ভব করে দিয়েছিল।" রিপোর্ট অফ দ্য কানপুর রায়টস এনকোয়্যারি কমিটি, পৃঃ ২২২-২৩, ২২৫।

৩। উদাহরণস্বরূপ দেখুন জওহরলাল নেহরু, ১৯৩১ ও ১৯৩৬-এ : "আমার মতে আসল ব্যাপারটা হল অর্থ নৈতিক উপাদান। আমরা যদি এর উপর জোর দিই এবং মানুষের দৃষ্টি এইদিকে সরিয়ে দিই তবে আমরা দেখব যে ধর্মীয় প্রভেদ পশ্চাদপটে মিলিয়ে যায় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক সাধারণ বাঁধনে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। অর্থ নৈতিক বাঁধন জাতীয় বাঁধনের চেয়েও শক্তিশালী। কৃষি শ্রমিক ও চাষীদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি, যেখানে এই অর্থ নৈতিক বাঁধন আছে সেখানে তাদের প্রভেদ খুবই সামান্য" (নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ৫, পৃঃ ২০৩)। "যদি জনগণের পূর্ণমাপে প্রতিনিধিত্ব করা হয়, অনিবার্যভাবে তাঁদের প্রভাবান্বিত করে, এমন অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সামনে আসবে এবং উপরিগত সমস্যাগুলি যথা সাম্প্রদায়িক সমস্যা, তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে"। (নি. রচ, খণ্ড ৬, পৃঃ ১২৭।) "সাম্প্রদায়িক সমস্যা মোকাবিলা করার স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান পথ হল মৌলিক অর্থ নৈতিক বিষয়গুলিকে সামনে আসতে দেওয়া, যাতে সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া যায়। অর্থ নৈতিক বিষয়গুলিকে উঠে আসতে দিলে সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গের মুখোমুখি হতে হবে এবং অনিবার্যভাবে তার সমাধান করা হবে।" (ঐ, পৃঃ ১১২।)

৪। "রিপোর্ট অফ দ্য কানপুর রায়টস এনকোয়্যারি কমিটি", পৃঃ ২২৭।

৫। সাম্প্রদায়িক (জাতগত বা ভাষাগত) দাঙ্গার ক্ষেত্রে তা যেন বাস্তব, এবং সরকারী ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে, একমাত্র, দৈহিক নিরাপত্তা সরবরাহ করত।

৬। জওহরলাল নেহরু এটা সে সময়ে বুঝেছিলেন। পরে, তার "অটোবায়োগ্রাফি"তে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার এবং তার ফলে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন: "তবে এটা হতে পারে, যে একটি বিশাল আন্দোলনকে এইভাবে হঠাৎ স্তব্ধ করে দেওয়া দেশে এক বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। রাজনৈতিক সংগ্রামে বিক্ষিপ্ত ও অকারণকর হিংস্রতার দিকে ভেসে যাওয়া বন্ধ হল, কিন্তু চেপে রাখা হিংস্রতাকে বেরোবার পথ খুঁজতেই হল, এবং এটা হয়ত পরবর্তী বছরগুলিতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বাড়িয়ে তুলেছিল···। এটা হয়ত সম্ভব, যে নাগরিক প্রতিরোধ বন্ধ করা না হলে এবং সরকার আন্দোলনকে ধ্বংস করলে, সাম্প্রদায়িক তিক্ততা কম হত এবং তৎপরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলির জন্য অতটা প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি থেকে যেত না।" পৃঃ ৮৬-৭।

৭। মইন শাকির, খিলাফৎ টু পার্টিশন, পৃঃ ১২৫।

৮। এম এম. ইসলাম, বেঙ্গল মুসলিম ওপিনিয়ন অ্যাস রিফ্লেক্টেড ইন দ্য বেঙ্গল প্রেস ১৯০১-১৯৩০, পৃঃ ১২৭।

৯। এম. এ জিন্না, স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস, খণ্ড ১, পৃঃ ৩১, ৩৬। একজন পর্যবেক্ষকের বক্তব্য অনুযায়ী মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে "ভাবপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মেঘ থেকে উঠল ইসলাম বিপন্ন এই ধ্বনি। মুসলিমদের বলা হল যে হিন্দুরা তাদের ক্রুশে বিদ্ধ করতে চলেছে"—পাইওনিয়ার, ৭ নভেম্বর ১৯৩৭-এ মাহমুদুল্লাহ জং,·বি. আর. নন্দা, নেহরু অ্যাণ্ড দ্য পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৫৯-এ উদ্ধৃত।

১০। এম এ. জিন্না, পূর্বোক্ত, খণ্ড ১, পৃঃ ৬৯-৭০, ৭২-৭৩, ৭৭। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তার ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এর প্রস্তাবেব ঘোষণা করে যে প্রদেশগুলিতে ১৯৩৫-এর আইনের ফলে পরিপূর্ণরূপে স্থায়ী সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং মুসলিম সংখ্যালঘুদের, যাদের জীবন ও স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও মানসম্মান বিপন্ন, এমনকি যাদের ধর্মীয় অধিকার ও সংস্কৃতি প্রতিদিন বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস সরকারের অধীনে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হচ্ছে, তাদের উপর হিন্দু আধিপত্য" ঘটেছে। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ১৯৩৯, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৫২।

১১। এম. এ. জিন্না, পূর্বোক্ত, খণ্ড, ১, পৃঃ ১২৭।

১২। ঐ, পৃঃ ১৩৯, ১৪১।

১৩। ঐ পৃঃ ১৪৬।

১৪। ঐ, পৃঃ ১৮৫।

১৫। ঐ, পৃঃ ২৪৩।

১৬। ঐ, পৃঃ ২৪৮।

১৭। ঐ, পৃঃ ৩৮৩।

১৮। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ১৯৪৬, খণ্ড ২, পৃঃ ২২৬।

১৯। জেড. এ সুলেরী, মাই লীডার, পৃঃ ১১, ৩৮, ৮৮।

২০। ইন্দ্রপ্রকাশ, এ রিভিউ···, পৃঃ ১২-তে উদ্ধৃত। "মৃত্যুপথযাত্রী জাতি" কথাটি পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বারংবার ব্যবহার করেছিলেন। জি. আর থার্সবি, হিন্দু-মুসলিম রিলেশনস ইন্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৫১।

২১। লাল চাঁদ, সেল্ফ্-অ্যাবনেগেশন ইন পলিটিক্স, পৃঃ ১৩।

২২। প্রভা দীক্ষিত, কমিউনালিসম-এ স্ট্রাগল ফর পাওয়ার, পৃঃ ১৫৯-এ উদ্ধৃত।

২৩। ইন্দ্রপ্রকাশ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৯০।

২৪। ঐ, পৃঃ ৯১। আগে, ১৯২৪ সালে, তিনি বলেছিলেন যে হিন্দুদের "যে মৃত্যু তাদের হুমকি দিচ্ছে তার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ১৯২৪, খণ্ড ২, পৃঃ ৪৮৮।

২৫। লালা লাজপত রাই, রাইটিংস অ্যাণ্ড স্পীচেস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৬, ২৫৩।

২৬। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪।

২৭। ঐ, পৃঃ ৩৫৫।

২৮। ইন্দ্রপ্রকাশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪-৫। এছাড়াও, তিনি এক অত্যন্ত উত্তেজক চিত্র কৌশলে তুলে ধরেন: "মুসলিম দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করলে তারা যা ইচ্ছা করতে পারে এমনভাবে মেয়েদের ফেলে রেখে প্রাণের ভয়ে হিন্দুদের পালিয়ে যাওয়ার দৈনন্দিন ঘটনা।" তিনি বলেন যে হিন্দু বেঁচে ছিল, "বর্তমান সময়ে, ব্রিটিশ মেশিনগান ও মুসলিম লাঠির যুগ্ম আধিপত্যে", ঐ পৃঃ ১০৫, ১০৭।

২৯। ঐ, পৃঃ V।

৩০। ভি. ডি. সাভারকার, 'হিন্দুরাষ্ট্র দর্শন', পৃঃ ১৪, ২৬-২৭, ৬২, ১১৩-১৪। এছাড়া দেখুন তাঁর 'হিন্দু সংগঠন', পৃঃ ২১৫। এটা ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রচারের খুব সাধারণ চরিত্র। উদাহরণস্বরূপ দেখুন ১৯২৫-এ হিন্দু মহাসভার এন. সি. কেলকারের সভাপতির ভাষণ, 'ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার', ১৯২৫, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫১।

৩১। ভি. ডি. সাভারকার, 'হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন', পৃঃ ২১-২২।

৩২। ঐ, পৃঃ ৭৭।

৩৩। ইন্দ্রপ্রকাশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ xxi। ১৯৩৩-এ তিনি হিন্দু মহাসভার অধিবেশনকে বলেন যে হিন্দুরা যদি সাম্প্রদায়িক অ্যাওয়ার্ড মেনে নেয় তবে "তাদের নিয়তি হুই দাসত্ব মেনে নেওয়া"। 'ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার', ১৯৩৩, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৪।

৩৪। এম এস. গোলওয়ালকার, 'উই', পৃঃ ৫৮, ৭৩।

৩৫। ঐ, 'বাঞ্চ অফ থটস্', পৃঃ ১৫০--৫২।

৩৬। আর. অবশ্যই, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটা প্রবণতা ছিল, স্বয়ং সম্পাদিত ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিণত হওয়া। কারণ, দাঙ্গায় বাস্তবেই দাঙ্গা পীড়িত এলাকার সমস্ত অধিবাসীর শারীরিক বিপদ হত, এবং তাও আবার অন্য সম্প্রদায়ের হাতে।

৩৭। ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। উদাহরণস্বরূপ, সৈয়দ আহমেদ খান, 'রাইটিংস্ অ্যাণ্ড স্পীচেস্', পৃঃ ২০৯-১০, এবং এম এ জিন্না, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯।

৩৮। গান্ধী ও জওহরলাল নেহরু যে দৃষ্টিভঙ্গির মহৎ প্রবক্তা ছিলেন, তা হল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বী হিসাবে হিন্দুদের উচিত সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলিমদের হয়ে নিরাপত্তার যে রক্ষাকবচ চাইছে তার প্রতি নিঃশর্তভাবে উদার দিশা অবলম্বন করা। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, জওহরলাল নেহরু, 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি', পৃঃ ১৩৬ ; এবং সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬৮-৬৯ ও ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০। এস. গোপাল সম্প্রতি তাঁর নেহরুর জীবনচরিতে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। গোপাল লিখেছেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গি "মহানুভবতার প্রতি আহ্বান সত্ত্বেও, একটি সাম্প্রদায়িক দিশা গ্রহণ করে, তা যত অসচেতনভাবেই হোক না কেন। এই যুক্তির ভিত্তি যে বিশ্বাস, তা হল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় একটি সুবিধাভোগী সম্প্রদায়, এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক হওয়ার যুক্তি আছে .এর নিহিতার্থ, যে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার কোনো কারণ আছে, তার সম্ভাবনাগুলিতে বিপজ্জনক ছিল"। 'জওহরলাল নেহরু—এ বায়োগ্রাফি', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩।

৩৯। যেমন, অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৮-এ লিখেছিলেন : "জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে··· । আপনারা যদি জাতীয়তাবাদী হতে চলেছেন, আপনারা যদি জাতীয়তাবাদের এই ধর্মে আরোহণ করতে চলেছেন, তবে আপনাদের তা করতে হবে ধর্মীয় চেতনায়। আপনাদের মনে রাখতে হবে যে আপনারা ঈশ্বরের হাতিয়ার"। 'স্পীচেস', পৃঃ ৬। আবার, ৩০শে মে ১৯০৯-এ উত্তরপাড়ায় প্রদত্ত বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি বলেন : "আমি আর বলি না যে জাতীয়তাবাদ একটি ধর্মমত, একটি বিশ্বাস, একটি ধর্ম : আমি বলি যে সনাতন ধর্মই আমাদের কাছে জাতীয়তাবাদ। এই হিন্দু জাতি জন্মেছিল সনাতন ধর্মের সঙ্গে ; তার সঙ্গেই এর অগ্রগতি, এর বৃদ্ধি।" শ্রীঅরবিন্দ, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০। অনুরূপভাবে, বিপিনচন্দ্র পাল ১৯১০--এ বলেছিলেন : "ভারতের নতুন জাতীয়তাবাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুদের প্রাচীন বেদান্তবাদ"। কে.পি. করুণাকরণ, 'কন্টিনিউইটি অ্যাণ্ড চেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স', পৃঃ ৯৭-৯৮-এ উদ্ধৃত।

৪০। যথা, ১৯১৭-এ বাংলা পত্রিকা 'আল-ইসলাম' ডি. এল রায় রচিত জাতীয়তাবাদী গান "বঙ্গ আমার"-এ মুসলিমদের অনুপস্থিতিকে সমালোচনা করেছিল : "তা অশোক, নিমাই, রাসমণি, প্রতাপাদিত্যের কথা বলে—কিন্তু গিয়াসুদ্দিন খান, ইসা খান প্রমুখ মুসলিম বীরদের কোনো চিহ্নই তাতে নেই। বাংলার জনসংখ্যা সাত কোটি—তার অর্ধেকের বেশী মুসলিম। তবে কেন হিন্দু ও মুসলিম, উভয়কে নিয়ে গঠিত এই বিশাল বাঙালী জাতির জন্য রচিত একটি জাতীয় সঙ্গীত থেকে মুসলিমদের বাদ রাখা হয়েছে?" ১৯১৮-তে, 'আল-ইসলাম' লিখেছিল যে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের অন্যতম মূল কারণ ছিল যে "হিন্দুরা সাহিত্যে মুসলিমদের অন্যায় ও অসাধুভাবে আক্রমণ করে"। অনুরূপভাবে, ১৯২৭ সালে 'আহমদি' অভিযোগ করেছিল যে হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রচার মাধ্যম তখনো মুসলিম-বিরোধী অনুভূতিকে লালন করত। এম. এন. ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩, ১২৩-এ উদ্ধৃত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের হিন্দী সাহিত্যে এই প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছিল তার এক সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য দেখুন সুধীরচন্দ্র : 'কমিউন্যাল কনশাসনেস ইন লেট নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী হিন্দী লিটারেচার'।

৪১। তাঁদের অনেকে একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যেরও পক্ষে ছিলেন। উপরন্তু, জাতীয় আন্দোলনের জাগরণ ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অনেকে মুসলিমদের প্রতি তাঁদের সমালোচনাত্মক ব্যবহার কমিয়ে আনেন, এমন কি তাকে মোড় ঘুরিয়ে তাদের অনুকূল্যে লেখেন। অন্যরা আরো প্রকাশ্যভাবে সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েন। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য সুধীরচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮১-৮২, এবং পৃঃ ১৭২-৭৫, ১৮০।

৪২। জে দ্বারকাদাস, 'পলিটিক্যাল মেময়ারস', পৃঃ ২৭। তাছাড়া দ্রষ্টব্য জে পি প্রধান ও এ. কে. ভাগবত, 'লোকমান্য তিলক', পৃঃ ৮৩-৯০।

৪৩। রামগোপাল, 'ইণ্ডিয়ান মুসলিম্‌স্‌', পৃঃ ৮৮।

৪৪। দ্রঃ, সুমিত সরকার, 'দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল ১৯০৩-১৯০৮', পৃঃ ৪৭-৪৮ : "স্বনির্ভরতার উপর জোর ক্রমবর্ধমানভাবে হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী ধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। নরমপন্থীদের নিন্দা করা হয় জাতীয়তাচ্যুত ইঙ্গপন্থী হিসেবে, এবং ধর্মীয় অনুভূতির কাছে আবেদন করাকে শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রণালী, তার উপর সেতুবন্ধন করার সবচেয়ে দক্ষ কৌশল হিসেবে, এবং রাজনৈতিক কর্মীদের মানসিকতা চাঙ্গা করার অত্যন্ত ভাল পথ হিসেবেও দেখা হয়।"

৪৫। এস আবিদ হুসেন, 'দ্য ডেস্টিনি অফ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস', পৃঃ ৫০-৫৩।

৪৬। মোহাম্মদ আলি, 'সিলেক্টেড রাইটিংস অ্যাণ্ড স্পীচেস', পৃঃ ৬৬-৬৭।

৪৭। ফ্রান্সিস রবিনসন, 'সেপারেটিসম অ্যামং ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্‌', পৃঃ ২০০-০১ উদ্ধৃত।

৪৮। এই পদ্ধতি ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের জন্য যে বিপদ সৃষ্টি করত, সে প্রসঙ্গে বেণী প্রসাদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "হতে পারে, যে ঠিক মত বোঝা গেলে সব ধর্ম এক ঐক্য ও সমন্বয় সাধনকারী প্রভাব বিস্তার করবে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটাই, যে জগতে সব কিছুই ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে, ধর্মও সেখানে যথার্থভাবে বোঝার সম্ভাবনা নেই।" 'দ্য হিন্দু-মুসলিম কোয়েশ্চনস', পৃঃ ৫০-৫১।

৪৯। ১৯২১ সালে হাকিম আজমল খাঁ হিন্দুদের আহ্বান করেন, তাঁরা যেন জামাত-উল-উলামা-ই-হিন্দের সম্পূরক হিসেবে তাঁদের নিজস্ব জামাত-ই-পণ্ডিতান গঠন করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, হিন্দু সংগঠন, পৃঃ ১১৮।

৫০। একথাও মনে রাখা উচিত যে ১৯৩০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক স্রোতের চেয়ে জাতীয়তাবাদী (এবং সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট) স্রোতে গিয়েছিলেন অনেক বেশী সংখ্যক তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবী।

৫১। যেমন, নেহরু ১৯৩৭-এর অক্টোবরে সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখেন যে 'আনন্দমঠ' পড়ার পর তাঁর বাস্তবিক মনে হয়েছিল যে গানটির পটভূমি "মুসলিমদের বিরক্ত করতে পারে···। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে 'বন্দেমাতরমের' বিরুদ্ধে বর্তমান হট্টগোল বহুলাংশে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সৃষ্ট। কিন্তু একই সঙ্গে তার মধ্যে কিছু সারবস্তু আছে মনে হয় এবং যাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঝোঁক আছে তারা এরদ্বারা প্রভাবিত হয়েছে"। নি. রচ. খণ্ড ৮, পৃঃ ১৮৭। এ ছাড়া দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৮, ২২২, ২৩৬-৩৭, ৩৪১-৪২, ৪৩৫-৩৬, ৭৬৮।

৫২। নেহরু, 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি', পৃঃ ১৩৬। এছাড়া দ্রষ্টব্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম', পৃঃ .৯৭।

৫৩। ১৯২০-র ও ১৯৩০-এর দশকে মদনমোহন মালব্য কংগ্রেসে যে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতেন তা মুসলিমদের নিরন্ত হতবুদ্ধি ও বিরক্ত করত। উদাহরণস্বরূপ, দ্রষ্টব্য, জওহরলাল নেহরুর প্রতি মোহাম্মদ আলি, ১৫ জুন ১৯২৪--নেহরু,'এ বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স', পৃঃ ৩৭-৩৮। আরো দ্রষ্টব্য চৌধুরী খালিকুজ্জামান, 'পাথওয়ে টু পাকিস্তান', পৃঃ ১৩২।

৫৪। যথা, ১৯৩৭ সালে জনৈক কংগ্রেস কর্মী অম্বিকাচরণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করেন যে আর্য সমাজের এক প্রচারক বলরামপুরে তহশীল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন এবং একাধারে শুদ্ধি ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচার করছিলেন। তিনি সতর্ক করে দেন যে এই কাজ "বিরাট বিরোধ, সংঘর্ষ ও ভুল বোঝানোর" সৃষ্টি করবে। অনুরূপভাবে, বুলন্দ শহরের এক কংগ্রেস কর্মী এ আই. সি সি.কে ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে একটি চিঠিতে অভিযোগ করেন যে মুসলিমরা জেলা কংগ্রেস কমিটিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, কারণ তার সদস্যরা "সাম্প্রদায়িক কাজকর্মে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেন"। ১৯৩৯ সালে যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সচিব কে. ডি. মালব্য এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস এম এল এ. আবদুল কায়ুম অনুরূপ অভিযোগ করেন। এগুলির উল্লেখ করেছেন ও উদ্ধৃতি দিয়েছেন অনিতা সিং, "নেহরু অ্যাণ্ড দ্য কমিউন্যাল প্রব্লেম ১৯৩৬-১৯৩৯", পৃঃ ২৪০ ও তারপর। ১৯৩৭-এ পাঞ্জাবে আবদুল মজিদ খান এক প্রধান পাঞ্জাব কংগ্রেস নেতা গোপী চাঁদ ভার্গবের হিন্দু মহাসভা এক্সিকিউটিভের সভায় উপস্থিত থাকার তীব্র প্রতিবাদ করেন। পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের কাছে লালা জগৎ নারায়ণ অভিযোগ করেন যে মহাবীর দলের পণ্ডিত অমরনাথকে সদস্য ভর্তির জন্য ১০০টি নিদর্শ-পত্র দেওয়া হয়েছিল। আরেক কংগ্রেস সদস্য, মাহমুদ হাসান, ২২শে মে ১৯৩৭ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কাছে পাঞ্জাবের কংগ্রেস কর্মীদের সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমালোচনা করে এবং মালব্যর মত "সাম্প্রদায়িকতাবাদী" ও "বিদ্রোহী"র প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হচ্ছে দেখিয়ে চিঠি লেখেন। 'অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি পেপার্স', ১৯৩৭-এর ফাইল নং পি ১৭। এই ফাইলে আরো আছে পাঞ্জাব কংগ্রেসে সাম্প্রদায়িকতাবাদী অনুপ্রবেশের দুনি চাঁদ রচিত এক দীর্ঘ সমালোচনা। এছাড়া, মালাবারের অভিযোগের জন্য দ্রষ্টব্য, ঐ, ১৯৩৭-এর ফাইল নং ৪৭, এবং বিহারের অভিযোগের জন্য ঐ, ১৯৩৮-এর ফাইল নং জি-২২।

৫৫। মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংবাদগুলি অনুরূপ দিশা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারা অন্তত নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী বলে দাবী করেনি।

৫৬। নতুন প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা এবং নতুন মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করার জন্য অতীতের কাছে আবেদন করা এবং অতীতের মতাদর্শ বা প্রতিষ্ঠান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বা সেগুলির দিকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে এই দাবী করা আবার খুবই ব্যাপক ঘটনা। মার্ক্সের ভাষায় : "প্রয়াত প্রজন্মগুলির ঐতিহ্য জীবিতদের মনে দুঃস্বপ্নের মত ভর করে থাকে।

আর, ঠিক যখন তারা আপাতঃভাবে নিজেদের ও তাদের বস্তুগত পারিপার্শ্বিকের বৈপ্লবিক রূপান্তরে রত থাকে, যা বিদ্যমান নয় তার সৃষ্টিতে রত থাকে, বিপ্লবীসংকটের ঠিক সেই যুগসমূহেই তারা ভীতভাবে তাদের সাহায্য করার জন্য অতীতের প্রেতাত্মাদের জাগিয়ে তোলে ; তারা তাদের নাম, রণধ্বনি ও বেশভূষা ধার নেয়, যাতে নতুন বিশ্ব-ঐতিহাসিক দৃশ্যকে মঞ্চস্থ করা যায় এই প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় ছদ্মবেশে ও ধার করা ভাষায়। লুথার ধারণ করেছিলেন [যীশুর] শিষ্য পলের মুখোশ ; ১৭৮৯-১৮১৪-র বিপ্লব নিজেকে একবার সাজিয়েছিল রোমের সাধারণতন্ত্র হিসাবে, আর একবার রোমের সাম্রাজ্যরূপে ; আর ১৮৪৮-এর বিপ্লব কোনো সময়ে ১৭৮৯-কে, আর অন্য সময়ে ১৭৯৩-৫-এর বিপ্লবী ঐতিহ্যকে নকল করার চেয়ে ভাল কিছু জানত না। একইভাবে, যে একটি নতুন ভাষা সদ্য শিখতে আরম্ভ করেছে, সে সর্বদা তা নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে নেয় : সে নতুন ভাষাটির মর্ম আত্মস্থ করেছে এবং নিজেকে ঐ ভাষায় অবাধে ব্যক্ত করতে শিখেছে এ কথা তখনই বলা যায়, যখন সে পুরোনো ভাষার সাহায্য ছাড়াই ঐ ভাষাকে ব্যবহার করতে পারে, এবং যখন সে নতুনটির ব্যবহার কালে নিজের পুরোনো ভাষাকে ভুলে যায়।" 'দ্য এইটিনথ, ব্রুমেয়ার অফ লুই বোনাপার্ট', পৃঃ ১৪৬-৪৭।

৫৭। এমনকি আয়ার্ল্যাণ্ডও বিভক্ত হয়েছিল তার জাতীয়তাবাদের ক্যাথলিক ধর্মীয় ভিত্তির দরুন।

৫৮। পিটার হার্ডি, 'দ্য মুসলিমস্ অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ২২৭। ১৯১৯-এর পর বামপন্থীরা সহ অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী নেতা একপেশেভাবে জনগণ ও তাঁদের সংস্কৃতির মহিমাকীর্তন করার ফলে এই দিকটির উপর যথাযথ জোর পড়ে নি। এ বিষয়ে আগের যুগের নরমপন্থী নেতারা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বোঝায় অধিকতর দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যেমন দেখিয়েছিলেন কিছুটা পরিমাণে গান্ধী। নেহরু সহ বহু নেতার ভ্রান্ত আশা ছিল যে জাতীয় আন্দোলনে গণ অংশগ্রহণ আপনা থেকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করে দেবে।

৫৯। বাস্তব ঘটনা এই যে নেতারা সাবধান না হলে এবং পুরোমাত্রায় নেতৃত্বে না থাকলে গণ আন্দোলনে তাঁদের অনুগামীরা ধীরে ধীরে আন্দোলনের উপর এমন এক বিষয়বস্তু চাপিয়ে দিতে পারেন, নেতারা যা দেওয়ার পরিকল্পনা করেন নি। তখন, জনপ্রিয় নেতা থাকতে চাওয়ার যুক্তির নিজে থেকে এমন এক অপ্রতিরোধ্য গুণ দেখা যেতে পারে, যদি না নেতৃত্ব মতাদর্শগতভাবে শক্তিশালী ও স্বচ্ছ থাকে এবং জনপ্রিয় মতামতের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। একটি সমসাময়িক উদাহরণ হল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের সমাজতন্ত্রে কৃষকদের সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক পশ্চাদপদ চরিত্র আরোপ করার ঘটনা।

৬০। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য আবশ্যকভাবে চাই একটি জনগণ ও সমাজের অতীত সাংস্কৃতিক গৌরবের সমস্ত সুস্থ উপাদান অন্তর্গত করা। পুনরুত্থানবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জ্ঞানের প্রসারে বাধাদানকারী ধারার জনপ্রিয় মূলে আঘাত করার জন্যও তার প্রয়োজন ছিল।

৬১। স্বাক্ষরতা, পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য গণ প্রচার মাধ্যমের বিস্তারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতি ছিল। যুগপৎ সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত দিক্ পরিবর্তনের অভাবে, আধুনিক পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকা রচনার বিস্তারের ফলে সাম্প্রদায়িক প্রচার ব্যাপকতরভাবে ছড়িয়ে পড়ল ও অনেক গভীর পর্যন্ত যেতে পারল।

৬২। গান্ধী তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ধর্মীয় প্রতীকতন্ত্র ও ধর্মীয় শ্রদ্ধার দরুন, এই ধারণাও, কম করে বলা যায়, বেজায় বাড়িয়ে কথা বলা। প্রথমত, গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় এক প্রধান ভারতীয় নেতা হয়েছিলেন, যেখানে ২৪ বছর বয়সের তরুণ

আইনজীবীর প্রতি ধর্মীয় শ্রদ্ধার প্রশ্ন ওঠে নি। তাছাড়া, তাঁর অনুগামীদের এক বড় অংশ ছিলেন মুসলিম। তাঁদের পক্ষে "সত্য", "সত্যাগ্রহ" ও "অহিংসা"—এই হাতিয়ার-গুলিকে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা সম্ভব ছিল না। ভারতে তাঁর প্রথম তিনটি প্রকাশ্য আন্দোলন—খেরা, চম্পারণ ও আমেদাবাদ—ছিল সম্পূর্ণ অ-ধর্মসংক্রান্ত। যে রাউলাট বিল-বিরোধী আন্দোলনগান্ধীকে জাতীয় নেতৃত্বের শীর্ষে নিয়ে গেল, তার মধ্যেও কোনো ধর্মীয় দিক ছিল না। গান্ধীর ধর্মীয় স্বাব্যতা তত্ত্বের অনেকটার ভিত্তি "মহাত্মা" উপাধি। কিন্তু মহাত্মা যত না গুরু, বা মহার্ষি, বা বাবা ধ'াচের ধর্মীয় উপাধি, তার চেয়ে বেশী নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্তরের উপাধি ছিল। গান্ধীজীকে কখনো ধর্মগুরু-রূপে উপাসনা করা হয় নি, যাঁর আশীর্বাদে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ বা বৈষয়িক সাফল্য অর্জন করা যায়। তাঁর বিশাল জনপ্রিয়তা এবং শেষ পর্যন্ত শহীদত্ব বরণ সত্ত্বেও, তাঁকে ঘিরে কোনো মন্দির গড়ে ওঠে নি। তাঁর প্রতিকৃতি ও ছবিকে ধর্মীয়ভাবে উপাসনা করা হয় না। কোনো ধর্মীয় উপগোষ্ঠী তাঁকে আপন বলে দাবী করেনি, বা তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠে নি। জনগণের প্রতি তাঁর আবেদনের অরাজনৈতিক অংশটি তাঁদের ধর্মীয় বোধের প্রতি ছিল না, ছিল তাঁদের নৈতিক বোধের প্রতি।

৬৩। অন্যদিকে, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা ও আর.এস.এস. কেবল সাম্প্রদায়িক ছিল, তা নয়। তারা আদৌ জাতীয়তাবাদী ছিল না। তারা হিন্দু বা মুসলিম, কোনোরকম জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করে নি। তারা ছিল নিছক সাম্প্রদায়িক, এবং ঔপনিবেশিকতা-বাদের বিষয়গত মিত্র। আরো দ্রষ্টব্য সি. জি শাহ, 'মার্ক্সিসম, গান্ধীসম্, স্ট্যালিনিসম', পৃঃ ১৭৩-৭৪।

৬

মতাদর্শগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের ভূমিকা : ২

১. ধর্মের ভূমিকা

ভারতে বহু ধর্ম বিদ্যমান, এটাই কি সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থানের ভিত্তি বা অন্তর্নিহিত কারণ বা যুক্তি? কেউ কেউ বলেন হ্যাঁ। যেমন, একজন সাম্প্রতিক লেখক দাবী করেছেন যে: "ভারতে রাজনৈতিক মেরুকরণের মূলে ছিল হিন্দু ও মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, এই প্রস্তাবনা আজ অধিকতর গ্রহণ যোগ্যতা দাবী করে।"[১] তিনি সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গকে "সাম্প্রদায়িক-ধর্মীয় প্রসঙ্গ"[২] রূপে ব্যাখ্যা করা পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন। একই কথা আরও পরিমার্জিত ভাবে বলা যায় যে এক বহুত্ববাদী সমাজে সাম্প্রদায়িকতাবাদ অনিবার্য ছিল এবং আছে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে।[৩] তার অর্থ, যতদিন ধর্মীয় প্রভেদ থাকবে, ততদিন কোনো না কোনো রূপে সাম্প্রদায়িকতাবাদও থাকবে—'একটি বহুত্ববাদী সমাজ সাম্প্রদায়িকতাবাদ এড়াতে পারে না'। তার উত্তর হল যে হয়তো বা তাকে ব্যাপকতর জাতীয়তাবাদের মধ্যে 'উপ-জাতীয়তাবাদ' রূপে অঙ্গীভূত করে নিয়ে, সহ্য করা ও সভ্য করে তোলা।[৪] অন্য উত্তর হতে পারে সব ধর্মের অবসান ঘটানো (যুক্তিবাদী উত্তর) অথবা একটি ধর্ম কর্তৃক বাকি ধর্মগুলিকে আত্মসাৎ করা (সাম্প্রদায়িক-ফ্যাসীবাদী উত্তর)। ধর্ম নিরপেক্ষ উত্তর ভিন্ন ধরণের। ইহা মনে করে না যে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতাবাদের মূলে থাকে।

ধর্মীয় প্রভেদ বাস্তব কিন্তু সেগুলি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কারণ ছিল না। ধর্মীয় ভিন্নতা স্বতন্ত্র ধর্মীয় চেতনাবোধ এবং সামাজিক বিশিষ্টতাকে ব্যাখ্যা করে; কিন্তু এটা সাম্প্রদায়িকতাবাদের মতো একটি দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার উৎপত্তি বা স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে না।[৫] আধুনিক যুগে সাম্প্রদায়ি-

কতাবাদ ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নি, আর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্তিম লক্ষ্য বা দিশাও ধর্ম ছিল না।[৬] অন্যভাবে বলা যায়, ধর্ম সেই অন্তর্নিহিত বা মৌলিক কারণ নয়, যার অপসারণ ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার মোকাবিলা করা বা সমাধান করার ক্ষেত্রে মৌলিক কাজ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মতাদর্শ অথবা বিশ্বাসের কাঠামো হিসেবে ধর্ম, ও ধর্মীয় বিশিষ্টতার মতাদর্শ, যা হল সাম্প্রদায়িকতাবাদ, এই দুইয়ের মধ্যে পৃথকীকরণ প্রয়োজনীয়। দুটি খুবই ভিন্ন। উপরন্তু, কেবল নিজের ধর্মের সম্পর্কে সচেতনতাই যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ নয়, তা বলা যথেষ্ট নয়। চীনে তাইপিংদের, গোড়ার যুগের খ্রীষ্টধর্মের, জার্মানীর কৃষক যুদ্ধগুলির ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সৎনামী ও শিখ বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ধর্মকে সামাজিক বা গণজাগরণের মতাদর্শ রূপে ব্যবহার করাও সাম্প্রদায়িকতাবাদ নয়। বস্তুত, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে, বা ধর্মীয় পরিচিতির মতাদর্শকে বুঝতে হলে, "একজনকে ধর্মের গণ্ডীর বাইরে যেতে হবে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির গণ্ডী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে হবে"।[৭]

তা হলে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদ্ভব ও বৃদ্ধিতে ধর্মের ভূমিকা কী ছিল? যা সত্য, তা হল, সাম্প্রদায়িক ফাটলের ভিত্তি ছিল ধর্মের পার্থক্য, এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রভেদের সংজ্ঞা দিত ধর্মীয় পরিচিতির প্রভেদের ভাষা অবলম্বনে, এবং তাকেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বা জাতিত্বের মৌলিক নির্ধারক করে নিত। ঘুরিয়ে বলা যায়, ধর্মীয় প্রভেদ ছিল সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও রাজনীতির এক মৌলিক উপাদান, এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তা ব্যবহার করত একটি সাংগঠনিক নীতি রূপে এবং জনগণকে লড়তে প্রস্তুত করার জন্য। কিন্তু ঐ প্রভেদ সেসবের কারণ ছিল না। কেন কিছু হিন্দু ও মুসলিম তাঁদের রাজনীতি ধর্মীয় পরিচিতিকে ঘিরে সংগঠিত করলেন, ঐ প্রভেদ তা ব্যাখ্যা করে না। সেই ব্যাখ্যার জন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করতে হবে, কারণ ধর্ম সাম্প্রদায়িকতাবাদের কারণও ছিল না, অন্তিম লক্ষ্যও ছিল না—ছিল তার পরিবহন মাত্র।

ধর্মীয় প্রভেদকে ব্যবহার করা হয়েছিল ধর্ম সংক্রান্ত নয়, এমন সামাজিক চাহিদা, আকাঙ্খা ও সংঘর্ষের "আড়াল" হিসাবে, যেগুলি ছিল ভারতীয় সমাজে ঔপনিবেশিকতার ধাক্কায় বেরিয়ে আসা বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন। অর্থাৎ, ধর্ম ছিল ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে উদ্ভূত রাজনীতির সেবক, ও তার ছদ্মবেশ বা ঘটনার পর যৌক্তিক করে তোলার উপায়,[৮] এমনকি সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তার বিপরীতে বিশ্বাস করলেও এবং অনেক সময়ে সেই বিশ্বাস আত্মস্থ করে নেওয়া সত্ত্বেও। এই কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা ছাড়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতির "ধর্মীয় প্রসঙ্গ সম্পর্কে অন্য কোন উল্লেখ ছিল না"। অথবা, আমরা প্রথম

অধ্যায়ে যেমন বলেছি, খুবই বাস্তব ধর্মীয় পার্থক্য, যেগুলি সম্পর্কে ভারতীয় জনগণ অবশ্যই পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন, সেগুলিকে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িকতা-বাদীরা ধর্মীয় পরিচিতি এবং সাম্প্রদায়িক বৈরীতার মিথ্যা চেতনা সৃষ্টি করেছিল। আমরা এখানে একটি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যমূলক ঘটনার উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করতে পারি।

খ্রীষ্টান জার্মান এবং ইহুদী জার্মানদের মধ্যে ধর্মীয় প্রভেদ ছিল বাস্তব, কিন্তু তা নাজীবাদ বা ইহুদী-বিদ্বেষী রাজনীতি বা জাতিগত [racial] রাজনীতি ও তত্ত্বের উত্থানের জন্য দায়ী ছিল না বা তার কারণ ছিল না। অর্থাৎ, নাজীবাদের উদ্ভব এই পার্থক্যগুলির মধ্যে নিহিত ছিল না। অনুরূপভাবে, কৃষ্ণকায় ও শ্বেত-কায়দের মধ্যে বর্ণভেদ বাস্তব, কিন্তু তা বর্ণবিদ্বেষী রাজনীতির কারণ নয়, অর্থাৎ বর্ণের পার্থক্যে বর্ণবিদ্বেষী রাজনীতির জন্ম নয়। ধর্মীয় পার্থক্য এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থানের ক্ষেত্রেও অবস্থা ছিল একই।

এই প্রশ্নটি যে যে ভাবে দেখা যায় তার একটি হল যেমনভাবে ডব্লু. সি. স্মিথ দেখেছিলেন : যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ধর্মীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে ছিল, এবং একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে তার এক ধর্মীয় ভিত্ত ছিল, কিন্তু তার কোনো ধর্মীয় সমাধান ছিল না। এটাকেই আমি মিথ্যা চেতনা বলে চিহ্নিত করেছি। এখানে সমস্যা বলে যা সামনে রাখা হচ্ছে তা সমস্যা নয়, এবং সমাধান বলে যা প্রস্তাব করা হচ্ছে তা কোনো সমাধান নয়। প্রকৃত সচেতনতা বলতে আমি ঠিক যা বলছি, তা হল, যে সমাধান দেখানো হচ্ছে তা সমস্যার উল্লেখ করে, এবং তা একটি সমাধান বা অন্তত সমাধানের অংশও বটে। যেমন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সমাধানের অংশ ছিল এবং আছে ; সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ না করে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি ঠিক করা যায় না।

আমরা এই সমস্যাকে আরেক দিক থেকে দেখতে পারি। বহু দশক ধরে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একমাত্র যে নির্দিষ্ট দাবী তুলত তা ছিল সরকারী চাকরী (এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত, শিক্ষাগত সুযোগ) এবং কাউন্সিলে বা পৌর প্রতি-ষ্ঠানে আসনের, অথবা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবাধ অধিকার সংক্রান্ত। তারা নির্দিষ্টভাবে অন্য কোনো সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংজ্ঞা দিতে পারত না।[৯] অবশ্যই, সাধারণভাবে মুসলিম সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের কথা বলা হত, কিন্তু তা রাখা হত ধোঁয়াটে ও সংজ্ঞাহীন। একইভাবে, সাধারণভাবে মুসলিমদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূরীকরণের কথা বলা হত, কিন্তু মুসলিমদের জন্য বৈশিষ্ট্যমূলক কোনো প্রসঙ্গ বা প্রতিকার তুলে ধরা হত না। বস্তুত, ধর্মীয় দাবী পর্যন্ত খুব কম সময়েই তোলা হত, হয়ত এই সহজ কারণে, যে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন ছিল, বা বিপন্ন হতে পারত,

এ কথা বলা কঠিন ছিল। চ্যালেঞ্জ করা হলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব করতে বেগ পেত, যা নির্দিষ্টভাবে মুসলিমদের জন্য দাবী করা যেত কিন্তু হিন্দুদের বা অন্যান্য ভারতীয়দের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হত না।[১০] অর্থাৎ ধর্ম ভারতীয়দের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিভাজন রেখা টানার বা "বিচ্ছেদের" ভিত্তি হতে পারত না। উল্লেখযোগ্য, যে তরুণতর কর্মীদের খোঁচায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব যখন ১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে একটি সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী রচনা করেছিলেন, তখন তা 'হিন্দুদের' স্পষ্ট কর্মসূচী থেকে ভিন্ন ছিল না ; তার মধ্যে বিশেষভাবে 'মুসলিম' কোনো কিছু ছিল না।[১১]

সাম্প্রদায়িকতাবাদের গণ, ফ্যাসীবাদী পর্বে সাধারণ মানুষকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করতে ধর্মকে সক্রিয়ভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল। মধ্যশ্রেণীগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার উদারনৈতিক, এলিট পর্বে, চাকরী, শিক্ষা ও কাউন্সিলে আসনের ক্ষেত্রে "রক্ষাকবচ" সম্পর্কিত তাদের সাম্প্রদায়িক দাবীগুলি গ্রহণ করার মাধ্যমে। এই দাবীগুলির স্থান ছিল জীবনের ধর্মনিরপেক্ষ বা অ-ধর্মীয় গণ্ডীতে, যদিও সম্প্রদায় গঠিত হল ধর্মের ভিত্তিতে। অন্যদিকে, জনগণকে আকৃষ্ট করা হয়েছিল তাঁদের ধর্মীয় উৎসাহকে উত্তেজিত করে, কারণ তাঁদের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদ তাঁদের বাস্তব-জীবনের কোনো দাবী বা স্বার্থকে জড়িয়ে নেয় নি বা তাদের সামনে আনে নি। তাঁদের ক্ষেত্রে ভীতির উদ্রেক পূর্ণমাত্রায় করা যেত, তাঁদের স্বার্থ বিপন্ন এই প্রচার করে নয়, বরং ক্রমান্বয়ে এই বলে, যে তাঁদের ধর্মই বিপন্ন। বাস্তবে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে একটি জনপ্রিয় আন্দোলনের স্তরে উন্নীত করার জন্য এমন কোনো আবেগসঞ্চারক ও দাহ্য উপাদানের প্রয়োজন ছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের ঔপনিবেশিকতাপন্থী ও উচ্চশ্রেণী চরিত্রের দরুন, একমাত্র ধর্মই এই উপাদান হতে পারত।

এ কথা বিশেষভাবে সত্য ছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসঙ্গে। ১৯৩৮ পর্যন্ত, বা এমন কি ১৯৪৫-৪৬ পর্যন্ত তার কোনো প্রকৃত গণভিত্তি ছিল না, এবং তা একটি জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল ১৯৩৭ থেকে, এবং আরো বিশেষভাবে ১৯৪৫-৪৭-এ যখন প্রায় তার সমগ্র জোর পড়ে ইসলামের ও ধর্মীয় উদ্দীপনার উপর, যখন সে 'বাঁকানো চাঁদ আর কোরানের' পতাকা তুলে ধরেছিল, গণসমর্থন আদায়ের জন্য ধর্মীয় আবেদন এবং ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করেছিল, ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল, এবং ইসলাম বিপন্ন, তীব্রভাবে এই ধ্বনি তুলেছিল।[১২] আগে ছিল—মুসলিমদের স্বার্থ বিপন্ন। এখন হল—ইসলাম বিপন্ন।[১৩] আগে বলা হত, মুসলিমরা শোষণ, অন্যের আধিপত্য এমন কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্মুখীন ; এখন বলা হল ইসলাম নির্মূল হতে চলেছে। আগে, সাম্প্র-

দায়িক রাজনীতির, এমনকি প্রথম যখন পাকিস্তানের কথা বলা হয় তারও, কাজ ছিল ভারতের মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করা। এখন পাকিস্তান দাবী করা হল ইসলামের শাসন সম্ভব করার জন্য।[১৪] আগে, মুসলিমদের পাকিস্তানের জন্য কাজ করতে বলা হয়েছিল। এখন, ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে, তাঁদের পাকিস্তানের জন্য ভোট দিতে বলা হল, কারণ: "লীগ ও পাকিস্তানের জন্য একটি ভোট ইসলামের জন্য··· [এবং] বিশ্বে ইসলামের কর্তব্যের জন্য একটি ভোট''। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে পাকিস্তান শাসিত হবে শরিয়ৎ; অর্থাৎ ইসলামের দৈব আইনের অধীনে। মুসলিমদের নিজ বাসভূমির প্রয়োজন, যাতে ইসলামের রাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং তাঁরা ইসলামের নীতি অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে পারেন; পাকিস্তান "ইসলামের পুনর্জন্মের'' মূর্ত রূপ হবে। সমস্ত জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের এখন "ইসলাম থেকে দলত্যাগী'' বা "ইসলামের প্রতি বেইমান'' বলে নিন্দা করা হল। বলা হল, তাঁরা ইসলামের শত্রুদের, বিশেষত গান্ধীব হুকুমে চলছেন। পাকিস্তান ছাড়া স্বাধীনতার অর্থ হবে "ইসলামকে ছেড়ে দেওয়া"। মসজিদগুলিকে লীগের প্রচারে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হল। শুক্রবারের প্রার্থনার পর অনেক সময়েই মসজিদে লীগেব সভা হত। মুসলিম লীগপন্থী উলেমা, পীর প্রমুখদের এখন নির্বাচনী প্রচারক রূপে এবং কোবান ও হাদিশ থেকে উদ্ধৃতি সহ ফতোয়া জারী করে দ্বিজাতি তত্ত্ব ইসলাম সম্মত এবং একজাতিতত্ত্ব ইসলাম-বিরোধী এই কথা প্রমাণ করার জন্য সামনে টেনে আনা হল। বলা হল যে পাকিস্তান হবে পৃথিবীর বুকে কোরাণের রাজত্ব কায়েম করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। তাঁরা মুসলিম ভোটদাতাদের মসজিদ ও মন্দিরের মধ্যে বেছে নিতে বললেন। কোরান ব্যাপকভাবে লীগের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হল, এবং লীগ নেতারা অনেক সময়ে বক্তৃতা শুরু করতেন কোরান থেকে একটি অংশ পাঠ করে। কোরাণ ছুঁয়ে লীগকে ভোট দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করানো হত। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগের জয়কে দেখানো হল কুফরের উপর ইসলামের জয় হিসাবে।[১৫]

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও "হিন্দুধর্ম বিপন্ন'',* "হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস বিপন্ন, এবং "হিন্দু কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বিপন্ন'', এই ধ্বনি তোলার চেষ্টা করে এবং হিন্দুদের সতর্ক করতে চায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ও তাদের চর গান্ধীর বিরুদ্ধে।[১৬] কিন্তু

* লেখক এখানে ব্যবহার করেছেন "Hinduism in danger"। তাঁর মতে, Hinduism বলতে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কেবল ধর্ম (ঈশ্বর, মন্দির, ইত্যাদি বোঝায় নি, ধর্মকেন্দ্রিক ও ধর্ম ভিত্তিক সামাজিক গঠন ও সমাজজীবন বুঝিয়েছিল। কিন্তু "হিন্দুত্ব" কথাটি পরে আরেকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় এখানে তা ব্যবহার করা গেল না। এখানের অর্থে Hinduism-কে অস্বাভাবিক বাংলায় "হিন্দুবাদ" (যথা Communism—সাম্যবাদ) বলা যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে। অন্যত্র হিন্দুধর্ম কথাটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

নীচে আলোচিত কারণে, অর্থাৎ প্রথমত হিন্দু ধর্মে একটিমাত্র গোঁড়া অবস্থানের অভাব, এবং জাতপাতের ফলে তার অনৈক্যের চেহারা ও তার ফলে ধর্মীয় আবেগের দুর্বলতার দরুন, প্রথম স্লোগানটিকে জনপ্রিয় করা সহজ ছিল না। দ্বিতীয় স্লোগানটি যথেষ্ট আবেগসঞ্চারকও ছিল না, এবং সারা দেশের হিন্দু জনগণ, বা এমনকি সাধারণ মধ্যশ্রেণীর হিন্দুদের কাছেও খুব অর্থবহ ছিল না। কেবল পাঞ্জাবে, যেখানে হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু এবং আর্য সমাজ একটি সামাজিক শক্তি ছিল, সেখানেই তা যথেষ্ট রাজনৈতিক সাড়া পেয়েছিল : অবশ্যই এ কথা বলা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাময়িক উন্মত্ততার কথা বাদ দিয়ে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কেন জনগণের মধ্যে গভীর শিকড় ঢুকিয়ে দিতে পারে নি, তার একটি কারণ হল ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যর্থতা। রাজনৈতিক আন্দোলন রূপে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে গিয়েছিল "হিন্দুরা বিপন্ন" স্তরে। "হিন্দু ধর্ম বিপন্ন"— এই স্তরে তারা যেতে পারে নি। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দুরা মুসলিমদের সমান জড়িয়ে থাকত, কারণ দাঙ্গা ঘটত একটি ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে।

এখানে আরেকবার বলা যেতে পারে যে উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যেখানে যুক্তিতর্কের সম্মুখীন হতে রাজী ছিলেন, ফ্যাসীবাদী বা চরমপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, ধর্মীয় আবেদনের অযৌক্তিক দিকগুলির উপর নির্ভর করে মনে করতেন যে, (ডব্লু. সি. স্মিথের ভাষায়) তা "তাঁদের যুক্তিবাদী চিন্তা থেকে এবং যুক্তিভিত্তিক সমালোচনার মোকাবিলা করা থেকে মুক্ত করে দিত। 'ইসলাম এত ভিন্ন' [বা 'হিন্দু সংস্কৃতি বা সভ্যতা এত ভিন্ন'] এই কথা বলে তাঁরা ইতিহাস, পাশ্চাত্য বা আধুনিক সমাজতত্ত্ব থেকে কোনো কিছু শেখার দায়িত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করে দিতেন।" সুতরাং আমরা সহজেই স্মিথের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারি : "তা আর যাই হোক না কেন, পাকিস্তানবাদ [বা হিন্দু সংস্কৃতিবাদ] ছিল অসুন্দর"।[১৭] অসুন্দর—যদি সাম্প্রদায়িক ফ্যাসীবাদ 'অসুন্দরের' বেশী কিছু না হ'ত।

ধর্মকে এত সহজে কীভাবে রাজনীতিতে আনা গেল ? প্রাথমিকভাবে, কারণ একটি প্রাক্-ধনবাদী জনগণের জীবনে তা এক বিশাল অংশ হত। জাতীয়তাবাদ এবং শ্রেণী অনুভূতির অভাবে, তা ছিল তাঁদের জীবনের সর্বাপেক্ষা আবেগসঞ্চারক দিক।[১৮] কে. বি. কৃষ্ণ-র কথায় : "কারণরা শূন্যে কাজ করে না। তারা কাজ করে জীবনে। ফলে তারা জীবনের সকল পর্যায় পুনরুৎপন্ন করে", এবং "ধর্ম লড়াইয়ে নামে কারণ মানুষ যে সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে ধর্ম তার অঙ্গ। যে চিন্তা পদ্ধতিগুলি একটি সমাজের বৈশিষ্ট্য, সেগুলি থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে দেওয়া যায় না।"[১৯]

ধর্মের সবসময়েই সংঘর্ষ ঘটানোর এবং চরম ও হিংস্র কাজে অনুপ্রেরণা জোগাবার বিস্ফোরক অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল। অতীতে তা কেবল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের

অনুগামীদের মধ্যেই হিংস্র সংঘর্ষ বাধায় নি (যথা হিন্দু ও মুসলিম, মুসলিম ও খ্রীষ্টান এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ) তা এক ধর্মের অনুগামীদের মধ্যেও হিংস্র সংঘর্ষ বাধিয়েছে, যেমন ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের, শিয়া ও সুন্নীদের, শৈব ও বৈষ্ণবদের, সনাতনী ও আর্যসমাজপন্থীদের (এবং বর্তমানে আকালী ও নিরংকারীদের) মধ্যে।

উপরন্ত, ধর্মীয় ব্যবহারের প্রভেদ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গার পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক কারণ ছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদ এগুলি সৃষ্টি করেছিল, আবার এগুলি তার বিকাশে সহায়তা করেছিল। ১৯৪৬-এর আগে, প্রায় সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল ধর্মীয় প্রসঙ্গকে ঘিরে, যথা মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো, গোহত্যা, অশ্বত্থ গাছ কাটা, হোলির সময়ে জল-রঙ ছোঁড়া এবং হোলি ও মহরম বা অন্য কোনো ধর্মীয় উৎসবের সমাপতন এবং ধর্মান্তকরণ ও পুনঃধর্মান্তকরণ।

অনুরূপভাবে, বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীরা অবশ্যই তাঁদের ধর্মীয় প্রভেদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অন্যান্য পরম্পরাগত গোষ্ঠীর পাশে দেখতে হবে, যাদের অনেকগুলি ১৯৪৭-এর পর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। যেমন, উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলে, হিন্দু ও মুসলিম হিসাবে গোষ্ঠী গঠন খুব কমই হতো (বা হয়)। বরং তা হয় জাট, আহির, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, চামার, বানিয়া, মুসলিম ইত্যাদি। মালাবারে হয় মুসলিম, নায়ার, এজাভা, ইত্যাদি। মহারাষ্ট্রে—মুসলিম, মারাঠা, মাহার, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি। অর্থাৎ, মুসলিমদের সঙ্গে ব্যবহার করা হত যেন তারা অন্য জাতের আরেকটি সামাজিক গোষ্ঠী, এবং তাদের দেখা হত "হিন্দু"দের বিপরীতে নয়, বরং গ্রামের অন্যান্য জাতের বিপরীতে।[২০]

এইভাবে, ধর্মীয় পরিচিতি, বা নিজের ধর্মের দরুণ প্রতিবেশীদের থেকে ভিন্নতর হওয়ার সচেতনতা এবং রাজনীতি সহ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ধর্মের অনুপ্রবেশ বিদ্যমান, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পরিস্থিতিতে অন্তর্নিহিত ছিল। কিন্তু যা অনিবার্য ছিল না, তা হল আধুনিক রাজনীতিতে—জনগণের অংশগ্রহণের রাজনীতিতে—ধর্মের প্রবেশের রূপ, এবং তার সাম্প্রদায়িকতাবাদে রূপান্তরিত হওয়া। ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠী বা পরিচিতিকে রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠনের জন্য বা রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা ছিল ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের এক নতুন বৈশিষ্ট্য। তা বুঝতে হলে তাকাতে হবে, (যেমন ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ অধ্যায়ে হয়েছে), সাম্প্রদায়িকতাবাদের আর্থ-সামাজিক উৎসের দিকে। ধর্মকে আনা হয়েছিল (যেমন হয়েছিল পরে জাতপাত ইত্যাদিকে) মুখ্যতঃ এই কারণে যে তাকে ধর্মনিরপেক্ষ, অ-ধর্মীয় ক্ষেত্রে উত্থিত শ্রেণীদের ও সামাজিক গোষ্ঠীদের রাজনীতিকে 'মুখোশ' পরিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করা যেত।

অনেক সময়েই পরিলক্ষিত হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের নিছক ধর্মীয় বা ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু অতি নগণ্য হওয়ার প্রবণতা রয়েছে।[২১] সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা খুব কমই ধর্মতত্ত্বের উপর নির্ভর করে, এবং বাস্তবে, ধর্মতাত্ত্বিক প্রসঙ্গসমূহকে সক্রিয়ভাবে এড়িয়ে যায়। কে. বি. কৃষ্ণ উদাহরণস্বরূপ বলেছেন মুসলিম মহাজনদের কথা, যারা মহাজনী কারবারে নেমেছিল তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে, এবং তারপর হিন্দু মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছিল।

সাম্প্রদায়িকতাবাদে ধর্মের ভূমিকা যে ছিল সম্পূর্ণরূপে বহিঃস্থ এবং প্রতিকল্প ভূমিকা—একটি মুখোশের ভূমিকা—তা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে যদি আমরা সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ বা ব্যক্তিত্বদের ধর্মীয় দিকটির প্রতি দৃক্‌পাত করি। গড়পড়তা মুসলিম লীগ নেতা গোঁড়া, এমনকি ব্যবহারিক মুসলিম পর্যন্ত ছিলেন না। "অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনকি কোরান ও সুন্না সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানও ছিল অতি সামান্য··· । তাঁর কাছে ইসলামীয় আবেদন ছিল নিছক লোক খেপানোর একটি যন্ত্র।"[২২] এই উক্তি অধিকাংশ আলিগড়ি সাম্প্রদায়িকতাবাবাদী সম্পর্কেই যথার্থ হত, এবং সর্বাগ্রে তা সঠিক ছিল এম. এ. জিন্নার প্রসঙ্গে।[২৩] অধিকাংশ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইসলামকে ব্যবহার করতেন এক সাধারণ অর্থে, নিশান হিসেবে, তার ধর্মীয় কার্যক্রমের অর্থে নয়। অন্যদিকে, হিন্দু মতবাদের চরিত্রের ফলেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে সমস্ত ধর্মীয় বিষয় সরিয়ে রাখত। বহু কট্টর আর্য-সমাজপন্থী, যাঁরা সব রকম পৌত্তলিকতার বিরোধী, তাঁরা তাঁদের সাম্প্রদায়িক ব্যবহারে কার্যত গো-উপাসকে পরিণত হন। সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রধান পুরোহিত ও তাত্ত্বিক বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছিলেন যুক্তিবাদী ও ব্যবহারিক নাস্তিক।[২৪] হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের বহুমতের ফলে তিনি হিন্দু ধর্ম, হিন্দুত্ব ও হিন্দুজাতির সংজ্ঞা নিছক সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি হিন্দুত্ব বা হিন্দু রাজনৈতিক পরিচিতি নিরূপণে ধর্মের ভূমিকাকে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেছিলেন। বরং, তিনি 'হিন্দুত্বের' ব্যবহার করেছিলেন হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করতে।[২৫] হিন্দুরা হিন্দুধর্মের অনুবর্তী নয়, বরং হিন্দুধর্ম হল হিন্দুদের ধর্ম। সাভারকার যেখানে স্পষ্টভাবে হিন্দুদের একটি সম্প্রদায় বা জাতি হিসেবে তাঁর প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে ধর্মকে বাতিল করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেখানে, যাঁরা তা করেন নি তাঁরাও ধর্মকে রেখেছিলেন যত না একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় অন্তর্বস্তু সম্পন্ন নির্দিষ্ট ধর্ম হিসেবে, তার চেয়ে বেশী একটি নৈর্ব্যক্তিক ভাবনা হিসেবে। যেমন, গোলওয়ালকার, যাঁর রাজনৈতিক চিন্তা অন্য বিষয়ে ছিল কার্যত সাভারকারের প্রতিধ্বনির মতো, এবং যিনি ভারতে জাতীয়তার একটি মৌলিক নির্ধারণকারী উপাদান রূপে ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও হিন্দুত্বের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন হয় চক্রাকার যুক্তির মাধ্যমে অথবা সেগুলিকে "নিম্নবর্ণিত বর্ণ ও আশ্রম"-এর সঙ্গে সমীকরণ করে।[২৬] একইভাবে, ভাই পরমানন্দ

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ভাষা, এলাকা ও ধর্মের প্রতি ভালবাসা হিসেবে, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ ধর্মীয় দিকটির প্রসঙ্গে পিছু হঠাছিলেন। প্রথমত, তিনি বলেছিলেন "ধর্ম তার নিজ বৈশিষ্ট্যে জাতীয়তাবাদ থেকে সর্বৈবরূপে ভিন্ন"। দ্বিতীয়ত, "ধর্ম কয়েকটি বদ্ধমূল ধারণা উপস্থাপনা করে⋯। ধর্ম কয়েকটি মৌলিক নীতির সত্যতা ধরে নেয়, এবং এইভাবে সংকীর্ণ মানসিকতা ও গোঁড়ামির ভিত্তি রচনা করে"। হিন্দু ধর্ম সেরকম ছিল না, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র কেবল ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী এক সার্বভৌম শক্তিরঅস্তিত্বের কথা মনে করে এবং অন্য সমস্ত কিছুকে "অজ্ঞেয়" বলে ঘোষণা করে। উপরন্তু, হিন্দুর সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন ছিল। তিনি বলেন যে তিলক ১৯০১-এ ঘোষণা করেছিলেন, "হিন্দু সে, যে বিশ্বাস করে বেদে আছে স্ব-প্রতীয়মান এবং স্বতঃসিদ্ধ সত্য"। কিন্তু, ভাই পরমানন্দ দেখান, যে এই সংজ্ঞা জৈন ও শিখদের বাদ দেবে। অন্য কেউ কেউ বলেছিলেন যে হিন্দু সেই, যে গোরু ও ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করে ; কিন্তু বহু হিন্দু তা করত না। শেষ পর্যন্ত তিনি হিন্দুকে, সে প্রসঙ্গে সাভারকারের সংজ্ঞা গ্রহণ করেন ও উপসংহারে বলেন : "যে নিজেকে হিন্দু বলে এবং মনে করে সেই হিন্দু"।[২৭]

অন্যদিকে, অধিকাংশ গোঁড়া উলেমা ও ধর্মতাত্ত্বিকরা, যাঁরা গভীরভাবে ধর্মভীরু ছিলেন এবং যাঁদের রাজনীতি অনেক দৃঢ়ভাবে ধর্মের উপর ভিত্তি করেছিল, তাঁরা ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধী ছিলেন বা অন্তত কম সাম্প্রদায়িক ছিলেন।[২৮] অনুরূপভাবে, গান্ধীর বা মৌলানা আজাদের গভীর ধর্মীয় আনুগত্য ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তাঁদের আনুগত্যের অন্তরায় হয় নি।[২৯] ধর্ম এমন কতকগুলি ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করতে পারত যা বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী স্বার্থের অংশ নেয়, সে কথা ছাড়াও, জাতীয়তাবাদী প্রেরণার উৎস হিসেবে ধর্ম, এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ, এই দুইয়ের মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্য ছিল। যেমন, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা প্রেরণা ও মতাদর্শের জন্য ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়তাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না। তাঁদের কাছে ধর্ম ছিল অন্তরের শক্তির উৎস, রাজনীতির ভিত্তি নয়। ধর্ম তাঁদের অনুপ্রেরণা দিত সমগ্র ভারতীয় জনগণের জাতীয় মুক্তির যোদ্ধায় পরিণত হতে, ভারতীয় জনগণের আরেক অংশের প্রতি ঘৃণা প্রচারকারী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সংগঠক হতে নয়। যেখানে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের ধর্মীয় ও অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস তাঁদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ার পথে নিয়ে যেত, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রায়ই হত মনোগতভাবে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, এবং বিষয়গতভাবে তারা ভারতীয় জনগণকে বিভক্ত করে ও রাজনীতির ধার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘোরানোর পরিবর্তে অন্য ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ঘোরাতো।

অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলিম, যারা সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক ভিত্তি রচনা করত, তারা প্রায়শই ধার্মিক ছিল না। ডব্লু. সি. স্মিথ সাম্প্রদায়িক মুসলিমদের সম্পর্কে যা বলেছেন তা সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের প্রসঙ্গে সমান প্রযোজ্য :

> " . বহু মধ্যশ্রেণীভুক্ত মুসলিমের কাছে সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল তাঁদের ধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছাড়া এই (ভারতীয়) মুসলিমদের অনেকে নামে মাত্র মুসলিম হতেন। কারণ, তাঁরা যখন "ইস-লামের" কথা বলেন, তখন তাঁরা মুসলিম সম্প্রদায়, বা সাধারণতঃ ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়, বা এমনকি কেবল মুসলিম লীগ, ও তার প্রতি আনুগত্যের কথা ছাড়া আর কি বলতে চান, বা আদৌ কিছু বলতে চান কিনা, তা বোঝা শক্ত। সাধারণভাবে তাঁরা অন্য কোনো অর্থে তাঁদের ধর্মের দ্বারা জীবন পরিচালনা করেন না, তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি ধর্ম প্রভাবিত নয়, তাঁদের আদর্শ ও লক্ষ্য ধর্ম থেকে উদ্ভূত নয়। অনেক সময়ে তাঁরা অন্য কোনো অর্থে তাঁদের ধর্ম সম্পর্কে খুব একটা জানেন না। ঈশ্বর ব্যক্তিগত মুক্তি, নৈতিকতা, উপা-সনা প্রসঙ্গে তাঁদের ভাবনা চিন্তা খুবই কম।"[৩০]

সুতরাং, এই অর্থেও সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি হাতসাফাই। সাম্প্রদায়িক প্রভেদ টানার জন্য ধর্মের উপর নির্ভর করলেও, তার মধ্যে ধর্ম প্রায় ছিলই না। (যেমন, সাভারকর এ কথাও বলেছিলেন যে নাস্তিক হলেও একজন ব্যক্তি হিন্দু হতে পারে)। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্মকে ব্যবহার করত এক ধরণের বিদ্যমান চেতনার কাছে আবেদন করে একদম অন্য এক নতুন রাজনৈতিক প্রভেদের সৃষ্টি করার জন্য। তারা ধর্মকে ব্যবহার করত নিছক রাজনৈতিক প্রয়োজনে জোট তৈরী ও বিচ্ছেদের নীতি হিসাবে। তারা ধর্মকে ব্যবহার করত এক মিথ্যা চেতনা সৃষ্টি করতে। তাদের কাছে ধর্মের আর প্রায় কোনো উপযোগিতাই ছিল না।

যদিও ধর্ম সে অর্থে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য দায়ী ছিল না, ধর্মভাব ছিল একটি বড় সহকারী উপাদান, এবং গণস্তরে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সেই আবেগ ও তীব্রতা দিয়েছিল যা তাকে রাজনৈতিকভাবে সফল করে তুলে-ছিল। ধর্মভাবের সংজ্ঞা হতে পারে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়সমূহে গভীর ও তীব্র আবেগ-পূর্ণ অঙ্গীকার, এবং ধর্ম ও ধার্মিক অনুভূতিকে জীবনের অ-ধর্মীয় বা অনাত্মিক ক্ষেত্রে ও ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনের মাত্রা ছাড়িয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া, ধর্মকে রাজ-নীতি, অর্থনীতি ও সমাজ জীবন থেকে স্বতন্ত্র করতে অস্বীকার করা—এক কথায় অতিধার্মিক হওয়া বা জীবনে বড় বেশী মাত্রায় ধর্ম রাখা। জওহরলাল নেহেরু বারংবার উল্লেখ করেছিলেন যে ভারতে "বড় বেশী ধর্মভাব" ছিল।[৩১] কৃষকরা যেখানে তাঁদের ধর্মকে গভীরভাবেই নিতেন, কিন্তু একটু সন্তর্পণে, সেখানে নিম্ন মধ্যশ্রেণীর মানুষ ও তাঁদের মেয়েরা, বিশেষত যাঁরা আধুনিক শিক্ষা ও

সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন নি, তাঁদের প্রবণতা ছিল ধর্মভাব ও ধর্মীয় আবেগের শিকার হওয়া।

অতিমাত্রায় ধর্মভাব ধর্মীয় উপাদানকে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে দিয়েছিল। তা জনগণকে সাম্প্রদায়িকতাবাদের ধর্মের নামে আবেগপূর্ণ আবেদনের ফাঁদে পা দেওয়ার অবস্থায় এনে দিয়েছিল। উপরন্ত, ধর্মভাব নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার ঝোঁক দেখাত, কারণ তার কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা ছিল না। ধর্মভাব ছাড়া ধর্মীয় আবেগ জাগ্রত করা যেত না; আর তা ছাড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদ ১৯৪৬-৪৭-এর মত গণ-আন্দোলনের চরিত্র কখনই অর্জন করত না। ধর্মভাব মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধিতাও কঠিন করে তুলেছিল। আর অবশ্যই, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্মভাব বাড়িয়ে তোলার এবং গণচেতনায় ধর্মের কব্জা দৃঢ় করার সব রকম চেষ্টা করত। তারা দৃঢ়ভাবে এই মতের বিরোধিতা করত যে ধর্ম "একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন" বা তা রাজনীতির বাইরে থাকা উচিত। তারা তর্ক করত এই বলে, যে ভারতীয়রা এক ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক জনগণ, যাঁদের ক্ষেত্রে ধর্মকে জীবনের সব ক্ষেত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে হবে।[৩২]

মুসলিম, শিখ ও আর্যসমাজপন্থীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার অধিকতর সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল তাঁদের মধ্যে ধর্মভাব প্রবলতর হওয়া। ১৯৩৫ সালেই নেহরু এর উল্লেখ করেছিলেন:

> "আমি তাঁর (মহম্মদ আলীর) সঙ্গে ধর্মের প্রসঙ্গে আলোচনা এড়িয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমি জানতাম যে আমরা কেবল একে অপরকে উত্যক্ত করব, এবং আমি তাঁকে হয়ত আঘাত দিতে পারি। যে কোনো ধর্মের বিশ্বাসীদের সঙ্গে এটা আলোচনা করার পক্ষে একটা কঠিন বিষয়। অধিকাংশ মুসলিমের সঙ্গে সম্ভবত তা আলোচনা করা আরো কঠিন কারণ সরকারীভাবে তাঁদের কোনোরকম চিন্তার জায়গা অনুমোদিত নয়। মতাদর্শগতভাবে, তাঁদের হল এক সোজা ও সংকীর্ণ পথ, এবং বিশ্বাসী ডাইনে-বাঁয়ে হেলার কোনো উপায় নেই। হিন্দুরা কিছুটা ভিন্ন, যদিও সবসময় না। প্রয়োগক্ষেত্রে তারা খুব গোঁড়া হতে পারেন; তাঁরা অত্যন্ত বস্তাপচা, প্রতিক্রিয়াশীল এমনকি ক্ষতিকর প্রথা পালন করতে পারেন ও করেন, অথচ তাঁরা সাধারণতঃ ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে র‍্যাডিকাল মতামত আলোচনা করতে রাজি থাকবেন। আমার ধারণা, আধুনিক আর্যসমাজীদের সাধারণভাবে এই প্রশস্ত বুদ্ধিগত দিশা নেই। মুসলিমদের মত, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সোজা ও সংকীর্ণ পথ ধরে চলেন।"[৩৩]

এর একটি কারণ হতে পারে মুসলিম, শিখ ও আর্যসমাজপন্থীদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু চরিত্র—এবং আর্যসমাজপন্থীরা ও হিন্দুরা সংখ্যালঘু ছিলেন। পাঞ্জাবে, যা ছিল একটিমাত্র প্রদেশ, যেখানে আর্যসমাজ জনপ্রিয় হতে পেরেছিল। সম্ভবত

ইসলাম ও শিখধর্মের ক্ষেত্রে অধিকতর ধর্মীয় সংহতি, বিচ্যুতি ও প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী গোষ্ঠীদের দমন করে রাখার জন্য একটি মাত্র ধর্মগ্রন্থ যার অনুশাসনের দিকে তাকানো যায় তার উপস্থিতি, সার্বজনীন ধর্মীয় প্রতীক ও বিশ্বাসের অস্তিত্ব, এবং ধর্মদৃষ্টি যে সাম্প্রতিক, নথিভুক্ত ইতিহাসে উদ্ভূত ও তাদের প্রতিষ্ঠাতারা বাস্তব ঐতিহাসিক চরিত্র, ও সব অংশত এই অধিকতর ধর্মভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে। সমস্ত মুসলিমরা তত্ত্বগতভাবে এক সমাজের সদস্য—মিলাত-এ-ইসলামী, ঠিক যেমন সমস্ত শিখ এক পন্থের অন্তর্ভুক্ত। মৌলভী, মোল্লা ও উলামা এবং গ্রন্থিরা—অর্থাৎ ধর্মীয় যাজক বা এলিটরা শক্ত হাতে মুসলিম ও শিখদের মনকে ধরে থাকে, যেহেতু তারা শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়। মুসলিমদের মধ্যে শিশুদের যা শিক্ষা দেওয়া হত তার অধিকাংশই হত ধর্মীয়। খিলাফৎ ও আকালী আন্দোলন অন্যদিক থেকে ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হলেও, মানুষের মনের উপর গোঁড়া মতবাদ এবং যাজকতন্ত্রের দখল শক্ত করেছিল এবং ধর্মভাব ও রাজনৈতিক প্রশ্নকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আলিগড় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মভাবকে সচেতনভাবে উৎসাহ দেওয়া হত। আর্য সমাজ ও তার স্কুল কলেজগুলিও পাঞ্জাবে একই ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন, বৈদিক শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তনের দাবী করা সত্ত্বেও, আর্যসমাজীরা বেদের একটিও হিন্দী বা উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন নি, বরং গোরক্ষার প্রশ্নকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরেছিলেন। অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যথা শিখ, ইসলামিয়া ও সনাতন ধর্ম স্কুল ও কলেজগুলিও ধর্মভাব জাগ্রত ও উৎসাহিত করত।

এই অধিকতর ধর্মভাব মুসলিম ও শিখদের সাম্প্রদায়িক অনুপ্রবেশের ও "ইসলাম (বা পন্থ) বিপন্ন" এই আবেগপূর্ণ ডাকের প্রতি অধিকতরভাবে খোলা রেখেছিল এবং সাম্প্রদায়িক প্রচার সহজে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল। এই ধর্মভাব অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা ও পক্ষপাতদুষ্ট ধারণার জন্ম দিয়েছিল। এগুলিকে তখন সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সচেতনভাবে ব্যবহার করত।

হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রয়াসের বিকাশ ও সংহতির দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল হিন্দুদের মধ্যে ধর্মভাবের অভাব। হিন্দুরা জাতিভেদ প্রথার দ্বারা বিভক্ত ছিলেন। গোড়ামি ছিল দুর্বল, কারণ প্রচলিত মতবিরোধী ধর্মীয় গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন জাতের ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ছিল (বহু নিম্নজাতির জন্য বৈদিক ধর্মের দ্বার রুদ্ধ ছিল ; অন্য অনেকে ছিল গো-মাংস ভক্ষণকারী)। হিন্দুদের মধ্যে তাই ধর্মীয় সংহতি কম ছিল এবং ধর্মীয় পরিচিতির বোধ ছিল অনেকটা খাদ মেশানো। ফলে ধর্মীয় আবেগ, ও হিন্দুধর্ম বিপন্ন এই জিগিরে সাড়া ছিল দুর্বল। উপরন্তু, যাজক শ্রেণী ছিল প্রায় অনুপস্থিত। তাই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাজ ছিল দ্বিগুণ কঠিন। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীকে

যেখানে কেবল মুসলিম ধর্মীয় পরিচিতিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদে পরিণত করতে হত, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীকে সেখানে হিন্দু ধর্মীয় পরিচিতিও সৃষ্টি করতে হত। গোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য এবং আভ্যন্তরীণ বিভাজনের ফলে, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মমত সংক্রান্ত প্রস্তাব ও তত্ত্বের বহুত্বের ফলে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্মীয় গোঁড়ামির কাছে আবেদন করতে পারত না এবং তারা দেখে যে ধর্মভিত্তিক ঐক্য স্থাপন করা কঠিন। হিন্দুকে তাঁরা এর এমন এক সুবিধাজনক সংজ্ঞা নিরূপণ করল, যা আদৌ ধর্মীয় নয়।[৩৪] মুসলিম ধর্মগুরুরা বা উলামা যেখানে রাজনৈতিক বিষয়ে প্রচারের জন্য ফতোয়া জারী করতে পারতেন, সেখানে হিন্দুদের মধ্যে তেমন ধর্মীয় অনুশাসন জারী করার কর্তৃত্বকেই প্রথমে সৃষ্টি করতে হত। উলামার অনুকরণ করার এবং তথাকথিত শঙ্করাচার্যদের মাধ্যমে আবেদন করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমনকি শুদ্ধি আন্দোলনও হিন্দুদের বিভক্ত করে, কারণ সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে : তা কি শাস্ত্রে অনুমোদিত ? আর কোন গোষ্ঠী বা জাতের জন্য শুদ্ধি ? অনুরূপভাবে, তফশীলভুক্ত জাতগুলিকে সংহতির মধ্যে আনার যে চেষ্টা হিন্দু মহাসভা করেছিল, তা সনাতনী পণ্ডিতদের মধ্যে ঝড় তোলে।

ফলে, হিন্দুরা অনেক সহজে সাড়া দিত জাত বা গোষ্ঠী বিপন্ন, এই আওয়াজে বা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় প্রসঙ্গে যা তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করাত, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে নয়। এই সাধারণীকরণের একমাত্র বড় ব্যতিক্রম আর্য সমাজের অনুগামীরা আর্যসমাজ ইসলামকে অনুকরণ করে ধর্মভাব ও গোঁড়ামিকে সচেতনভাবে বাড়িয়ে তুলত।[৩৫]

সুতরাং এ প্রসঙ্গে আলোচনার শেষে এ কথা বলা যায় যে যাঁরা আধুনিক পরিবেশে ধর্মকে জীবনের এক বৃহৎ অঙ্গ করে রাখার মধ্যযুগীয় অবস্থানকে স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন, তাঁরা যত পরোক্ষভাবে, অসচেতনভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক না কেন, সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রসারে সহায়তা করেছিলেন। বস্তুত, তাঁরা তা করেছিলেন এমন কি সচেতনভাবে তার বিরোধিতা করার সময়েও।

এখানে উলামা ও সর্ব-ইসলামাবাদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে নেতিবাচক। মুসলিমরা কেবল ধর্মীয় আদর্শে স্থাপিত মিল্লাত-এ-ইসলামিয়া, এই অখণ্ড সমাজের অন্তর্ভুক্ত, এই কথা জোর দিয়ে বলে ; তাঁদের সমস্ত অবস্থানকে কোরান ও অন্য ধর্মীয় রচনার ভিত্তিতে প্রমাণ করে , মুসলিমদের শারিয়া অনুসারে জীবনযাপনের দাবী করে, যার ব্যাখ্যা করবে আদালত নয়, উলামা, যাতে দুটি স্বতন্ত্র আইন ব্যবস্থা থাকে ; হিন্দু ও মুসলিম বাচ্চারা স্বতন্ত্র স্কুলে যাবে এই দাবী করে, এবং সাধারণভাবে মুসলিমদের সমস্ত আধুনিক সংস্কৃতি ও চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখার দাবী করে ; ক্রমাম্বয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে খোঁচা দিয়ে, ধর্ম ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের আর সমস্ত ক্ষেত্রকে জড়িয়ে থাকবে একথা ক্রমাম্বয়ে জোর

করে বলে ; এবং পরম্পরাগত ধর্মীয় ধাঁচের শিক্ষার মূল্য জাহির করে, এমনকি জাতীয়তাবাদী উলামাও মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয়, এমন কি সাম্প্রদায়িক পরিচিতি বাড়াতে ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রসারে প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করেছিলেন।[৩৬] আর অবশ্যই, যখন উলামার একাংশ মুসলিম লীগে যোগদান করেন, তখন এই ধর্মভাবকে প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ঘোরানো হয়েছিল ; পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধাচরণকে অনৈস্লামিক, এমনকি শরিয়া বিরোধী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পাকিস্তানপন্থী উলামা জাতীয়তাবাদী উলামার তুলনায় নিশ্চিতভাবে শক্তিশালী ছিলেন। তাঁরা যেখানে ঘোষণা করতে পারতেন যে পাকিস্তান শাসিত হবে শরিয়া অনুযায়ী, সেখানে জাতীয়তাবাদী উলামা সংযুক্ত ভারত সম্পর্কে বা সেখানে বসবাসকারী মুসলিমদের সম্পর্কে তেমন কোন আশ্বাস দিতে পারতেন না। জাতীয়তাবাদী উলামা আরো যা পারতেন না, তা হল ফতোয়া জারী করে পাকিস্তানকে হারাম বা দার-উল-হারাব বলে ঘোষণা করা। অনুরূপভাবে, স্বামী দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং অন্যান্যরা ধর্মভাবকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং এইভাবে পরোক্ষে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিচিতি বোধকে উৎসাহিত করেন।

আধুনিক জীবন-বিকাশের এক বিশাল নতুন দিগন্ত খুলে যায়। হয় ধর্ম সেখানে অনুপ্রবেশ করবে, অথবা তা নিজের জন্য জীবনের এক ক্রমশ ক্ষীয়মাণ ক্ষেত্র গ্রহণ করবে। অর্থাৎ, ধর্মনিরপেক্ষতা আংশিকভাবে জীবনের সম্প্রসারণের ফল। ধর্ম সাম্প্রদায়িকতাবাদের কারণ নয়, কিন্তু তার উপাদানগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদের মতাদর্শগত বাহনের কাজ করেছিল। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা গড়ে তোলার অর্থ, ধর্ম বা ধর্মীয় চেতনাকে অপসারণ করা না হলেও, ধর্মভাব কমানো বা ক্রমেই ধর্মের ক্ষেত্রকে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব জীবনের স্তরে নামিয়ে আনা। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসমূহ ধর্মভাব বর্জন করেছে, ধর্মকে ত্যাগ করে নি।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনগুলির, বিশেষত তাদের ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী শাখাদের ভূমিকাও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এই আন্দোলনগুলি, যেগুলি একত্রে ভারতীয় নবজাগরণ নামে পরিচিত, কেবল আধুনিকীকরণের প্রতিনিধিত্ব করেনি। বরং তারা ধর্মীয় মৌলবাদ এবং হিন্দুধর্ম ও ইসলামের প্রত্যাবর্তনেরও প্রতিনিধিত্বকারী ছিল। অর্থাৎ আধুনিকীকরণের পাশাপাশি অনেক সময়েই ছিল সেই প্রক্রিয়া, যাকে সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন 'সংস্কৃতকরণ' এবং 'আরবীকরণ' বা 'ইসলামীকরণ'।

মধ্যযুগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ও ধীরে ধীরে এক সাধারণ সংস্কৃতির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের স্তরে, জনপ্রিয় ধর্ম, তাদের পারস্পরিক

প্রভাব ও সুতরাং 'ভ্রষ্ট', অর্থাৎ গোঁড়া নয়, এমন রূপ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সামাজিক ও কৃষ্টিগতভাবে একত্রে আনছিল। উচ্চতর ধর্মগুলিকে বিচিত্র উপ-জাতীয় এবং স্থানীয় কৃষ্টি ও বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং বিভিন্ন জাতের পরম্পরার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চলছিল। উপরন্তু, অধিকাংশ মুসলিম ছিলেন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি, যাঁরা তাদের সঙ্গে নতুন ধর্মে পুরোনো ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস ও ব্যবহারকে নিয়ে গিয়েছিলেন। জনপ্রিয় ধর্মগুলি ছিল বিশ্বাসে ও ব্যবহারে খুবই মিশ্র ধাঁচের। তাদের মধ্যে জনগণের সাধারণ কৃষ্টি ও জীবনধারার প্রাধান্য ছিল। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক প্রথা ও ব্যবহারে ঝোঁক ছিল ঐক্যের, বা অন্তত, ভাল ও মন্দ দু'রকম চরিত্রের ক্ষেত্রেই, পারস্পরিক প্রভাবের প্রাধান্যের দিকে। হিন্দু ও মুসলিমদের একই সন্ত ও পীর, মাজার, দরগা ও অন্যান্য পবিত্র স্থান, এমনকি জনপ্রিয় দেবদেবী ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগ্ম ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। জাতিভেদ প্রথার কিছু কিছু উপাদান, যথা খাদ্য সংক্রান্ত বাধা নিষেধ, অশুচিতা, বৈবাহিক নিষেধ, ইত্যাদি উভয়ের সাধারণ ব্যবহারে পরিণত হয়েছিল। হোলি, দশেরা, দুর্গা পূজা, দেওয়ালি, রাখী ও ঈদ অষ্টাদশ শতকে অযোধ্যা, বঙ্গদেশ ও অন্যত্র সাধারণ মানুষ ও শাসকশ্রেণী উভয়েই একত্রে উত্থাপন করত। এমনকি যেখানে এসব বা অন্য উৎসব একত্রে পালিত হত না, সেখানেও কিছুটা পরিমাণে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তা ভাগ করে নেওয়া হত। মহরমের তাজিয়া ছিল সকলের জন্য উৎসব, বিশেষত হিন্দু মেয়েদের জন্য, যারা বিশ্বাস করত যে তাজিয়ার নীচ দিয়ে হাঁটলে তারা সন্তানের মা হবে। জ্যোতিবিদ্যা, হস্তরেখাবিদ্যা ও পঞ্জিকা সকলেই ব্যবহার করত। ধর্মনিরপেক্ষ বীর ও বীরাঙ্গনাদের উপর ভিত্তি করে, বা সাধারণ ধর্মীয় চরিত্র, প্রতীক ও কাহিনীর ভিত্তিতে, পরস্পরের সাধারণ সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮৮১-র আদমসুমারীতে পাঞ্জাবের জাতগুলি সম্পর্কে দেঞ্জিল ইবেট্‌সনের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের গবেষণা থেকে এক দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন :

> "বাস্তব ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের পূবাঞ্চলে ধর্মান্তর ধর্মান্তরিতের জাতের উপর আদৌ কোনো প্রভাব ফেলে না। মুসলমান, রাজপুত, গুজার বা জাট সমস্ত সামাজিক, উপজাতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে তার হিন্দু ভাইয়ের মতই একজন রাজপুত, গুজার বা জাট। তার সামাজিক প্রথা অপরিবর্তিত, তার উপজাতিক বাধানিষেধের শৃংখল শিথিল হয় নি, তার বৈবাহিক ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম অপরিবর্তিত; এবং প্রায় একমাত্র তফাৎ হল এই, যে সে তার মাথার চুলের গোছা আর গোঁফের উপর দিকটা কামায়, মসজিদে গিয়ে মহম্মদের ধর্ম আওড়ায়, আর হিন্দু বৈবাহিক প্রথার

সঙ্গে মুসলমান প্রথা জুড়ে দেয়…। এমনকি, সে আগের মত মূর্তিপূজাও করে, বা অতি সাম্প্রতিককালে তা করা বন্ধ করেছে।

ঘটনা এই, যে জনগণ যে কোনো ধর্মের নিয়মের চেয়ে অনেক বেশী আবদ্ধ, সামাজিক ও উপজাতিক প্রথার দ্বারা। যেখানে গ্রামাঞ্চলের সমগ্র হাবভাব ভারতীয়, যেমন পূর্ব পাঞ্জাবে, কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেখানে একজন মুসলমান নিছক একজন হিন্দুর মত। যেখানকার হাবভাব সিন্ধুনদ পারের দেশের মত যথা, পাঞ্জাব সীমান্তে, সেখানকার হিন্দু প্রায় একজন মুসলমানের মত। প্রভেদটা জাতীয়, ধর্মীয় নয়।"

ইবেটসন আরো লিখেছেন যে :

"পারস্পরিক বিবাহ প্রসঙ্গে মহম্মদ যে ছাড় দিয়েছেন তা দিল্লী অঞ্চলের জাট মুসলমানদের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, কারণ ইতিমধ্যেই হিন্দু যাজক ও শাস্ত্র তাকে এর চেয়ে কম ছাড় দিয়েছিল তা গ্রহণ করতেই অস্বীকার করেছে, এবং নিজেকে বেঁধে রেখেছে উভয় ধর্মের চেয়ে অনেক কঠোর উপজাতিক নিয়মের দ্বারা। কিন্তু পাঠান ও বিলোচদের উদাহরণ মুলতান অঞ্চলের জাটেদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে ; সে স্বীকার করে, ঠিক মহম্মদের নিষেধাজ্ঞা নয়—যা শুধু সে সব নয়, কারণ তা হল সবচেয়ে কম—বরং তার সীমান্তবর্তী প্রতিবেশীদের উপজাতিক নিয়ম, যা তার ধর্মের নিয়মের চেয়ে কঠোরতর, কিন্তু তার জাতির নিয়মের চেয়ে শিথিল। আমি বিশ্বাস করি যে পশ্চিম পাঞ্জাবে জাত ও উপজাতি আরোপিত প্রথার ফলে নিয়মের যে শিথিলতা ও বাধানিষেধ লক্ষ্য করা যায়, এবং যা মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে কোনোভাবেই কম নয়, তা যত না ধর্মান্তরিত হওয়ার ফল তার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিবেশী সীমান্ত উপজাতিদের উদাহরণের দরুণ। পূর্বের কৃষকের, সে হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক, সামাজিক ও উপজাতিক প্রথা ভারতের ; আর পশ্চিমে জনগণ, হিন্দু বা মুসলমান, বহুলাংশে —যদিও পূর্ণমাত্রায় নয়—গ্রহণ করেছে আফগানিস্তান ও বিলোচিস্তানের সামাজিক ও উপজাতিক প্রথা। উভয় ক্ষেত্রেই এই নিয়মাবলী ও প্রথাসমূহ উপজাতিক বা জাতীয়, ধর্মীয় নয়।"[৩৭]

সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলি, বিশেষ করে তাদের পুনরুত্থানবাদী শাখাগুলি, এই ধারাকে উল্টে দেওয়ার ঝোঁক দেখায়। তারা জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারকে আক্রমণ করে অযৌক্তিক এবং আদি ধর্মের বিকৃত ও খাদমিশ্রিত রূপ বলে। তারা জোর দেয় ধর্মের নিষ্কলুষ চরিত্রের উপর, এবং জনপ্রিয় ধর্ম থেকে তথাকথিত 'বহিরাগত উপাদান' বাতিল করার উপর। তার অর্থ হয় ধর্মকে অনেক বেশী মৌলবাদী এবং অনেক কম সার্বজনীন করে তোলা এবং সুদূর ও স্বতন্ত্র পথের পরম্পরায় ফিরে যাওয়া—এমন যুগের পরম্পরা,

যখন হিন্দু ও মুসলিমরা একে অপরকে জানত না এবং যা তার ফলে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ও তাদের মধ্যে ধর্মীয়, কৃষ্টিগত ও সামাজিক প্রভেদ বাড়িয়ে তোলে। এইভাবে, হিন্দুধর্ম ও ইসলামের আদিযুগের শুচিতায় প্রত্যাবর্তনের, এবং ধর্মীয় আচার, প্রথা, বিশ্বাস ও ব্যবহারের এবং সামাজিক প্রথার, ঐতিহ্যের ও মূল্যবোধের শুদ্ধিকরণের অর্থ হয় ধর্মীয় মিলনের মাধ্যমে যুগ্ম ধর্ম বিশ্বাস যা গড়ে উঠেছিল তাকে নিন্দা করা, একে একে সাধারণ উপাদানগুলিকে বাতিল করা, মধ্যযুগে যে সমন্বয়কারী কৃষ্টির পথে বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল তাকে রোধ করা, এবং ধর্মে ধর্মে, মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়িয়ে তোলা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নিজস্বতার বোধ সৃষ্টি করা। বস্তুত, পুনরুত্থানবাদী সংস্কারকরা অনেক সময়েই তাঁদের ধর্মের ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যগুলির উপরই জোর দিতেন, যেখানে তা অন্যান্য ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র। সংস্কারকরা একে অপরের উৎসব ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা বন্ধ করতেও চেষ্টা করেন। সংস্কার আন্দোলনগুলির এই বিভাজক ভূমিকার উল্লেখ করেন গান্ধী, ১৯৩৯ সালে : "আমরা [হিন্দু ও মুসলিমরা] যে আজ একে অপরের থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে বলে মনে হয়, তা হল, যে জাগরণ ঘটেছে তার স্বাভাবিক পরিণতি। এই জাগরণ প্রভেদের ক্ষেত্রগুলির উপর জোর দিয়েছে, প্রতিকূল বিশ্বাসকে, পারস্পরিক সন্দেহকে এবং হিংসাকে বাড়িয়ে তুলেছে।"[৩৮] গোটা প্রশ্নটিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন বেণী প্রসাদ, যিনি নিজে কৃষ্টিগত সমন্বয়ের মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের, এবং এলাহাবাদের ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ বিজ্ঞান চর্চার এক চমৎকার প্রতিনিধি। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে তাঁর রচনা থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

> "পুনরুত্থানবাদ আধা-ধর্মান্তরিতদের টিঁকে থাকা হিন্দু বিশ্বাস ও আচারাদি থেকে সরিয়ে নিল। অন্যদিকে যে সব হিন্দু জাতগুলি মুসলিম জীবনধারা গ্রহণ করেছিল তারা হিন্দু পুনরুত্থানবাদ অথবা আধুনিকতার দিকে সরে এল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এমন বহু আদব-কায়দা ছেড়ে দিতে শুরু করল, যা তারা একে অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল এবং যা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধন করত। সাধারণ জীবন ও চিন্তার বহু ক্ষেত্র এইভাবে সংকুচিত হয়েছে, বহু মিলনস্থল ধূলিস্মাৎ হয়েছে। পুনরুত্থানবাদ একটি সম্প্রদায়ের উৎসবাদি থেকে অপরটির প্রত্যাহরণ ঘটায়, যেখানে সহানুভূতি ও অনুকরণের স্বাভাবিক শক্তি সেগুলিকে উভয়ের সাধারণ উৎসবে পরিণত করতে চায়। তা সচেতনভাবে বিদ্যমান অপসরণকারী ধারাগুলিকে আঁকড়ে ধরে ও গভীরতর করে এবং খাদ্য ও বেশভূষা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি প্রসঙ্গে তেমন নতুন অনেক ধারা সৃষ্টি করে ও সেগুলিকে প্রকাণ্ড 'কৃষ্টিগত' প্রভেদ হিসাবে ফাঁপিয়ে তোলে। তা হিন্দু ও মুসলমানের সাহিত্যকর্মের সাধারণ উপাদানগুলির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটায় এবং অল্পবয়স্কদের শিক্ষার উপর

নিয়ন্ত্রণ দাবী করে ও স্বতন্ত্র স্কুল, একাডেমী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নিজের লালন-পালন করে। তা সাহিত্যে নিজের ভাষা ফুটিয়ে তোলে, উর্দু থেকে সংস্কৃত এবং হিন্দী, বাংলা ও অন্যান্য ভাষা থেকে আরবী শব্দ খারিজ করার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। পুনরুত্থানবাদ সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠনকে উৎসাহ দেয় এবং অনেক সময়ে এমন এক আক্রমণাত্মক ভঙ্গী ধারণ করে যা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে রুক্ষ বিবাদে জড়িয়ে ফেলে।''[৩৯]

সংস্কারপন্থী ও পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন ধর্মের গোড়ামির প্রসার ঘটিয়েছিল, আগে যেখানে প্রচলিত নানা ধর্ম মতের অস্তিত্ব ছিল। তারা ধর্মের প্রতি অধিকতর আনুগত্যের প্রসার ঘটাতে না পারলেও, ধর্মভাব ও ধর্মীয় আত্ম-সচেতনতার বিস্তার করেছিল, অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম বা শিখ হওয়ার চেতনা বিস্তার করেছিল। নিজেরা অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িক না হলেও পুনরুত্থানবাদীরা মধ্য শ্রেণীভুক্ত মানুষ ও ব্যাপক জনগণ উভয়কেই সাম্প্রদায়িক প্রভাবের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল করে তুলেছিলেন।

উপরন্তু, বিশেষ করে পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনগুলি অনেক সময়েই ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সেই সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলিকেই প্রভাবিত করত ও তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করত, যারা তাদের বস্তুগত ও শ্রেণী চাহিদা মেটানোর জন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিবর্তন ঘটাচ্ছিল—অর্থাৎ পতনোন্মুখ জমিদারশ্রেণী, বিকাশমান গ্রামীণ ভূস্বামীশ্রেণী, এবং ব্যবসায়ী ও মহাজনরা। তাছাড়া, এই একই সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলি সাহিত্যের পেশাগুলিতে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করেছিল, ফলে তারাই ছিল স্কুল-কলেজে, এবং সংবাদপত্র, অন্যান্য প্রকাশনা ও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে মতাদর্শ গঠনের দায়িত্বে। তারা ক্রমবর্ধমান আধুনিক প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করে নিজেদের চিন্তা ও মতাদর্শ সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মত অবস্থায় ছিল।[৪০]

২. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান

অসংখ্য সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে আধুনিক শিক্ষা এবং ব্যবসা ও শিল্প মুসলিম (এবং শিখ) মধ্য ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীগুলির মধ্যে ততটা অগ্রসর হতে পারে নি, যতটা পেরেছিল ঐ একই শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে।[৪১] তাঁরা শিল্প, বাণিজ্য, পেশাসমূহ ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বহু দশক পিছিয়ে পড়েছিলেন।[৪২] তার ফলে মুসলিমদের (এবং শিখদের) মধ্যে একটি আধুনিক বুদ্ধিজীবী স্তর, আধুনিক মধ্যশ্রেণীসমূহ ও আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশে প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধান দেখা দিয়েছিল।[৪৩] এই ব্যবধান, সরকারী চাকরীতে

ব্যবধান নয়, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

পূর্বোল্লিখিত ব্যবধানের এবং মুসলিমদের মধ্যে একটি আধুনিক বুদ্ধিজীবী স্তর ও একটি আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভবের বিলম্বের ঐতিহাসিক কারণগুলি কী ছিল? একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের উত্তর ভারতে উচ্চ-শ্রেণীব মুসলিমদের বিন্যাস, চরিত্র, জীবনের ধাঁচ ও ঐতিহ্য। তাদের প্রায় সকলেই ছিল 'সামন্ত', অর্থাৎ জমি, (জমিনদার ও জাগীরদার রূপে), সামরিক ও উচ্চতর বেসামরিক প্রশাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা মধ্যযুগেও বেসামরিক প্রশাসনের নিম্নতর স্তরগুলিতে এবং বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সুতরাং, মুসলিমদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী এলিট ছিল তারা, যাদের কে. এম. আশরাফ বর্ণনা করেছিলেন জাগীরদারী উপাদানসমূহ বলে। ব্রিটিশ শাসন সমস্ত ভারতবাসীকেই সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে উচ্চতম পদগুলি থেকে বঞ্চিত করেছিল, যেখানে নিম্নতর পদগুলি আবো বাড়তে থাকে। উচ্চ শ্রেণীগুলি, যারা ছিল অধিকতর মুসলিম, বা যাদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল বেশী, তারা এতে আঘাত পায। অন্যদিকে নিম্ন মধ্য ও মধ্যশ্রেণীগুলি, যারা ছিল বেশী হিন্দু, বা যাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল বেশী, তারা বাড়তে থাকে, তারা প্রশাসনের নিম্নতর ও মধ্যবর্তী স্তবে স্থান রক্ষার জন্য আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে। আর উচ্চ শ্রেণীগুলির পক্ষে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান, অর্থাৎ উচ্চতর সরকারী পদ রক্ষা করার, কোনো উপায় ছিল না, কারণ ব্রিটিশ নীতি ছিল সেনাবাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের উচ্চতব পদে সর্বত্র ইউরোপীয়দেব আসীন করা। একই সঙ্গে উচ্চশ্রেণী, তারা হিন্দু বা মুসলিম যাই হোক না কেন, উচ্চপদ থেকে নীচে নেমে করণিকের পদগুলি দখল করতে রাজি ছিল না। নিম্ন মধ্যশ্রেণীর হিন্দুরা, যারা পরম্পরাগতভাবে ঐ নীচু ধরণের পদ নিতেই অভ্যস্ত ছিল, তারা খুশী মনে তা করত। একই কারণে শিখ উচ্চশ্রেণীও পাঞ্জাবে বঞ্চিত হয়।

অনুরূপভাবে, যেমন আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি, চিরাচরিত জমিদাবরা, হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই ক্রমেই অধিকতরভাবে সম্পত্তি হারায ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়, আর মহাজন, ব্যাঙ্কার ও বণিক, প্রাক্-বৃটিশ যুগে যাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু, তাদের সংখ্যা ও অর্থ নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং তারা এমনকি জমিদার ও ভূস্বামী হিসাবে জমিতেও এগিয়ে আসে এবং আধুনিক ব্যাঙ্ক ও শিল্পে উত্তরণ ঘটায়।

দ্বিতীয়ত, বৃটিশ সাম্রাজ্য গঠন ও তার প্রভাব দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে পড়েছিল। মুসলিম উচ্চশ্রেণীর আধিপত্যাধীন এলাকা—যে সব এলাকায় মুসলিম এলিটরা বাস করত—দখল করা হয়েছিল দেরীতে, ফলে তারা ঔপনিবেশিক প্রভাব অনুভব করেছিল দেরীতে।

তৃতীয়ত, চিরাচরিত মুসলিম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, বা উলামা, উনবিংশ শতাব্দীতে দারিদ্রের সম্মুখীন হয়। মুঘলদের যুগে তারা সরকারী অনুদান ও বিচারক (কাজী ও মুফতি) রূপে চাকরীর উপর নির্ভরশীল ছিল, যা এখন শেষ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে তার ফলে মুসলিমদের মধ্যে পুরোনো শিক্ষাব্যবস্থারও অবক্ষয় হয়।

চতুর্থত, আধুনিক মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা গোড়ার দিকে যে স্তর থেকে উঠে আসতে পারত তারাও দারিদ্রপীড়িত ছিল। ভূসম্পত্তির মালিক শ্রেণী, এই নতুন বুদ্ধিজীবী ও পেশাদার সংগ্রহের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে থাকতে পারত। কিন্তু তারা তখন দ্রুতবেগে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, শহুরে ব্যবসায়ী, মহাজন, আমলা ইত্যাদির হাতে নিঃস্ব হয়ে পড়ছিল। তথাপি, মুসলিমদের মধ্যে তারাই আধুনিক বুদ্ধিজীবী সরবরাহের প্রধান উৎস হিসেবে থেকে যায়, যা ব্যাখ্যা করে, তাদের সংখ্যা কেন কম ছিল, আর কেনই বা তারা মূলতঃ রক্ষণশীল ছিল।

১৮৫৭-র ঠিক পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা উত্তর ভারতে প্রশাসনের উচ্চতর শাখাগুলিতে মুসলিমদের নিয়োগ করার বিরোধী নীতি অনুসরণ করে—অর্থাৎ ঠিক তখনই, যখন আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা এ দেশে জন্মলাভ করছে।

নিম্ন মধ্যশ্রেণীভুক্ত মুসলিমরা ব্যাপকভাবে প্রশাসন ও আদালতের চাকরী থেকে বিতাড়িত হয়। তারা আগে নির্ভরশীল ছিল সেনাবাহিনী ও পুলিশের কাজের উপর, এবং তাদের শিক্ষিত অংশ নির্ভরশীল ছিল মুনশী হিসাবে ও অসামরিক প্রশাসনে করণিক হিসাবে কাজের উপর। সরকারী ভাষারূপে পারসিকের পরিবর্তে ইংরেজীর প্রবর্তনও তাদের এক প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। সেনাবাহিনী ও পুলিশে পরিবর্তনেরও অনুরূপ ফল হয়। তবু, যুক্তপ্রদেশে পুলিশী আমলাতন্ত্রে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল খুবই বৃহৎ। এই ঘটনা আবার আমলাতান্ত্রিক স্তর থেকে উদ্ভূত মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের উপর একটি রক্ষণশীল চরিত্র আরোপ করে।

পঞ্চমত, মুসলিম পুনরুত্থানবাদ ও প্রতিক্রিয়া আধুনিকীকরণ ও "নবজাগরণকে" দুর্বল করে রাখে ও এইভাবে এক আধুনিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উদ্ভবে বাধা দেয়। এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে মুসলিম পুনরুত্থানবাদ হিন্দু পুনরুত্থানবাদের গোটা অর্ধশতক আগে উদিত হয়েছিল এবং তা ছিল অনেক বেশী পশ্চাদমুখী, শৃংখলায় বাঁধা ও গোঁড়া।

এই প্রতিক্রিয়ার একটি রূপ ছিল আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বয়কট করার প্রচেষ্টা। মোল্লা ও মৌলভীরা, পুরোনো 'সামন্ত' বা জাগীরদারী শ্রেণীর কোনো কোনো অংশের সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে, ধর্মের নামে মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করে। তারা বিশেষভাবে মুসলিমদের আধুনিক স্কুল ও কলেজে পাঠ না করতে বলে এই কারণে, যে সেগুলি ধর্মনিরপেক্ষ ও 'বিদেশী' জ্ঞান বিতরণ করত, অতএব এগুলি ছিল 'অনৈস্লামীয়'।[৪৪] আরো তিনটি দিকও ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রথম, ব্যবসায়ী ও পেশাদার এলিটদের এবং

নিম্নমধ্য শ্রেণীগুলির অপেক্ষাকৃত দুর্বলতার অর্থ ছিল এই যে দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম ছাত্র ছিল না, যারা স্কুল ও কলেজের মোটা মাইনে দিতে পারত বা গ্র্যান্টস-ইন-এড ব্যবস্থার অধীনে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারত। দ্বিতীয়ত, যেখানে একজন মুসলিম ছাত্র নতুন স্কুল বা কলেজ পর্যন্ত পৌঁছত, সেখানেও সে হিন্দু বা পার্সি ছাত্রের তুলনায় দুর্বল ছিল, কারণ তার ধর্মের গোঁড়ামি তাকে পূর্বতন বছরগুলি একটি চিরাচরিত ধর্মীয় স্কুলে কাটাতে বাধ্য করেছিল। সে আরো পিছিয়ে ছিল আরবী অথবা পারসিক শিখতে এবং বাঙালীদের ও দক্ষিণ বা পশ্চিমের ভারতীয়দের উর্দুও শিখতে হবে। সবশেষে, গোঁড়াদের দল কার্যত ১৯২০-র দশক পর্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষাকে সফলভাবে বিরোধিতা করেছিল। তা কেবল মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভবকেই দুর্বল করে নি, বরং যখন তাদের উদ্ভব হয় তখন আধুনিকীকরণের প্রতি তাদের অঙ্গীকার ছিল অনেক হাল্কা। আধুনিক শিক্ষার এই অবহেলা কেবল সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার উপাদানগুলিকে দৃঢ়তর করে নি, বরং পেশাসমূহে মুসলিমদের স্থান আরো দুর্বল করে দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মুসলিমদের মধ্যে মধ্যশ্রেণীগুলির ক্ষুদ্রতর আয়তনের কারণ এবং মুসলিম মধ্যশ্রেণীর আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির এবং চিন্তার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ নিহিত ছিল নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, 'হিন্দুদের' দিক থেকে তাদের অনগ্রসর রাখার কোনো প্রচেষ্টায় নয়।

এ সবের অর্থ ছিল যে মুসলিমদের মধ্যে, বিশেষত উত্তর ও পূর্ব ভারতে, আধুনিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, মধ্যশ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণী দুর্বল থেকে যায়। ফলস্বরূপ এবং যেই হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা, ভূস্বামী, জমিদার ও সাধারণভাবে অভিজাততন্ত্রের—অর্থাৎ জাগীরদারী উপাদানের—এবং উচ্চতর আমলাদের অধিকতর প্রভাব মুসলিমদের বিকাশমান রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক এলিটের মধ্যে প্রধান থেকে যায়।[৪৫] বা, আরো আধুনিক পরিভাষায়, মুসলিমদের মধ্যে মুখ্য এলিট, যারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিগত ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আধিপত্য জাহির করেছিল, তারা আধুনিক বুদ্ধিজীবী ছিল না, ছিল জাগীরদারী ও আমলাতান্ত্রিক উপাদানসমূহ। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা, সেখানে আলিগড় আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব দেয় নবাব, জমিদার ও আমলারা—সৈয়দ আহমদ খানের মূল শ্রোতৃবর্গ এবং তাদের সমর্থন করে ঔপনিবেশিক প্রশাসন।

যতদিনে উত্তর ভারতে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা জন্ম নেয়, ততদিনে সামাজিক প্রেক্ষাপট পাল্টে গেছে। অসম সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়া তার ছাপ ফেলে

গেছে। নিঃসন্দেহে শিক্ষিত মুসলিমরা ছিল একটি শিক্ষিত 'শ্রেণী' বা স্তর, কিন্তু তারা অনেক কম পরিমাণে আধুনিক বুদ্ধিজীবী ছিল। উপরন্তু, যে মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের বিকাশ হয় তাদেরও বহুলাংশে একটি 'সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্র' ও ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক যোগাযোগ ছিল। হিন্দু ও পার্সি শিক্ষিতেরা যেখানে যুক্তিবাদ, সমাজ সংস্কার, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের মৌলিক চিন্তা সমৃদ্ধ এক বৃহৎ অংশের সৃষ্টি করেছিল, সেখানে পরে আসা মুসলিম শিক্ষিতরা অনেক সময়েই বড় হয় সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ, বড় জমিদার ও বড় আমলাদের পক্ষপুটে, এবং গোঁড়া উলামার ছত্রছায়ায়। যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসন সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার চরিত্র উপলব্ধি করায় এবং আধুনিক ধ্যানধারণা জনপ্রিয়করণে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল মৌলিক, তাই এই বিকাশ মুসলিমদের মধ্যে এক মৌলিক ঘাটতি সৃষ্টি করে। তা মধ্য ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর মুসলিমদের মধ্যে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেয় এবং তাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদের সহজ শিকারে পরিণত করে।[৪৩] উপরন্তু, পরে যখন বুদ্ধিজীবীরা ও মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জন করে, তখন তারা জাগীরদারী উপাদান ও ভূতপূর্ব আমলাদের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট গঠনে বাধ্য হয়।

বিকাশমান মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এই জাগীরদারী যোগাযোগের একটি উদাহরণ পাওয়া যায় হালি, ইক্‌বাল ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের অন্যান্য মুসলিম লেখকের কবিতার অনেকটা জুড়ে রয়েছে যে বিষণ্ণতা ও হতাশা—'হৃদয়-বিদারক বেদনা'র অনুভূতি—এবং যাকে অনেক সময়ে ব্যাখ্যা করা হয় মুসলিমদের ক্ষমতা হারানোর দরুন সংকটের ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনার বোধের অভিব্যক্তি রূপে। 'ক্ষমতা হারানো' তো ঘটছিল কেবল জাগীরদারী উপাদান-সমূহের ক্ষেত্রে। ব্যাপক মুসলিম জনগণের ক্ষেত্রেও, ব্যাপক হিন্দু জনগণের, কখনো ক্ষমতা ছিল না। উপরন্তু, কেবলমাত্র জাগীরদারী উপাদানসমূহই এমন এক ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়েছিল যা ছিল 'অন্ধকার ও বিবর্ণ, কোনো আশার আলো বিহীন'। সাধারণ মানুষ, বুর্জোয়া শ্রেণী ও নতুন বুদ্ধিজীবীরা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করছিল। হালির **মুসাদ্দাস**, ইক্‌বালের **শিকওয়া**, ইত্যাদির মাধ্যমে জাগীরদারী মূল্যবোধ সমস্ত মুসলিমের মূল্যবোধ বলে পরিচিতি পেল। অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষের আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ—এবং বুদ্ধিজীবীদের অভিব্যক্তির বহুলাংশ—সমাজের জাগীরদারী উপাদান-সমূহের আঙ্গিক বুদ্ধিজীবীর কাজ করত। এই জাগীরদারী উপাদানসমূহ আবার নিজেদের প্রয়োজনে ছিল সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা।

এসব অবশ্য সত্য ছিল মূলতঃ উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমদের ছিল এক ভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমি এবং ঔপনিবেশিক শাসনে এক ভিন্ন ধাঁচের সামাজিক বিকাশ, কারণ তাদের মধ্যে

আধুনিক ব্যবসায়ী শ্রেণী ও আধুনিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী উভয়েরই বিকাশ হয়। তাছাড়া, তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক বিকাশের উপর কোনো বৃহৎ জাগীরদারী উপাদানের আধিপত্য ছিল না। ফলে এই সব অঞ্চলে মধ্যশ্রেণীর মুসলিমদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, সমাজ সংস্কার ও আধুনিক শিক্ষা অগ্রসর হতে পেরেছিল। উপরন্তু, এই সব অঞ্চলে মুসলিমরা মোট জনসংখ্যার এক অতি ক্ষুদ্র অংশ ছিল। তাছাড়া, বোম্বাইতে, মুসলিমরা অনেক গোঁড়া ধর্মমত বিরোধী অনেকগুলি গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকায় তাদের দিশার মধ্যে একধরণের উদারনীতি ছিল।

এই পর্যায়ে মনে রাখা দরকার যে, ভূস্বামী ও জমিদার বা জাগীরদারী উপাদানসমূহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পশ্চাদমুখী, সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদ প্রেমী হত, তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণীগত অবস্থানের জন্য, তারা হিন্দু হোক বা মুসলিম হোক। তারা ব্রিটিশ শাসকদের সম্পূর্ণ পদানত হয়ে থাকাকে স্বীকার করে নিয়েছিল, বিশেষত ১৮৫৭-র পর, এবং তারা ক্রমেই তাদের রাজনীতিকে এই অবস্থানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করত। কিন্তু হিন্দু ও পার্সীদের মধ্যে যেখানে আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা এবং উদীয়মান ধনিক শ্রেণী জাগীরদারী উপাদানগুলিকে নেতৃত্ব থেকে কমবেশী হঠিয়ে দিয়েছিল এবং জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীন ধনবাদী বিকাশের মতাদর্শ নিয়ে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আধিপত্য কায়েম করেছিল, সেখানে মুসলিম জনগণের ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর উপর নেতৃত্ব বজায় রাখে প্রতিক্রিয়াশীল ও রাজানুগত জাগীরদারী স্তর ও পশ্চাদমুখী ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীরা। যেমন, সৈয়দ আহমদ খান ও রাজা শিবপ্রসাদের এক সাধারণ সামাজিক পটভূমি ছিল এবং ১৮৮০-র দশকে তাঁরা ভূসম্পত্তির অধিকারী, উঁচুজাতের, ঔপনিবেশিকতাপ্রেমী এলিটের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয় কংগ্রেসকে আক্রমণ করার জন্য হাত মিলিয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদ খান যেখানে আমৃত্যু উত্তর ভারতের মুসলিমদের মধ্যে এক শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান দখল করে রাখেন, হিন্দুদের মধ্যে শিবপ্রসাদের প্রভাবকে দ্রুত অতিক্রম করে কংগ্রেস নেতাদের প্রভাব। অন্যদিকে, যেখানে, যথা পাঞ্জাবে, হিন্দু জনগণ ও মধ্যশ্রেণীর উপর আধিপত্য কায়েম করেছিল ভূতপূর্ব আমলারা, মহাজন ও ভূস্বামীরা, এবং রাজানুগত, জাতপাতে বিশ্বাসী ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীরা, সেখানে কংগ্রেস বিশেষ অগ্রসর হতেই পারে নি, অথবা প্রথমে অগ্রগতির পর পিছু হঠেছিল।

অনুরূপ এক উপাদান ছিল শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে আমলাদের প্রাধান্য। অন্যদিকে, সার্বিকভাবে শিক্ষিত ভারতীয়দের বিশাল সংখ্যার দরুন, আমলা বা ভূতপূর্ব আমলারা প্রধান অংশ কখনোই ছিল না।

আবার, একথা অনেক সময়েই তাঁরা ভুলে যান, যাঁরা শিক্ষিত ভারতীয়দের

একটিমাত্র ঐক্যবদ্ধ সামাজিক স্তর বা গোষ্ঠী হিসাবে দেখেন হিন্দু পার্সী ও খ্রীশ্চানদের মধ্যেও আমলা ও ভূতপূর্ব আমলারা ছিল রাজানুগত, প্রতিক্রিয়াশীল, এবং অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িক। তাদের স্বার্থও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ ছিল না। কিন্তু হিন্দু ও পার্সী মধ্যশ্রেণীদের আমলাদের মধ্যে গুরুত্ব ছিল কম। সারা দেশে পথ নির্দেশক, নেতা ও জনমতের স্রষ্টা ছিলেন আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী ও সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং যাঁরা সমসাময়িক অর্থে র‍্যাডিকালবাদের দিকে ঝুঁকতেন, যথা দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, প্রথম পর্বের বদরুদ্দীন তৈয়াবজী, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। ফলে, হিন্দু ও পার্সীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও রাজানুগতদের উদ্ভব হলেও, তারা একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শক্তিতে পরিণত হয় নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল অল্প এবং সেই অল্প কয়েকজনকে সহজে, হিন্দু ও পার্সীদের চেয়ে অধিকতর মাত্রায়, ব্রিটিশ ভারতে বা দেশীয় রাজ্যগুলিতে সরকারী চাকরীতে ঢুকিয়ে দেওয়া ও স্থান করে দেওয়া সম্ভব ছিল। যেমন, কিছু সংখ্যক ভাল চাকরীর মাধ্যমে প্রথম প্রজন্মের মুসলিম জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের, জাতীয়তাবাদী মঞ্চ থেকে কার্যত সরিয়ে দেওয়া গিয়েছিল।[৪৭] উপরন্তু, এই অল্পসংখ্যক নব্য-শিক্ষিত মুসলিমের সামাজিক আকাঙ্খার গতি ছিল সরকারী চাকরীর দিকে, বিশেষত যেহেতু বিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরগুলিতে পেশাদার বৃত্তিতে স্থান হ্রাস-প্রাপ্ত হচ্ছিল এবং মুসলিমদের মধ্যে ব্যবসা ও শিল্পে প্রবেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। ফলে আমলারা ও পেনশনভোগীরা মুসলিম মধ্যশ্রেণীর অভ্য-ন্তরে এক প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান লাভ করে, যার ফল আবারও ছিল রাজানুগত্য ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের রাজনীতি। এর আরেকটি ফল হল এই যে মুসলিম জনগণ ও নিম্নতর মধ্যশ্রেণীগুলি, কিছু মাত্রায় আধুনিক ধ্যানধারণা ও মতাদর্শ থেকে বঞ্চিত হয়। অবশ্যই, ১৯৩০-এর দশকে মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের বিকাশ ঘটেছিল, এবং আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা বামপন্থী জাতীয়তাবাদের দিকে মোড় নেয়। কিন্তু এই বিকাশ ঘটে অনেক দেরীতে, কারণ ততদিনে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বোলবোলাও হচ্ছে। উপরন্তু, মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বামমার্গী গমন ১৯৪০-এর দশকে পিছু হঠে, অংশত জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ত্রুটির ফলে। ১৯৪০-এর সাম্প্রদায়িক বন্যা নতুন বুদ্ধিজীবীদের হয় সরিয়ে দেয় অথবা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে, সরকারের বিরুদ্ধে দাবীর ভিত্তিতে

অবস্থান গ্রহণ করা বা সরকারের বিরোধিতা করার পদ্ধতি বা অভ্যাসই অনুপস্থিত ছিল। তারা জন্ম দিতে পারত কেবল রাজানুগত্য বা সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা অনেক সময়ে একত্রে এই দুইয়ের রাজনীতি। যেহেতু মুসলিমদের মধ্যে উদীয়মান বুদ্ধিজীবীরা আবার মুখ্যতঃ জাগীরদারী ও আমলাতান্ত্রিক স্তর থেকে এসেছিল, তাই তারা তাদের রক্ষণশীলতা ও সাম্প্রদায়িকতাও কিছুটা আত্মস্থ করে নিত।

ফলে, ১৯১৬ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত যে অল্পদিন মুসলিম লীগ জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যোগ দেয় ও তরুণতর বুদ্ধিজীবীরা তার নেতৃত্ব হাতে নেন, তা ছাড়া অন্য সব সময়ে তার নেতৃত্বে এইরকম সব নামের ছড়াছড়ি ছিল: আগা খান, ঢাকার নবাব, নবাব মোহসীন-উল মুলক, নবাব ওয়াকার-উল-মুলক, মহমুদাবাদের রাজা, ছাত্তারীর নবাব, স্যর সিকান্দার হায়াত খান, স্যর ফিরোজ খাঁ নুন, স্যর জুলফিকার খান, নবাব লিয়াকৎ আলী খান। সাধারণভাবে, ১৯৪৭ পর্যন্ত লীগের নেতৃত্বে প্রাধান্য ছিল বর্তমান ও প্রাক্তন রাজকর্মচারী, বড় ভূস্বামী ও নাইট এবং খান বাহাদুরদের। এই একই কথা প্রযোজ্য হিন্দু মহাসভার প্রসঙ্গে, যাতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন ধনী ব্যবসায়ী ও ভূস্বামী এবং সফল আমলারা, যথা রাজা রামপাল সিং, রাজা নরেন্দ্রনাথ, স্যর গোকুলচাঁদ নারাং, রায় বাহাদুর রামশরণ দাস, কুরাকোটি শঙ্করাচার্য, বা তাঁদের মোসাহেবরা, যথা গণেশ দত্ত এবং বি. এস. মুঞ্জে। বড় প্রভেদ ছিল এই, যে দেশের রাজনীতিতে যেখানে হিন্দু মহাসভার ভর ছিল অল্প, মুসলিম লীগের ভর ছিল উল্লেখযোগ্য।

এই দিকটার সংক্ষিপ্তসার করা যায় ডব্লু. সি. স্মিথের কথায়:

> "মুসলিম মধ্যশ্রেণী হিন্দু মধ্যশ্রেণীর তুলনায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদ ছিল, এবং বেশী ব্রিটিশপ্রেমী ছিল, তা বলার চেয়ে এ কথা বলা বেশী ঠিক হবে যে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ ও ব্রিটিশপ্রেমী মধ্যশ্রেণী ছিল প্রবীণতর, অধিকতর শক্তিশালী, এখন ত্রুটিসন্ধানী মধ্যশ্রেণীর তুলনায় বেশী মুসলিম · । তিনি [সৈয়দ আহমদ খান] অবশ্যই সেই ক'জন মুসলিমকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেওয়া থেকে বুঝিয়ে নিরত করতে পারেন নি, যারা ছিল অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর অংশগুলির সদস্য। কিন্তু কম অগ্রসর অংশের যে অগণিত মুসলিম সদস্য এমনিই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিতে চায় নি, তাদের তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন যে তাদের যোগদান থেকে নিরত থাকা উচিত 'মুসলিম হিসাবে।'"[৪৮]

এর সঙ্গে আমরা শুধু এইটুকু যোগ করতে পারি যে তারা, অর্থাৎ কম অগ্রসর গোষ্ঠীরা, 'হিন্দু' বা 'পার্সী' হিসাবেও তাতে যোগ দিত না। শুধু, শিবপ্রসাদ, ভিণ্ডা, পিয়ারীমোহন মুখার্জী ও ডি. এন. পেটিটের দল মধ্যশ্রেণীর হিন্দু ও পার্সীদের টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি।

নবজাগরণের, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের এবং আধুনিক চিন্তার

শিকড় হিন্দু ও পার্সী মধ্যশ্রেণীর মধ্যে নিঃসন্দেহে ছিল নিতান্তই অল্প দূর প্রবিষ্ট বিশেষত যখন ইউরোপীয় মধ্যশ্রেণীর মধ্যে নবজাগরণ ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের গভীর অনুপ্রবেশের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তবু, এই চিন্তা ও আন্দোলন উপস্থিত ছিল। মুসলিম মধ্যশ্রেণী নবজাগরণ ও আধুনিক চিন্তা গ্রহণে অনেক কম প্রস্তুত ছিল। তাদের মধ্যে বুদ্ধিবিভাষার প্রসার ছিল অনেক কম। তারা অনেক বেশী চিরাচরিত ও পশ্চাদপদ থেকে যায়,[৪৯] এবং ফলে প্রাক্-আধুনিক ধরণের আত্ম সমীক্ষার সহতর শিকারে পরিণত হয়। তা হয়েছিল একাধিক কারণে : সংস্কার প্রয়াস হাতে নেওয়ার ও তা ঘটার বিলম্ব; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঘটে যাওয়া পুনরুত্থানবাদের দরুন গোঁড়া ধর্মের বলিষ্ঠতর নিয়ন্ত্রণ;[৫০] ভূস্বামী ও আমলাদের বৃহৎ সামাজিক প্রভাব ও এই দুই সামাজিক স্তরের সঙ্গে নতুন বুদ্ধিজীবীদের শক্তিশালী সম্বন্ধ; এবং সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের জন্য একটি সংগঠিত আন্দোলনের কার্যত অনুপস্থিতি।

যেমন, ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে সৈয়দ আহমদ খান একটি সর্বাত্মক ধর্মীয়, বুদ্ধিগত, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সংস্কার আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন ও তার সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু দ্রুত গোঁড়া উলামা এবং বড় জমিদাররা তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচেষ্টাগুলিকে রক্ষা করতে এবং আলিগড় কলেজের উন্নতি সাধন করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে সমাজের জাগীরদারী উপাদানসমূহকে এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকেও তুষ্ট রাখতে হবে, কারণ তারা আর্থিক সাহায্য বন্ধ রেখে এই প্রচেষ্টাগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিতে, এমন কি ব্যর্থ করতে পারে, এবং জাগীরদারী ও আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীদের উপর তাদেব প্রভাবের দ্বারাও তা কবতে পারে। ফলতঃ তিনি অন্য সব দিকে সংস্কার প্রচেষ্টা ছেড়ে দিলেন এবং সমস্ত রাজনীতি বর্জন করলেন। এস. আবিদ হুসেন যেমন দেখিয়েছেন, যে তাঁকে "তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কিছু লক্ষ্য ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁকে তাঁর সংস্কার ব্রতের মুখপত্র, 'তাহজিব-উল-আখ্‌লাক্', বন্ধ করে দিতে হয়, এবং প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে আলিগড় কলেজে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে একেবারে কঠোর পরম্পরাগত ভাবে, তাঁর নিজস্ব চিন্তার কণামাত্র প্রভাব ছাড়াই।"[৫১] উপরন্তু, যেমন দেখানো হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে, গণতন্ত্র ও সামাজিক সাম্যের যে ধারণাগুলিকে তাঁর সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণ করছিলেন ও প্রবল প্রচার করছিলেন, সেগুলিকে তিনি প্রকাশ্যে নিন্দা করেন। আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে লালা হংসরাজ, দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক স্কুল ও কলেজগুলির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ত্যাগ করেন। তবে, তিনি কখনো উত্তর ভারতে তো নয়ই এমন কি পাঞ্জাবেও একজন বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারেন নি

অনুরূপভাবে, ১৮৭০-এর দশক থেকে ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত, আধুনিক

মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জন্মস্থান আলিগড় কলেজ ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গোড়া থেকেই একটি বড় উপাদান ছিল ধর্মীয়।[৫২] ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামি এবং পাঠক্রমের ধর্মীয় বিষয়বস্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে দৃঢ়তর হয় উলামার সান্নিধ্যে আসার সচেতন প্রচেষ্টার ফলে। তা না হলেও আলিগড়ের শিক্ষাক্রমের চরিত্রে একটি সচেতন আমলাতান্ত্রিক ও জাগীরদারী ঝোঁক ছিল। ফলে আলিগড়ের ছাত্র বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তার সমসাময়িক অন্যান্যদের তুলনায় অনেক কম মুক্ত ছিল। উপরন্তু, আলিগড কলেজে, এবং উত্তরের বহু সরকারী কলেজে, যেখানে অন্য মুসলিম ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার জন্য যেত, যে শিক্ষাদান করা হত তা ছিল অনেক বেশী ঔপনিবেশিক।[৫৩] ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রাধান্য ছিল, এবং ছাত্রদের সন্তর্পণে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও আন্দোলনের ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করা হত। একইভাবে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পুনরভ্যুদয় মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক চিন্তার প্রসারকে দুবল করে দেয় এবং চিন্তা ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে যাজকদের কর্তৃত্ব বাড়িয়ে তোলে।

এই সব কিছুও মুসলিম মধ্যশ্রেণীদের ধর্মভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার প্রতি অনেক বেশী আসক্ত করে তোলে এবং মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক প্রভাব কমিয়ে দেয়। আর, অবশ্যই, মধ্যশ্রেণীর রক্ষণশীলতার ফল নীচের দিকে, ব্যাপক জনগণের মধ্যে নেমে যায়। জাতীয় আন্দোলনে যে হিন্দু সংশ্লেষের কথা বলা হয়েছে, তার প্রভাবও তীব্রতর হয় এই সামাজিক, ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিগত ও রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার দরুন। একটি অধিকতর আধুনিক ও র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী এই হিন্দু সংশ্লেষের বিরুদ্ধে অনেক সফলতর ভাবে, এবং সাম্প্রদায়িক ফাঁদে পা না দিয়ে, লড়তে পারত।

তাছাড়া, মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেরও মধ্যশ্রেণীর এই রক্ষণশীলতাই তাদের আধুনিক জাতীয়তাবাদকে, বিশেষত তা যখন ক্রমে ক্রমে র‍্যাডিকাল হতে থাকে তখন, দেখতে শেখালো তাদের যে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যকে তারা মূল্যবান মনে করত নবজাগরণ ও আধুনিকতার অভাবের দরুন, সেগুলির পরিপন্থী বলে। অনেক সময়ে, 'হিন্দু' হুমকি ছিল আধুনিকতার হুমকি। একবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী আধুনিকতার প্রতিনিধিত্ব করতে এলে এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ প্রায় সব ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও স্থিতাবস্থাকে সমর্থন শুরু করলে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলরা, গোড়া ব্যক্তিরা ও কায়েমী স্বার্থগুলি তাদের অস্তিত্বের প্রতি গভীরতর হুমকি দেখতে পেল জাতীয়তাবাদের মধ্যে। এটা একটা কারণ, কেন হিন্দু ও মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীলরাই গান্ধীর গণভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদকে এবং ধর্মহীন নেহরু, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের বামপন্থী জাতীয়তাবাদকে তাদের 'সম্প্রদায়ের' প্রতি

এক গভীর বিপদ বলে মনে করত, আর বিদেশী পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে অনেক সময়ে দেখত তাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের রক্ষাকর্তা, এমনকি 'ধর্মের রক্ষাকর্তা' হিসাবে।

এই দুর্বল নবজাগরণের অন্য দুটি দিকের কথাও মনে রাখতে হবে। সেটা প্রধানত মধ্যশ্রেণীদের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল, তার মানে সেটা আরেকটি কারণে মুসলিমদের মধ্যে দুর্বল ছিল—তাদের মধ্যে আধুনিক মধ্যশ্রেণী ছিল সংখ্যায় কম। তা যদি অনেক বেশী গভীরে প্রবেশকারী সাংস্কৃতিক ঘটনা হত, তবে তা সমাজের সবকটি অংশকে স্পর্শ করত ও তার ধাক্কা ও প্রবেশের ক্ষেত্রে অসমতার বিকাশ হতে দিত না, কারণ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে শ্রেণী গঠনে অসমতা সীমিত ছিল ধনিকশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী গঠনের ক্ষেত্রে। মুসলিম 'সম্প্রদায়' নয়, বরং মুসলিম মধ্যশ্রেণী ও বুর্জোয়ারা তাদের হিন্দু প্রতিপক্ষদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল ; হিন্দু ও মুসলিম জনগণ যদিও সমান অনগ্রসর ছিলেন।

একথাও মনে রাখা দরকার যে জনগণের মধ্যে নবজাগরণের অগভীর সামাজিক ভিত্তি এবং হিন্দু মধ্য ও নিম্নমধ্য শ্রেণীদের মধ্যে তার দুর্বল ও আপোষকামী চরিত্র তাদের মধ্যে প্রকট সাম্প্রদায়িকতাবাদের সম্ভাব্য ভিত্তি এবং গোপন সাম্প্রদায়িকতাবাদের বাস্তব ভিত্তি রেখে দিয়েছিল। যথা, ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত হিন্দু মধ্যশ্রেণীদের ভিতর কোনো কোনো ধরণের সাম্প্রদায়িকতাবাদ বেশ শক্তিশালী ছিল। অনুরূপভাবে, ধর্মভিত্তিক হিন্দু কলেজগুলি এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর বড় বড় কেন্দ্র। শুধু, হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী সেখানে শিক্ষা ও তালিম প্রাপ্ত ছিলেন না। যত না হিন্দু মধ্যশ্রেণী, তার চেয়ে বেশী আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা ছিল মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক। এখানেই রয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ও বিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তাৎপর্য। তাদের সব দুর্বলতা সত্ত্বেও, এই দুই আন্দোলন নিশ্চিত করে দেয় যে হিন্দু ও পার্সীদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আধিপত্যশালী বুদ্ধিজীবীরা, যাদের সমাজ, ও তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ সম্পর্কিত দিশা গৃহীত হবে ও কোনো মৌলিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে না, রাজা রামমোহন রায় থেকে জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত তারা হবে ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক। মুসলিমদের মধ্যে অবস্থাটা ছিল এর বিপরীত।

উপরে সদ্য আলোচিত দুটি উপাদানের—অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্যে প্রধান বা আধিপত্যশালী শ্রেণীজোট ছিল জাগীরদারী ও আমলাতান্ত্রিক উপাদানগুলি এবং মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক চিন্তার প্রসার ঘটেছিল কম, এই দুটির—যুগ্ম ফল হল এই, যে তাদের মধ্যে প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল গণতান্ত্রিক

বুদ্ধিজীবীদের এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শসমূহের নয়, বরং ভূস্বামী, আমলা, মোল্লা, মৌলভীদের এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক (জাগীরদারী) ও ঔপনিবেশিক কৃষ্টি ও চিন্তার, যেগুলি ক্রমে ক্রমে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে ঘিরে সংহত হল।

৩. সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা, নৈতিক শূন্যতা ও সামাজিক বাধা

ভারতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধিকে সাহায্য করে কারণ তা সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের জনগণের সামাজিক-অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি অপব্যাখ্যা করতে এবং তাঁদের বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রামকে দিক্‌ভ্রান্ত করে সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত করতে দিয়েছিল।[৫৪] আমরা আগে দেখেছি যে এই অনগ্রসরতা শ্রমিক ও কৃষকের শ্রেণী সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক বা জাতপাতের সংজ্ঞা দিয়েছিল বা পেটি বুর্জোয়া হতাশাকে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার দিকে পরিচালিত করেছিল। তা ভারতীয় ও বিদেশী উভয় কায়েমী স্বার্থকেই নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ ও পরিচিতিকে ব্যবহার করতেও দিয়েছিল।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল যে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষিত ভারতীয়েরও সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত মান বেশ নিচু ছিল। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক চরিত্র, যা সমালোচনাত্মক দক্ষতার এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশকে নিরুৎসাহ করত, তার ফলে স্বাক্ষর ও শিক্ষিতরাও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ বোধে সমান অপ্রস্তুত ছিল।[৫৫] বস্তুত, যথাযোগ্য সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিগত ও রাজনৈতিক অন্তর্বস্তুর অনুপস্থিতিতে, স্বাক্ষরতা ও সংবাদপত্র, পুস্তিকা ও পোস্টার প্রভৃতি আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক প্রচারের অনুপ্রবেশের পথ আরো সহজ, আরো দ্রুত করে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী শক্তিগুলিও জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের প্রশ্নকে যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পুরোনো জগতের সংকট ও ক্রমান্বয় ভাঙন এবং ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে চিরাচরিত নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষয় ও ভাঙন এক নৈতিক শূণ্যতা ও নৈতিক শিকড়বিহীন অবস্থার সৃষ্টি করার প্রবণতা দেখায়। তা আবার সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাশিস্ত অনৈতিকতা,[৫৬] অযৌক্তিকতা, ঘৃণা, ভয়, সংঘর্ষ ও হিংস্রতার উপর ভিত্তি করে চিন্তা ও কার্যপদ্ধতির প্রচার ও তাদের ব্যাপ্তির জন্য আদর্শ জমি তৈরী করে দেয়।

অনুরূপভাবে, ঔপনিবেশিকতা (এবং অনুন্নত ধনতন্ত্র) ব্যাপক হারে সব

কিছু আদায় করে নেওয়ার প্রবৃত্তি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব ও 'নগ্ন আত্ম-স্বার্থ'কে নিয়ে আসে, অথচ ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ও অর্থ নৈতিক বিকাশ, যা সেগুলিকে তুষ্ট করতে পারত, তাকে বাদ দিয়েই। ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র ইচ্ছার সৃষ্টি করে, যাকে ঔপনিবেশিক অনুন্নতি হতাশ করে দেয়। এ ছিল ঔপনিবেশিকতার এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য, এবং তার অন্যতম প্রধান নেতিবাচক দিক। সমগ্র গোষ্ঠী ও স্তর সৃষ্টি হত, যারা সম্পদ ও ক্ষমতা চেয়েছিল এবং যাদের খুব কমই ঐতিহ্য বা মূল্যবোধ ছিল যা তাদের যে কোনো ভাবে সে সব আদায় করা থেকে নিবৃত্ত করত। অথচ, তাদের অধিকাংশের সামাজিক অস্তিত্ব, বাসনা ও উচ্চাশা ব্যাহত হওয়া ছিল পূর্বনির্ধারিত। উপরন্তু, চিরাচরিত সামাজিক বন্ধন ও পরিবার আত্মীয়-স্বজন ও এলাকার প্রতি আনুগত্য ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল, বিশেষ করে শহর-গুলিতে। কিন্তু কোনো নতুন দৃঢ় বন্ধন তৈরী হচ্ছিল না। এই যে মূল্যবোধহীন এবং বস্তুগত, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক হতাশাগ্রস্ত সামাজিক পরিবেশ, তা ছিল অযৌক্তিক দর্শন ও মতাদর্শ, ঘৃণা ও ভয়ের আন্দোলন, স্থূল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও এক গোষ্ঠীকে অবেক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লাগিযে দেওযার জন্য আদর্শস্থানীয়।[৫৭] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমযে যে চরম বর্বরতা, পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতা দেখা যায় তাও অংশগত জনগণেব এই সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার দরুন, অংশত এই কারণে, যে এই দাঙ্গাগুলিতে প্রধান অংশগ্রহণকারী ছিল শহরের দরিদ্ররা যাবা নিছক বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্য দিযে সমস্ত নৈতিক বাধা হারিয়ে ফেলেছিল, এবং অংশত মধ্যবর্তী স্তবের বিদ্যমান সামাজিক অবস্থান বক্ষা করার তিক্ত লডাইযেব দরুন।

এই নৈতিক শূণ্যতা পূরণ করার প্রয়োজন ছিল, নতুন, ইতিবাচক মূল্য-বোধের এবং নৈতিকতার প্রয়োজন ছিল অযৌক্তিক ও অনৈতিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে লডবার জন্য। গান্ধীবাদী 'গ্রামবাদ' এবং চিরাচরিত নৈতিক মূল্যবোধের উপর জোর আরোপ, এমনকি কিয়দংশে পুনরুত্থানবাদও ছিল আংশিকভাবে ঔপনিবে-শিক সমাজের নৈতিক বিধ্বংসীকবণের প্রতিক্রিয়া। আরেকবার, জাতীয় আন্দোলন ও বামপন্থী শক্তিগুলি এই শূণ্যস্থানে এসে দাঁড়াতে পারে নি, নতুন মূল্যবোধেব বিকাশ ও পুরোনো মূল্যবোধের যা সেরা তাকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রামকে পূর্ণোদ্যমে শুরু করতে পারে নি। এক দিক থেকে তা ছিল বিস্ময়কর, কারণ এই আন্দোলনগুলির নেতারা ও কর্মীরা নিজেরা আন্দোলনে এসেছিলেন একরকম নৈতিক অঙ্গীকারবোধ থেকে, এবং তাঁদের তাই সমাজের নৈতিক পুনর্জন্মের প্রয়োজনকে দেখা উচিত ছিল।

সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের দিকে হিন্দুদের গতি সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধিকে সাহায্য করেছিল। জাতিভেদ ব্যবস্থার ভিত্তি, সামাজিক সংকীর্ণমনা আচরণ ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ, এবং সামাজিক নিষিদ্ধকরণের উপর। হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক

স্থাপন জাতের বিন্যাসের এই কঠোর ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হত। তারা মুস-লিমদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে তাদের বহিরাগত হিসেবে দেখা হয় এবং জাতি ব্যবস্থা ও তার বিন্যাস বহির্ভূত হিসাবে দেখা হয়। বিভিন্ন হিন্দু জাতের মধ্যে যেমন, হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে তেমন কোনো অন্তর্বিবাহ ছিল না। যা আরো খারাপ, তা হল পরম্পরাগত ভাবে একে অপরের খাদ্য গ্রহণেরও প্রথা ছিল না। উপরন্তু, সাধারণ একজন হিন্দু মুসলিমের হাত থেকে খাদ্য বা জল গ্রহণ করত না, এমনকি তাদের ছোঁয়া কিছুই স্পর্শ করত না। এই 'ছুঁয়ো না আমাকে মত'-এর স্থায়ী নির্দেশিকা ছিল রেলের প্ল্যাটফর্ম ও বাস স্ট্যাণ্ডে 'হিন্দু পানি' এবং 'মুসলিম পানি' এই চীৎকার। বড় বড় শহরে হিন্দু ও মুসলিমদের প্রবণতা ছিল স্বতন্ত্রভাবে, ভিন্ন ভিন্ন মোহল্লা বা এলাকায় বাস করা। একে অপরের খাদ্য গ্রহণ করা ও অন্তর্বিবাহের তুলনামূলক অনুপস্থিতির ফলে শহরের নিম্নমধ্যশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক সংযোগ হত যৎসামান্য।

তবে, যদিও এসব সামাজিক ছুৎমার্গ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ একটি সামাজিক দূরত্ব ও হয়ত মানসিক বিচ্ছেদ অথবা স্বতন্ত্র পরিচিতিবোধও সৃষ্টি করেছিল, এবং কিছু মাত্রায় মানসিক উত্তেজক হিসাবে কাজ করত, তবু, এ সব সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থানের কারণের কোনো উপাদান ছিল না। এগুলির উদ্ভব হয়েছিল কতকগুলি আচারগত ও জাতিগত চিন্তা থেকে। যেহেতু মুসলিমরা (এবং খ্রীশ্চানরা) সংজ্ঞা অনুসারে জাতি ব্যবস্থার বহির্ভূত, তাই জাতবিচারের সমস্ত নিষেধ যান্ত্রিক-ভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তা কতকগুলি ক্ষেত্রে সামাজিক নিষেধা-জ্ঞার রূপ নিলেও, মুসলিমরা (বা খ্রীশ্চানরা) অস্পৃশ্য ছিল না, তারা কেবল জাতিভিত্তিক সমাজের বাইরে ছিল। সুতরাং মৌলিকভাবে কোনো দিক থেকেই কোনো রকম জাতিগত বা শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনত্ব সম্বন্ধীয় প্রত্যয় জড়িত ছিল না; কেবল নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা ছাড়া।[৫৮] যখন শাসকরা ও বহু উচ্চ রাজকর্মচারী ছিল মুসলিম, সেই বোধ তখনো ছিল। আর আধুনিক যুগে সেটা বিদ্যমান ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে উচ্চতর মুসলিমদের সঙ্গে তাদের নীচে স্থিত হিন্দুদেরও, যথা মুসলিম প্রভু ও হিন্দু ভৃত্যের মধ্যে মুসলিম ভূ-স্বামী ও হিন্দু প্রজার মধ্যে। অনেক সময়ে সেটা ইংরেজ সাহেব ও তাদের নগণ্যতম চাপরাসী বা করণিকদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। বহু শতাব্দী ধরে, মুসলিমরা এই সামাজিক নিষেধ ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে ও সেটা যে সামাজিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতীয়মান হত, সেগুলিকে অবমাননাকর বা প্রভেদমূলক ও হীনতাসূচক বলে মনে করে নি। বরং, সেগুলিকে দেখা হয়েছিল হিন্দুদের ধর্ম ও জাত-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যসমূহ রূপেই।[৫৯] ফলে সেগুলি তেমন কোনো ক্ষোভ বা সম্মানহানি বা শোষণের বোধের জন্ম দেয় নি, যেমন দিয়েছিল অস্পৃশ্যদের

মধ্যে। সেগুলি হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক উত্তেজনার সৃষ্টিও করে নি, বা তার ভিত্তি হিসাবেও পরিগণিত হয় নি। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক দূরত্বকে ফাঁপিয়ে দেখাও উচিত হবে না। সামাজিক বহুধর্মিতা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়—এ কথা ঠিক নয় যে হিন্দুরা ও মুসলিমরা ছিল 'সমস্ত সামাজিক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী'। সাধারণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অনেকটাই ছিল। পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন একজন পাকিস্তানপন্থী লেখক স্বীকার করেছিলেন : "সাধারণ মানুষ, যারা দরবারের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের মধ্যে একই রকম প্রাচীন সৌজন্য, সম্মান ও সু-প্রতিবেশীসুলভ আচরণ বজায় থাকে ও আমাদের দিন পর্যন্ত থেকে এসেছে ·। সামাজিক ঐকতান ও শান্তির এক আবহাওয়া [বিদ্যমান ছিল]। হিন্দুরা ও মুসলিমরা একে অপরের উৎসব, বিবাহ ও অন্যান্য ঘরোয়া ব্যাপারে অংশগ্রহণ করত এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখের সাথী হত।"[৬০] একইভাবে, বিপিনচন্দ্র পাল, ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে সিলেটের একটি গ্রামে হিন্দুদের ব্যাপকভাবে মহরমে অংশ নেওয়ার কথা আলোচনা করার পর তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত চিন্তা কোনোভাবে গ্রামে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমাজ জীবনকে ব্যাহত করে নি :

> "আমাদের গ্রামের সমাজ ছিল···খুবই মিশ্র। আমাদের গ্রাম শুধু প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়েরই ছিল না, ছিল বেশ বড় এক মুসলমান বসতিও। আর হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে আদানপ্রদান ছিল প্রায় বিভিন্ন হিন্দু জাতের মধ্যে আদানপ্রদানের মতই অবাধ ও বন্ধুত্বপূর্ণ। আমাদের পৈতৃক বাড়িতে আমরা আমাদের মুসলিম প্রতিবেশী জমিদারকে পূজো ছাড়া বাড়ির সমস্ত উৎসবে ডাকতাম, কারণ তাঁরা পূজোয় অংশ নিতে পারতেন না, যদিও মুসলমানদের ঈদ পরবের সময়ে এবং বিবাহ বা মৃত্যু ঘটলে আমাদের মধ্যে নিয়মিত উপহার বিনিময় চলত"।

পালের রচনা অনুযায়ী :

> "আমার আজও মনে আছে যে এই মুসলিম প্রতিবেশী আমাদের বাড়িতে কোনো শ্রাদ্ধ হলেই একখণ্ড কাপড় ও দুটি টাকা পাঠাতেন ; আর আমরা অনুরূপ পরিস্থিতিতে সেগুলি ফেরৎ পাঠাতাম। আমাদের বাড়িতে যে কোনো উৎসবের সময়ে আমরা তাঁদের পুকুর থেকে মাছ ধরার অনুমতি পেতাম, যেমন তাঁদের বাড়িতে উৎসবে ব্যবহারের জন্য তাঁরা অবাধে আমাদের মাছ ধরতে পারতেন। এ সব ব্যাপারে আমাদের হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশীদের মধ্যে কোনো প্রভেদ করা হত না। আর গ্রামের সাধারণ মুসলিম জনতার সঙ্গে ব্যবহার হত যেমন ব্যবহার করা হত হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে, জাত ও ধর্মের স্পষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে, একইভাবে এবং প্রায় সমান সামাজিক সমতার ভিত্তিতে। ধর্মবিশ্বাস ও ব্যবহারে আমাদের এই প্রভেদ সামাজিক

সদ্ব্যবহার ও সম্পর্কে সামান্যতম পার্থক্য এনে দিত না। উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা একে অপরকে সম্পূর্ণ সহ্য করত।''৬১

১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে পাঞ্জাব বোর্ড অফ ইকনমিক ইনকোয়্যারি পাঞ্জাবের একটি গ্রামের সমীক্ষা করে লক্ষ্য করেছিল :

"পোড়ামাটির তৈরী দুটি মসজিদ রয়েছে, এবং দুটিই বেশ ভাল অবস্থায় আছে। মসজিদ চত্বরে সমস্ত ধর্ম ও বিশ্বাসের পথিক ও বিবাহ যাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা করা আছে। অনুসন্ধানকারী দেখে যে এই ঘরগুলিতে একটি হিন্দু বিবাহযাত্রী দল ছিল ও গান করছিল, যদিও মুসলিম প্রার্থনার সময়ে তারা থাকছিল নীরব। এই গ্রামের অধিবাসীরা স্মরণাতীত কাল থেকে এই পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত।''৬২

রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর যুগ্ম-গ্রাম জেরাদেই এবং জামাপুর প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"দেখাই যেত যে গ্রামজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট ছিল ধর্ম, এবং হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে নিখুঁত ঐকতান ছিল। মুসলিমরা হোলির মত হইচইপূর্ণ উৎসবে হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিত। দশেরা, দেওয়ালী ও হোলির সময়ে মৌলভী বিশেষ কাব্য রচনা করতেন । হিন্দুরা তাজিয়া বার করে মহরমে অংশগ্রহণ করত। জেরাদেই ও জামাপুরের সম্পন্ন হিন্দুদের তাজিয়া গরীব মুসলিমদের তাজিয়াগুলির চেয়ে বড় ও ঝকঝকে হত । [তাজিয়ার শোভাযাত্রায়] আবহাওয়া হত উৎসাহে পরিপূর্ণ, এবং হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমস্ত প্রভেদ ঘুচে যেত।''৬৩

উপরন্তু, সামাজিক পার্থক্য ও সামাজিক নিষেধ প্রদেশ থেকে প্রদেশ, নগর থেকে শহর, শহর থেকে গ্রাম, এবং শ্রেণী থেকে শ্রেণী অনুযায়ী ভিন্নতর হত। উচ্চশ্রেণী ও পেশাদারদের সবসময়েই ধর্ম নির্বিশেষে সামাজিক আদান-প্রদানের অনেকগুলি পথ খোলা ছিল। বড় শহরের তুলনায় গ্রামে ও ছোট শহরেও সামাজিক ফারাকটা ছিল অনেক কম। গ্রাম স্তরে হিন্দু ও মুসলিমরা এক সাধারণ আর্থসামাজিক কাঠামোর মধ্যে বাস করত, যার ভিত্তি ছিল সাধারণ বহু বন্ধনের এক জাল, এবং বহুবিধ সাধারণ সামাজিক প্রথা, রীতি ও কৃষ্টিগত রূপ। সাধারণভাবে, একে অপরের সঙ্গে খাওয়া ও অন্তর্বিবাহ ছাড়া, একই সামাজিক শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম নির্বিশেষে যথেষ্ট অবাধ সামাজিক মেলামেশা ছিল। কোন শহরে নিম্ন মধ্যশ্রেণীর মধ্যে, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে, এই সামাজিক ফারাক এক বিরাট ব্যবধানে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিত। আর তার এক মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব পড়েছিল পরবর্তী কালে, যখন নিম্ন মধ্যশ্রেণীগুলি ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে সক্রিয় উপাদানে পরিণত হল।

খাদ্য সংক্রান্ত নিষেধ নিয়েও বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। অনেক সময়ে

তা অতিক্রান্ত হত, যখন মুসলিমরা তাদের হিন্দু বন্ধুদের আপ্যায়ন করত হিন্দু দোকান থেকে মিষ্টি কিনে বা আরেক হিন্দু বন্ধু বা প্রতিবেশীর বাড়িতে। তাতে কোনো হীনতাবোধ অনুভূত হত না। উদাহরণস্বরূপ, শিবাজীর পৌত্র শাহু ও তাঁর মা ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হলে তিনি বহুকাল ধরে দেখেছিলেন যাতে তাঁদের থাকা খাওয়ার কঠোরতম হিন্দু সামাজিক ও খাদ্য সংক্রান্ত নিষেধ পালিত হয়।[৬৪] রাজেন্দ্র প্রসাদও তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে উৎসব ইত্যাদির পর যখন "মিষ্টান্ন বিতরণ করা হত তখন সকলেই হাত বাড়িয়ে দিত, কিন্তু হিন্দুরা মুসলিমদের কাছ থেকে জল নিত না। তবে মুসলিমরা হিন্দুদের অনুভূতি বুঝত এবং তাতে কিছু মনে করত না"।[৬৫]

এই প্রসঙ্গে একটু আত্মজীবনী কথন অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কারণ আজকের ভারতীয়রা, যাঁরা ১৯৪০-এর দশকের ও তৎপরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে বড় হয়েছেন, তাঁরা হয়ত যখন সাম্প্রদায়িকতাবাদ দুর্বল ছিল, বা এমন কি অনুপস্থিত ছিল, সেই প্রাক্-সাম্প্রদায়িক যুগের সামাজিক মেজাজকে ধরতে পারবেন না।[৬৬] আমার বাড়ি ছিল তৎকালীন পাঞ্জাব প্রদেশে। সেখানে হিন্দু মধ্যশ্রেণীর পরিবার থেকে তাদের মধ্যশ্রেণীভুক্ত মুসলিম বন্ধুদের দেওয়ালীতে মিষ্টি পাঠানোর রেওয়াজ ছিল। তারা আবার ঈদের মিষ্টি পাঠাত—শুধু সেগুলি হিন্দু মিষ্টান্ন বিক্রেতার দোকান থেকে সোজা হিন্দু বাড়িতে বাড়িতে আনা হত। আমার শৈশবের একটি নাটকীয় ঘটনা আজও আমার মনে আছে, যা ১৯৩৭ পর্যন্ত প্রকৃত পরিস্থিতি কী ছিল তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি স্কুলের ফাঁকে 'চাট' খাচ্ছিলাম, যখন আমার মুসলিম বন্ধু দৌড়ে এসে আমার গায়ে পড়ে ও যে হাতে আমি 'চাট' ধরে ছিলাম সেই হাতটাকে ধরে ফেলে। সে যখন দেখল যে আমি 'চাট' ফেলে দিচ্ছি না, তখন সে আমাকে তা করতে বলল, কারণ তা না হলে আমি 'ভ্রষ্ট' (অপবিত্র) হয়ে যাব। জাতীয়তাবাদী প্রচারে আলোকপ্রাপ্ত হওয়ায়, এবং সম্ভবত লোভী হওয়ায়, আমি তা করতে অস্বীকার করি। তখন সে আমার মা-বাবার কাছে আমার নামে নালিশ করার ভয় দেখায়। তাতে ঈপ্সিত ফল না পাওয়ায়, এবং সে আমার চেয়ে চেহারায় ভাল এবং বেশী মজবুত হওয়ায় চাটের প্লেটটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং বলে যে সে তার একজন বন্ধুকে নরকে যেতে দিতে পারে না। একইভাবে, অধ্যাপক মুনীশ রজার বক্তব্য হল যে যুক্তপ্রদেশে তাঁর শহরে সামাজিক দূরত্ব রক্ষিত হত অনুভূমিক ভাবে, সামাজিক শ্রেণী বিভাজন অনুযায়ী, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। অতএব খাদ্য সংক্রান্ত নিষেধ স্বীকার করা হত, কিন্তু সামাজিক বিভাজনের মধ্যে তাকে মানিয়ে নেওয়া হত। যথা, একজন মুসলিম কোনো ভোজসভার আয়োজন করলে সমস্ত উচ্চশ্রেণী ও উচ্চজাত ভুক্ত হিন্দু ও মুসলিম একই সময়ে খেতে বসত, কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে। আবার নিম্নতর শ্রেণী ও জাতের হিন্দু-মুসলিম পরে

একই সময়ে খেত, কিন্তু এবারও স্বতন্ত্র স্থানে। সুতরাং সামাজিক প্রভেদের প্রতীক ছিল খাওয়ার স্বতন্ত্র স্থান নয়, বরং স্বতন্ত্র সময়। এইভাবে, একজন হিন্দু উচ্চশ্রেণী ভুক্ত রাজপুত বা ব্রাহ্মণ মুসলিম নিমন্ত্রণকারীর সঙ্গে একই সময়ে খেত, আর একজন মুসলিম জোলা বা নীচু জাতের একজন হিন্দু ভৃত্য উভয়েই পরে খেত, কিন্তু উভয়ে একই সময়ে খেত। অবশ্যই ১৯৩০-এর দশকে বহু শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলিম, বিশেষত আইনজীবী, ডাক্তার ও সরকারী কর্মচারী, একত্রেও ভোজন করত। রাজার মতে, বহু ধার্মিক মুসলিম বৃদ্ধা প্রমুখ ধার্মিকতার অঙ্গ হিসাবে হিন্দুদের রান্না করা বা হিন্দুর দ্বারা পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ করতেন না। কিন্তু তাতে তাঁদের শ্রেণী, জাত, বা জাতিগত উৎপত্তি, অর্থাৎ ইরানী, তুর্কী ও আরব ইত্যাদি বিদেশী উৎপত্তি বা দেশীয় 'হিন্দুস্থানী' উৎপত্তি, এ ছাড়া অন্য কোনো রকম সামাজিক উৎকর্ষের বোধ থাকত না।

কিন্তু সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও নিষেধে সবসময়েই গোলমাল ও ভুল বোঝা-বুঝির কতকগুলি সম্ভাবনা সুপ্ত থাকে। নতুন এক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরি-স্থিতিতে, এবং একবার সাম্প্রদায়িকতাবাদ বাড়তে শুরু করার পর, তা অন্য কারণে হলেও, এই নিষেধগুলিকে শিক্ষিত মুসলিমরা অন্য চোখে দেখতে শুরু করেন। আধুনিক ব্যক্তিরা, যারা সামাজিক সাম্যের আদর্শে শিক্ষিত, তাদের চোখে এগুলি অবমাননাকর ও পক্ষপাতমূলক বলে ঠেকে। এগুলি ধ্রুব উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং হিন্দু-মুসলিম সামাজিক দূরত্বের অনুস্মারকে পরিণত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সে সবের ব্যবহার করে হিন্দুবিদ্বেষ ছড়াতে এবং মুসলিম নিম্ন মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক তিক্ততাবোধের উদ্রেক করতে পারত ও এইভাবে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে পারত। এই সামাজিক নিষেধাজ্ঞাগুলিকে এখন দেখা হল, বা যে তথ্যকে প্রমাণ করার জন্য দেখানো হল, তা হচ্ছে, হিন্দুরা মুসলিমদের ঘৃণা ও অপছন্দ করে এবং সম্পূর্ণ অবজ্ঞার চোখে দেখে। একথা বিশেষভাবে সত্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, কারণ সেখানে পাঞ্জাব, কেরালা ও যুক্ত প্রদেশের থেকে স্বতন্ত্রভাবে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ছিল, দরিদ্র মুসলিম কৃষকের প্রতি হিন্দু জমিদারের শ্রেণীগত অবজ্ঞার একটি দিক।[৬৭]

এইভাবেই, ১৯১৮-তে বঙ্গদেশ থেকে 'আল-ইসলাম' লেখে, হিন্দু-মুসলিম ঘাত-প্রতিঘাতের চারটি কারণের একটি হল যে: "সাধারণ মুসলিমরা অভিযোগ করে যে হিন্দু জমিদাররা তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, এমন কি সাধারণ হিন্দুরাও অযৌক্তিক অপবাদ দেয় ও তাদের সঙ্গে পথে, ট্রেনে ও স্টীমারে এবং বাজারে শত্রুর মত অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করে"।…একইভাবে, 'বঙ্গ নুর' ১৯২০-তে লেখে যে হিন্দু-মুসলিম উত্তেজনার উৎসগুলির একটি হল "মুসলিম ছোঁয়াচের ভয় (এবং) যবন ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার"।[৬৮] 'সওগত'-এর জনৈক

সংবাদদাতা, বঙ্গদেশ থেকে ১৯২৮-এ লেখেন যে যদিও ঐতিহাসিকভাবে যবন মানে বিদেশী, "যারা এখন সেটা 'মুসলিম' অর্থে ব্যবহার করে তারা তাদের হৃদয়ে এক নির্দিষ্ট বিতৃষ্ণা বোধ করে"।[৭০] ১৯৪০-এ এম. এ. জিন্না দাবী করেন যে হিন্দু ও মুসলিমরা কেন কখনো একটি ভারতীয় জাতীয়তা গঠন করতে পারবে না তার অন্যতম কারণ হল "তারা অন্তর্বিবাহও করে না, একত্রে ভোজনও করে না।"[৭১] ১৯৩০-এর দশকের মধ্যে জাতীয়তাবাদী লেখকরাও হিন্দুদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবোধকে সাম্প্রদায়িকভাব প্রসারে অন্যতম উপাদান হিসাবে দেখতে শুরু করেছিলেন। শওকতউল্লাহ আনসারী ১৯৪৫-এ লেখেন : "সমস্যার মূল হল এই যে হিন্দুরা সামাজিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণমনা, এবং তা মুসলিমদের আঘাত করেছে। হিন্দুরা মুসলিমদের অস্পৃশ্য রূপে দেখেছে . । হিন্দুদের কাছে তার যে কারণই থাক না কেন, মুসলিমরা এই আচরণে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেন না . । মুসলিমদের হৃদয়বেদনা তীব্র হয়ে থাকে এবং যাঁরা হিন্দুদের কাছে অপমানিত হয়েছেন তাঁদের বুকে ঘৃণার সঞ্চার করে"।[৭২] একইভাবে, হুমায়ুন কবীর ১৯৪২-এ লেখেন : 'সামাজিক বিষয়সমূহে হিন্দুরা সাধারণভাবে অহিন্দুদের প্রতিও বিশেষ-ভাবে মুসলিমদের প্রতি যে আচরণ করেন তা হিন্দু-মুসলিম ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির একটি। সামাজিক অক্ষমতা চেতনার উপর এমনভাবে এসে পড়ে, যা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অক্ষমতাও পারে না. ।" তিনি অবশ্য আগে বলেন : "শেষ পর্যন্ত সামাজিক অক্ষমতা কেবল কিছু লক্ষণ যা এক গভীরতর রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যে রোগকে পাওয়া যাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসাম্যের মধ্যে।"[৭৩] গান্ধীও এই যুক্তির বল স্বীকার করেছিলেন। অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি ২৫শে মে ১৯৪০ 'হরিজন'-এ লেখেন : "আমি মনে করি অস্পৃশ্যতা আমাদের পতনের এবং হিন্দু-মুসলিম বিভেদের প্রধান কারণ।'[৭৪]

শহরে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে আপেক্ষিক সামাজিক ব্যবধান বা সামাজিক সংযোগের অভাব সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রসারে আরও গুরুতরভাবে সহায়তা করেছিল। সেটা নিজের মত করে বাঁধাধরা রূপের উদ্ভব ঘটাত বা ঘটানো সহজ করে দিত। এই প্রবণতাকে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা পূর্ণরূপে ব্যবহার করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে অবজ্ঞা, ভয় ও ঘৃণা ছড়াতো। সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদয় বা বৃদ্ধির কারণের উপাদান না হলেও এ ছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদী তূণের অন্যতম বাণ।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলিমদের দেখাত সংস্কৃতিহীন, এবং গুণ্ডা, মাস্তান ও রক্তপিপাসু পশু হিসেবে, যার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল লুঠতরাজ, খুন, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ করা। সাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তিতে একজন মুসলমান ছিল নিকৃষ্ট নৈতিকতা যুক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত যৌন লালসা পীড়িত এক ব্যক্তি, যে সর্বদা

হিন্দু নারীদের সতীত্বহানি করতে, গুম করতে ও আক্রমণ করতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং হিন্দু মেয়েদের মুসলিম এলাকায় যাওয়া নিরাপদ ছিল না। এমনকি, তারা নিজেদের এলাকাতেও নিরাপদ ছিল না, যদি না হিন্দু যুবকরা তাদের সম্মান রক্ষা করার জন্ম সংগঠিত হত। মুসলিমদের এই ছাঁচে তৈরী রূপ ব্যবহার করে এবার হিন্দুদের মধ্যে ভয় ও আত্মরক্ষামূলক মনোভাব তৈরী করা হত, যদিও তারাই ছিল দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দুদেরও এক ছাঁচে ফেলা চরিত্র চিত্রায়ন করে। হিন্দু ছিল 'নিরীহ', 'পোষমানা' এবং 'নপুংশক'। এর কারণ ছিল হিন্দুদের খোঁচা মেরে একটি 'জঙ্গী জনগণে' রূপান্তরিত করা, যার জন্ম ফাশিস্ত ও সাম্প্রদায়িক ধাঁচে সংগঠিত হওয়ার দরকার ছিল। বস্তুত, তারা বলে, একবার হিন্দুরা 'শক্তিশালী' হলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য হয়ে যাবে কারণ মুসলিমরা আর তাদের আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।[৭৫]

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ছবিতে হিন্দুরা হল হিসেবী, ধূর্ত, সন্দেহজনক বাণিয়া, যাকে বিশ্বাস করা যায় না ও যার প্রতিটি কথাকে গোপন প্যাঁচের জন্ম মেপে নিতে হবে। ফলে 'হিন্দু' রাজনীতিবিদ্‌রা যা আশ্বাস দিক না কেন, সবই ছিল অর্থহীন। উপরন্তু, সমস্ত হিন্দু ছিল টাকা-পাগল শোষক, যেখানে মুসলিমরা টাকার বিশেষ পরোয়া করত না এবং "শোষণের কোনো ধারণা ছিল না"[৭৬] তাদের মধ্যে। হিন্দুরা ছিল ধনিক ও কলমধারী বাবুর জাত। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আখ্যা দেওয়া হয় 'বাণিয়া সাম্রাজ্যবাদী' বলে। সবচেয়ে বড় কথা, হিন্দুরা ছিল ভীষণ কাপুরুষ, যার প্রতীক ছিল তাদের কৃতি। কাপুরুষ হিন্দু ও বলিষ্ঠ মুসলিমের এই ছাঁচ ব্যবহার করে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রথমে সংখ্যালঘু ফাশিস্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদের টিঁকে থাকার ও পরে ভারতের চেয়ে অনেক ছোট পাকিস্তানের টিঁকে থাকার ক্ষমতা প্রমাণ করতে চেয়েছিল।

১৯৪৭-এর পূর্বে ভারতে শিখবিদ্বেষী ও হিন্দুবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে উভয় ধরণেব সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একে অপরের সম্পর্কে অনুরূপ চরিত্রায়ণ প্রচার করছে। উল্লেখযোগ্য, বিশেষ কোনো নতুনত্ব আসে নি। অনেক ক্ষেত্রেই, আগে মুসলিমদের সম্পর্কে যা বলা হত তা এখন শিখদের উপর চাপানো হয়েছে, আর শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেব অনুকরণ করছে।

১৯৪৭ পরবর্তী পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদের ও সাম্প্রদায়িক ছাঁচে ফেলা চরিত্রের উদয় (এবং সারা দেশে জাতপাতের উদয়) দেখায় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদয় ও বৃদ্ধিতে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবোধ বা ব্যবধান খুবই ছোটো ভূমিকা পালন করে, কারণ শিখদের ও হিন্দুদের মধ্যে তেমন ব্যবধান নেই বললেই চলে। তারা একত্রে ভোজন করে, অন্তর্বিবাহ করে, অবাধ সামাজিক সংযোগ ও সম্পর্ক রাখে, এবং শহরে শহরে একই মহল্লায় থাকে। তাদের মধ্যে আছে 'রোটি বেটি

কি সাঁঝ'। তাদের মধ্যে ধর্মীয় প্রয়োগ, উৎসব, ধর্মান্তর ইত্যাদি নিয়েও বৈরীতার কোনো জায়গা নেই। লক্ষ লক্ষ হিন্দু গ্রন্থ সাহেবকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রূপে উপাসনা করে, আর লক্ষ লক্ষ শিখ হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকে সম্মান জানায়। তদুপরি, মাত্র কয়েক বছর আগেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা শিখদের হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা বলে অভিহিত করত।

একইভাবে আধুনিক, পাশ্চাত্য অনুসরণকারী বুদ্ধিজীবী যাদের কলেজে, আদালতে বা সংবাদপত্রে দেখা যায় তারা ১৯৩০, ১৯৪০, বা বর্তমান দশকে প্রায় কখনোই খাদ্য সংক্রান্ত ও অন্যান্য সামাজিক নিষেধাজ্ঞা পালনও করত না, তার সংস্পর্শেও আসত না বা আসে না। তাদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান অন্য দিক থেকেও খুবই সংকীর্ণ। তবু প্রায়ই তারাই ছিল (এবং আছে) সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রধান প্রবক্তা, নেতা ও তাত্ত্বিক।

সবশেষে একথা বলা যায় যে এই স্তরে, এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অঙ্গরূপে এই সামাজিক নিষেধাজ্ঞা, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সংকীর্ণ মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা অত্যাবশ্যক ছিল। সে লড়াই করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বিশেষভাবে বিস্ময়কর, কারণ হরিজন ও মেয়েদের বিরুদ্ধে একই রকম নিষেধাজ্ঞা ও প্রভেদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হচ্ছিল। এ কথা বলা যেতে পারে যে এই ব্যর্থতা অন্তত আংশিকভাবে ছিল জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সামাজিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের ব্যাপক উপস্থিতির দরুন। জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সক্রিয় সামাজিক দ্রুত কর্মপন্থা দরকার, তা বহু চিন্তাশীল ভারতীয় স্বীকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন ১৯২৩-র দশকের প্রথম দিকে লিখেছিলেন :

> "যখন আমাদের জাতীয়তাবাদীরা আদর্শের (জাতীয়তাবাদী) কথা বলেন, তখন তারা ভুলে যান জাতীয়তাবাদের ভিত্তির অভাব। যে সব ব্যক্তিরা এই সব আদর্শ উঁচুতে তুলে ধরেন তারা নিজেরাই সামাজিক আচরণে খুবই রক্ষণশীল। উদাহরণস্বরূপ জাতীয়তাবাদীরা বলেন, সুইজারল্যাণ্ডের দিকে তাকাও, দেখবে জাতিগত ভেদ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এরা একটা জাতিতে সবাই একত্রীভূত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত সুইজারল্যাণ্ডে বিভিন্ন জাতি পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। কারণ তাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। ভারতে তেমন কোন জন্মসূত্র নেই।"[৭৭]

৪. এক সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিক্রিয়ার রূপ আরেক সাম্প্রদায়িকতাবাদ

অতীতে অনেক সময়ে, এবং আজও, একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী—এবং কখনো কখনো একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিও—একটি সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদ্ভব ব্যাখ্যা করেন অপর সাম্প্রদায়িকতাবাদের অস্তিত্ব দেখিয়ে। তাকে দেখা হত বা হয় ও স্বতন্ত্রভাবে বা নিয়ে থেকে উদিত অন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিক্রিয়া বা ফল হিসাবে। এইভাবে, দোষ বা আদি পাপের বোঝা বিপরীত সাম্প্রদায়িকতাবাদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের সাম্প্রদায়িকতাবাদের, বা যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হচ্ছে বা যাকে সমর্থন করা হচ্ছে তার জন্য একটা খিড়কীর দরজা দিয়ে ন্যায্যতা আনার চেষ্টা করা হয়। একই সময়ে, নিজের 'সম্প্রদায়ের' জন্য 'আমি তোমার চেয়ে পবিত্র' এই ধরণের এক মর্যাদা দাবী করা হয়। এর এক সাম্প্রতিক উদাহরণ মেলে প্রভা দীক্ষিতের রচনায়। তিনি বলেন যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম রূপে বিকশিত হয়েছিল এবং "হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিক্রিয়ারূপে উদিত হয় নি।" "অন্য দিকে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধি হয় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিক্রিয়ায়"।[৭৮] "হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ : তার জন্ম ও বৃদ্ধি" প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন : "সুতরাং, তাঁদের নিজেদের ও গোটা দেশের স্বার্থে, হিন্দু নেতারা জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন।"[৭৯] কিন্তু ১৯০৬-এ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা "হিন্দু নেতাদের প্রবল ধাক্কা দিল। মুসলিম নেতৃত্ব স্পষ্টতই তাঁদের সাম্প্রদায়কে জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোত থেকে সরিয়ে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।" ফলে :

> "একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে ১৯০৯-এর আইন, যা স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী ও মুসলিমদের জন্য বিশেষ স্থান দিল, তা হিন্দুদের মধ্যে সংগঠিত সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্মের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। কংগ্রেস দাঁড়িয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাধারণ জাতীয়তার আদর্শে। তা এখন হিন্দুদের একাংশের চোখে মূল্য হারাল। জাতীয় ঐক্যের সমগ্র বোঝা হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কংগ্রেসী নীতির বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল··· । মনে করা হল যে হিন্দুদের "ন্যায্য অধিকার" রক্ষা করার জন্য একটি স্বতন্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা উচিত··· । মুসলিম লীগ বিনা আন্দোলনে ও বিনা সংগ্রামে মুসলিমদের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও সুবিধা আদায় করায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একটি সম্মানজনক ও লাভজনক পেশা বলে পরিগণিত হল। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আদর্শের তুলনায় মুসলিমদের সাম্প্রদায়িকতাবাদী আদর্শের সুবিধাগুলি এত স্পষ্ট ছিল যে তাদের অবহেলা করা যেত না। তাঁরা যাকে অধিকার

সমর্পণ মনে করতেন তাতে রাজি না হয়ে হিন্দুদের একাংশ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা বেছে নিলেন।"[৮০]

উল্টো দিক থেকে একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন মুশিরুল হাসান। বি. এস. মুঞ্জের সাম্প্রদায়িক উক্তি ও ক্রিয়া লক্ষ্য করে হাসান লিখেছেন: 'সে সব দেখিয়ে দিল যে কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবর্গ হিন্দু মহাসভাপন্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব রোধ করতে ব্যর্থ, তা **মুসলিমদের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেতনা বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করল** এবং কিছু মুসলিম গোষ্ঠীর সন্দেহ যে কংগ্রেসের পরিভাষায় স্বরাজ মানে হিন্দু আধিপত্য, তাকে দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করল।" (জোর আরোপিত)। ১৮৮০-র দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতি ও মুসলিম লীগের বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করে—যাকে তিনি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশ হিসাবে দেখেন না—তিনি লিখেছেন:

> "তার সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ ব্যতীত, মুসলিম লীগ সাংগঠনিক অভিব্যক্তি দিয়েছিল তাঁদের অনুভূতির, যাঁরা উগ্র গোরক্ষাকর্তাদের ও জঙ্গী ভাষা সংস্কারকদের কাজের ফলে প্রভাবান্বিত বা চিন্তিত হয়েছিলেন। লীগ একটি মঞ্চ তৈরী করে দিল, যেখান থেকে ঐ চিন্তা ব্যক্ত করা যেত, আর ব্রিটিশদের সঙ্গে মৈত্রী নিশ্চিত করে দিল যে **মুসলিম স্বার্থ,** যত ভিন্নভাবেই দেখা হোক না কেন, যথাযোগ্যভাবে রক্ষিত হবে। ১৯০৬ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত মুসলিম রাজনীতির ভিত্তি প্রস্তর ছিল লীগকে **মুসলিমদের স্বার্থের কার্যোপযোগী মুখপাত্র** রূপে সুসংহত করা, তা ছিল রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক দাবী, দুই-ই ব্যক্ত করার একটি যান।"[৮১]
> (জোর আরোপিত)

নিঃসন্দেহে, একবার দুই সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশ হলে তারা একে অপরের উপর ভর করে বড় হয়েছিল। একে অপরকে নাকচ করার পরিবর্তে তারা পরস্পরের প্রবৃত্তির চক্রবৃদ্ধি হারে প্রগতির সহায়ক হয়েছে। মেহতা ও পট্টবর্দ্ধন যথার্থ ই লিখেছেন: "প্রত্যেকে অপরের অস্তিত্বের যুক্তি ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে"।[৮২] তাদের একে অপরকে ব্যবহার করাটা ঘটেছে যেন পাহাড়ের উপর থেকে তুষারগোলক গড়িয়ে পড়ার পথে তার আয়তন বৃদ্ধির মত। এই হল 'এক সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিক্রিয়া রূপে অপর সাম্প্রদায়িকতাবাদ' তত্ত্বের সঠিক অংশ। যেমন, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বল বৃদ্ধিতে মুসলিমদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটে; তার ফলে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে ভয় জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল তার যাথার্থতা প্রমাণ করে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী বা সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম যত আত্মতৃপ্তির সঙ্গে ও পৃষ্ঠপোষকতার ভান করে জাতীয়তাবাদের প্রতি হিন্দুরা কত নিয়োজিত, তা বলতে

থাকে 'ও মুসলিমদের' 'স্বার্থপরতা' ও 'সংকীর্ণ মানসিকতা' ত্যাগ করে জাতীয়তা-বাদের মূলধারায় আসতে বলে—যে 'আমি তোমার চেয়ে পবিত্র'-আচরণ প্রভা দীক্ষিতের উদ্ধৃতিটি থেকে পাওয়া যায়—ততই মুসলিমরা মনে করতে থাকে যে হিন্দুরা তাদের দেখে নাক সিঁটকাচ্ছে এবং অবজ্ঞা করছে, অতএব, মুসলিম সাম্প্রদায়িক বক্তব্য সঠিক। একইভাবে, মুসলিমদের, স্বার্থ স্বতন্ত্র এবং হিন্দুরা তাদের উপর আধিপত্য কায়েম করতে ও তাদের ধ্বংস করতে চায়, এই প্রচারে হিন্দু প্রতিক্রিয়া দেখা দিত।

এই পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার এক বিশেষ নিদর্শন দ্বিজাতি তত্ত্ব। ১৯৩৬-এর পর সাভারকার ও জিন্না দুজনেই বলতে থাকেন যে হিন্দুরা ও মুসলিমরা দুটি স্বতন্ত্র জাতি।[৮৩] উভয়ের এই উক্তি উভয়ের হাত শক্ত করে বিচ্ছিন্নতাবাদের উদয়ের শর্ত সৃষ্টি করে।

তবে যে কোনো সাম্প্রদায়িকতাবাদ অপরটির প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত একথা বলা ভুল হলেও, একথা ঠিক, যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও তার আক্রমণাত্মক প্রচার, এবং জাতীয় আন্দোলনের অনেকাংশে হিন্দু সংশ্লেষের অস্তিত্ব, ছিল জাতীয় আন্দোলন ও পরে শ্রেণীগত আন্দোলনগুলি কর্তৃক মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে পরাভূত করতে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ।

পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার ফাঁদের উত্তর ছিল প্রয়োগের ক্ষেত্রে। উভয়েই সমান ভ্রান্ত, কেউই তাই অপরকে ন্যায্যতা বা বৈধতা অর্পণ করতে পারত না। উভয়কে একই সঙ্গে সমালোচনা ও উদ্‌ঘাটন করা উচিত ছিল। কার্যক্ষেত্রে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে বেশী সমালোচনা করা উচিত ছিল হিন্দু শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বা বক্তা হিন্দু হলে এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে বেশী, মুসলিম শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বা বক্তা মুসলিম হলে। নচেৎ, কখনো কখনো কেবল সাম্প্রদায়িক শ্রোতাদের সামনে অপর সাম্প্রদায়িকতাবাদের সমালোচনা—যথা হিন্দু সাম্প্রদায়িক শ্রোতাদের কাছে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের সমালোচনা বা তার বিপরীত—সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ইন্ধন যোগাতে পারত।

তবে শেষ পর্যন্ত এ কথা মনে রাখতে হবে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধি ও পর্যায়ে পর্যায়ে ব্যাপকতর গণ সমর্থন প্রাপ্তির মূল কারণ ছিল সামাজিক পরিস্থিতি। তা পুঞ্জীভূত ও স্বয়ংচালিত হতে পেরেছিল কারণ তা সর্বদাই কিছু সামাজিক শক্তির দ্বারা পুষ্ট হত, যারা তার মধ্যে পেয়েছিল হাতের কাছে একটি তৈরী ও চলনসই মতাদর্শ।

টীকা

১। গোপাল কৃষ্ণ : রিলিজিয়ন ইন পলিটিক্স, পৃঃ ৩৭৫। তিনি আরো বলেছেন : "আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তনে কোনো একটি উপাদান ধর্মের মত সর্বব্যাপি হয় নি। তা বহুলাংশে গত একশত বছরের রাজনৈতিক বিভাজন, ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জোট-গঠনের কার্যকলাপকে শাসন করেছে"। ঐ, পৃঃ ৩৬২।

২। ঐ, পৃঃ ৩৮০।

৩। ঐ, পৃঃ ৩৭৬, ৩৯৪ ; রশীদ-উদ্দীন খান : 'সেল্ফ্-ভিউ অফ মাইনরিটিস্ : দ্য মুসলিমস ইন ইণ্ডিয়া'।

৪। রশীদউদ্দীন খান লিখেছেন : "একটি বহুমাত্রিক সমাজে স্বয়ংসম্পূর্ণতাযোগ্য অংশগুলির মধ্যে—আঞ্চলিক, ভাষাগত, কৃষ্টিগত, সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক—টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব শুধু অনিবার্য নয়, যা গতিশীল পরিবর্তনের যে কোনো পরিস্থিতি থেকে প্রতীয়মান, বরং উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, যে যদি টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্বগুলিকে আইন স্বীকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে 'ধারণ' করা হয় এবং তাদের মধ্যস্থতা করা হয় চাপ দেওয়ার ও দরকষার এমন পদ্ধতির দ্বারা, যা স্বাভাবিক ক্রিয়ামূলক, ক্রিয়াবিগুণ্যজাত নয়, তবে তারা পরিবর্তনেরই সৃজনশীল অনুঘটকে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।" ঐ। এছাড়া দেখুন এ. আর. কামাত, "ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন অ্যাণ্ড সাব-ন্যাশনাল লয়ালটিস্"। আমার মতে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকে ভাষাগত, কৃষ্টিগত বা রাজনৈতিক আনুগত্য ও দ্বন্দ্বের সঙ্গে সমস্তরে রাখা ভুল।

৫। এমনকি একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে—সাম্প্রদায়িক হিংসার হঠাৎ বিস্ফোরণকে- ব্যাখ্যা করতেও আমরা এমন একটি উপাদানকে ব্যবহার করতে পারি না যা সতত উপস্থিত—অর্থাৎ ধর্মীয় প্রভেদ। আমাদের এমন এক উপাদান বা পরিস্থিতির সন্ধান করতে হবে যা এমন এক জনগণের মধ্যে অকস্মাৎ হিংসা ও দ্বেষের সঞ্চার ঘটিয়েছিল যাঁরা আগে একত্রে শান্তিতে বাস করতেন ও ভবিষ্যতেও তা করার সম্ভাবনা থাকে।

৬। পাঞ্জাবে শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থানের ক্ষেত্রে এটা ছিল স্পষ্ট। এখানে হিন্দু ও শিখ উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদ মিলেই একটি স্বতন্ত্র ধর্মের পৃথক্ পরিচিতির সৃষ্টি করেছিল।

৭। পি. সি যোশী, "দ্য ইকনমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ কমিউনালিসম ইন ইণ্ডিয়া—আ মডেল অফ অ্যানালিসিস", পৃঃ ১৭১।

৮। কে এম আশরাফ এই দিকটিকে অত্যন্ত যথাযথ ও সুন্দর একটি উক্তির দ্বারা প্রকাশ করে বলেছেন, সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল "মাঝহাব কি সিয়াসি দুকানদারী"—যার নিখুঁত অনুবাদ প্রায় অসম্ভব, কিন্তু যার মোটামুটি অর্থ হল "ধর্ম নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা"। হিন্দুস্থানী মুসলিম সিয়াসত তার এক নজর, পৃঃ ৭৩।

৯। নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলন, ১ জানুয়ারী ১৯২৯-এর প্রস্তাবাবলী ও এম এ. জিন্না-র ২৮ মার্চ ১৯২৯-এর ১৪ দফার জন্য দ্রষ্টব্য গোয়াইয়ের, এম এবং আপ্পাদোরাই, এ, স্পীচেস্ অ্যাণ্ড ডকুমেন্টস অন দি ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ১৯২১-৪৭, খণ্ড ১, পৃঃ ২৪৪-৪৭।

১০। ঐ।

১১। লীগের ১৯৩৭ অধিবেশন নিম্নলিখিত "অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা কর্মসূচী" গ্রহণ করে : "ফ্যাক্টরী শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের জন্য কাজের ঘণ্টা ও ন্যূনতম মজুরী বেঁধে দেওয়া ; শ্রমজীবীদের আগমন ও স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতির উন্নতিবিধান এবং বস্তী পরিস্কার করার ব্যবস্থা যতদিন না যথাযোগ্য আইন প্রণীত হয় ততদিন গ্রামীণ ও শহুরে

ঋণ হ্রাস করা ও মহাজনীর বিলোপ ; ডিক্রীপ্রাপ্ত হোক বা না হোক, সমস্ত ঋণ প্রসঙ্গে স্থগিতাদেশ জারী করা ; ডিক্রী জারী করে গৃহ দখল বা বিক্রয় রদে আইন প্রণয়ন ; কৃষকের স্বত্ব আদায় ও ন্যায্য খাজনা ও কর নির্ধারণ ; বেগার শ্রমের বিলোপ ; গ্রামীণ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ . গ্রামে ও শহরে কুটির শিল্প ও ছোটো দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ প্রদান ; স্বদেশী দ্রব্য, বিশেষত হস্ত শিল্পজ বস্ত্র ব্যবহারে উৎসাহ দান . শিল্পের বিকাশ ও দালালের হাতে শোষণ রোধে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বোর্ড গঠন ; বেকারীর উপশমকল্পে ব্যবস্থা নেওয়া , বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ঘটানো ; মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার, বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার পুনর্গঠন , রাইফেল কাব ও একটি সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠা . মদ্যপান নিবারণ , মুসলিম সমাজ থেকে অনৈসলামিক প্রথা ও ব্যবহার দূরীকরণ ; সমাজ সেবাকল্পে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ; এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পন্থা নির্ধারণ ও ঐ লক্ষ্যাভিমুখে গতিশীল সকল রাজনৈতিক সংস্থার সহযোগিতা আমন্ত্রণ করা ।" এস এম পীরজাদা, 'ফাউণ্ডেশনস অফ পাকিস্তান···', খণ্ড ২, পৃঃ ২৮০ । লীগের ১৯৩৬-এর নির্বাচনী ইস্তাহার নিম্নলিখিত কর্মসূচী পেশ করে :"১. মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা । সমস্ত প্রকার নিছক ধর্মীয় বিষয়ে জামায়েত উল-উলেমা-ই-হিন্দ এবং মুজতাহিদদের মতের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হবে । ২ সমস্ত দমনমূলক আইন প্রত্যাহারের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা হবে । ৩ ভারতের অনিষ্টকর সমস্ত পদক্ষেপের বিরোধিতা করা হবে, যে সব পদক্ষেপ জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা খর্ব করে ও দেশের অর্থনৈতিক শোষণের পথে যায় । ৪ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনযন্ত্রের বিপুল ব্যয় হ্রাস করা হবে, এবং জাতীয় গঠন সংক্রান্ত দপ্তরগুলিকে যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হবে । ৫ ভারতীয় সেনাবাহিনীর জাতীয়করণ এবং সামরিক ব্যয়সংকোচ করা হবে । ৬ কুটির শিল্প সহ শিল্পের বিকাশে উৎসাহ দেওয়া হবে । ৭. দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে মুদ্রা, বিনিময় ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে । ৮ গ্রামীণ জনগণের সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে থাকা হবে । ৯ গ্রামীণ ঋণভার লাঘবের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে । ১০ মৌলিক শিক্ষা বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক করা হবে । ১১ উর্দু ভাষা ও লিপিকে রক্ষা ও উৎসাহদান করা হবে । ১২. মুসলিমদের সাধারণ অবস্থার উপশমের জন্য পন্থা নির্ধারণ করা হবে । ১৩ করভার লাঘবের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে । ১৪ দেশজুড়ে সুস্থ জনমত ও সাধারণ রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করা হবে ।" জেড এইচ. জাইদি, "আসপেক্টস অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ মুসলিম লীগ পলিসী, ১৯৩৭-৪৭", পৃঃ ২৫২ । এছাড়া দেখুন মহম্মদ নোমান, 'মুসলিম ইণ্ডিয়া···', পৃঃ ৩৫৬-৫৭ । ১৯২০-র দশকের জন্য দেখুন রাম গোপাল, 'ইণ্ডিয়ান মুসলিমস···, ১৭শ-২৭শ অধ্যায় এবং প্রভা দীক্ষিত, 'কমিউনালিসম-অ্যা স্ট্রাগল ফর পাওয়ার, ৩য় অধ্যায় ।

১২ । লীগ নেতৃবর্গ ও উলামা এই চীৎকার শুরু করেন ১৯৩৭-এ ও তারপরে, যখন মুসলিম জনগণকে ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচীর ভিত্তিতে আকৃষ্ট করার কংগ্রেসী প্রয়াসকে ব্যাপকভাবে ইসলামের উপর আক্রমণ বলে দেখানো হয় , কিন্তু তা বড় মাত্রায় গৃহীত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পর্বে । যেমন, এম এ. জিন্না ইসলামের প্রতি আবেদন শুরু করেন ১৯৩০-এর দশকের শেষদিক থেকে । দ্রঃ. 'স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস', খণ্ড ১, পৃঃ ৭৩ ও ৮৬-৮৮ । এছাড়া দেখুন রামগোপাল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬০ ।

১৩ । জনগণ নিজেরাই দেখতে পারতেন, মুসলিমরা বা হিন্দুরা বিপন্ন কি না ; অন্তত এজন্য নেতাদের ও লেখকদের কিছু প্রমাণ দিতে হত । কিন্তু ইসলাম বা হিন্দুধর্ম বিপন্ন -এ ছিল এক নির্ভেজাল রহস্য যা কেবল প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিরা অবগত, এবং যা পক্ষপাতদোষ, ভয় ও বিদ্বেষের দ্বারা পুষ্ট অন্ধ ধর্মীয় আবেগের উপর নির্ভর করতে পারত ।

১৪। দ্রঃ এম.এ জিন্না, পূর্বোক্ত এবং জেড এ. সুলেরি, 'মাই লীডার' (এছাড়া দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, ১০ মার্চ ১৯৪১-এ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন্নার বক্তৃতা : "পাকিস্তান কেবল এক বাস্তব লক্ষ্য নয়, যদি আপনারা এই দেশে ইসলামকে নির্মূল হওয়া থেকে বাঁচাতে চান, তবে একমাত্র লক্ষ্য" । ঐ, খণ্ড ১, পৃঃ ২৪৩ । সুলেরি ছিলেন আরো প্রকট : "কংগ্রেস হল হিন্দু ধর্মোপাসনার নাম, তা তারই জন্য কাজ করে", অথবা, "উত্তর খিলাফৎ যুগের মুসলমানরা ইসলামের অস্তিত্ব ঘুচিয়ে দিতে রাজি ছিলেন", বা, জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা ছিলেন, "ক্রয়যোগ্য পণ্য", বা জিন্না "তাঁর নিজ বাসভূমে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, বা জিন্না "ছিলেন আগ্রাসনের সম্মুখে ইসলামের অনড় চরিত্রের প্রতীক" ; গান্ধী ছিলেন "ইসলামের এক শত্রু" যেখানে জিন্না ছিলেন "ইসলামের জীবিত প্রধান স্থপতি" । পূর্বোক্ত, যথাক্রমে পৃঃ ৫৪, ৬২, ৭৪, ১৮৬, ১৯১ ।

১৫। দ্রঃ পিটার হার্ডি, 'দ্য মুসলিমস অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ২৩৮-৪২ ; ডব্লু. সি. স্মিথ, 'মডার্ন ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া', পৃঃ ২৯৮, ৩০০ ; কে. বি সঈদ, 'পাকিস্তান—দ্য ফর্মেটিভ ফেস', পৃঃ ১৯৮-২০৬, ২১১ ; মুশিরুল হক, 'মুসলিম পলিটিক্স ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া, ১৮৫৭-১৯৪৭' পৃঃ ১৪৮, অনিতা সিং, "নেহরু অ্যাণ্ড দ্য কমিউনাল প্রব্লেম ১৯৩৬-১৯৩৯", পৃঃ ৭০, আই এ. ট্যালবট, "দ্য ১৯৪৬ পাঞ্জাব ইলেকশনস্" ; আবিদ হুসেন, 'দ্য ডেস্টিনি অফ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্', পৃঃ ১১২-১৩। মুসলিমদের লীগকে ভোট দেবার জন্য ডাক দিয়ে লীগের প্রধানতম নেতা, জিন্না, বলেন : "আমরা যদি আজ আমাদের কর্তব্য বুঝতে ব্যর্থ হই তবে আপনারা শূদ্র স্তরে নেমে যাবেন এবং ইসলাম ভারতে পরাভূত হবে", পূর্বোক্ত, খণ্ড ২, পৃঃ ২৪০-৪১। অনুরূপভাবে ১৯৪৩-এর এপ্রিলে লীগ সভাপতির ভাষণে তিনি খান আবদুল গফফর খানকে বর্ণনা করেন "যোদ্ধা পাঠানদের নপুংসক করবার ও হিন্দুয়ানীর প্রভাবের ভারপ্রাপ্ত" বলে ; ঐ, পৃঃ ৪৮৯ । ১৯৪৭ থেকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটের কারণ আংশিকভাবে এই আন্দোলনের এবং তার মতাদর্শগত ভিত্তির উত্তরাধিকার। একদিকে, ইসলাম ও ইসলামিয় আইন পাকিস্তানের আইনী, সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রায় কোনো স্থান পায় নি। অন্যদিকে, রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানীদের হাতে যে তৈরী আন্দোলন ছিল তা হল ইসলামের জন্য অধিকতর ভূমিকাকে ঘিরে আন্দোলন, যার সফল বিরোধিতা করতে অসুবিধা হয়েছে আধুনিক রাজনৈতিক দল ও শাসকদের।

১৬। এম.এস গোলওয়ালকার, 'উই', ভি. ডি. সাভারকর, 'হিন্দুত্ব, হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন এবং হিন্দু সংগঠন', পৃঃ ২১৪, ২১৯, ইন্দ্রপ্রকাশ, এ রিভিউ··· ।

১৭। ডব্লু. সি স্মিথ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০০ ।

১৮। যখন আবেদন করতে হত কৃষকদের কাছে, তখন একথা বিশেষভাবে সত্য। পি. সি যোশী উল্লেখ করেছেন : "কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক মতপ্রকাশ অনেক সময়ে ঘটে প্রচলিত ধর্মবিরোধী ধর্মীয় মতের উত্থানের মাধ্যমে, ধর্মীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে তার দিশা পাল্টানোর মাধ্যমে। কৃষক দীর্ঘকাল আধুনিক সমস্যাকে সাড়া দিতে পারে অতীতের ভাষায়" । "মিথস্ : ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ ।"

১৯। কে.বি. কৃষ্ণ, 'দ্য প্রব্লেম অফ মাইনরিটিস্', পৃঃ ২৭৭, ২৯২ । তদুপরি, তিনি বলেন যে "এই বহিঃপ্রকাশ আবার নির্ভর করে যে শ্রেণী ও ব্যক্তিরা তাদের অভিজ্ঞতা ও চাহিদার সাধারণীকরণ করে তাদের উপর" । ঐ, পৃঃ ২৯২ ।

২০। দ্রঃ ১ম অধ্যায়, ৩য় অংশ ।

২১। যেমন, লুই ডুমোঁ লিখেছেন : "তার [সাম্প্রদায়িকতাবাদের] গঠনে যে ধর্মীয় উপাদান প্রবেশ করে তা যেন কেবল ধর্মের ছায়ামাত্র, অর্থাৎ ধর্মকে জীবনের সর্বক্ষেত্রের নির্যাস ও

পথপ্রদর্শক রূপে নেওয়া হয় না, বরং হয় কেবল একটি মানবগোষ্ঠীর, কার্যত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্যান্যদের সঙ্গে পার্থক্যের চিহ্ন রূপে"। "রিলিজিয়ন / পলিটিক্স অ্যাণ্ড হিস্ট্রি ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৯০-৯১। অনুরূপভাবে, জাতিভেদের আজ আর প্রায় কোনো আচার অনুষ্ঠানের দিক নেই, অনেক সময়েই জাতের বাছবিচারের নিষেধাজ্ঞাও অমান্য করা হয়।

২২। ইকতিদার আলম খান, "দি অরিজিন অ্যাণ্ড রাইস্ অফ মুসলিম অবস্কুর‍্যান্টিসম্"। এ ছাড়া দেখুন হুমায়ুন কবীর, 'মুসলিম পলিটিক্স ১৯০৬-৪৭ অ্যাণ্ড আদার এসেস্', পৃঃ ৪১।

২৩। কীথ ক্যালার্ড বলছেন: "[পাকিস্তানের দাবীতে] আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন যাঁরা তাঁদের প্রেক্ষাপট ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামীয় আইন নয়, বরং রাজনীতি ও সাধারণ আইন, দেওবন্দ নয় বরং কেম্ব্রিজ এবং ইনস্ অফ কোর্ট। মিঃ জিন্না ও তাঁর সেনানীরা, যথা লিয়াকৎ আলি, পাকিস্তান জয় করেছিলেন বহুলাংশে ধর্মের গুরুদের ভূমিকার বিরুদ্ধে। তাঁরা একটি ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট একটি রাষ্ট্র গড়ার জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন"। 'পাকিস্তান, এ পলিটিক্যাল স্টাডি', পৃঃ ২০০। এছাড়া দেখুন কে. বি সঈদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৮-৯৯। কংগ্রেস বিরোধী জামাত-ই-ইসলামির নেতা মৌলানা মৌদুদি এই সময়ে লেখেন: "লীগের কায়েদ-ই-আজম থেকে শুরু করে সবচেয়ে ছোটো নেতা, একজনও ছিলেন না যাঁকে ইসলামিয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বলা যায়।" কে বি সঈদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৮-এ উদ্ধৃত।

২৪। ডি. কীর, 'বীর সাভারকর', পৃঃ ২০১-০৭।

২৫। তাঁর 'হিন্দুত্ব' দ্রষ্টব্য। তিনি হিন্দুর সংজ্ঞা দেন ধর্মের ভিত্তিতে নয় বরং ভারতকে মাতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে বিশ্বাস করার ভিত্তিতে। তা করা হয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবে: "... আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উল্লেখ করা থেকে নিবৃত্ত থেকেছি, যা আমরা জাতিরূপে সাধারণভাবে বিশ্বাস করতে পারি। আমরা কোনো প্রতিষ্ঠান বা ঘটনা বা প্রথা সম্পর্কেও তার ধর্মীয় দিক বা তাৎপর্যের উল্লেখ করি নি। তার কারণ, আমরা 'হিন্দুত্বের' মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছি কোনো 'মতবাদ'-এর (যথা হিন্দুধর্ম) আলোকে নয়, বরং একটি জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে"। ঐ, পৃঃ ৮০। তিনি এ বিষয়েও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে 'হিন্দুত্বের' বা জাতীয়তার সংজ্ঞার জন্য হিন্দুধর্মের উপর ধর্ম হিসাবে নির্ভর করলে হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্ট হবে। ঐ, পৃঃ ৩-৪, ৬৪-৬৫। এ ছাড়া দেখুন ১৯৩৭-এ হিন্দু মহাসভায় তাঁর সভাপতির ভাষণ, 'হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন', পৃঃ ৮।

২৬। এম এস গোলওয়ালকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩-৬৪। এছাড়াও দ্রঃ, পৃঃ ২৬-৩১।

২৭। ভাই পরমানন্দ, 'হিন্দু সংগঠন', পৃঃ ৫-১১।

২৮। এস আনসারী, 'পাকিস্তান—দ্য প্রব্লেম অফ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ৬২-৬৪।

২৯। যেমন, গান্ধী ১৯৪২-এ বলেন: "ধর্ম একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ যার রাজনীতিতে কোনো স্থান পাওয়া উচিত নয়" এবং ১৯৪৭-এ: "ধর্ম প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব প্রসঙ্গ। তাকে রাজনীতি বা জাতীয় প্রসঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা যায় না।" এম.কে. গান্ধী, 'দি ওয়ে টু কম্যুনাল হারমোনি', পৃঃ ৩৯ ও ৩৯৮-এ উদ্ধৃত। অবশ্যই, তিনি যে হিন্দু ধর্মীয় বাক্‌রীতি ব্যবহার করতেন—সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই কম করে,—তা জনগণ, হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই, ভুল বুঝতে পারতেন এবং ভুল বুঝতেনও, যদিও ততটা নয়, যতটা বহু লেখক বিশ্বাস করেন।

৩০। ডব্লু. সি. স্মিথ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৩-৪।

৩১। জওহরলাল নেহরু, নি. রচ, খণ্ড ৩, পৃঃ ১।

৩২। দ্রঃ, উদাহরণস্বরূপ, এম.এস. গোলওয়ালকার, 'উই' পৃঃ ২৮ ; এফ কে খান দুরানী, 'দ্য মিনিং অফ পাকিস্তান', পৃঃ ৩৪-৩৫, ৩৭।

৩৩। জওহরলাল নেহরু, 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি', পৃঃ ১১৮।

৩৪। দ্রঃ, উদাহরণস্বরূপ, ভি. ডি সাভারকর, 'হিন্দুত্ব', পৃঃ ৮৫, ৮৮-৮৯, ১০২-০৬ ; এম এস. গোলওবালকার, 'উই', পৃঃ ১৯-৩০, ৪৮-৪৯ ; ভাই পরমানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫-১১।

৩৫। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের দুর্বলতায় দুর্বল ধর্মভাবের অবদানকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা স্বীকার করেছে এবং ১৯৩০ এর দশক থেকে তারা সচেতন ও বলিষ্ঠভাবে ধর্মভাব প্রসারে, বিশেষত শহুরে নিম্ন মধ্যশ্রেণীদের মধ্যে নেমেছে, এমনকি যদি তার ফলে নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগ করতে হয় তাহলেও—যেমন আর.এস.এস.-এর নেতাদের আর্যসমাজপন্থী অংশের দ্বারা ভাগবতী জাগরণের প্রতি সমর্থন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিন্দু মহাসভা অনুরূপভাবে চেষ্টা করেছিল নিয়মিত জমায়েত করে প্রার্থনা সংগঠিত করার। আর এস এস.-ও সচেতনভাবে ধর্মের ভূমিকাকে সম্প্রসারণ করে রাজনীতি ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রকে তার আওতায় আনতে চেয়েছিল।" দেখুন গোলওয়ালকার, 'উই', পৃঃ ২৭ ও তারপর।

৩৬। সর্ব-ইসলামবাদের (Pan-Islamism) একটি দিক সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধী ছিল। যদি মুসলিমরা একটি বিশ্ব সম্প্রদায় হয়, তবে স্পষ্টতই ভারতীয় মুসলিমদের ভারতে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বা রাষ্ট্র হওয়ার দরকার ছিল না, তাঁরা এক বিশ্বজোড়া সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারতেন—ভারত সহ। উপরন্তু, সেই বিশ্বজোড়া সম্প্রদায় তাহলে কোনো ধর্ম-নিরপেক্ষ কারণে নয়, কেবল ধর্মীয় কারণেই একটি সম্প্রদায় হতে পারত। সেক্ষেত্রে সর্ব-ইসলামবাদ জীবনের প্রতি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃঢ়তর করলেও ভারতে সাম্প্রদায়িক দিশাকে দুর্বল করত।

৩৭। ডেনজিল ইবেটসন, 'পাঞ্জাব কাস্টস', পৃঃ ১০-৪৪ (পাঞ্জাবের আদমসুমারী, ১৮৮১-র পৃঃ ১৭৮-৭৯ পুনর্মুদ্রিত)।

৩৮। এম.কে. গান্ধী, সং রচ, খণ্ড ৬৯, পৃঃ ২৮০।

৩৯। বেণীপ্রসাদ, 'দ্য হিন্দু-মুসলিম কোয়েশ্চনস', পৃঃ ২৫-২৬। ডেনজিল ইবেটসন ও তাঁর পূর্বোল্লিখিত গবেষণা প্রসঙ্গে এই দিকটির উল্লেখ করে লিখেছিলেন : "একই সময়ে, এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে না যে হিন্দু জাতগুলির কৃত্রিম নিয়ম, এবং যে উপজাতিক প্রথা হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই বেঁধে রাখে, তা অধুনা শিথিল হতে শুরু করেছে, এবং তা আবার হিন্দুদের চেয়ে মুসলিমদের মধ্যে অনেক দ্রুততর ঘটছে। আর এই প্রভেদ নিঃসন্দেহে ধর্মের পার্থক্যের দরুন। গত ৩০ বছরে পাঞ্জাবে এক বিরাট মুসলমান পুনরুত্থান ঘটেছে ; শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে, ও তার সঙ্গে ধর্মের নিয়ম সম্পর্কে বেশী যথাযথ জ্ঞান, এবং এখন দিনে দিনে যে প্রবণতা শক্তিশালী হচ্ছে তা হল অন্তর্বিবাহ হোক, উত্তরাধিকার হোক, বা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হোক, সমস্ত বিষয়ে উপজাতিক প্রথার স্থানে ইসলামের আইনকে বসানো। এই আন্দোলন এখন পর্যন্ত বস্তুগতভাবে প্রভাবিত করেছে কেবল উচ্চতর ও অধিকতর শিক্ষিত শ্রেণীদের ; কিন্তু তা যে ধীরে ধীরে সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে সে বিষয়ে সংশয়ের খুব কারণ নেই।" পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪।

৪০। আমরা শেষে উল্লেখ করতে পারি যে আমরা এখানে কেবল সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারবাদী ও পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনগুলির ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা

করেছি। তাদের অন্য ভূমিকা, যথা ঔপনিবেশিক কৃষ্টির আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষ্টিগত প্রতিরক্ষা, সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ক্রমাগত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির কলঙ্ক প্রচারের মুখে আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করা, এবং কৃষ্টিগত পরিচিতি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান ও তার জন্য সংগ্রাম ছিল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও, ধর্মভাব ও ধর্মীয় প্রভেদ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের এক রকম সম্পর্ক ছিল না। যেমন, ব্রাহ্ম সমাজ ছিল বেশী মিলনপন্থী। উপরের বক্তব্যের জন্য আমি কে. এন পানিক্করের কাছে ঋণী।

৪১। মুসলিম ও অ মুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীগুলি, এবং চিরাচরিত জমিদার-ভূস্বামী ধরণের উচ্চশ্রেণী, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ ছিল। অপর্ণা বসু, 'দ্য গ্রোথ অফ এডুকেশন অ্যাণ্ড পলিটিকাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, ১৮৮৯-১৯২০', পৃঃ ১৫২।

৪২। সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীতে, বাংলাদেশ ছাড়া কোথাও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে সরকারী বিভাগে চাকরীর ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার পরিমাণ খুব একটা বেশী ছিল না। পিটার হার্ডি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০-২৪, ফ্রান্সিস রবিনসন, 'সেপারিটসম্ অ্যামঙ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্', পৃঃ ৪৬।

৪৩। মুসলিমদের মধ্যে স্বাধীন পেশাদার, যথা আইনজীবী, ডাক্তার, সাংবাদিক ও আধুনিক স্কুল বা কলেজের শিক্ষকের সংখ্যা ছিল কম এবং জমিদার ও সরকারী কর্মচারী ও পেনশন ভোগীদের (যারা ব্রিটিশ ভারতে বা দেশীয় রাজ্যগুলিতে কাজ করেছিল বা করছিল) সংখ্যা ছিল বেশী।

৪৪। মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বিলম্ব ঘটানোতে তাদের সাফল্য দেখা যায় এই তথ্য থেকে যে ১৮৯০ সালে ও যুক্তপ্রদেশে স্কুলগামী মুসলিমদের প্রায় অর্ধেক (৪৭%) যেত বেসরকারী, প্রধানত ধর্মীয়, স্কুলে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এর তুলনীয় সংখ্যা ছিল ১৮%। এমনকি ১৯১০-এও দুটি সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬৬% ও ৭৪%। উপরন্তু, মুসলিমদের মধ্যে উচ্চতর পরম্পরাগত ধর্মীয় শিক্ষা প্রদায়ক নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ও বলশালী হয়ে ওঠে। ফ্রান্সিস রবিনসন, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩৯, ২৭৪।

৪৫। বস্তুত, আধুনিক গবেষণা দেখিয়েছে যে মুসলিমদের অনগ্রসরতা সংক্রান্ত তত্ত্বের এটাই একমাত্র সঠিক অংশ। যুক্তপ্রদেশে, যেখানে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী, সেখানে মুসলিমরা চাকরীর ক্ষেত্রে (উচ্চপদস্থ চাকরী সহ) পিছিয়ে ছিল না। দ্রঃ ফ্রান্সিস রবিনসন, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২২-২৩, ৩৮-৩৯, ৪৫-৪৬।

৪৬। দেখুন কে.এম. আশরাফ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৬১-৬২ : "যখন রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ণ অর্ধশতক পরে স্যর সৈয়দ আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করলেন, তখন মুসলিমদের সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়নের সংগ্রামকে সাহায্য করার পরিবর্তে মুসলিম মধ্যশ্রেণী ব্রিটিশ স্বার্থের সেবায় নিয়োজিত হাতিয়ারে পরিণত হয় ; এবং নতুন পর্বে মুসলিমরা নতুন, সুস্থ উপাদানসমূহের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অর্ধ শতাব্দী পরে মুসলিমদের মধ্যে একটি মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হল বটে ; কিন্তু এ ছিল বার্ধক্যের সন্তান, যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জায়গীরদারী অনুচরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বদলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চাকরী সংরক্ষণের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বড় হল। সে আমলাতান্ত্রিক উচ্চাশা ও আমলাতান্ত্রিক জীবনদর্শন গ্রহণ করল। আলিগড় আন্দোলনকে বম্বে, কলকাতা বা মাদ্রাজের শিক্ষাগত ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করলে প্রতিপদে পাওয়া যাবে নবাব ও জাগীরদারদের, যারা ব্রিটিশ শাসকদের ও সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্র ও ক্রীড়নক এবং যারা আলিগড়

শিক্ষা আন্দোলন এবং মুসলিমদের 'জাতীয়' রাজনীতি, দুটিকেই কুক্ষিগত করেছে।" এর একটি ফল হল "ভারত এবং এশিয়ার জাগরণের এই নতুন যুগে মুসলিমদের নেতা বলে পরিচিত হল সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস ঢাকার নবাব ও আগা খান"। উর্দু থেকে অনূদিত।

৪৭। হিন্দু এবং পার্শীদের প্রতিও সরকার বিকাশমান জাতীয়তাবাদী নেতাদের আত্মভূত করার নীতি অবলম্বন করেছিল। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে এই নীতি নেতৃত্বদায়ক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ আত্মভূত করতে বা বাতিল করে দিতে পারে নি।

৪৮। ডব্লু. সি স্মিথ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৮৭।

৪৯। এস আবিদ হুসেনের কথায়: "তাদের [মুসলিমদের] অজ্ঞতার এই অন্ধকার এতই নিশ্ছিদ্র ছিল যে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের আলো তাতে হারিয়ে যায়। স্যর সৈয়দ, জাতীয়তাবাদী উলামা এবং বদরুদ্দীন তৈয়াবজী যে আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকটিই নিজের মত করে সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিল ও কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্তু একটা জায়গায় পৌঁছে তারা দেখে যে তাদের রাস্তা বন্ধ. .।" পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫৩।

৫০। মুঘল যুগেই কঠোর নিয়মানুবর্তীতা প্রচারকারী এবং তার ভিত্তিতে দাঁড়ানো দুটি বড় প্রতিক্রিয়াশীল পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন দেখা গিয়েছিল—সপ্তদশ শতাব্দীতে শেখ আহমদ সিরহিন্দির এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাহ ওয়ালিউল্লাহের আন্দোলন।

৫১। এস. আবিদ হুসেন, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ৩১।

৫২। "আলিগড় কলেজে প্রতিদিনের কাজের প্রথম ঘণ্টা ছিল ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতার জন্য রাখা। এই বক্তৃতায় হাজিরা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মাবলী ছিল, কলেজের সাধারণ ক্লাসের কাজ সংক্রান্ত নিয়মের মত কড়া। সমস্ত মুসলিম ছাত্রকে দিনে ৫ বার উপাসনা করতে হত। উপাসনায় অনুপস্থিত থাকলে শাস্তিস্বরূপ জরিমানা করা হত। বিশেষ কারণ না থাকলে রমজানে উপবাস ছিল বাধ্যতামূলক।" এইচ. মালিক, 'মুসলিম ন্যাশনালিসম ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান', পৃঃ ২১৫।

৫৩। আলিগড়ের এক প্রাক্তন ছাত্র, এস রশিরুদ্দিনের বক্তব্য হল, যাঁরা আলিগড় কলেজ এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করতেন "তাঁরা বহু প্রজন্ম ধরে এমন এক ধরণের যুবক সৃষ্টি করেন যাদের কোনো রকম রাজনৈতিক ধারণা ছিল না এবং যাদের ইসলাম সম্পর্কে মনের গভীরে গাঁথা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা।" "প্যান-ইসলামিসম্ ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স অ্যাণ্ড দ্য খিলাফৎ অ্যাজিটেশন"।

৫৪। যেমন, মোপলা কৃষকদের হিন্দু ভূস্বামী বিরোধী শ্রেণী সংগ্রামকে ও তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবকে সহজেই সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত করা গিয়েছিল তাদের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা, নিরক্ষরতা ও তীব্র ধর্মভাবের দরুন।

৫৫। যে ব্যাপক বিশ্বাস রয়েছে যে ১৯৪৭-এর আগের শিক্ষা ব্যবস্থা আজকের দিনের চেয়ে উন্নত ছিল, তা কাল্পনিক চিন্তা ছাড়া কিছুই নয়। তা হয়ত যারা ঐ শিক্ষা পেত তাদের ভাল ইংরেজী লিখতে শেখাত, কিন্তু তার বুদ্ধিবৃত্তিগত অন্তর্বস্তু ছিল নেহাতই অগভীর। ঔপনিবেশিক যুগে ইতিবাচক সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জোয়ার এসেছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে জাতীযতাবাদী আন্দোলন এবং শিক্ষাগত বহির্ভূত জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে। আজ সাম্প্রদায়িক শক্তিরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে যাতে শিক্ষার মানের উৎকর্ষ না ঘটে। জনবাদী পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা স্কুল ও কলেজের পাঠক্রমকে প্রাক্-১৯৪৭ স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

৫৬। অন্ধকারে ছুরি চালিয়ে নিরীহ ব্যক্তিদের হত্যা করা বা অনেক বেশী সংখ্যক উন্মত্ত জনতা

কম সংখ্যক ব্যক্তিকে হত্যা করার চেয়ে বেশী অনৈতিক ও কাপুরুষোচিত কাজ কিছুই হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড প্রায় কখনোই কমবেশী সমসংখ্যক জনতা বা "স্বেচ্ছাসেবকদের" মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ নেয়।

৫৭। বা. কে বি. কৃষ্ণ যেমন বলেছেন: "পরম্পরাগত নৈতিক অনুশাসন এবং বাস্তব চাহিদার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব একটি শ্রেণীকে উৎপাদন করেছে, যে এক ক্ষীয়মান শ্রেণী, যার সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি মৃত, যার কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থ ই সবকিছু, যারা রাজনৈতিক যাজকদের ভাড়াটেতে পরিণত হয়েছে। এই দুর্বল শ্রেণীগুলি যারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করে চুপিসাড়ে, যারা অন্ধকারে নৈতিক অনুশাসনকে অবহেলা করে···। এই দুর্বল পতনোন্মুখ শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য হল নিজেদের স্বার্থের জন্য প্রকাশ্যে ধর্মপালন করা, বুকে হাঁটা, এবং অন্ধকারে তাকে অবহেলা করা—অন্য কোনো প্রয়োজনে।" পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৮৪।

৫৮। বিশেষত, একজন গোঁড়া হিন্দুর কাছে একজন মুসলিম ছিল ম্লেচ্ছ, আর একজন গোঁড়া মুসলিমের কাছে একজন হিন্দু ছিল কাফের।

৫৯। এমনকি উঁচুজাতের হিন্দুরাও একে অপরের বিরুদ্ধে নানা নিষেধাজ্ঞা পালন করত। একজন ব্রাহ্মণ পাচক তার রাজপুত বা বানিয়া বা ক্ষত্রী মালিকের বিরুদ্ধে খাদ্য সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা পালন করত। মুসলিম উচ্চ শ্রেণীগুলিও 'জাতিগত' ও সামাজিক প্রভেদের দ্বারা কম বিভক্ত ছিল না, শুধু তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা অনেক কম নগ্ন ও চরম রূপ নিত। উপরন্তু, অনেক সময়ে জাতপাতের নিষেধাজ্ঞাও, অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে ছাড়া, প্রভেদ, অবমাননা ও সামাজিক নিপীড়নের প্রতীক ছিল না। এ বিষয়ে দেখুন বি সি পাল, 'মেমোরিস্ অফ মাই লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস', খণ্ড ১, পৃঃ ১০৬-০৮।

৬০। এক কে খান দুররানী, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৩। অনুরূপভাবে, বেণীপ্রসাদ মধ্যযুগ সম্পর্কে যা বলেছেন তা সাধারণভাবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারত সম্পর্কেও প্রযোজ্য: "জাত ও ধর্ম অন্তর্বিবাহ নিষেধ করেছিল, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ছিল --কৃষক, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী, কারিগর ও শ্রমিক, সৈনিক, রাজকর্মচারী, ইত্যাদি। একটি শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের, গ্রামে হোক আর শহরে হোক, বেশভূষা, আবাসন, আদবকায়দা ও ব্যবহারে কাযত কোনো প্রভেদ করা যেত না। মেয়েদের অবস্থা, বিয়ের বয়স এমন কি কিছু কিছু বৈবাহিক আচার এক একটি শ্রেণীর মধ্যে একই রকম ও তার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হত। হিন্দু ও মুসলমানরা যে একে অপরের উৎসবে যোগ দেবে, তা ছিল স্বাভাবিক। একটা প্রশস্ত অর্থ নৈতিক স্বার্থের ঐক্য শ্রেণীকে একত্রে ধরে রাখত ও ধর্মীয় প্রভেদকে খণ্ডিত করত। এ সবের পিছনে ছিল হিন্দু ও মুসলিম নৈতিকতার মানদণ্ডের সাদৃশ্য।" এবং, "চিত্রাঙ্কন, যা একটি জনগণের আত্মিক অভিব্যক্তির আরেকটি পন্থা, তা ষোড়শ শতাব্দী থেকে হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীদের হাতে সাধারণ থাকায় বিকশিত হতে থাকে এবং প্রকৃতই ভারতীয় রূপ নেয়। সঙ্গীত ও নৃত্যের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে উভয়ের সাধারণ পদ্ধতিতে পরিণত হয় ও তাই থেকে গেছে।" পূর্বোল্লিখিত, যথাক্রমে পৃঃ ১২-১৩ ও পৃঃ ১১।

৬১। বি. সি. পাল, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ১০৯-১০। মহরম সংক্রান্ত উক্তির জন্য দেখুন পৃঃ ৮৮-৯২।

৬২। 'অ্যান ইকনমিক সার্ভে অফ নাগ্‌গাল', পৃঃ ২।

৬৩। রাজেন্দ্রপ্রসাদ: 'অটোবায়োগ্রাফি', পৃঃ ১৩-১৪। এছাড়া দেখুন শিবলি নোমানি—উদ্ধৃত কে. বি. সঈদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩৬-৩৭; এম. এল. ডার্লিং, 'রাস্টিকাস লোকুইটর', পৃঃ ২২, ৪২, ৬২-৬৩, ৭৪, ১৩৭, ২৮৮-৮৯।

৬৪। এইচ. এন. সিন্‌হা, 'রাইজ অফ দ্য পেশওয়াস্', পৃঃ ১২-১৩।

৬৫। পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য।

৬৬। অনুরূপভাবে, বিদেশী পণ্ডিত যাঁরা সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা ভ্রান্ত-ভাবে এই সামাজিক সমস্যাটিকে দেখেন তাঁদের নিজেদের সমাজের শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষ বা ইহুদী বিদ্বেষের প্রেক্ষাপটে।

৬৭। উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশের মুসলিম জমিদার ও অন্যান্য উচ্চস্তরের মুসলিমরা মুসলিম কৃষকের প্রতি প্রায় সমান অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করত। হিন্দু জমিদারদের প্রতি তুলনায়, তারা কৃষকের সঙ্গে এক ভাষারও ভাগীদার ছিল না। তারা বাংলার পরিবর্তে উর্দু ব্যবহার করে গর্ববোধ করত। কামরুদ্দীন আহমদ, 'এ স্যোসাল হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', পৃঃ ১২-১৩।

৬৮। এম. এন. ইসলাম, 'বেঙ্গল মুসলিম পাব্‌লিক ওপিনিয়ন অ্যাস্ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য বেঙ্গলী প্রেস ১৯০১-১৯৩০', পৃঃ ১১১।

৬৯। ঐ, পৃঃ ১১৫।

৭০। ঐ, পৃঃ ১২১।

৭১। জিন্না, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ১৬০। এ ছাড়া দেখুন ঐ, পৃঃ ২১৭, ২৩০ ; সি ম্যান-শারড 'দ্য হিন্দু-মুসলিম প্রব্লেম ইন ইণ্ডিয়া', পৃঃ ৩৭-৩৮।

৭২। এস আনসারী, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৭। এ ছাড়া দেখুন আফজল হকের উক্তির জন্য এ মেহতা ও এ, পটবর্ধন, 'দ্য কমিউনাল ট্রায়াঙ্গল ইন ইণ্ডিয়া', পৃঃ ১৮২।

৭৩। এইচ কবীর, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩০।

৭৪। এম কে গান্ধী, সং. রচ., খণ্ড ১২, পৃঃ ৭৭। এর সঙ্গে আজকের পাঞ্জাবের একটা সমা-ন্তরাল প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যায়। বহুকাল পর্যন্ত শিখরা তাদের নিয়ে রসিকতায় কিছু মনে করত না। কিন্তু একবার হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদ একে অপরের প্রতি বৈরভাবে বিকশিত হওয়ার পর সেগুলিকে দেখা হয় শিখ-বিরোধী বলে, এবং সেই রসি-কতা এখন করলে অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতাবাদ বলিষ্ঠতর হয়। বিস্ময়ের কথা, আগে যেমন খাদ্য ও পানীয় সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা, তেমন বর্তমানে এই সব রসিকতা ছড়ানোর বিরুদ্ধে ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তিগুলি খুব কম কাজই করছে।

৭৫। যেমন দেখুন জি আর থার্সবি, 'হিন্দু-মুসলিম রিলেশনস ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ১৩৪-তে শ্রদ্ধানন্দের এবং ১৩২-তে মালব্যর উক্তি ; ইন্দ্রপ্রকাশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ xiii-xxi-তে ভাই পরমানন্দ কর্তৃক লাজপত রায় উদ্ধৃত ; ভি ডি সাভারকর, 'হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন', পৃঃ ১৩৪-৩৫ ; শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, 'অ্যাওয়েক হিন্দুস্থান', পৃঃ ৮৩-৮৪। অন্য সময়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একই যুক্তির অবতারণা করতেন, যথা জাইদি, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ২০০-এ জিন্নার উদ্ধৃতি।

৭৬। যেমন দেখুন এফ. কে খান দুররানী, পৃঃ ১৯৬-৯৭, ১৯৮।

৭৭। শশধর সিংহ, 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইন পার্সপেক্‌টিভ', পৃঃ ৭২-এ উদ্ধৃত।

৭৮। প্রভা দীক্ষিত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ viii, ৯।

৭৯। ঐ, পৃঃ ১৩৮-৩৯।

৮০। ১৯৪৭-এর পর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান প্রসঙ্গে দীক্ষিতের ব্যাখ্যা একই রকম। তা হল মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিশেষ অধিকারের দাবী, ইত্যাদি। ঐ, পৃঃ ২১৬-১৭।

৮১। মুশিরুল হাসান, "কমিউনাল অ্যাণ্ড রিভাইভ্যালিস্ট ট্রেণ্ডস ইন কংগ্রেস", পৃঃ ২১০-১২। প্রভা দীক্ষিত ও মুশিরুল হাসান উভয়েই সম্ভবত মনোগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, এবং তাঁরা মনে করছেন যে, তাঁরা যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসঙ্গে গবেষণা করছেন তার বিপরীত-

টিই আদি সাম্প্রদায়িকতাবাদ, তার উৎস হল সাম্প্রদায়িকতাবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বা উপলব্ধি করতে তাঁদের ব্যর্থতা। খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক লেখকরা এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই আরো প্রকটভাবে এগিয়ে দেন।

৮২। এ. মেহতা ও এ. পট্টবর্ধন, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৮১।

৮৩। ভি ডি. সাভারকর, হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন পৃঃ ২১, ২৬, ৬৪, ১০১ ; এম এ. জিন্না, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ১১৬-১৭। এছাড়া দেখুন এম.এস. গোলওয়ালকার, 'উই', পৃঃ ৪২, ৬২ (পাদটীকা)। দ্বিজাতি তত্ত্বের আরেকটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক রূপ ছিল যে ভারতে একমাত্র জাতি হিন্দুরা, মুসলিম ও অন্যান্যরা বিদেশী।

৭

ইতিহাসের ব্যবহার

সাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে, এবং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের একটি মৌলিক অঙ্গ এবং ঐ মতাদর্শ কর্তৃক সৃষ্ট বস্তু হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল ভারতীয় ইতিহাসের, বিশেষত তার প্রাচীন ও মধ্যযুগের একটি সাম্প্রদায়িক এবং বিকৃত অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুত, ইহা অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয় যে ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রধান মতাদর্শ, এবং তা না থাকলে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের খুব কম অবশিষ্ট থাকবে। একথা বিশেষভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্য সত্য।[১] 'ইতিহাস' ব্যবহারে ভীতির অনুভূতি বা মানসিকতা সৃষ্টি করার জন্য মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু অনুভূতির উপর অনেক বেশী নির্ভর করত। বর্তমানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পক্ষে তা কার্যকরীভাবে করা প্রায় সম্ভব ছিল না। সুতরাং তারা ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ভর করত অতীতের উপর। অনুরূপভাবে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীরূপে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র ও বিশেষ অবস্থান দাবী করত ভারতীয় ইতিহাসে তাদের অবস্থার ভিত্তিতে। উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদই ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকে ব্যবহার করেছিল ভীতি, ক্রোধ, পক্ষপাতিত্ব এবং ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য।

সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বৃহত্তর অংশ ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর, বিশেষত হিন্দু ও মুসলিমদের গতানুগতিক ছক এবং মিথ, প্রতীক ও লোককাহিনী সৃষ্টি করা। অনেক সময়ে সমান্তরালভাবে এগুলি সৃষ্টি ও প্রচার করার জন্য নানাস্তরে ইতিহাস শিক্ষাকে ব্যবহার করা হত। এইভাবে হিন্দুদের মুসলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হত ও প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্প্রদায়িকতাবাদ দুটিকে শক্তিশালী করা হত। একটি

বিশেষ সাম্প্রদায়িকতাবাদের পক্ষে উপযোগী অতীতের ব্যাখ্যাই আবার ব্যবহৃত হত ঐ সাম্প্রদায়িকতাবাদের স্থায্যতা বা বুদ্ধিগত যাথার্থ্য প্রমাণের জন্ম।

বিশেষ করে, হিন্দুরা যে একটি নির্দিষ্ট জাতি এবং তাদের যে একটি সাধারণ কৃষ্টি রয়েছে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের এই মৌলিক ধারণা নির্ভর করত ইতিহাসের বিশেষ ব্যাখ্যার উপর।[২]

স্কুলে ও কলেজে ভারতীয় ইতিহাস শেখানো সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশে এক প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। পুরুষপরম্পরা, প্রায় আধুনিক স্কুল ব্যবস্থার জন্মলগ্ন থেকে, নানা স্তরে বিভিন্ন মাত্রার তীব্রতা সহকারে ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্যাখ্যা প্রচার করা হয়েছে। এ কাজ প্রথমে করেছেন সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা, ও পরে অন্তরা। ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এত গভীর এবং বিস্তৃতভাবে ঢুকে গিয়েছিল যে বহু দৃঢ়চেতা জাতীয়তাবাদীও, যতটা অসচেতনভাবেই হোক না কেন, ঐ দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলি মৌলিক অঙ্গকে ভারতীয় ইতিহাসের মৌলিক 'সত্য' বলে মনে করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মধ্যে যে হিন্দুত্বের সংশ্লেষ থেকে গিয়েছিল, এবং যার প্রতি মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের গভীর আপত্তি ছিল, তার গঠনের পিছনে ছিল উপরোক্ত 'সত্য' সমূহ। এই প্রভাব এতটাই থেকে গেছে, যে তার ফলাফল নাকচ করার জন্ম ইতিহাস প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিপ্লবের, এবং সম্ভবত সমাজে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সমসাময়িক অনেকেই সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিস্তারের ক্ষেত্রে ইতিহাস শিক্ষা এবং ব্যাখ্যার ভূমিকা স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গান্ধী লিখেছিলেন: "যতদিন স্কুলে ও কলেজে পাঠ্যপুস্তক মারফৎ ইতিহাসের অতিমাত্রায় বিকৃত ভাষ্য শেখানো হচ্ছে, ততদিন আমাদের দেশে স্থায়ীভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।"[৩]

লাজপত রাই নিজের বাল্যকাল সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন: "সে সময়ে সরকারী স্কুলগুলিতে **ওয়াকিয়াত-ই-হিন্দ** নামে ভারতের ইতিহাসের উপর একটি বই পড়ান হত। বইটি আমার মনে এই বোধের জন্ম দেয় যে মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি গভীর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আচরণ করেছিল। বাল্যকালে ইসলামের প্রতি যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলাম, **ওয়াকিয়াত-ই-হিন্দ** পাঠের ফলে ধীরে ধীরে তা ঘৃণায় পরিণত হতে থাকে।"[৪]

১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারীতে **কমরেড** পত্রিকায় মহম্মদ আলী লেখেন:

"জাতিগত বৈরীতার তীব্রতার কারণ প্রধাণত ইতিহাসের মিথ্যা পাঠ। অতীত তার মৃত হাত ছুঁড়ে দিয়েছে বর্তমানকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে রাখার জন্ম। ভারতীয় ইতিহাসের বিগত দিনগুলিতে মুসলিম রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে হিন্দু "দেশপ্রেমিকদের" মূঢ় কিন্তু যথেষ্ট বাস্তব ক্ষোভ, এবং

আরেক দিকে হারিয়ে যাওয়া ক্ষমতা, মর্যাদা ও সাম্রাজ্যের জন্য মুসলিমদের সমপরিমাণে নির্বোধ অথচ শক্তিশালী অনুভূতি, রাজনীতির বাস্তব প্রসঙ্গকে নাড়া দেয়।"[৫]

১৯৩২ সালে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত কানপুর রায়টস্ এন্‌কোয়্যারি কমিটির রিপোর্টের মুখবন্ধে বলা হয় যে স্কুলের ও অন্যান্য ইতিহাস বইয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসের যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়, তা "সম্প্রদায় দুটিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে"। রিপোর্টে আরো বলা হয়:

"জনগণ অতীতকে আরো সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে শুরু না করলে, আমরা মনে করি পারস্পরিক আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বর্তমান প্রভেদগুলির বাস্তব ও স্থায়ী সমাধানে উপনীত হওয়া কঠিন, বা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমরা মনে করি, হিন্দু-মুসলিম সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পথে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য পদক্ষেপ হল ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিগুলি অপসারণের চেষ্টা।"[৬]

কবিতা, নাটক, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ছোটগল্প, সংবাদপত্র ও জনপ্রিয় পত্রিকা, পুস্তিকা, বই এবং সবচেয়ে বেশী, মৌখিকভাবে, প্রকাশ্য মঞ্চে বক্তৃতা, ক্লাসে এবং ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ইতিহাস-ব্যাখ্যা পাঠ্যপুস্তকের চেয়েও বেশী ব্যাপকভাবে প্রচারিত হত। তদুপরি, এই স্তরে,—জনপ্রিয় ইতিহাসের স্তরে,—সাম্প্রদায়িক অন্তর্বস্তু ছিল অনেক তীব্র এবং অনেক বেশী আষাঢ়ে। তার ফলাফলও ছিল অনেক ক্রূর, এবং তা খণ্ডন করা অনেক দুরূহ। তবু, জনমানসে তা-ই ছিল ইতিহাস, 'পরিচিত' তথ্যের সংগঠিত বিন্যাস। সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের এই ক্রূর ভাষ্য কার্যত পৌরাণিক কাহিনীর মত প্রচারিত হত। ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও এগুলি কদাচিৎ লিপিবদ্ধ, এবং এই জন্য নথিভুক্ত করা দুরূহ। কিন্তু এ সবের বিষয়বস্তু কিছুটা আন্দাজ করা যায় ভি. ডি. সাভারকার, এম. এস. গোলওয়ালকার, জেড. এ. সুলেরি, এফ. কে. খান দুরাণী, এবং সমধর্মী অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনৈতিক লেখক ও নেতাদের বক্তৃতা ও রচনা থেকে। এম. এ. জিন্নার শেষ পর্বের কিছু বক্তৃতাও এই গোষ্ঠীভুক্ত।

ইতিহাসকে এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্যাখ্যার আরও কয়েকটি দিক লক্ষ্য করা যেতে পারে। ১৯৪৭-এর আগে গবেষণা বা পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডিত্যের স্তরে সমস্ত উপাদানের সাহায্যে পূর্ণরূপে গঠিত ও প্রায়শ সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন খুব কমই দেখা যেত, কারণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের মতাদর্শের আধিপত্য। ১৯৪৭-এর পর ভারত ও পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য ও প্রকাশ্য বুদ্ধিজীবী-অনুগামী লাভ করে।[৭] ফলে উচ্চশিক্ষার ও গবেষণার স্তরে, অর্থাৎ স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ ও ডক্টরেট স্তরে, প্রশিক্ষণ ও গবে-

যণা খুব কম সময়েই খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক হত। কিন্তু তার ফলে এই স্তরে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ইতিহাস দর্শন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হত এমন নয়, কারণ স্নাতকোত্তর স্তরে যে ছাত্র পৌছত, তার মন ইতিমধ্যেই পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েছিল।

ক্লাসঘরের ইতিহাস শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতাবাদী হওয়ার একটা ফল হয়েছিল যে, শিক্ষাবিস্তারের অর্থ দাঁড়িয়ে গেল সাম্প্রদায়িকতা বিস্তার, বিশেষত দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক ও সনাতন ধর্ম্ম, ইসলামিক, শিখ, ইত্যাদি ধর্মীয় স্কুল ও কলেজ-গুলিতে।

বাল্যকাল থেকে সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিতির ফলে জাতীয়তাবাদীরাও অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেন। ব্যাপক সংখ্যক কংগ্রেস নেতা ও সদস্য, যতটা সচেতনভাবে এবং ফলাফল সম্বন্ধে যত অজ্ঞভাবেই হোক না কেন, এই উপাদানগুলি আত্মস্থ করেন এবং খোলাখুলি-ভাবে তা প্রচার করেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা খুব স্বচ্ছন্দে বলতেন যে ভারত হাজার বছর ধরে বিদেশী শাসনে ভুগেছে, এবং 'মুসলিম শাসনে' ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির তীব্র অধঃপতন ঘটেছে। বাস্তবে, যে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, তাঁর নিজের ইতিহাস দর্শনের কতটা 'প্রতিষ্ঠিত' বা 'প্রমাণিত' তথ্য বা ঐতিহাসিক সত্যরূপে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা আত্মস্থ করে গঠিত।

হিন্দু ও মুসলিম, এই দুটি সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর বিরোধী ও বৈরীতাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করলেও মৌলিকভাবে একই ঐতিহাসিক কাঠামো, প্রাথমিক ভিত্তি ও ধারণাসমূহ ব্যবহার করত। অনেক সময়ে শুধু তফাৎ, অন্য 'সম্প্রদায়টি' খল নায়ক।

তাছাড়া, আগেই ইংরেজ ঐতিহাসিক, প্রশাসক ও লেখকরা যে ব্যাখ্যা ও সাধারণীকরণগুলি রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি অনেক সময়েই, উভয় সাম্প্রদায়ি-কতাবাদী ব্যাখ্যা ও সাধারণীকরণের ভিত্তি হত।[৮] ঐ ঐতিহাসিক প্রমুখও সব সময়ে নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁরা অনেকে, অনেক সময়ে, ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ব্যতীত অন্য চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্রথমত, তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয় জনগণকে চিরকাল নিষ্ঠুর প্রজাপীড়নকারী শাসনকর্তা ও অনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারীরা শাসন করেছে। সুতরাং ব্রিটিশ শাসন যদি স্বৈরতান্ত্রিক বা স্বেচ্ছাচারী হয় তবে তাতে অন্যায় কিছু নেই; বরং তা প্রজাহিতৈষী, ন্যায়-পরায়ণ এবং আইনের শাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তদুপরি, মুসলিমরাও ব্রিটিশদেরই মত বিদেশী ছিল; সুতরাং ব্রিটিশরা ভারতে বিদেশী শাসনের সূচনা করেনি, বরং একটি বর্বর ও অমানবিক বিদেশী শাসনের পরিবর্তে একটি মানবিক ও সুসভ্য বিদেশী শাসন এনেছে। দ্বিতীয়ত, তাঁরা দেখাতে চেয়ে-

ছিলেন যে হিন্দুরা অত্যন্ত নৃশংস ও ভয়াবহভাবে মুসলমানদের দ্বারা শোষিত পদদলিত ও অত্যাচরিত হয়েছিল। ইংরেজরা কার্যত তাদের 'মুক্ত' করেছিল। যেহেতু হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনে অনেক সুখে আছে, তাই তাদের ব্রিটিশদের প্রতি ঋণগ্রস্ত বোধ করা উচিত এবং ব্রিটিশদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা উচিত। তৃতীয়ত, তাঁরা দৃঢ়ভাবে দাবী করতে চেয়েছিলেন যে হিন্দু ও মুসলিমরা চিরকাল বিভক্ত ছিল এবং পরস্পরের রক্তের জন্য উৎসুক ছিল, তাই একটি তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ বৃটিশ পক্ষ, না থাকলে তারা পরস্পর শান্তিতে বাস করতে পারত না। মধ্যযুগীয় ভারতের প্রধান ইংরেজ ইতিহাসবিদ্ এইচ. এম. এলিয়ট তাঁর "দ্য হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া অ্যাস্ টোল্ড বাই ইটস্ ওন হিস্টোরিয়ানস্" এর "আদি মুখবন্ধে" ১৮৪৯ সালে লেখেন যে "এই একটিমাত্র খণ্ডের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেও আমরা মুসলিমদের সঙ্গে বিবাদ করার জন্য হিন্দুদের হত্যা করা, শোভাযাত্রা, প্রার্থনা ও শুদ্ধিকরণের উপর সাধারণ নিষেধাজ্ঞা জারী করা, এবং অন্যান্য অসহিষ্ণু পদক্ষেপ, মূর্তির অঙ্গচ্ছেদ করা, মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়া, বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তকরণ ও বিবাহ, নিষিদ্ধকরণ ও বাজেয়াপ্তকরণ, হত্যা ও গণহত্যা, এবং যে স্বৈরাচারীরা তা করত তাদের ভোগবাসনা চরিতার্থকরণ ও মত্ততার ছবি দেখতে পাই"। তিনি এই ইতিহাস কেন প্রকাশ করছেন, তাও স্পষ্টভাবে বলে দেন। তার কারণ ছিল, যেন এর ফলে "আমাদের শাসনের মৃদুতা ও সাম্যের ফলে আমাদের দেশীয় প্রজারা কত বিশাল সুবিধা পাচ্ছে সে বিষয়ে তাদের সচেতন করে তোলা যায়", এবং উদীয়মান জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা, বা তাঁর ভাষায় "বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাবুবৃন্দ" যেন প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের বাস্তব চিত্র দেখতে পায় এবং তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাদের যে সমালোচনা সদ্য দেখা দিচ্ছিল তা বন্ধ করে দেয়।[৯]

সাম্প্রদায়িকতাবাদীর হাতে অতীতের পর্যালোচনা অনেক সময়েই হত রূপকধর্মী। ধরে নেওয়া হত, বা আকারে ইঙ্গিতে বোঝানো হত, যে তখন যা ঘটেছিল এখনও তাই ঘটতে বাধ্য। সুতরাং, সমকালীন সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতিকে অতীতে প্রক্ষেপ করা হত এবং অতীতের ঘটনাবলীকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হত ও এমন ঐতিহাসিক মিথ্ সৃষ্টি করা হত যা বর্তমানের সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির স্বার্থ সিদ্ধি করবে, তাকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করবে। সুতরাং উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদই অতীতের এমন এক ব্যাখ্যা গ্রহণ করে যার মাধ্যমে বর্তমানকালে উক্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদের অনুগামীদের মধ্যে ভীতি, অনিশ্চয়তা এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলা যায়। এই অর্থে, সাম্প্রদায়িক ইতিহাস যেমন সাম্প্রদায়িকতাবাদ সৃষ্টি ও প্রচার করেছিল, তেমনি, সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতি আবার সাম্প্রদায়িক ইতিহাস রচনা, প্রশিক্ষণ এবং ঐতিহাসিক মিথ্ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে মদৎ দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ের কথা লক্ষ্যণীয় যে

মধ্যযুগের মানুষ যেভাবে সেযুগের ইতিহাসে ছিলেন, বা মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যেটা, তা সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্ম দেয় নি। মধ্যযুগে কি হয়েছিল তার সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্যাখ্যা সাম্প্রদায়িকতাবাদের সৃষ্টি করেছিল এবং তা স্বয়ং ছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদ সৃষ্ট। এই ব্যাখ্যা স্বয়ং ছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদী মতাদর্শ।[১০]

অনেক সময়ে, ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর উপাদান ও বিষয়বস্তু, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার প্রথার মধ্যে, হিন্দু বা মুসলিম-সংশ্লেষ হিসেবে দেখা যেত। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদ সেগুলিকে বাড়িয়ে দেখাত, বিকৃত করত, তাদের সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং মতাদর্শগত মর্মবস্তু পাল্টে দিত এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজে লাগাত। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এই সহজ সাফল্যের আংশিক কারণ ছিল অবশ্যই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক প্রথার দিক থেকে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উচ্চমান পূর্ণাঙ্গভাবে বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়া।

১. ভারতের ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক উপাদানসমূহ

সাম্প্রদায়িকতাবাদীর চোখে মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস হল হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের এক দীর্ঘ কাহিনী। হিন্দুরা এবং মুসলিমরা স্থায়ীভাবে স্বতন্ত্র শিবিরে বিভক্ত ছিল, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তিক্ত, সন্দিগ্ধ, এবং বৈরীতাপূর্ণ। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে স্বতন্ত্র এবং স্বকীয় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। মুসলিমরা একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্প্রদায় হওয়ার কারণ ছিল ইসলাম; এবং সেই জন্যই মুসলিমদের পক্ষে সাংস্কৃতিকভাবে অঙ্গীভূত হওয়া অসম্ভব ছিল। কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৪০-এর মার্চে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে জিন্না বলেছিলেন: "গত ১২ শত বছরের ইতিহাস ঐক্যসাধনে ব্যর্থ হয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে দেখেছে যে ভারত চিরকালই হিন্দু ভারত এবং মুসলিম ভারতে বিভক্ত হয়েছিল।"[১১] ভি.ডি. সাভারকার অনেক বেশী হিংস্র ছিলেন। ১৯২৩ সালে লেখা 'হিন্দুত্ব' বইটিতে তিনি দাবী করেন "যেদিন মুহম্মদ গজনী সিন্ধুনদ পার হয়েছিলেন ··সেই দিন জীবন মরণের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল", এবং তা "শেষ হয়েছিল—বলা যায় কি, আবদালীর সঙ্গে?" তিনি এর সঙ্গে যোগ করেন: "দিনের পর দিন, দশকের পর দশক, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই বীভৎস সংঘাত চলতে থাকে···।" এই সংঘাতে গোষ্ঠী, অঞ্চল ও জাত নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুরা "সকলে হিন্দু হিসেবে যন্ত্রণাভোগ করেন, হিন্দু হিসেবে বিজয়ী হন"। সমস্ত মুসলিমরা ছিলেন শত্রু, এবং "শত্রুরা আমাদের হিন্দু হিসেবে ঘৃণা করত।" "শত যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করা হচ্ছিল" একটিমাত্র প্রসঙ্গে—হিন্দুত্ব এবং হিন্দুদের সাংস্কৃতিক ঐক্য।[১২]

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে এই যে সংগ্রাম বা শত্রুতা, তা "স্বাভাবিকভাবে" উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে চলে আসে এবং সমসাময়িক সাম্প্রদায়িক বৈরীতার কারণ বা ভিত্তি এবং ন্যায়সঙ্গতা, উভয় ভূমিকাই পালন করে। এই ভিত্তিতেই হিন্দুদের 'সুপ্রাচীন শত্রু' বলে আর.এস.এস. মুসলিমদেব চিহ্নিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৯ সালে এম. এস. গোলওয়ালকার জাতীয়তাবাদীদের নিন্দা করেন কারণ তাঁরা সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছিলেন যার মাধ্যমে হিন্দুরা "আমাদের সুপ্রাচীন আক্রমণকারী ও শত্রুদের সঙ্গে একত্রিত হতে থাকে এক বিজাতীয় নামের আড়ালে, যা হল—ভারতীয়"। তিনি যোগ করেন:

> "এই বিষের পরিণতি অতীব পরিচিত। আমরা নিজেদের ঠকাতে দিয়েছি এবং বিশ্বাস করেছি যে আমাদের শত্রুরা আমাদের বন্ধু, এবং আমাদের নিজেদের হাতে আমাদের প্রকৃত জাতিত্বের ভিত্তি ধ্বংস করছি। **এটাই আজকের দিনের প্রকৃত বিপদ—আমাদের নিজেদের ভুলে যাওয়া, আমাদের প্রাচীন ও তিক্ত শত্রুরা আমাদের বন্ধু, এ কথা বিশ্বাস করা।**"[১৩] (জোর বর্তমান প্রবন্ধকারের)

১৯৩৭ সালে ভি. ডি. সাভারকার বলেন: "কিন্তু কঠিন সত্য এটাই, যে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক প্রশ্নগুলি শত শত বর্ষের হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং জাতীয় বৈরীতার ঐতিহ্য"।[১৪] মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সচ্ছন্দে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও প্রচার করেছিল এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বেব উৎস খুঁজেছিলেন মধ্যযুগে। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে অতীতের বৈবীতার এই তত্ত্ব এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে বহু সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি বর্তমানকালে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়াস চালানোর সঙ্গে সঙ্গে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে 'ঐতিহাসিক বৈরীতা' তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে দুই সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক সমস্যার যে দাওয়াই বা সামাজিক সমাধান প্রস্তাব করে তা একই রকম ছিল। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিমদের হিন্দুদের থেকে পৃথক করার দাবী তোলে, আর উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা দাবী কবে, যে (হিন্দু সমাজে) 'মিশে যেতে' অস্বীকার করে বিদেশী থেকে গেছে যে মুসলিমরা, তাদের হয় বহিষ্কার করতে হবে অথবা পদানত রাখতে হবে।[১৫]

এই যুক্তির অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মধ্যযুগের সমাজের অন্যান্য সামাজিক টানাপোড়েন ও সংঘাতের অস্তিত্ব অস্বীকার করত বা খাটো করে দেখাত। শ্রেণী ও জাতিভিত্তিক উত্তেজনাকে তো অগ্রাহ্য করা হতই, এমন কি প্রকট রাজনৈতিক সংঘাত, যথা রাজপুত ও মারাঠাদের মধ্যে, উত্তরের ও দক্ষি-

শের রাজ্যগুলির মধ্যে, রাজপুত ও শিখদের মধ্যে, এবং আফগান ও তুর্কীদের মধ্যে যে সংঘাত, তাও ধামাচাপা দেওয়া হত।

মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের শাসনকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিদেশী শাসন রূপে চিহ্নিত করত। ফলে, তাদের মতে, মুসলিমরা ছিল ভারতীয় সমাজে এক বহিরাগত উপাদান এবং দেশের মধ্যে চিরস্থায়ী বিদেশী। এটা ছিল মূলতঃ তাদের ধর্মের জন্য। একজন মুসলিম বিদেশী, কারণ সে মুসলিম। হিন্দু ভারত-বাসীরা, যথা পাঞ্জাবী ও বাঙালী হিন্দুরা, যে মুহূর্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তৎ-ক্ষণাৎ তারা বিদেশী হয়ে পড়ে। যেহেতু ইসলাম বহিরাগত, অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের বাইরে, তাই তা একটি 'বিদেশী' ধর্ম এবং তার ফলে তার অনুগামীরা সকলে বিদেশী হয়ে পড়ল। অর্থাৎ 'ভারতীয়ত্ব' বা 'দেশীয়তা' বা জাতিত্ব সবই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বস্তুত, বিনায়ক দামোদর সাভারকার এবং এম. এস. গোলওয়ালকার উভয়েই জাতিত্বের এমন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন যে মুসলিম, ক্রীশ্চান, ইহুদী এবং পার্সীরা জাতির বহির্ভূত থাকে।[১৩] একজন হিন্দু বা একজন ভারতীয় দেশীয় ব্যক্তি সে, যে ভারতে প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মের অনু-গামী; এই কারণেই সে ভারতকে পুণ্যভূমি হিসেবে দেখতে পারে। একই কারণে, একজন অ-হিন্দুকে বিদেশী থাকতে হয়। মুসলিমরা যে মুসলিম থেকে গেল, তাই দেখিয়ে দেয় যে তারা ভারতীয় সমাজের অন্তর্গত হতে অনিচ্ছুক, হয়ত তাদের ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়, এবং তাই তারা বিদেশী থেকে গেল। অবশ্যই বর্তমান কালের জন্য সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত হয়ে পড়ল স্বতঃ-সিদ্ধ।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সমস্ত সময়ে 'মুসলিম শাসন' ও ব্রিটিশ শাসনকে একত্রে বিদেশী শাসন বলে দাবী করত। 'সহস্রবর্ষ ব্যাপী দাসত্ব' বা 'বিদেশী শাসন'-এর কথা ছিল খুবই প্রচলিত। এমনকি, জাতীয়তাবাদীরাও অনেক সময়ে ১৯৪৭-এর আগে, এবং পরেও, এই ধরণের কথা বলতেন। তরুণ ও অশিক্ষিত মাথায় দিনেব পর দিন সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে, পত্রিকা মারফৎ, এবং ক্লাসে, এগুলি ঢুকিয়ে দেওয়া হত। আগেই বলা হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রচারের সবচেয়ে তীব্র ও হিংস্র ভাষ্যগুলির ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণ দেওয়া কঠিন, কারণ সেই প্রচার করা হত লোকমুখে। কিন্তু বিরল লিখিত উদাহরণও একটি দেওয়া যেতে পারে। তাঁর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা থেকে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গোলওয়ালকর ১৯৩৯-এ 'উই'-তে লেখেন:

> হিন্দুস্তানের অ-হিন্দু জনগণকে হয় হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে শিখতে হবে, হিন্দু জাতি (race) এবং সংস্কৃতির মহিমা প্রচার ব্যতীত অন্য কোনো ধারণা বর্জন করতে হবে, অর্থাৎ তাদের কেবল এই দেশ ও তার যুগযুগান্তব্যাপী ঐতিহ্যের অসহিষ্ণুতা

ও কৃতঘ্নতার দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করলেই হবে না, বরং তার পরিবর্তে ভালবাসা ও আরাধনার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে—এক কথায়, তাদের হয় বিদেশী হয়ে থাকা বন্ধ করতে হবে, অথবা তারা এ দেশে থাকতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে হিন্দু জাতির অধীনস্থ হয়ে, কোনো কিছু দাবী না করে, কোনো বিশেষ সুবিধার দাবিদার না হয়ে, কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণের দাবিদার না হয়ে তো বটেই—এমন কি নাগরিক অধিকারেরও দাবিদার না হয়ে।[১৭]

তিনি অহিন্দুদের শাসিয়ে দেন: "বিদেশীদের জন্য দুটি মাত্র পথ খোলা আছে, হয় জাতীয় জীবনে মিশে যাওয়া ও তার সংস্কৃতি গ্রহণ করা, অথবা জাতীয় জীবনের মর্জির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা।"[১৮] গোলওয়ালকর বারংবার বলেন যে মুসলিমরা হল বিদেশী ও হানাদার, যারা ভারতকে গৃহরূপে না দেখে সরাইরূপে দেখেছিল।[১৯] সাভারকারও ইঙ্গিত করেন যে মুসলিমদের কাছে ভারত ছিল "কেবল সময় কাটাবার জায়গা" যেখানে হিন্দুদের কাছে তা ছিল দেশ।[২০] মুসলিমরা যে ভারতে বিদেশী, এই দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নভাবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাছেও যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য ছিল। যদি এই ধারণার ফলে মুসলিমদের ভারত থেকে বহিষ্কার করা হত, তবে তা তাদের কাছে সম্পূর্ণ বর্জনীয় ছিল। কিন্তু যদি এর মাধ্যমে দেখানো যেত যে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন, যদি দেখানো যেত যে হিন্দুরা যে অর্থে ভারতীয়, মুসলিমরা সে অর্থে নয়, তবে তা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে যেত। তাই ১৯৪১ সালে জিন্না বলেন:

> "... যখন একজনের মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তকরণ হল, যদি মেনে নেওয়া হয় যে অধিকাংশের ক্ষেত্রে ধর্মান্তকরণ ঘটেছিল হাজার বছরেরও আগে, তবে তো আপনাদের হিন্দু ধর্ম ও দর্শন অনুযায়ী, সে তার জাত খুইয়েছিল এবং একজন ম্লেচ্ছ (অস্পৃশ্য) হয়ে পড়েছিল, এবং হিন্দুদের তার সঙ্গে সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বা অন্য কোনোরকম সম্পর্ক থাকল না? সুতরাং সে একটা ভিন্ন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল, শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও এবং সে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অর্থে ঐ নির্দিষ্টভাবে স্বতন্ত্র ও বৈরীতামূলক সমাজব্যবস্থায় জীবন কাটিয়েছে। **মুসলিমদের ব্যাপক অংশ এখন সহস্রাধিক বর্ষ ধরে একটি ভিন্ন জগত, একটি ভিন্ন সমাজ, একটি ভিন্ন দর্শন ও একটি ভিন্ন আস্থায় জীবন নির্বাহ করছে।**[২১]

এইভাবে, ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, উগ্রতম সাম্প্রদায়িকতাবাদের পর্যায়ে, সরাসরি এই ধারণা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় যে হিন্দুরা ও মুসলিমরা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। কেবল, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যখন জাহির করে যে ভারতে দুটি জাতি ছিল, তখন বহু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীর মত ছিল

যে ভারতে একটিমাত্র জাতির অস্তিত্ব ছিল, অর্থাৎ হিন্দু জাতির, আর মুসলিমরা ছিল 'বিদেশী'।

সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের অন্যতম মৌলিক উপাদান ছিল এই ধারণা যে মধ্যযুগের ভারতে মুসলিমরা ছিল শাসক শ্রেণী বা প্রধান গোষ্ঠী, আর হিন্দুরা ছিল শাসিত, আধিপত্যাধীন, প্রজা, বা 'নিয়ন্ত্রণাধীন'। লক্ষ্যণীয় যে এখানে সমস্ত মুসলিমদের, এমন কি শহর ও গ্রামের ব্যাপক দরিদ্র মানুষকেও শাসকরূপে অঙ্কিত করা হয়, এবং সমস্ত হিন্দুদের, যাদের মধ্যে পড়ত রাজা, দলপতি, অভিজাত, আমলা এবং জমিদার, শাসিত বলে দেখানো হয়। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে মধ্যযুগীয় সমাজ সম্পর্কে এই বক্তব্য রাখতে শুরু করে, যাতে আইনসভাগুলিতে তারা এক বড় সংখ্যক আসন দাবী করতে পারে।[২২] পরে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী মতাদর্শের এক প্রধান স্তম্ভরূপে এই বক্তব্য প্রচারিত হয়। ১৯৪১ সালে লাহোরের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এম. এ. জিন্না বলেন, "আমাদের দাবী হিন্দুদের কাছে নয় কারণ হিন্দুরা কখনো সমগ্র ভারত নেয় নি। মুসলিমরাই ভারত অধিগ্রহণ করে ৭০০ বছর শাসন করেছিল। মুসলমানের কাছ থেকে ভারত নিয়েছিল ব্রিটিশরা"।[২৩] ১৯৪২ সালে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে যদি ইংরেজরা ভারতের প্রশাসন মুসলিম লীগের হাতে তুলে দেয়, তবে "তারা মুসলিমদের প্রতি পূর্ণমাত্রায় প্রতিকার করবে, যাদের কাছ থেকে সরকার অধিগ্রহণ করেছিল তাদেরই কাছে ভারতের প্রশাসন ফিরিয়ে দিয়ে"।[২৪] অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী লেখকরা আরো কাঁচাভাবে লেখেন। যথা জেড. এ. সুলেরি এই মত প্রকাশ করেন যে ভারত হিন্দুদের হতে পারে না কারণ তাদের হাজার বছর ধরে দমন করা হয়েছে[২৫]; এবং ১৯২৯ সালে শওকত আলী বলেন যে "হিন্দুরা দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা দাসরূপেই থাকবে"।[২৬] আমরা দেখেছি যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সহজেই স্বীকার করতেন যে "মুসলিম শাসনে" হিন্দুরা "দাস" ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৭ সালে ভি. ডি. সাভারকার মুসলিম শাসকদের শাসনকে "হিন্দু জাতির পক্ষে একটি মৃত্যু পরোয়ানা"[২৭] বলে বর্ণনা করেন।

মধ্যযুগের ভারতে মুসলিমরা ছিল শাসক আর হিন্দুরা ছিল শাসিত, এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী তত্ত্বের আরেক ভাবেও ব্যাপক প্রচলন ছিল। একথা ব্যাপকভাবে বলা হত যে মুসলিমরা শাসকশ্রেণী ছিল, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মুসলিমদের কাছে এটা ছিল সুখকর বা 'মহিমান্বিত' অতীত স্মৃতি, এবং সেটা তাদের বর্তমান রাজনীতিকে ভাল বা মন্দের জন্য প্রভাবিত করত। একই ঘটনা হিন্দুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল—কেবল তাদের নাকি ছিল এক শোকের স্মৃতি, শাসিত হওয়ার বা 'নিয়ন্ত্রণাধীন' থাকার অপমানজনক স্মৃতি। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই ছিল সমসাময়িক সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ কর্তৃক সৃষ্ট, এবং কোনো অতীত,

বিশ্বত অনুভূতির পুনরুত্থান বা ঐতিহাসিক বা লোক স্মৃতি নয়। কিন্তু এই দৃষ্টি-ভঙ্গি যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তা প্রমাণিত হয় যখন আমরা দেখি যে সি. ম্যানশারডের মত একজন বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকও তা গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৬ সালে লেখেন যে :

"মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের এই আদি বৈরীতা বর্তমান যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। যদিও ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলিমদের চেয়ে বেশী, তবু তারা যেন ভীত। মুসলিম আধিপত্যের দিনগুলি স্মরণে এনে তারা আজকের দিনে মুসলিম রাজনৈতিক প্রাধান্যের কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। অন্যদিকে, মুসলিমরা তাদের মহিমান্বিত অতীতের কথা মনে করে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকায়।"[২৮]

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকগুলি অনুসিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। প্রথমত আসে এই ধারণা, যে ভারতে রাজনীতি, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টন সব সময়েই ধর্ম এবং ধর্মীয় পার্থক্যের, এবং তাও আবার শাসকদের ধর্ম ও তাদের মধ্যে পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে ছিল। ভারতীয় রাষ্ট্র ছিল ধর্মীয় রাষ্ট্র, এবং মধ্যযুগে তা ছিল ইসলামিক রাষ্ট্র—এই তথ্য নির্ধারিত হয় শাসকদের ব্যক্তি-গত ধর্ম অনুযায়ী। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগের রাষ্ট্রের মৌলিক লক্ষ্য ছিল সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে ইসলাম ও তার মহিমা প্রচার করা, এবং তার কারণ ছিল মুস-লিম শাসনাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত চরিত্র। **রিপোর্ট অফ দ্য কানপুর রায়টস এনকোয়্যারি কমিটি** উল্লেখ করে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চোখে মুসলিম শাসকরা ছিলেন :

"ঐকান্তিক ধর্মযোদ্ধা, যাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রসার ঘটানো, এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যাদের পদ্ধতি ছিল মন্দির ধ্বংস করা এবং বাধ্যতামূলক ধর্মান্তকরণ· । মুসলিম লেখকরা দুঃখপ্রকাশ করে যে মুসলিম রাজারা তাঁদের শাসনাধীন দেশে মূর্তিপূজা চালু থাকতে দিয়ে এবং অবিশ্বাসীদের বাড়তে দিয়ে খাঁটি ধর্মীয় অনুভূতির অভাব দেখিয়ে-ছিলেন ; আর হিন্দু লেখকরা বিলাপ করে যে হিন্দু শাসকদের ধর্মীয় অনুভূতি ছিল দুর্বল এবং তাদের দেশপ্রেম ছিল অনুপস্থিত, যে জন্য তারা ধর্ম ও দেশ রক্ষায় বিদেশীর বিরুদ্ধে সফলভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি।"[২৯]

একই কারণে, হিন্দু রাজা ও দলপতিরা যে স্বতন্ত্র বা আধা-স্বতন্ত্র রাজ্যগুলি শাসন করতেন, যথা মারাঠা সাম্রাজ্য এবং মারাঠা দলপতি শাসিত রাজ্যগুলি, বা রাজপুত রাজা ও জাট জমিদার শাসিত রাজ্যগুলি, সেগুলিকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়, এবং তাদের শাসকদের হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা বলে অভিহিত করা হয়। শাসকের ধর্ম অনুযায়ী মধ্যযুগের রাষ্ট্রগুলির মৌলিক চরিত্র নির্ধারণ সংক্রান্ত এই মৌলিক তত্ত্বায়ন একবার গৃহীত হওয়ার পর অন্য সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য

ইসলামের মূলমন্ত্র অনুযায়ী একজন কাফেরকে বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে হত্যা করার পর হত্যাকারী বা ঘাতককে তার সমগোত্রীয় মানুষ বা সম্প্রদায়ের চোখে বড় করে; শুধু তাই নয়, তা তাকে শহীদ করে তোলে ও তার স্বর্গের পথ সুগম করে তোলে।"[৩৫]

এই সাধারণীকরণের জন্য একটি প্রমাণ দর্শানো হয় যেটা হল বিশ্বজুড়ে ইসলাম প্রবর্তনের ঐতিহাসিক খতিয়ান। দাবী করা হয় যে তা ছিল সর্বত্রই সমান রক্তাক্ত ও বিধ্বংসী। বস্তুত, ইসলামের প্রসার যে তরবারি মারফৎ ঘটেছিল, এই ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করা হত। উদাহরণস্বরূপ, গোলওয়ালকার উই-তে লেখেন:

"তারপর ইরানে ইসলামিক আগ্রাসন, এবং তার সহগামী হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসলীলা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ, সমস্ত পবিত্র স্থান লঙ্ঘন করা, ধর্ম ও সংস্কৃতি অপবিত্র করা, হত্যাকারীর ধর্মে বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ, এবং ইসলামের প্রসারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আর যা যা ঘটত সে সব পুরোনো কাহিনীর কুৎসিত পুনরাবৃত্তি।"[৩৬]

রিপোর্ট অফ দ্য কানপুর রায়টস এনকোয়্যারি কমিটিও লক্ষ্য করে:

"বর্তমানে যে বহু ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান, তার মধ্যে তিক্ততা ও শত্রুতার সবচেয়ে বড় উৎস যেটি তা হল এই ধারণা যে ইসলাম অন্তর্নিহিতভাবে গোঁড়া ও অসহিষ্ণু···। ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসারিত হয়েছে এই তত্ত্ব এত ব্যাপকভাবে এবং এত দৃঢ়ভাবে প্রচার করা হয়েছে যে সাধারণ একজন ভারতীয়ের মনে তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়েছে···। [এই তত্ত্ব] হিন্দু-মুসলিম সমস্যা ধারালো করে তোলে···।"[৩৭]

'মুসলিম স্বৈরাচার' সংক্রান্ত এই রাজনৈতিক ও মৌখিক ঐতিহ্য পণ্ডিতী রূপ পায় মূলতঃ ১৯৪৭-এর পর, যথা ভারতীয় বিদ্যাভবনের দ্য হিস্টি্র অ্যাণ্ড কাল্চার অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল"-এ।[৩৮] কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগেও ক্লাসঘরে তা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি নোটে বলা হয়:

"যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পরীক্ষাপত্র দেখেছেন তাঁরা জানেন মুসলিম রাজা ও শাসনকর্তাদের কীভাবে রক্তচোষা বাদুড় এবং নিষ্ঠুরতার প্রতি আসক্ত বলে প্রদর্শন করা হয়। তারা সাধারণভাবে যে প্রভাব সৃষ্টি করে তা হল এই যে মুসলিম শাসকরা ভারতে এসেছিলেন নিছক হিন্দুদের ও তাঁদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে এবং জনগণকে তলোয়ারের খোঁচায় ইসলাম গ্রহণ করাতে।[৩৯]

অনুরূপভাবে, রিপোর্ট অফ দ্য কানপুর রায়টস এনকোয়্যারি কমিটি পর্যবেক্ষণ করে যে:

"মূর্তিভাঙা এবং বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের এই কাহিনীগুলি আমাদের ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে সাধারণত প্রচারিত সেই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে, যা সমগ্র আন্দোলনটাকে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে একটি আট শতাব্দীব্যাপী ক্রমাম্বয় ধর্মীয় যুদ্ধ বলে দেখে। এমন কি যে সমস্ত লেখকেরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁদের সার্বিক আচরণ থেকে আপাতঃভাবে তার রাজনৈতিক চরিত্র উপলব্ধি করেন, তাঁরাও অভিন্নরূপে মনে ঐ একই রকম ছাপ ফেলেন।"[৪০]

মুসলিম স্বৈরতন্ত্রের মিথের কতকগুলি অনুসিদ্ধান্তও ছিল। তা হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক আবেগের উদ্রেক ঘটাতে, এবং উল্টো দিকে, মুসলিমদের কুপিত করে তুলত, কারণ তাঁরা সর্বদা তাঁদের কাঠগড়ায় তোলায় আপত্তি করতেন। তাঁরা অনেকে আবার আত্মরক্ষার খাতিরে মধ্যযুগের মুসলিম শাসক ও দলপাতদের, এমন কি ঔরংজেবের মত একজন শাসকের কার্যকলাপের পক্ষ সমর্থনেব প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন। কালক্রমে এই মিথ মুসলিমদের এক বাঁধা-ধরা সাম্প্রদায়িক চিত্র বিন্যাসে সাহায্য করে, যা অনুযায়ী মুসলিমরা সহজাতভাবে নৃশংস, লম্পট ও আগ্রাসী। অধিকাংশ হিন্দু স্বভাবত যে ভয়ের অনুভূতি এমন কি মনোবিকার, বোধ করতেন না, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তা সৃষ্টি করার জন্য এই মিথ ব্যবহার করত। মুসলিমদের সমান নাগরিক অধিকারের দাবীকে তাঁদের পূর্বপুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবহারের অজুহাতে অস্বীকার করার জন্য, এবং স্বৈরতন্ত্রের ঐতিহাসিক স্মৃতির সুবাদে বর্তমানে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার জন্যও এই মিথ ব্যবহৃত হত। অধিকন্তর হিংস্র সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা এমন কি এই তত্ত্বও প্রচার করত যে মধ্যযুগে হিন্দুদের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তাঁদের উচিত তার প্রতিশোধ নেওয়া, বা অন্তত পক্ষে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।[৪১] মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যেহেতু এইভাবে ইতিহাসকে ব্যবহার করতে পারত না, তাই তারা ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির ভূমিকা সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারের পথ বেছে নিয়েছিল।[৪২]

মুসলিমদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলার মিথকে ব্যবহার করে মধ্যযুগের অর্থনীতি, রাজনীতি ও কৃষ্টির ইতিবাচক দিকগুলিকে, এবং ভারতীয় সমাজের বিকাশে তাদের অবদানকে অস্বীকার করাও হত।

ইতিহাসের হিন্দু সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা যে কল্পিত কাহিনীর উপর সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করত, তা হল : ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি—ভারতীয় সভ্যতা—প্রাচীন যুগে মহান, আদর্শ শিখরে উত্তরণ করেছিল, এবং 'মুসলিম' শাসন ও আধিপত্যের ফলে মধ্যযুগে তা ঐ স্থান থেকে চিরস্থায়ী ও ক্রমাম্বয় অবক্ষয়ে পতিত হয়েছিল।

প্রাচীন মাহাত্ম্যের সাম্প্রদায়িক কল্পকাহিনীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল। প্রথমত, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ বর্ণনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমালোচনাবিহীন পদ্ধতি ব্যবহার

করা হত।[৪৩] যেহেতু অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তীকালে মুসলিমদের আমলে পতনের গভীরতা দেখানো, তাই পতনের আরম্ভ এক বিশাল উচ্চতা থেকে হওয়ার দরকার ছিল। সুতরাং প্রাচীন যুগকে শাস্ত্রসিদ্ধ এবং সমালোচনা-মূলক অধ্যয়নের ঊর্ধ্বে মনে করা হত। প্রাচীন যুগের কোনো সমালোচনা সহ্য করা যেত না, কারণ সেই সমালোচনা মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িক সমালোচনার ভার কমিয়ে দিতে পারত। সুতরাং, প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সর্বাপেক্ষা নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহকেও সমর্থন করা হত বা এড়িয়ে যাওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ, সাভারকর তাঁর 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থন করেছিলেন, এমন কি সমুদ্রযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞাকেও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছিলেন।[৪৪] গোল-ওয়ালকারও তাঁর "উই" গ্রন্থে জাতিভেদ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন।[৪৫]

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখা হত, এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে আবার সংস্কৃত আঙ্গিকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে এক করে ফেলা হত। সুতরাং, সর্বাগ্রে, স্বর্ণযুগ বলে প্রশংসা করা হত গুপ্ত যুগের, কারণ একথা বিশ্বাস করা হত যে ঐ যুগ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতির উপর জোর দিত। একইভাবে, "মাহাত্ম্য" কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া হত সামরিক বিজয়, শক্তিশালী রাজা এবং সাম্রাজ্যের আয়তনের ভিত্তিতে। এখানেও গুপ্তযুগ চাহিদা মেটাতো।[৪৬]

তৃতীয়ত, মধ্যযুগে যেখানে সংঘাত, নিপীড়ন ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখানো হত, সেখানে প্রাচীন ভারতীয় সমাজকে সামাজিক ও ধর্মীয় টানাপোড়েন এবং সংঘাত-মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এমন কি জাতিভেদ প্রথাও নাকি সামাজিক বিভাজন নয়, সংহতি বৃদ্ধি করেছিল।

চতুর্থত, প্রাচীন ভারতীয় মাহাত্ম্যের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করা হত তার প্রাচীনতাকে। এই প্রাচীনতা, বা বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় ভারতীয় সভ্যতার এই স্বকীয় চরিত্রকে প্রবল উৎসাহে জাহির করা এবং তার পক্ষ নিয়ে কথা বলা হত।

ইন্দ্র প্রকাশ বলেন যে হিন্দুরা ছিল "প্রথম জনগণ যারা এক উচ্চমানের সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল এবং তাকে এই জগতের নানা অংশে ছড়িয়ে দিয়েছিল।"[৪৭] প্রাচীনতাকে ব্যবহার করে এই ধারণারও সমর্থন পাওয়া যেত যে প্রাচীন যুগেই হিন্দু জাতি গঠিত হয়েছিল।[৪৮] ভারত কেবলমাত্র হিন্দুদের 'উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভূখণ্ড' বা সম্পত্তি[৪৯] এই দাবীর জন্য পূর্বোক্ত তত্ত্ব মৌলিক ছিল। এইভাবে মুসলিমদের 'বৈদেশিকতা'র উপর জোর দেওয়া সম্ভব হত ও দীর্ঘকাল ভারতে থাকায় তারা ভারতীয় হয়ে যাওয়ার অধিকার পেতে পারে তা অস্বীকার করা যেত। দেশের প্রতি হিন্দুদের 'প্রাচীন স্বত্ব' প্রমাণ করার এবং মুসলিমদের জন্য তা অস্বীকার করার এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ক্রমে

এই অবস্থান গ্রহণ করে যে ভারত ছিল আর্যদের আদি বাসস্থান, এবং তারা বাইরে থেকে ভারতে আসে নি। আর্য অভিপ্রয়াণ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক দিকটি যাই হোক না কেন, তাকে অস্বীকার করা একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদীর কাছে একটি মতাদর্শগত ও অনুভূতিগত আবশ্যকীয়তায় পরিণত হল। মাঝে মাঝে তা হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখতে পারি বিষয়টিকে গোলওয়ালকর কীভাবে নিয়েছিলেন। ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকে সাভারকর যেখানে আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে আসার তত্ত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন[৫০], সেখানে ১৯৩৯ সালে গোলওয়ালকর প্রবলভাবে সেই তত্ত্ব খণ্ডন করেন, এবং বলেন যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল "হিন্দুরা যে [ভারত] ভূমিতে নিছক ভুঁইফোড ও দখলদার" তা দেখানো। কিন্তু এই খণ্ডনে একটা বড় সমস্যা ছিল। আর্যদের মেরু অঞ্চলের নিবাস ও উদ্ভব প্রসঙ্গে লোকমান্য তিলক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আর, তাঁকে জাতীয়তা-বিরোধী এবং হিন্দু-বিরোধী বলে ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং গোলওয়ালকর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে বর্তমানে যেখানে বিহার ও উড়িষ্যা, অতীতে সেখানেই ছিল উত্তর মেরু, এবং তার ফলে, আর্যরা ভারতেই থেকে গেল, তবে সুমেরু অঞ্চল এক আঁকাবাঁকা পথে উত্তর দিকে যাত্রা করল। তাঁরই কথায়: "...বেদের সুমেরু অঞ্চলের গৃহ ছিল বাস্তবে হিন্দুস্থানেই, এবং হিন্দুরা সেই দেশে অভিপ্রয়াণ করেন নি, বরং সুমেরু অঞ্চল অভিপ্রয়াণ করে হিন্দুদের হিন্দুস্থানে রেখে চলে যায়।" নৈতিক শিক্ষাটা ছিল স্পষ্ট: "আমরা হিন্দুরা কোথা থেকেও এই দেশে আসি নি, বরং স্মৃতির অতীতকাল থেকে এই মাটির সন্তান, এবং দেশের স্বাভাবিক প্রভু।"[৫১]

ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক দিশা অনুযায়ী স্পষ্ট পর্বগুলির দ্বিতীয় পর্ব ছিল মধ্যযুগে ভারতীয় জনগণ ও তাঁদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার 'ভয়ংকর' পতন।[৫২] ইন্দ্রপ্রকাশ জানালেন: "এইরকম উচ্চতার শিখর থেকে তারা দাসত্ব ও বিদেশী আধিপত্যের গভীরে নিমজ্জিত হলেন। এই পতন ছিল প্রকৃতই এক ভয়ংকর পতন"।[৫৩] ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর মুসলিম অভিঘাতের এই নেতিবাচক অভিমত মধ্যশ্রেণীর হিন্দুদের মনে দিবারাত্রি সম্ভাব্য সর্বপ্রকার প্রচার মাধ্যম সহযোগে প্রবিষ্ট হয়। ভারতীয় সমাজের অধিকাংশ সামাজিক ও কৃষ্টিগত ত্রুটির তার সমস্ত পশ্চাদপদতা 'মুসলিম শাসন' ও 'ইসলাম'-এর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সমগ্র মধ্যযুগকে দেখানো হয় অন্ধকার যুগ রূপে, "যে সময়ে ভারতের জাতীয় জীবনকে তার বিকাশের স্বাভাবিক গতিপথ থেকে ধাক্কা মেরে বাঁকিয়ে দেওয়া হয়, এবং তা এমন এক সামাজিক ও ধর্মীয় বিশৃংখলার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেখান থেকে তার পক্ষে নিজেকে উদ্ধার করা কঠিন"।[৫৪] আমরা আগেই দেখেছি যে সমগ্র মধ্যযুগকেই "পাপের" যুগ হিসেবে[৫৫], হিন্দুদের "জাতিগত অধিকার থেকে বঞ্চিত" করার[৫৬], এবং হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে "জীবন-মৃত্যুর

সংঘাতের" যুগ হিসেবে[৫৭] চরিত্রায়ণ করা হয়েছিল। সাধারণতঃ, আরো দুটি কথা বলা হত। প্রথমত, "হিন্দু সাংস্কৃতিক অধঃপতনের জোয়ার" আধুনিক যুগেও ধারাবাহিকভাবে চলেছিল।[৫৮] দ্বিতীয়ত, সমস্ত কিছু চিরতরে হারিয়ে যায় নি ; হিন্দু 'জাতি' "একটি কৃষ্টির" বিবর্তন সংঘটন করেছিল, "যা মুসলমান ও ইউরোপীয়দের অপকৃষ্ট 'সভ্যতাগুলির' সঙ্গে গত দশ শতাব্দীব্যাপী অধঃপতনশীল সংস্পর্শ সত্ত্বেও আজও বিশ্বের মহত্তম কৃষ্টি । আর সেগুলিও, বিদেশী প্রভাবের স্পর্শে সংক্রামিত হলেও, বাকি সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ সর্বকিছুর সঙ্গে তুলনায় শ্রেয় বলে দেখা দিতে বাধ্য"।[৫৯]

সাম্প্রদায়িকতাবাদের তৃতীয় বক্তব্য ছিল বহু শতাব্দীর অবক্ষয়, স্বৈরতন্ত্র ও বিদেশী আধিপত্যের পর, অষ্টাদশ শতকে "হিন্দু পুনরভ্যুত্থান", যদিও এমন কি ৬০০ বছর ব্যাপী "পরাজয়" ও "অবমাননা" এবং "মুসলিম উত্থানের" যুগেও হিন্দুরা "তাঁদের জাতীয় সম্মান ও মহিমা পুনরুদ্ধার করার জন্য এক জীবন-মরণ-সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।"[৬০] কিন্তু একথাও বলা হয় যে সম্পূর্ণ হিন্দু পুনরুজ্জীবন ও পুনরভ্যুদয় ঘটতে শুরু করে শিবাজীর নেতৃত্বে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দু আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্ষুদে জমিদাররা, রাজপুত রাজারা এবং মারাঠা দলপতিরা যে সমস্ত বিদ্রোহ, রাজ্য জয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করেছিল, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সেগুলিকে আখ্যা দিয়েছিল হিন্দু সংগ্রাম, তাদের রাষ্ট্রগুলিকে হিন্দু রাজ্য ও সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেছিল। উপরন্তু, এ কথাও বলা হয় যে এই সংগ্রামগুলি সুপ্ত হিন্দু জাতীয় অনুভূতির শক্তিবৃদ্ধি করেছিল।[৬১]

১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে হিন্দু মহাসভার প্রতি তাঁর সভাপতির ভাষণ-সমূহে সাভারকর এই বিষয়ে বারংবার জোর দিয়ে কথা বলেন। সুতরাং একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি এখানে বেমানান হবে না :

> হিন্দু পতাকার নীচে হিন্দু রূপে বিদ্রোহ করেন এবং অভ্যুত্থান করেন হাজার হাজার মানুষ, রাজা ও কৃষক উভয়েই। তাঁরা তাঁদের অ-হিন্দু শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, এবং সংগ্রামে প্রাণ হারান। অবশেষে জন্মগ্রহণ করেন শিবাজী, হিন্দু জয়োল্লাসের ঘণ্টা বেজে ওঠে, মুসলিম আধিপত্যের দিন অস্ত যায়। 'হিন্দু' এই একটি মাত্র সাধারণ নাম নিয়ে, এক সাধারণ পতাকা, হিন্দু পতাকার নীচে, এক সাধারণ হিন্দু নেতৃত্বে, 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' (হিন্দু সাম্রাজ্য) প্রতিষ্ঠার এক সার্বজনীন আদর্শ নিয়ে, 'হিন্দুস্থানের' রাজনৈতিক মুক্তি, এই এক সাধারণ লক্ষ্যে, তাঁদের সাধারণ মাতৃভূমি ও পুণ্যভূমিকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে, প্রদেশের পর প্রদেশে হিন্দুরা উঠে দাঁড়ান, যতদিন না শেষ পর্যন্ত মারাঠা মিত্রসঙ্ঘ মুসলিম নবাব ও নিজাম, বাদশাহ ও পাদশাদের শত যুদ্ধক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়।[৬২]

অনুরূপভাবে ১৯২৩ সালে 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা সংগ্রামকে "জাতীয় মুক্তির মহান্ আন্দোলন"[৬৩] বলে অভিহিত করেছিলেন এবং লিখেছিলেন :

> এই দীর্ঘ ও ক্রোধোন্মত্ত সংঘাতে আমাদের জনগণ আমাদের নিজেদের হিন্দুরূপে তীব্রভাবে জেনেছিলেন এবং আমাদের ইতিহাসে অজ্ঞাতপূর্ব পর্যায় অবধি একটি জাতিতে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়েছিলেন··· সনাতনপন্থী, সৎনামী, শিখ, আর্য, অনার্য, মারাঠা ও মাদ্রাজী, ব্রাহ্মণ ও সকলে হিন্দুরূপেই কষ্ট সহ্য করেন এবং হিন্দুরূপেই বিজয়ী হন··· । শত্রু আমাদের হিন্দু হিসেবেই ঘৃণা করত, এবং আটক থেকে কটক পর্যন্ত সমস্ত জাতিগোষ্ঠী ও ধর্ম বিশ্বাসের জনগণের যে পরিবার, তা সহসা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়ে একটিমাত্র অস্তিত্বে পরিণত হয় ।[৬৪]

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাদের প্রায় সমস্ত প্রতীক ও নায়ক, যাদের বীরত্বের কাহিনী তাদের অনুগামীদের প্রেরণা দিতে ব্যবহার করা হত, তাদের বেছে নিত মধ্যযুগ থেকে। যাঁরা ব্রিটিশদের ভারতজয়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করেছিলেন, বা যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন, তাঁদের তারা অবহেলা করত। এর দুটি কারণ ছিল : কেবলমাত্র 'মুসলিম-বিরোধী' নায়কদের দিয়েই সাম্প্রদায়িক আবেগের চাহিদা মেটানো যেত ; আর এটা অনেক নিরাপদ পথও ছিল, কারণ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ঐ রকম নায়কের গুণগান অগ্রাহ্য করত, কিন্তু ব্রিটিশ-বিরোধী নায়কদের কোনো প্রশংসা বা তাঁদের পক্ষে কোনোরকম প্রচার হলে কড়া ব্যবস্থা নিত। একথাও উল্লেখযোগ্য যে যাঁরা মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের জাতীয় নায়করূপে চিত্রায়ণ করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ব্যাখ্যার একটি মৌলিক দিককে একাধারে জাগিয়ে তোলা এবং প্রচার করা হচ্ছিল : তাঁরা নিছক স্থানীয় বা আঞ্চলিক দেশপ্রেমী ছিলেন না, বরং "জাতীয়" নায়ক ছিলেন কারণ তাঁরা "বিদেশীদের" বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। আর মুসলিম শাসকরা বিদেশী ছিলেন অন্য কোনো সংজ্ঞা অনুযায়ী নয়, কেবল তাঁরা মুসলিম ছিলেন বলে।[৬৫]

কিন্তু হিন্দু পুনরুজ্জীবন ও মুক্তির কর্তব্য, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উক্তি অনুযায়ী, ব্রিটিশ জয়ের ফলে থেমে যায়।[৬৬] কিন্তু সেই বিজয়ও সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশরা মুসলিমদের কাছ থেকে যে সাহায্য পায় তার ফলে।[৬৭] মুসলিম অসহযোগিতা সে সময়েও শেষ হয় নি। হিন্দুরা যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে, মুসলিমরা তখন সহযোগিতা করে নি। সুতরাং হিন্দুরা এককভাবে নিজেদের কর্তব্য পালনে রত হয়। বস্তুত, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা শেখায়, যে তাদের দুটি সংগ্রামকে যুক্ত করতে হয়েছিল—মুসলিম বিরোধী সংগ্রাম এবং ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম।[৬৮] ১৯৩৮ সালে সাভারকর বলেন যে বর্তমান প্রজন্মের হিন্দুদের কর্তব্য

হল "মারাঠা ও শিখ হিন্দু সাম্রাজ্যগুলির পতনের সময়ে আমাদের পিতামহরা আমাদের জাতীয় জীবনের সূত্র যেখানে ফেলে দিয়েছিলেন···তাকে সেখান থেকে পুনরায় ধরা"।[৬৯]

ইতিহাসের হিন্দু সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার এই দিকটি সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবার আগে এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি দিকের উপরও আমরা কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের একটি মৌলিক উপাদান রূপে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি স্তুতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বহু জাতীয়তাবাদীও পোষণ করতেন; আর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয়তাবাদীদের কাছ থেকে ধার করেছিল। কিন্তু তার ব্যবহার এবং তার রূপ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে মতভেদ ছিল। দাদাভাই নওরোজী এবং রমেশচন্দ্র দত্ত থেকে আরম্ভ করে গান্ধী ও নেহরু পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রাচীন ও মধ্যযুগ, উভয়েরই এক ইতিবাচক ছবি এঁকেছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা অতীতের মহিমা বর্ণনা করতেন জাতীয় আত্মবিশ্বাস ও আত্মাভিমান দৃঢ়তর করার জন্য। বিশেষত, যেখানে ঔপনিবেশিক মতাদর্শগত প্রয়াস ছিল তার ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া এবং হীনতা ও নির্ভরশীলতার মানসিকতা সৃষ্টি করা, সেখানে এই কাজ করা হত। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রাচীন যুগের প্রশংসা করত বা তাকে আদর্শ স্থানীয় বলে দেখাত মধ্যযুগের পতন ও অবক্ষয়ের সঙ্গে বৈপরীত্য আনার এবং এইভাবে মুসলমান-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য জাতীয়তাবাদীরা অতীতের দিকে তাকাতেন আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্র, আধুনিক নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগে ভারতের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য সন্ধানে। কে. পি. জয়সওয়াল, পি. এন. ব্যানার্জী, বি. কে. সরকার, ইউ. এন. ঘোষাল, ডি. আর. ভাণ্ডারকার, এমন কি প্রথম যুগের আর. সি. মজুমদার প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ্‌রা প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ জীবনের গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক, অ-স্বৈরতান্ত্রিক, এমন কি প্রজাতন্ত্রী, অ-ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ, এবং যুক্তিবাদী উপাদানগুলির উপর জোর দিয়েছিলেন।[৭০] সুতরাং, জাতীয়তাবাদীদের হাতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের মহিমা বর্ণনা ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে একটি হাতিয়ার। তার অবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, এবং বহুভাষী, বহুসংস্কৃতি সম্পন্ন, বহুধর্মীয় এবং বহুজাতি সম্পন্ন দেশে ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, এই ব্যাখ্যার একটি ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল মর্মবস্তু ছিল। উপরন্তু, জাতীয়তাবাদীরা সহজেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন ও ক্রমবিকাশের জন্য বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি গ্রহণ করতেন। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অতীতকে ব্যবহার করত সাম্প্রদায়িক অনুভূতি সৃষ্টি ও সংহত করার জন্য। তারা প্রশংসার জন্য তুলে ধরত প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির সর্বাপেক্ষা নেতিবাচক কিছু বৈশিষ্ট্য। তারা তার কোনো অংশের

কোনো রকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা সমালোচনা গ্রহণ করতেও প্রস্তুত ছিল না।

শিক্ষিত মুসলিমরা, এবং পরে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, এ সবের প্রতিক্রিয়ায় তাকাতে শুরু করে 'ইসলামিক' বা আরব ও তুর্কী কৃতিত্বের স্বর্ণযুগের দিকে। তারা যে সব নায়ক, মিথ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আবেদন করে, তারা প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের অংশ ছিল না, ছিল মধ্যযুগের পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের অংশ। এখানে প্রতীক ছিল সৈয়দ আহমেদ খান কর্তৃক তুর্কী ফেজ (টুপি)-এর জনপ্রিয়করণ। তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাত ভারতীয় সভ্যতার 'অবক্ষয়ের' কারণ ছিল, তা তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাদের অনেকে তাই মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতির সমস্ত বা অধিকাংশ দিকের সমর্থন করতে শুরু করে। অধিকতর তীব্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এমন কি আওরংজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামির নীতি, জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তন এবং মন্দির ধ্বংস করাকেও সমর্থন করে। তাঁকে ভারতে **দার-উল-ইসলামের** প্রবর্তক রূপে অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয় এবং এক মহান্ ও ধর্মপ্রাণ শাসক আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, আকবরকে ইসলামকে দুর্বল করার জন্য নিন্দা করা হয়। ভারতে 'ইসলাম কর্তৃক ধ্বংসীকরণের' তত্ত্বের বিপরীতে তারা জোর দেয় কুসংস্কার, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও অসাম্য পূর্ণ হিন্দু সমাজের উপর 'সমতাবাদী' ইসলামের প্রতিঘাতের উপর।

'ঐতিহাসিক ইসলামের' গুণ বর্ণনার জন্য অতীতের দিকে তাকানোর, অর্থাৎ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সেই সব রাজ্যের অতীতের দিকে তাকানোর যাদের শাসকরা ছিলেন মুসলিম, অন্যতম দিক ছিল প্যান-ইসলামিজম। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী এক 'মুসলিম জনগণ' আছে, এবং সাম্রাজ্য গঠন এবং ধর্মীয় ঐক্য উভয়তই তারা অতীতে মহান্ কীর্তি রাখতে পেরেছিল। প্যান-ইসলামিজমের লক্ষ্য ছিল শুধু বিশ্বজুড়ে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ কর্তৃক আক্রান্ত 'মুসলিম' স্বার্থ রক্ষা নয়, বরং ইসলামের বা 'মুসলিম জনগণের' অতীত মহিমার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তবে প্যান-ইসলামিজমের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। একদিকে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশে তার গুরু দায়িত্ব থাকলেও, তা মূলতঃ হিন্দুদের বিরোধী ছিল না। অন্যদিকে, ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত তা সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিল, কারণ বিশ্বব্যাপী বিচারে প্রধানত মুসলিম জনসংখ্যাবহুল দেশগুলিকে উপনিবেশে পরিণত করছিল বা করার হুমকি দিচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদ। একই সঙ্গে, যখন প্যান-ইসলামিজম বিশ্বজোড়া বিচারে ব্রিটিশ বিরোধী ছিল, ভারতের ক্ষেত্রে তা তখনো সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিল না। ব্যতিক্রম ছিল শুধু খিলাফৎ আন্দোলনের পর্ব।

যাই হোক, স্বর্ণযুগ ও মহিমান্বিত যুগের সন্ধানে বহু শিক্ষিত মুসলিম এবং প্রায়

সমস্ত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের কীর্তি জনপ্রিয় করেছিলেন।[৭১] সেই যুগের এবং সেই সমস্ত অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পৌরাণিক কাহিনীসমূহ এবং নায়কদের ব্যবহার করা হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রদায়ের ভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। **কানপুর রায়টস এনকোয়্যারি কমিটির** রিপোর্ট লক্ষ্য করেছিল যে :

> সমগ্র-ইসলামতন্ত্র (Pan-Islamism) যেন তাদের সামনে আশা ও ও আকাংখার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল, যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চেয়ে অনেক পছন্দসই এবং আকর্ষণীয় ছিল, কারণ এই নতুন দিগন্তে তাদের কল্পনাশক্তি হিন্দু রাজের যন্ত্রণাদায়ক আতঙ্ক থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারত, এবং সময় অনুকূল হলে এমন কি এক সম্ভাব্য বিশ্বজোড়া মুসলিম আধিপত্যের স্বপ্নে মসগুল থাকতে পারে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি ছিল মুসলমানদের শিক্ষিত অংশের একচেটিয়া সম্পত্তি।[৭২]

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা 'পতন' সম্বন্ধেও তাদের নিজস্ব ভাষ্য প্রচার করত। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, যখন হিন্দুরা 'উপরদিকে উঠছিল', তখন 'সম্প্রদায়' হিসেবে মুসলিমদের 'পতন' বা অধোগমন ঘটেছিল—ভারতীয় জন-গণের একাংশরূপে নয়। তা ঘটে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়। একথা বলা হয় যে উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মুসলিমদের অধোগমন ঘটেছিল, 'তারা' রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবার পর। তাদের সামাজিক পরিস্থিতি অনুকম্পার যোগ্য হয়ে পড়েছিল। তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল। তারা উত্তরোত্তর দুর্বল ও নিঃসহায় হয়ে পড়ছিল।[৭৩] বহু লেখক, যথা আলতাফ হুসেন হালি, এবার 'মুসলিম বিষাদ'-এর বিষয়ে লেখা শুরু করেন। এই 'বিষাদ'কে দেখা হয় মুসলিম অধোগমনের ফল রূপে।[৭৪] অনিবার্যভাবে, এই তত্ত্ব ভারতে মুসলিমদের চূড়ান্ত 'বিলুপ্তির', এবং তারা সাম্প্রদায়িক সংহতি গড়ে না তুললে 'অন্য সম্প্রদায়সমূহ' কর্তৃক তাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের ভয়ের জন্ম দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখতে পারি, ১৯৪০-এর দশকের একজন প্রধান মুসলিম লীগ তাত্ত্বিক, জেড. এ. সুলেরি, এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখেছিলেন।[৭৫] সুলেরির মতে ১৯৩০-এর দশকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে জিন্নার পুনরভ্যুদয় পর্যন্ত ভারতীয় মুসলিমরা এক সংকটপূর্ণ যুগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁরা 'ডুবে যাওয়া' অথবা 'মুছে যাওয়ার' বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। '১৭৫৭ থেকে মুসলিমদের' গোটা ইতিহাসটাই ছিল ব্রিটিশ কর্তৃক হিন্দুদের সমর্থন করার ও মুসলিমদের দমন করার কাহিনী। হিন্দুরা যখন 'ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিল', মুসলিমরা তখন 'ডুবে যাচ্ছিল'। বিশেষ করে ১৮৫৭-র পর মুসলিমদের 'অধঃপতনের বিশাল সমুদ্রে ঠেলে দেওয়া হয়'। উপরন্তু, হিন্দুরা

ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল কিন্তু মুসলিমরা বিভক্ত হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 'শতাব্দী ব্যাপী সমৃদ্ধি এবং নতুন শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা হিন্দুদের দৃঢ়, শক্তিশালী ও শিক্ষিত করে তুলেছিল, এবং যা আরও গুরুত্বপূর্ণ, তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। অন্যদিকে শতাব্দী ব্যাপী দমন মুসলিমদের দুঃখের তিমিরে ফেলে ছিল··· ।' সৈয়দ আহমেদ খান 'একটি গোটা জনগণের অধঃ-পতনকে' রোধ করেছিলেন। যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'একটি সম্প্রদায়ের পিছনে ছিল শতাব্দী-ব্যাপী সমৃদ্ধি ও শিক্ষা, আর অন্যটির ছিল শতাব্দী-ব্যাপী দমন ও অজ্ঞতা। এই দুইয়ের স্বার্থ কীভাবে এক হতে পারে ?' 'পরাভূত' মুসলিমদের অধঃপতন জিন্না মঞ্চে আসা পর্যন্ত, ১৯২০-র ও ১৯৩০-এর দশকে আরো সম্প্রসারিত হয়েছিল : "১৯৩৪ সালের মধ্যে মুসলিম মানসের হিন্দু কর্তৃক দখল প্রায় সম্পন্ন হয়েছিল। জয়গর্বিত হিন্দু বাহিনীরা এক-তাহীন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং আত্মবিশ্বাসহীন মুসলমানদের দলে দলে হিন্দুত্বের পরিধির মধ্যে অঙ্গীভূত করতে ব্যস্ত ছিল।"

শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অবশ্যই মধ্যযুগকে তাদের পতনের পর্ব রূপে গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু তারাও বলত যে ঐ যুগ ছিল মুসলিম স্বৈরতন্ত্র এবং হিন্দু অধোগমন ও অধঃপতনের যুগ। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিখধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল মুসলিম স্বৈরতন্ত্র ও নিজেদের কাপুরুষতা থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মত অনুযায়ী সেটা ক্ষয়িষ্ণু, জাতিভেদ-পীড়িত হিন্দু-ধর্মের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে করা যেত না। বরং তা করা যেত এক নতুন জাতিভেদহীন, কুসংস্কারমুক্ত এবং সমতাবাদী ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

[দুই]

ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য যাচাই করার স্থান সম্ভবত এখানে নেই। সাম্প্রতিক কালে বহু ইতিহাসবিদ্ ঐ ব্যাখ্যার মূল সূত্র-গুলিকে এবং উপাদানসমূহকে দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন। আমরা পাঠকের কাছে তাঁদের রচনাবলীর উল্লেখ করছি।[৭৬] এখানে আমরা কেবল আরেকবার বলতে চাই যে প্রাক্-১৯৪৭ ভারতে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও প্রচার এবং সাম্প্র-দায়িক রাজনীতির বৃদ্ধিতে এই ব্যাখ্যা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৭-এর পরও তা সেই ভূমিকা পালন করে আসছে। বস্তুত, কতকগুলি দিক থেকে তার শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমানে তা গবেষণার স্তরে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যপুস্তকে সমর্থন লাভ করেছে, এবং স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে এবং জনপ্রিয়

'সহজপাঠ্য' বইয়ে তার আজও ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব মেলে। উপন্যাস, কবিতা, গল্প, জনপ্রিয় পত্রপত্রিকা এবং শিশুদের পত্রিকা, গল্পের বই এবং কমিকেও তার সাহিত্যিক ও চিত্রানুগ প্রকাশ ঘটে।

টীকা

১। ১৯৪৭-এর পূর্ববর্তী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের তিনটি মূল গ্রন্থে এটা স্পষ্ট বেরিয়ে আসে। বই তিনটি হল : ভি. ডি. সাভারকরের "হিন্দুত্ব", হিন্দু মহাসভায় তাঁর সভাপতি ভাষণসমূহের সংকলন "হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন", এবং এম এস. গোলওয়ালকারের "উই"।

২। উদাহরণস্বরূপ, ভি.ডি. সাভারকর, "হিন্দুত্ব", পৃঃ ৭৫-৭৭।

৩। এ. এন. বিদ্যালংকার, "ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন অ্যাণ্ড টিচিং অফ হিস্ট্রি", পৃঃ ৩-এ উদ্ধৃত।

৪। লাজপত রাই, "অটোবায়োগ্রাফিকাল রাইটিংস", পৃঃ ৭৭।

৫। মহম্মদ আলী, "সিলেক্টেড রাইটিংস অ্যাণ্ড স্পীচেস্", পৃঃ ৭৮।

৬। পৃঃ ৪৫ দ্রষ্টব্য।

৭। ১৯৪৭-এর পরবর্তী কালের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদরা ১৯৪৭-এর পূর্বে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও কাঠামো সৃষ্টি করেছিল এবং যা তাঁরা সচেতন বা অবচেতনভাবে আত্মস্থ করেছিলেন তা তাঁদের গবেষণায় গ্রহণ করেন। তাঁরা নতুন কোনো চিন্তা বা তত্ত্ব সৃষ্টি করেন নি। বহু সময়ে তাঁরা কেবল উন্নততর মানের গবেষণালব্ধ তথ্য দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করেছিলেন।

৮। অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক সাধারণীকরণকেই সহজে এভাবে দেখানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় ইতিহাসকে হিন্দুযুগ ও মুসলিম যুগে বিভাজন প্রথম করেন জেমস মিল, তাঁর "দ্য হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া"তে।

৯। তারা চাঁদ, "হিস্ট্রি অফ ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া", ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৪-৮৫ তে উদ্ধৃত।

১০। এই দিকটি ভাই বীর সিংয়ের উপন্যাসগুলিতে স্পষ্ট ও নাটকীয় ভাবে বেরিয়ে আসে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্মলগ্নে লিখতে গিয়ে ভাই বীর সিং ইতিহাসের এক 'দ্বিবিধ' বা দুমুখো সাম্প্রদায়িক ভাষ্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলিম ও হিন্দু, উভয়েরই প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান ঘটানো। তাঁর নায়ক-নায়িকারা পাষণ্ড মুসলিমদের দ্বারা নিপীড়িত হতেন, এবং কাপুরুষ হিন্দুরা তাঁদের অরক্ষিত অবস্থায় ত্যাগ করত। হয় বীর শিখরা তাঁদের মুসলিম স্বৈরতন্ত্র ও হিন্দু কাপুরুষতার হাত থেকে রক্ষা করতেন, অথবা তাঁরা সাহসী ও বীর পুরুষ ও নারীর চরিত্র লাভের জন্য শিখ হয়ে যেতেন। এ প্রসঙ্গে হরজোত ওবেরয়ের "লিটারেচার অ্যাণ্ড স্যোসাইটি : অ্যান অ্যাপ্রোচ টু দ্য নভেলস্ অফ ভাই বীর সিং" দ্রষ্টব্য।

১১। এম এ জিন্না, "স্পীচেস্ অ্যাণ্ড রাইটিংস", ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১।

১২। ভি ডি সাভারকর, "হিন্দুত্ব", পৃঃ ৩৪-৩৬। এছাড়া, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ১৩৩-এ হিন্দু মহাসভার কাছে ১৯৩৯-এ তৎকর্তৃক প্রদত্ত সভাপতির ভাষণও দ্রষ্টব্য। ১৯৪৭-এর পর এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষাজগতের স্তরে ব্যক্ত হয়। ভারতে, ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত "দ্য হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পীপল"-এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড রূপে প্রকাশিত "দ্য দিল্লী সুলতানাট" গ্রন্থে আর. সি মজুমদার লেখেন যে মধ্যযুগের ভারত "স্থায়ীভাবে দুটি শক্তিশালী এককে বিভক্ত ছিল যাদের প্রত্যেকের ছিল নিজের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব, ফলে যাদের

মিলন বা এমন কি স্থায়ী নিবিড় সমন্বয় সাধ্য ছিল না"। ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ xxviii। পাকিস্তানে, ইশতিয়াক্ আহমদ কুরেশী নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত "দ্য মুসলিম কমিউনিটি অফ দি ইন্দো-পাকিস্তান সাব-কণ্টিনেণ্ট"-এ লেখেন, "উপমহাদেশের মুসলিমরা সব সময়েই স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিলে যেতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাঁদের স্বতন্ত্র চরিত্র বজায় রাখতে প্রয়াস করেছিলেন।"

১৩। এম. এস. গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ১৯। কয়েক পৃষ্ঠা আগে তিনি লিখেছিলেন, "যদিও গত এক হাজার বছর বা তার কম কিছুকাল যাবৎ দেশের বিভিন্ন অংশে খুনে ডাকাতদের দল ছেয়ে গেছে, তবু দেশ পরাধীন হয় নি, আয়ত্বাধীনে আনাতো দূরের কথা। এই সমস্ত বছর ধরে দেশ এই দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে এবং সেই মহান সংগ্রাম আজও অদম্যভাবে চলেছে, এবং তাতে উভয় পক্ষের সাফল্য হচ্ছে কম বেশী। সংক্ষেপে বলা চলে, আমাদের ইতিহাস হচ্ছে বহু হাজার বছরের হিন্দু জাতীয় জীবনের বিকাশের, এবং তারপর গত দশ শতাব্দী ধরে অপ্রতিহত সংগ্রামের ইতিহাস যার শেষ আজও হয় নি।" ঐ পৃঃ ১৭-১৮।

১৪। ভি. ডি সাভারকর, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ২৬।

১৫। এম. এস. গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ২৬-২৭, ৫৩-৫৬।

১৬। দ্রঃ, ভি. ডি. সাভারকর, "হিন্দুত্ব", এবং এম.এস গোলওয়ালকার, "উই"। গোলওয়ালকার ও সাভারকর জাতির সংজ্ঞা দিতে 'রেস' (race) বা একই রক্তের ধারণারও ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু প্রথম জন সচেতন ছিলেন যে মুসলিম এবং হিন্দুদের 'রক্ত' এক। তিনি তাই 'রেসের মানস'-এর (race spirit) কথা বলেছিলেন, যা নাকি ধর্ম পরিবর্তনের ফলে হারিয়ে গিয়েছিল। "উই", ২য় ও ৩য় অধ্যায়।

১৭। পৃঃ ৫৫-৫৬।

১৮। ঐ, পৃঃ ৫৫। পৃঃ ২৬-২৭ও দ্রষ্টব্য।

১৯। "উই" বইয়ের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় এরকম উল্লেখ পাওয়া যায়।

২০। ভি ডি. সাভারকর, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ৫০। এছাড়া দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ৬৩-৬৪, প্রভা দীক্ষিত, "কমিউন্যালিসম—এ স্ট্রাগল ফর পাওয়ার", পৃঃ ১৬৮-৭১। অন্য কেউ কেউ আরো এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা বলেন, একথা গ্রহণ করা যায় না যে এ দেশ "যৌথভাবে তাদের মালিকানাধীন ছিল, যারা হয় নিজ দেশ থেকে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় চেয়েছিল, বা প্রাক্তন হিন্দুদের উত্তরাধিকারী যারা ক্ষমতা বা অর্থের লোভে, বা ভয়ে তাদের মহিমান্বিত ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, অথবা যারা সেই সব বর্বর আক্রমণকারীদের উত্তরাধিকারী যারা আমাদের পবিত্র ভূমি বিনষ্ট করেছিল, আমাদের পবিত্র মন্দির ধ্বংস করেছিল···এ দেশ তাদের হতে পারে না ; তাদের যদি এখানে থাকতে হয়, তবে তাদের একথা মেনে নিয়েই থাকতে হবে যে হিন্দুস্থান কেবল হিন্দুদের দেশ, আর কারো নয়।" ইন্দ্র প্রকাশ, "হোয়্যার উই ডিফার", পৃঃ ৬৬, প্রভা দীক্ষিত, ঐ, পৃঃ ১৭১-এ উদ্ধৃত।

২১। এম. এ. জিন্না, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩০। অনুরূপভাবে, মামদোতের নবাব ১৯৪১ সালে বলেন যে "প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীকাল ধরে ভারতে পাকিস্তান বিদ্যমান রয়েছে।" মৈন শাকির, "খিলাফৎ টু পার্টিশন", ২০০-তে উদ্ধৃত।

২২। ভাইসরয় মিণ্টোর কাছে ডেপুটেশন কর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য, রাম গোপাল, "ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্ : এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি (১৮৫৮-১৯৪৭)", পৃঃ ৩৩০-এ উদ্ধৃত। কার্জন এমন কি একথাও বলেন যে সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিমরা কেবল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে

"ক্ষমতার লাগাম" হারিয়ে ফেলছিলেন। এস. গোপাল, "বৃটিশ পলিসী ইন ইণ্ডিয়া, ১৮৫৮-১৯০৫", পৃঃ ২৫৯। এছাড়া দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ১৯৩।

২৩। এম. এ. জিন্না, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯।

২৪। ঐ, পৃঃ ৪০৪।

২৫। জেড. এ. সুলেরি, "মাই লীডার", পৃঃ ১৬২।

২৬। রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬-৭-এ উদ্ধৃত।

২৭। ভি ডি. সাভারকর, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ১৫। এ ছাড়া দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ৬১ ; এম. এস. গোলওয়ালকার, "বাঞ্চ অভ থট্স্" পৃঃ ২৯৪-৯৫ ; ১৯২৫ সালে হিন্দু মহাসভার কাছে এন. সি. কেলকার প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, "ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার", ১৯২৫, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫১। "মুসলিমরা শাসকশ্রেণী ছিল", এবং মুসলিমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছিল, এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব প্রমাণিত হয় যা থেকে, তা হল যে এমন কি দৃঢ় ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে, অসচেতন ভাবে এবং তার পূর্ণাঙ্গ ফলশ্রুতি উপলব্ধি না করে হলেও, ঐ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেন। দ্রষ্টব্য—এ মেহতা ও এ পট্টবর্ধন, "দ্য কমিউন্যাল ট্রায়াঙ্গল ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ১৮২।

২৮। সি ম্যানশারড্‌ট, "দ্য হিন্দু-মুসলিম প্রব্লেম ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৩৩। এই ব্যাখ্যার অন্যতম প্রথম প্রবক্তা ছিলেন লর্ড ডাফরিন। "রিপোর্ট অন ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল রিফর্মস", ১৯১৮, পৃঃ ৯১-এ উদ্ধৃত। এছাড়া দ্রষ্টব্য, জন স্ট্র্যাচী, "ইণ্ডিয়া", পৃঃ ২৩৯, ভি. ডি সাভারকর, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ৬১ ; এম এস গোলওয়ালকার, "উই" পৃঃ ১৯। ঐতিহাসিক স্মৃতি তত্ত্বের সাম্প্রতিক বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, এইচ ভি. হডসন, "দ্য গ্রেড ডিভাইড", পৃঃ ১১ ; কে বি সায়ীদ, "পাকিস্তান—দ্য ফর্মেটিভ ফেস্ ১৮৫৭-১৯৪৮", পৃঃ ১৭৯। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, সুধর চন্দ্র "কমিউন্যাল কনশাসনেস ইন দ্য লেট নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরী হিন্দী লিটরেচার", পৃঃ ১৭৩, ১৭৭-৭৮।

২৯। পৃঃ ১০৫।

৩০। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে মধ্যযুগীয় ঘটনা-লিপিকার, সভাকবি প্রমুখের রচনা থেকে সহজেই এরকম প্রকৃত বা কাল্পনিক ঘটনা খুঁজে বার করা যেত, কারণ তাঁরা তাঁদের জীবিকা উপার্জন করতেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের কীর্তি বা অপকীর্তিকে ধর্মীয় ভিত্তিতে ন্যায্য বলে প্রমাণ করে।

৩১। এম এন. ইসলাম, "বেঙ্গল মুসলিম পাবলিক ওপিনিয়ন অ্যাস্ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য বেঙ্গল প্রেস ১৯০১-১৯৩০", পৃঃ ১৪২-৪৩-এ উদ্ধৃত।

৩২। এম এস গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ১৭-১৯। পরে, তাঁর "বাঞ্চ অফ থটস্"-এ তিনি লিখেছিলেন : "তাদের গত এক হাজার দু'শ বছরের বিধ্বংসীকরণ, লুণ্ঠন ও সবরকম বর্বর অত্যাচারের ঘটনার পূর্ণ ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে যে বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যা, তা তারা সারা দেশ জুড়ে যে নিদারুণ নাশকতা চালিয়েছিল তার অন্যতম ফল। কেবল ভাঙা স্তূপগুলি নয়, বরং একটি ভগ্ন সমাজের এই খণ্ডগুলিও সমানভাবে তাদের বর্বরতার প্রমাণ। মুসলিম ধর্ম ও মুসলিম জনগণের প্রতি আমাদের ভাল ব্যবহার কি এনে দিয়েছে? আমাদের পবিত্র স্থান কলুষিত করা এবং আমাদের জনগণ দাসত্ব বন্ধনে পড়া ছাড়া কিছুই না।" পৃঃ ২৯৪-৯৫।

৩৩। পৃঃ ৩৫ দ্রষ্টব্য।

৩৪। ইন্দ্র প্রকাশ, "এ রিভিউ...", পৃঃ ৪। পরে, তিনি আবার "মহান হিন্দু জাতির সুপ্ত চেতনা—যা পূর্বতন শাসনের স্বভাবসিদ্ধ ধারাবাহিক সন্ত্রাস ও প্রত্যক্ষ সামাজিক ও ধর্মীয়

অবমাননার সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক দাসত্ব বিলুপ্ত হওয়ার দুই শতাব্দীর মধ্যে ভোঁতা হয়ে গেছে, এবং চাপা পড়ে গেছে", তার উল্লেখ করেছিলেন। পৃঃ ২২।

৩৫। পৃঃ ৮১ দ্রষ্টব্য।

৩৬। পৃঃ ২৫ দ্রষ্টব্য। এছাড়া দ্রষ্টব্য, ভি.ডি. সাভারকর, "হিন্দুত্ব", পৃঃ ৩৪-৩৫। ইসলামের "অন্তর্নিহিত" চরিত্রের কথা তুলে এ কথাও বলা হয়েছিল যে মুসলিম নয় এমন কোনো জাতীয়-রাষ্ট্রের (nation state) প্রতি একজন মুসলিম কখনোই অনুগত হতে পারে না। ভি.ডি সাভারকর, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ৬০ ও পৃঃ ১৩৫ দ্রষ্টব্য।

৩৭। পৃঃ ৬৮-৬৯।

৩৮। উদাহরণস্বরূপ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬২৭-৩৬ দ্রষ্টব্য।

৩৯। এফ কে খান দুরানী, "দ্য মীনিং অফ পাকিস্তান", পৃঃ ৬৯-এ উদ্ধৃত।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।

৪১। এমন কি ১৯৭৪ সালেও ইতিহাসবিদ জি সি পাণ্ডে সহ রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন প্রবীণ অধ্যাপক প্রকাশ্যে দাবী করেন যে মুসলিমদের উচিত, তাঁদের পূর্বপুরুষরা যে ধর্মীয় বর্বরতা দেখিয়েছেন তার ঐতিহাসিক ক্ষতিপূরণস্বরূপ স্বেচ্ছায় চাঁদা তুলে সোমনাথ মন্দিরের অন্তত আংশিক পুনর্গঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

৪২. "পিরপুর কমিটি রিপোর্ট" এবং "ইট শ্যাল নেভার হ্যাপেন এগেইন" দ্রষ্টব্য।

৪৩। উদাহরণস্বরূপ, এম.এস. গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ৮, ১০, ১৩ দ্রষ্টব্য।

৪৪। পৃঃ ২২-২৩, ৬৯ দ্রষ্টব্য।

৪৫। পৃঃ ৬২-৬৪, ৭১ দ্রষ্টব্য।

৪৬। উদাহরণস্বরূপ, ভি.ডি সাভারকর, "হিন্দুত্ব", পৃঃ ১৮-২১, ৩৩-৩৪, এবং "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য।

৪৭। ইন্দ্র প্রকাশ, "এ রিভিউ…", পৃঃ ৪। এছাড়া, ভি. ডি. সাভারকর, "হিন্দুত্ব", পৃঃ ৪-৫, ১১১ ; এবং এম. এস গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ৮-১০ দ্রষ্টব্য। এখানে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল, যে সাম্প্রদায়িক লেখকরা অনেক সময়েই যেমন করতেন, ইন্দ্রপ্রকাশ সেভাবেই তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য পাশ্চাত্যের লেখকদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট হাজির করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা হলেন লর্ড কার্জন এবং ম্যাক্স মুলার। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৪৮। ভি ডি. সাভারকর, "হিন্দুত্ব", পৃঃ ৫, ১০-১২, ২০, ২৩-২৪, ২৬, ৩৩-৩৪ এবং "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ৪১-৪২ , এম.এস গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ৭২।

৪৯। এম এস গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ৪৮।

৫০। ভি. ডি সাভারকর, "হিন্দুত্ব", পৃঃ ৭, ১০, ২৪।

৫১। এম. এস গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ১১-১৩।

৫২। যদিও পতনের শুরু দেখানো হয় আরো আগে, যাতে আক্রমণকারীদের হাতে হিন্দু শাসকদের পরাজয় ব্যাখ্যা করা যায়। দ্রষ্টব্য, গোলওয়ালকার, ঐ পৃঃ ১৪।

৫৩। ইন্দ্র প্রকাশ, "এ রিভিউ…", পৃঃ ৪।

৫৪। "রিপোর্ট অফ দ্য কানপুর রায়টস এনকোয়্যারি কমিটি", পৃঃ ১৩০।

৫৫। এম.এস. গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ১৭।

৫৬। ঐ, পৃঃ ৩৬।

৫৭। ভি. ডি. সাভারকর, "হিন্দুত্ব", পৃঃ ৩৪।

৫৮। এম. এস. গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ৬৮-৭০।

৫৯। ঐ, পৃঃ ৪৯।

৬০। ইন্দ্র প্রকাশ, "এ রিভিউ…", পৃঃ ৬।

৬১। ভি. ডি. সাভারকর, "হিন্দুত্ব", পৃঃ ৩৮-৫৬, ৬৩-৬৪, এবং "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ১৫-১৬,-৩০, ৩৯-৪০, ২৯৩-৯৪ ; এম.এস. গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ১৪-১৫, ৬৯।

৬২। ভি. ডি. সাভারকর, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ৪০। তিনি এর আগে "হিন্দুত্ব" গ্রন্থে লিখেছিলেন : "শিবাজীর নেতৃত্বে হিন্দু শক্তির উত্থান সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দুদের মনকে বিদ্যুৎ চমকিত করেছিল। শোষিতরা তাঁকে একজন অবতার ও ত্রাতারূপে দেখত।" পৃঃ ৪৭।

৬৩। পৃঃ ৫৩ দ্রষ্টব্য।

৬৪। পৃঃ ৩৬ দ্রষ্টব্য। বস্তুত, এই বইয়ের ১১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সাভারকর ২০ পৃষ্ঠার বেশী ব্যয় করেছিলেন হিন্দু পুনরুত্থানের প্রসঙ্গে। পৃঃ ৩৮-৫৬, ৬৩-৬৪ দ্রষ্টব্য।

৬৫। এই দিকটির উপর বিস্তৃত আলোচনার জন্য রোমিলা থাপার প্রমুখ রচিত "কমিউন্যালিসম অ্যাণ্ড দ্য রাইটিং অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি", পৃঃ ৫৪-৬১ দ্রষ্টব্য।

৬৬। ভি ডি সাভারকর, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ৩০, ৪৩ ; এম. এস. গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ১৫, ৬৭।

৬৭। এম. এস. গোলওয়ালকার, "উই", পৃঃ ১৫ ; ভি. ডি. সাভারকর, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ৪৩।

৬৮। অথবা, এম.এস. গোলওয়ালকারের ভাষায়, আমরা হিন্দুরা একই সঙ্গে একদিকে মুসলিমদের সঙ্গে আর অন্যদিকে বৃটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত।" "উই", পৃঃ ১৯। ঐ, পৃঃ ১৬-১৮ ; ভি ডি. সাভারকর, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ১৭, ২১, ৫১, ৭১-৭৩ দ্রষ্টব্য।

৬৯। ভি.ডি. সাভারকর, "হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন", পৃঃ ৬৩।

৭০। আর.এস. শর্মা, "আসপেক্টস অফ পলিটিক্যাল আইডিয়াস্ অ্যাণ্ড ইনস্টিটিউশনস ইন এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৩-১৩, ৪৪ ; রোমিলা থাপার, "এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান স্তোশাল হিস্ট্রি", পৃঃ ১৩। অনুরূপ পদ্ধতিতে, ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের জনক দাদাভাই নওরোজী প্রাচীন যুগের ব্রিটিশ সভ্যতার নিম্নমানের সঙ্গে তার সমসাময়িক ভারতীয় সভ্যতার শিখরের তুলনা করেছিলেন।

৭১। এই প্রচেষ্টা অজ্ঞদের হাতে পড়ে মাঝে মাঝে হাস্যকর ফলাফল সৃষ্টি করত। যেমন, ১৯৪৫-৪৬-এ ফিরোজ খান ন্যুন চেঙ্গিজ খানের গণহত্যার গুণগান করেছিলেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে তাঁর নামে যেহেতু "খান" ছিল, তাই তিনি ছিলেন এক মহান মুসলিম দিগ্বিজয়ী। এ কথা সুবিদিত যে চেঙ্গিজ খান ছিলেন টেঙ্গিরি নামক দেবতার উপাসক মোঙ্গোল যাযাবর ধর্মে বিশ্বাসী, এবং তিনি 'বিরাট সংখ্যক' মুসলিম হত্যা করেছিলেন। এম. হাবিব, "চেঙ্গিজ খান অ্যাণ্ড দ্য মোঙ্গোলস্" দ্রষ্টব্য।

৭২। পৃঃ ২০৭-৮।

৭৩। সৈয়দ তুফাইল আহমদ ম্যাঙ্গালোরির "মুসলমানোঁ কা রোশন মুস্তাকবিল"-এ এম বশিরুদ্দিন রচিত "মুখবন্ধ" ও ম্যাঙ্গালোরি রচিত "ভূমিকা" ও ১ম অধ্যায়ে এই বিশ্বাসের ব্যাপক বিস্তৃতি দেখানো হয়েছে। ম্যাঙ্গালোরির এই বইটি লেখার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল এই বিশ্বাসকে খণ্ডন করা।

৭৪। এই "বিবাদের" শ্রেণী চরিত্রের জন্য বর্তমান গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭৫। জেড. এ. সুলেরি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১-২৩, ৬১-৬৫।

৭৬। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য ইরফান হাবিব, "দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ হিস্টোরিয়ানস্ টু দ্য প্রসেস অফ ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ইন ইণ্ডিয়া—মিডিওভ্যাল পিরিয়ড", এবং "ইকনমিক হিস্ট্রি অফ দ্য দিল্লী সুলতানেট—অ্যান এসে ইন ইণ্টারপ্রিটেশন" রোমিলা থাপার, প্রমুখ,

প্রাগুক্ত ; আর. এস. শর্মা, প্রাগুক্ত ; রোমিলা থাপার "পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজুডিস্", "ইন্টারপ্রিটেশনস অফ এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি" ; হরবনস মুখিয়া, "কমিউন্যালিসম : এ স্টাডি ইন ইটস্ সোশিও-হিস্টোরিক্যাল পার্স্পেক্টিভ" ; সতীশচন্দ্র, "কমিউন্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি", "হিস্ট্রি রাইটিং ইন পাকিস্তান অ্যাণ্ড দ্য টু-নেশন থিয়োরী", এবং "জিজিয়া অ্যাণ্ড দ্য স্টেট ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং দ্য সেভনটিন্থ সেঞ্চুরী", "কানপুর রায়টস এনকোয়্যারি কমিটি রিপোর্ট" ; ইকতিদার আলম খান, "মুঘল নোবিলিটি অ্যাণ্ড আকবরস্ রিলিজিয়াস পলিসী" ; এম. আথার আলি "দ্য মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার আউরঙজেব", "কসেস অফ দ্য রাঠোর রেবেলিয়ন অফ ১৬৭৯", এবং "দ্য রিলিজিয়াস ইস্যু ইন দ্য ওয়ার অফ সাকসেশন" ; তারা চাঁদ, "সোসাইটি অ্যাণ্ড স্টেট ইন দ্য মুঘল পিরিয়ড"।

৮

ব্রিটিশ নীতির ভূমিকা

[এক]

আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশের জন্য ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ নীতির এক বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। ব্রিটিশরা এর সুযোগ নিয়েছে, একে উৎসাহ দিয়েছে এবং অবশেষে ১৯৪৬-৪৭-এ এটাকে ভয়ঙ্কর আকার নিতে সাহায্য করেছে।

প্রথমে ঔপনিবেশিক শাসকদের এবং বর্তমানে কিছু গবেষকদের এই দৃষ্টি-ভঙ্গিকে অবজ্ঞাভরে দেখা একটা প্রচলন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা হয়েছে যে এই দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের[১] চাহিদা মেটাতে বা তার উন্নতি-সাধন করতে, এবং এখন সেটা জাতীয়তাবাদী ঘোর, একদেশদর্শীতা বা অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সমালোচনার একটি সাম্প্রতিক প্রকাশ ঘটেছে গোপাল কৃষ্ণর লেখায়, যিনি একটি ইতিহাস-রচনা সম্বন্ধীয় সমীক্ষা প্রবন্ধে লিখেছেন:

> "প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সাম্প্রদায়িকতাবাদের (বিশেষত মুসলিম সাম্প্র-দায়িকতাবাদের) যে তত্ত্ব জাতীয়তাবাদী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল তা হল, সাম্প্রদায়িকতা **আবশ্যিকভাবে ব্রিটিশ নীতি-প্রসূত**...। এটা একটা জাতীয়তাবাদী যুক্তি, যার বিকাশ ঘটেছে, ফিরে তাকালে মনে হয়, ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা ন্যায্য হয়ে নয়, বরং জাতীয় আন্দোলনের সমকালীন চাহিদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।[২] (জোর আরোপিত)

একইভাবে, ফ্রান্সিস রবিনসন লিখেছেন: "দ্বিতীয় মত হল, ব্রিটিশরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে **ভারতীয় সমাজে বিভাজন ঘটিয়েছে**...ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে এই যুক্তি ছিল বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। তাঁরা তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের, হিন্দু-মুসলিম

সংস্কৃতির যে সমন্বয় গড়ে উঠেছিল, তাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন।[৩] (জোর আরোপিত)

এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনাকে ধূলিস্মাৎ করার এবং ব্রিটিশের ভূমিকাকে 'আড়াল করার' একটা পথ হল সমালোচনা-টাকে এমন চরম বা সরল আকারে উপস্থিত করা যাতে সেটা হাস্যকর বা অবা-স্তব মনে হয়। ধরেই নেওয়া হয় যে এই সমালোচনা বলতে চায়, সাম্প্রদায়িকতা "আবশ্যিকভাবে ব্রিটিশ নীতির ফলস্বরূপ'; অথবা রাজনীতিতে ধর্মের যোগা-যোগ বা সাম্প্রদায়িক বিরোধের পুরো ব্যাপারটাকেই ব্রিটিশরা আকাশ থেকে পেড়ে এনেছিল, ব্রিটিশ শাসনই সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ও বিকাশের জন্য এক-মাত্র দায়ী ছিল, অথবা সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা রাজনীতির পুরো দায়িত্ব ব্রিটিশ নীতির ঘাড়ে দেওয়া যায়। এভাবে এক কাগুজে বাঘ তৈরী করা হয় যাকে এক ফুঁ দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া যায়।

নিশ্চিতভাবেই, 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল'—এই ব্রিটিশ নীতি সফল হতে পেরে-ছিল, সমাজের আভ্যন্তরীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ভিতর কিছু একটা তার সাফল্যে সহায়তা করেছিল বলে। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে এই অবস্থাগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান ও বিকাশ এবং 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতির বিশেষভাবে অনুকূল ছিল, এবং সাম্প্রদায়ি-কতাবাদ বাড়তে পেরেছিল শুধু তা ঔপনিবেশিকতাবাদের রাজনৈতিক চাহিদা মেটাতে পেরেছিল বলে নয়, ভারতীয় সমাজের কোনো কোনো অংশের সামা-জিক চাহিদাও মেটাতে পেরেছিল বলে।

নীচুতলার রাজনৈতিক কর্মীদের[৪] গণ-আন্দোলনের স্তরে যাই বলা হয়ে থাক না কেন, কোনো দায়িত্বশীল নেতা বা লেখক কখনো বলেন নি যে সাম্প্রদায়ি-কতাবাদের জন্য ব্রিটিশ শাসন একমাত্র দায়ী ছিল অথবা এই সাম্প্রদায়িকতাবাদের সৃষ্টির জন্য মূলতঃ দায়ী ব্রিটিশ নীতি বা উপনিবেশবাদকে দূর করলে সমস্যা আপনা থেকেই মিটে যাবে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকরা যা বলেছেন তা হল, ঔপ-নিবেশিক প্রভুরা 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতি অনুসরণ করেছিল, সাম্প্রদায়িক-তাবাদকে উৎসাহ ও সমর্থন যুগিয়েছিল এবং নিজেদের শাসন বজায় রাখার জন্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে ব্যবহার করেছিল, আর, তার ফলে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার 'সমাধানের' জন্য ঔপনিবেশিকতার অপসারণ যথেষ্ট না হলেও আবশ্যক শর্ত ছিল। এই প্রশ্নকে ঘিরে এত ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে যে এ ব্যাপারে ব্রিটিশদের দায়িত্ব নির্ধারণ করার অর্থ হল অন্ধ জাতীয়তাবাদী হিসাবে অভিযুক্ত হওয়া। তাই, এই দায়িত্ব নির্ধারণ করার আগে আমি জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রতি-নিধিত্বমূলক দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চাই যে তাঁরা এই সমালোচনার যে উদ্ভট রূপটা সাম্রাজ্যবাদের সাফাই-গায়করা তাঁদের নামে চালায়, তা হাজির করেন নি।

এইরকম জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে, মতিলাল নেহরু ১৯২৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন: "সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ, যা আমাদের বর্তমান সময়ের ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায় যুক্ত করেছে, তার জন্য সরকারই একমাত্র দায়ী নয়" ; এবং "যুক্তফ্রণ্ট ছাড়া বিদেশীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অসম্ভব। বিদেশী শাসন যখন মাথার উপর রয়েছে তখন যুক্তফ্রণ্ট করা সোজা নয়।"[৫] সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর অন্যতম প্রামাণ্য জাতীয় দলিল, কানপুর দাঙ্গা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, ১৯৩১-এ বলা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতাবাদের দায়িত্ব "সেই সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়গুলির যা সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্মের জন্য মূলতঃ দায়ী"। সেই সঙ্গে, এতে আলোচনা করা হয়েছে "ব্রিটিশ নীতি একে বাড়িয়ে তোলা ও বর্তমান সংকট সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা নিয়েছে" তাই নিয়ে। একইভাবে, এতে ব্রিটিশ নীতির ভূমিকা অধ্যয়ন করার সমস্যাটাও সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে: "প্রকৃতপক্ষে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণগুলি এই সমস্যার জন্ম দিয়েছে সেগুলি আবিষ্কার করতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আমাদের সমগ্র ব্রিটিশ শাসনকালের ব্রিটিশ নীতিব অন্তর্নিহিত ধারাটিকে অধ্যয়ন করতে হবে।"[৬]

১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের ভাষণে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন যে কংগ্রেস সবসময়েই "এই যুক্তি উপস্থাপন করেছে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভব কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতির সমন্বয় থেকে যা তৃতীয় পক্ষকে সুযোগ দিয়েছে অন্য দুই পক্ষকে ব্যবহার করার।"[৭] (জোর আরোপিত) এবং, আবার, ১৯৩৬-এ লর্ড লোদিয়ানকে লেখা চিঠিতে তিনি এ ব্যাপারে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী সমালোচনাকে ভাষা দিয়েছিলেন:

> স্পষ্টভাবে কেউ এটা বলতে পারে না যে ভারতে বিভেদের একটি অন্তর্নিহিত ঝোঁক ছিল না, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার সম্ভাবনা যত কাছে আসতে থাকে ততই এর বাড়বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই ঝোঁককে কমিয়ে দেওয়ার জন্য একটি নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল; এটাকে বাড়িয়ে তোলাও সম্ভব ছিল। সরকার দ্বিতীয় নীতিই গ্রহণ করে এবং দেশের সমস্ত বিভেদের ঝোঁককে সবরকমভাবে উৎসাহ যোগায়।"[৮]

এর আগে, ১৯৩৪ সালে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন: "এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার আরেক নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ব্রিটিশ সরকার, ভারতে এই প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্ররূপে, স্বভাবতই তার উপকারী বন্ধুকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছে।"[৯] ১৯৪৩-এ, তাঁর জেলখানার ডায়েরীতে তিনি মন্তব্য করেন:

> "জিন্না আর তার মুসলিম লীগকে কত কিছুর জন্যই জবাব দিতে হবে। ...কিন্তু অন্যকে গালাগাল করে কি কোনো লাভ আছে? ওরা খারাপ ব্যব-

হার করেছে এবং আমাদের দেশ ও স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মানছি—কিন্তু তারপর ?…আমরা ওদের সেটা করতে দিয়েছিলাম কেন ? এটা ঠিকই যে ব্রিটিশ সরকার ওদের সাহায্য করেছে এবং ওদের বাড়বাড়ন্ত হয় এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তাও যথেষ্ট নয়। আমাদের চিন্তায় নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল ছিল, থাকতেই হবে। অন্যকে দোষ দেওয়া কখনোই ভাল নয়।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার একই ধরণের মত প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সাবধান করেছিলেন এই বলে, যে : "মুসলিমদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় এটাই আসলে ভাবনার কথা, কে তাদের ব্যবহার করে তা ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। দোষ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত শনি ঢুকতে পারে না ·।"[১১]

জাতীয়তাবাদী নেতারা বিশ্বাস করতেন যে 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' অথবা একের বিরুদ্ধে অন্যকে লাগিয়ে দেওয়ার নীতি ঔপনিবেশিক নীতির একটি মূলগত দিক ছিল এবং যতক্ষণ না 'তৃতীয় পক্ষ' অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সরকার মঞ্চ ছেড়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সুদূরপ্রসারী সমাধান হতে পারে না। এ থেকেই হয়ত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে খানিকটা ভুল বোঝা হয়েছে।

বহু-সমালোচিত জাতীয়তাবাদী বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকরাও, তাঁদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাতে দোষী ছিলেন না। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় বিশ্লেষক কে. বি. কৃষ্ণ, যাঁকে গোপালকৃষ্ণ ও ফ্রান্সিস রবিনসন উভয়েই, সাম্প্রদায়িকতাবাদের উৎসের জন্য ব্রিটিশ দায়ী, এই উপকথার সৃষ্টি ও প্রচারের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন, তিনি সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক উৎসের দীর্ঘ বিশ্লেষণ করে তারপর লিখেছেন :

> "দেশের সামাজিক অর্থনীতি থেকে উদ্ভূত [ভারতীয় সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীদের মধ্যে] এই সংঘাতগুলি বর্ধিত হয় সামন্তবাদী পরিস্থিতিতে ভারতীয় ধনবাদের বিকাশের যুগে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের, একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগিয়ে দেওয়ার নীতির দ্বারা·· সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা গেলেও, স্বার্থান্বেষণ বা সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে যে সামাজিক শক্তিগুলি, তাদের জয় করার সমস্যার মোকাবিলা করতেই হবে। এখানেই সমাজতন্ত্র, সমস্যার সমাধান রূপে দেখা দেয়।"[১২] (জোর আরোপিত)

এ. আর. দেশাই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন।[১৩] অনুরূপভাবে, রজনীপাম দত্ত, উদীয়মান মধ্যশ্রেণীগুলির মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশ্লেষণ করে লিখেছেন : "এই জমিতেই সরকারী নীতির পক্ষে অন্তর্নিহিত বিরোধগুলিকে খেলিয়ে তাদের উপর একটা গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ হয়েছিল।"[১৪] সি. জি. শাহ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির

আর একজন প্রধান বিশ্লেষক, আরো বিশদভাবে বলেছেন: "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার জন্ম না দিলেও (সাম্রাজ্যবাদই এর জন্ম দিয়েছিল এটা একটা ভুল ধারণা), তার 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে বাড়িয়ে তুলেছিল এবং ব্যবহার করেছিল ভারতে নিজের শাসন বজায় রাখার জন্য।"[১৫] বেণীপ্রসাদও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। যদিও ব্রিটিশরা সাম্প্রদায়িকতাবাদ সৃষ্টি করে নি, "ভারতীয় পরিস্থিতির বিভিন্ন উপাদান ও চাহিদার সঙ্গে গত ৮০ বছর ধরে একটু একটু করে খাপ খাইয়ে নিতে নিতে, ব্রিটিশ সরকার এমন নীতি নিয়েছিল ও কাজ করেছিল যার লক্ষ্য ছিল দুই সম্প্রদায়ের বিরোধগুলিকে জীইয়ে রাখা ও বাড়িয়ে তোলা!"[১৬] বহু-নিন্দিত অশোক মেহতা ও অচ্যুৎ পটবর্ধন পর্যন্ত এই প্রশ্নে কোনো চরম বা বোকার মত সিদ্ধান্ত নেন নি এবং "আমাদের সমাজ-কাঠামোয় বিভেদকারী ঝোঁকগুলির" এবং "গত দেড়শ বছর ধবে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিগুলির" দ্বারা প্রস্তুত "অনুকূল জমির" প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক নীতির সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনাকে উপস্থিত করেছেন।[১৭]

বস্তুত, এই ধরণের সস্তা অভিযোগ এড়াবার জন্যই আমি আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উৎসগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার পর শেষের দিকে "ব্রিটিশ নীতির ভূমিকা" শীর্ষক এই অধ্যায়টি রেখেছি।

[দুই]

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ব্রিটিশ শাসকরা আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সমর্থন, বিস্তার, বৃদ্ধি ও আংশিক সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই ভূমিকা গুরুত্ব পেয়েছিল এই কারণেই, যে তাদের হাতে ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা, যেটা যে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ বা আন্দোলনের রাজনৈতিক ভাগ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। আর যাঁরা এটা দেখিয়েছেন তাঁদের বক্তব্যকে বিকৃত করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ভূমিকাকে অস্বীকার কবার অর্থ সাম্রাজ্যবাদের সাফাই গাওয়া। বস্তুত, এটা ঔপনিবেশিক নীতির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র যা তাকে বাঁচানো বা তার সাফাই গাওয়ার জন্য নয়া-ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদরা ব্যবহার করেন, অনেক সময়ে উচ্চাঙ্গের বিশ্লেষণের নামে।

বস্তুত, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়া, ব্রিটিশ নীতি ছিল সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের নিয়ন্তা। হাজার হোক, সংশ্লিষ্ট সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির—জমিদার থেকে শুরু করে পেটি বুর্জোয়াদের পর্যন্ত—সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক অভাব ছিল, এবং ঔপ-

নিবেশিক রাষ্ট্রের মদত না পেলে তারা বেশীদূর যেতে পারতো না, অথবা যেতে সাহস করত না। এখানে বর্তমানের সঙ্গে তফাৎটা দেখা দরকার। আজ, ভারতে এমন কি একটি দুর্বল ও সমঝোতাপ্রবণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অস্তিত্বও সাম্প্রদায়িকতাবাদকে বাধা দেওয়া এবং জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না দেওয়াকে সম্ভব করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতীয়দের ভাগ করা এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সমর্থন যোগানোর নীতি, উদীয়মান জাতীয় আন্দোলনকে ঠেকাতে ঔপনিবেশিক নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর, বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তার বিকাশের সঙ্গে সমান্তরাল এবং সাংবিধানিক সংস্কার-প্রক্রিয়ার পাশাপাশি, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সক্রিয় সমর্থন করার সরকারী নীতিরও বিকাশ হয়। ব্রিটেনে যে বিকাশমান গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলন ক্রমবর্ধমানভাবে সাম্রাজ্যবাদকে, ও বিশেষত জাতীয় গণ-আন্দোলনকে দমন করার নীতিকে, প্রশ্ন করছিল, তার মোকাবিলা করার জন্যও এই নীতির দরকার হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসকরা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে হাজির করেছিল সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার সমস্যারূপে। এবং সাম্রাজ্যবাদের ন্যায্যতার অন্যান্য তত্ত্বগুলি—উপনিবেশের জনকল্যাণ, সভ্যতার পূণ্যযাত্রা, শ্বেতাঙ্গের ভার, ইত্যাদি—যত বেশী করে আস্থা হারাচ্ছিল, ততই সংখ্যালঘুদের রক্ষার সমস্যা তার প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রপরিচালক, পদস্থ কর্মচারী ও তাত্ত্বিকরা সেই সময়ে বলত যে ব্রিটেনকে ভারত শাসন করে যেতেই হচ্ছে কারণ সে-ই শুধু সংখ্যাগুরুদের প্রভুত্ব, শোষণ ও দমনের হাত থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে সক্ষম।[১৮]

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতির একমাত্র উপাদান ছিল না, যেমন নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য ঔপনিবেশিকতার অস্ত্রাগারে 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' একমাত্র হাতিয়ার ছিল না। যতগুলি সম্ভব সামাজিক গোষ্ঠী ও স্বার্থকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবার ও সামাজিক বিভেদের সংখ্যা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা ছিল; এবং ভারতীয় জনগণকে বিভক্ত করা ও তাঁদের বিকাশমান ঐক্যকে ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল। আঞ্চলিকতা (যেমন বাঙালী বনাম বিহারী, পাঞ্জাবী বনাম বাঙালী, অন্য সকলে বনাম পাঞ্জাবী), ভাষা-বিভেদ, প্রাদেশিক বিভেদ, জাত-সংঘর্ষ অথবা এক জাত যাতে বেশী ক্ষমতা না পায় তার জন্য অন্য জাতকে দিয়ে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করা (পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ বনাম অ-ব্রাহ্মণ), যোদ্ধা বনাম অ যোদ্ধা 'জাতি', কৃষিজীবী বনাম অ-কৃষিজীবী, জমিদার ও কৃষক বনাম শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী, জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি

স্তরে নরমপন্থী বনাম চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী, 'নবীন ভারত' বনাম 'প্রবীণ ভারত', বামপন্থী বনাম দক্ষিণপন্থী; কমিউনিস্ট বনাম রক্ষণশীল, সংস্কারপন্থী বনাম প্রাচীনপন্থী—কোনো সম্ভাব্য বিভেদই সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অচ্ছুৎ ছিল না, কোনো গোষ্ঠীকেই তারা জাতীয় আন্দোলনের মুখোমুখি দাঁড় করবার জন্য ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেনি। এর উপর, জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে তালুকদার, জমিদার, ভূস্বামী, রাজা, বড় ব্যবসায়ী ও ধনপতিদের কায়েমী স্বার্থকে সংগঠিত করার সমস্ত চেষ্টাই করা হয়েছিল। শ্রেণী-বিভেদকেও একেবারে অবহেলা করা হয় নি। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কৃষক ও ভূস্বামী, শ্রমিক ও ধনপতি, এবং ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়েছে। এই-ভাবে, 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' ছিল এক বহুরূপী নীতি, যা ঔপনিবেশিক নীতির একটি মূলগত এবং সর্বব্যাপ্ত উপাদানে পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিক কারণে সাম্প্রদায়িকতাই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে ও সবচেয়ে কার্যকর হতে পেরেছিল।

সাধারণত, মুখ্য ব্রিটিশ নীতি-নির্ধারকদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয় যে ব্রিটিশরা 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতি অনুসরণ করেছিল বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ব্যবহার করেছিল। ম্যালকম (১৮১৩) এবং এলেনবরো (১৮৪৩) থেকে শুরু করে ডাফরিন, কলভিন, কার্জন এবং মিণ্টো হয়ে অলিভার, বার্কেনহেড এবং চার্চিল পর্যন্ত নেতাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়, এবং তা দেওয়া সহজ। এটা একটা যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পদ্ধতি। কিন্তু আমরা এখানে তা অনুসরণ করব না, যেহেতু, অন্যান্য কারণ ছাড়াও, সেটা অনেক জায়গা নেবে।[১৯] বরং আমরা এই নীতির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে দেখব, কারণ সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি ব্রিটিশ নীতির সমালোচকদের যে প্রতি সমালোচনা করা হয়, অথবা এই নীতির যে সাফাই গাওয়া হয়, তার অনেকটাই আসে এর অন্তর্বস্তুকে এবং এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে বোঝার ব্যর্থতা থেকে।

[তিন]

ভারতে ব্রিটিশ শাসকরা কোনো বিশেষ 'সম্প্রদায়' বা সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি ভালবাসা থেকে সেই 'সম্প্রদায়' বা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করে নি। 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল'—এই ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য ছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনীতির বিকাশকে খর্ব করা, তাদের সমন্বয় ও ঐক্যকে খর্ব করা, ভারতীয় জাতিগঠনের প্রক্রিয়াকে বিশৃঙ্খল করা। যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন শুরু হয়, তখন থেকে এই নীতিকে পরিচালিত করা হয় তার বিকাশকেও খর্ব করার দিকে, তার প্রকৃত বা সম্ভাব্য সমর্থকদের বিভক্ত করে

এবং মুসলিমদের (যেমন জমিদার, পুঁজিবাদী, পাঞ্জাবী প্রমুখদেরও) এতে যোগ দেওয়া থেকে বিরত করে। জাতীয়তাবাদী আক্রমণের মোকাবিলা করার এবং নিজেদের শাসন বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশদের দরকার ছিল ভারতীয় জনগণের কিছু অংশের মধ্যে সমর্থন পাওয়া, কিছু রাজনৈতিক সমর্থনভূমি তৈরী করা। যে দীর্ঘমেয়াদী নীতি নেওয়া হয়েছিল তা ছিল এক একটা সময় এবং এক একজন শাসনকর্তার ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিরোধ, রাজনীতি ও সংগঠনকে শক্তি যোগানো। এটা ভারতীয়দের বিভক্ত করবে, যাতে তারা একে অপরের সঙ্গে শত্রু হিসাবে লড়াই করে, এবং এইভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তিদের সমর্থন পাওয়া যাবে, যেহেতু তারা অন্য সম্প্রদায়কেই প্রধান ও আশু শত্রু বলে ধরবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রতি সরকারী সমর্থন কোনো হিন্দু-বিরোধী নীতির অঙ্গ ছিল না, জাতীয়তাবাদ-বিরোধী নীতির অঙ্গ ছিল। এই কারণেই জাতীয় কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠন আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও, ব্রিটিশ নীতি-নির্ধারকরা শুধু উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকেই ভয় পায় নি, ভারতীয় জনগণকে একটি জাতিতে পরিণত করার জন্য তার প্রচেষ্টাকেও ভয় পেয়েছিল।

ব্রিটিশের সরকারী দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি ছিল না, তা ছিল তাকে নিজের বিশেষ স্বার্থে ব্যবহার করার প্রতি। 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' কোনো বিকৃত নীতি ছিল না। নিজেদের জন্য, অথবা বিকৃতরুচি বা বিদ্বেষ থেকে ভারতীয় সমাজকে বিভক্ত করাটাই লক্ষ্য ছিল না। এই নীতি নিজেদের অথবা নীতির খাতিরে অনুসৃত হয় নি, হয়েছিল জাতীয়তাবাদী চ্যালেঞ্জের মুখে ঔপনিবেশিক শাসনকে টিঁকিয়ে রাখার এক ব্যাপকতর রাজনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে। আরো অন্যান্য কারণের সঙ্গে এটা শুধু যতদূর দরকার ততদূরই ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, এর ধরণধারণ সবসময় সমান ছিল না। ঔপনিবেশিক রাজনীতির পরিবর্তমান চাহিদা ও পরিবর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে। অঞ্চলবিশেষেও এর ফারাক ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা বা উত্তর প্রদেশের মত একপেষেভাবে পাঞ্জাবে এটাকে প্রয়োগ করা হয় নি, ১৯১১-র আগে এবং ১৯৩০-এর পরে যতখানি, এর মাঝখানে, ততটা সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় নি। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা এসেছে কেবল ১৯৩৯-এর পর।

তার উপর, এই নীতির আবশ্যিকভাবে কোনো সুসংগঠিত পরিকল্পনা ছিল না, বা কোনো একজন শাসনকর্তা বা নীতি-নির্ধারক কোনো এক বিশেষ দিন থেকে নকশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই ধরণের নীতি কোনো একটি সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের থেকে বিকশিত হয় না। সমস্ত নীতি-নির্ধারক

পদস্থ কর্মচারীদের সম্পূর্ণ জ্ঞান বা সম্মতি না থাকলেও তা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। এর বিকাশ অনেকটা বাজারের সিদ্ধান্তগুলির মত, যা কোনো ধনপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে ধনবাদী স্বার্থ বা মুনাফার দ্বারা পরিচালিত। 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' এর ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসনকে টি ঁকিয়ে রাখা মুনাফার জায়গা নেয়।

এই নীতি আচম্বিতে ভারতীয় সমাজের বাইরে থেকে তার উপর চেপেও বসে নি। আগেই দেখানো হয়েছে, ভারতীয় সমাজের মধ্যেই বিভেদের ঝোঁক-গুলি অবস্থান করছিল এবং গড়ে উঠছিল। সংহতির শক্তিগুলিও সক্রিয় ছিল। রাষ্ট্র, তার বিরাট শক্তি নিয়ে, হয় জাতীয় সংহতিকে নয়তো সমস্তরকম বিভেদকে মদত দিতে পারতো। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, ঔপনিবেশিক হওয়ার দরুন, দ্বিতীয় পন্থাই বেছে নিয়েছিল।

একটি কারণ, যার জন্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করতে পেরেছে এবং এই নীতিকে সফল করে তুলতে পেরেছে, তা হল, এই দুইয়েরই সামাজিক ভিত্তি ছিল সাধারণভাবে জাগীরদারী উপাদানগুলির, এবং বিশেষভাবে, ভূস্বামী ও আমলাদের মধ্যে, যারা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেরাও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিদেব প্রকল্পিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সম্পর্কে শঙ্কিত হচ্ছিল। তাছাড়া, সাম্প্রদায়িক দাবী-গুলি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দেয়নি বা ঔপনিবেশবাদকে দুর্বল করে দেয় নি।

'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' ছিল এক জটিল ও সূক্ষ্ম নীতি। এর সমালোচকরা এবং তাঁদের সমালোচকরা, উভয়েই একে একটু সরলীকৃত বা স্থূলভাবে বুঝেছেন। হয়তো কেবল শেষের দিকে ছাড়া খুব কম সময়েই তা পদস্থ কর্মচারীদেব ষড়যন্ত্রের চেহারা নিয়েছিল। আমরা দেখব যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বড় একটা প্রকাশ্য এবং ব্যাপক সমর্থন জানায়নি। তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়ে-ছিল তাদের দাবীকে তাড়াতাড়ি মেনে নিয়ে, তাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে, তাদের আন্দোলনকে "ভ্রূকুঞ্চিত করে" না দেখে, তাদের মতাদর্শগত অপপ্রচা-রের বিরুদ্ধে কিছু না করে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রসারিত করে, ইত্যাদি নানাভাবে স্থান ও কালভেদে সমর্থনের মাত্রারও তারতম্য ঘটেছে।

সমস্ত বিভেদকে যে নির্বিচারে সমর্থন করা হয়েছে তা নয়। কিছু বিভেদকে খর্ব করা হয়েছে। যেমন, পাঞ্জাবে, ফজলি হুসেন, সিকান্দার হায়াত খান, ছোটু রাম ও সুন্দর সিং মাজিদিয়ার মত আধা-সাম্প্রদায়িক নেতাদের দিয়ে অকৃষি-জীবীদের বিরুদ্ধে কৃষিজীবীদের ঐক্যের নামে পারস্পরিক সহযোগিতা করানো হয়েছে। তেমনি, ১৯১৬-তে যখন মুসলিম লীগে বম্বে ও উত্তর প্রদেশের মধ্যে এবং খোজা ও সুন্নিদের মধ্যে দ্বিমুখী বিভাজনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তখন

বম্বের গভর্নর হস্তক্ষেপ করেন এবং যে সভায় বিরোধগুলির মীমাংসা হয় তার সভাপতিত্ব করেন।[২০]

একাধিক কারণে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, কেবল শেষের দিকে ছাড়া, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে প্রকাশ্য ও ব্যাপক সমর্থন দেয়নি। অনিয়ন্ত্রিত, চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও বিদ্বেষ এবং চরমপন্থী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল, এবং কোনো কোনো দিক থেকে তার স্বার্থের বিরোধী ছিল। তাই তাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, শুধুমাত্র, 'পোষমানা' অবস্থাতেই উৎসাহিত বা অনুমোদিত করার দরকার ছিল। তার মানে হল, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করার সাধারণ কাঠামোর মধ্যে, ঔপনিবেশিক শাসকরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দমাতে, 'সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠা' এড়াতে এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা কমাতেও চেষ্টা করেছে, বিশেষত যখন তার সঙ্গে 'নীচু শ্রেণীর অশান্ত হয়ে ওঠার' সংযোগ থেকেছে।

জঙ্গী সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক হিংসা শাসনব্যবস্থায় সমস্যা সৃষ্টি করত এবং আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, যাকে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার পক্ষে আবশ্যক হিসাবে দেখা হত, তার পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। স্থানীয় শাসকরাও তেমন সাম্প্রদায়িক গোলযোগকে স্বাগত জানাবেন, এটা আকাঙ্খিত ছিল না। তাই ঔপনিবেশিক শাসকরা সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসাকে উপশম করতে এবং যখন সাম্প্রদায়িক জিগীর খুব উঁচু পর্দায় উঠেছে তখন তাকে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা ভারতীয় জনগণের একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিনা বাধায় এগিয়ে যেতে দেওয়ার থেকে সাম্প্রদায়িকতা যে শাসনব্যবস্থার সমস্যাগুলি সৃষ্টি করছিল তার মোকাবিলা করাটাই শ্রেয় মনে করেছিল। ১৮৯৭ সালে রাষ্ট্রসচিব হ্যামিল্টন ভাইসরয় এলগিনের কাছে যেমন লিখেছিলেন: "কোন্‌টা যে চাওয়া উচিত কে জানে। [ভারতীয়দের মধ্যে] চিন্তা ও কাজের ঐক্য রাজনৈতিকভাবে ভীষণ ক্ষতিকর হবে, চিন্তার বিভিন্নতা ও সংঘাত শাসনকার্যের দিক থেকে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই দুটোর মধ্যে শেষেরটা হবে কম ঝুঁকিপূর্ণ, যদিও তা সংঘাতের জায়গায় যারা উপস্থিত থাকে তাদের উপর উৎকণ্ঠা ও দায় চাপিয়ে দেয়।"[২১]

চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা রাজনীতিতে ধর্মের যোগাযোগও গণরাজনীতির দিকে এবং গণবিক্ষোভের দিকে নিয়ে যেতে পারতো, যা ঘুরে যেতে পারতো ঔপনিবেশিক শাসকদের দিকে, এবং সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাও জাগিয়ে তুলতো। ধর্মীয় স্তরে, ওয়াহাবী আন্দোলন, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ, এবং আকালি আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় এটা নিশ্চিতভাবেই বোঝা যায়। সাম্প্রদায়িক স্তরে, ১৮৯৭-এর কলকাতার দাঙ্গা, ১৯১৩-র

কানপুর মস্‌জিদের ঘটনা এবং ১৯২২-এর মাপ্পিলা বিদ্রোহ এর উদাহরণ। সাম্প্রদায়িকতার বর্শামুখ সরকারের দিকে ঘুরে গেলে তা বাঞ্ছনীয় নয়। সেটা হওয়া উচিত নয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ যেন আওতার বাইরে চলে না যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ১৯৩০-এর দশকে পাঞ্জাবে জঙ্গী খাকসার আন্দোলনের ভাগ্যটা দেখতে পারি। এই আন্দোলনের ভিত্তি ছিল হস্তশিল্পী ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মুসলিমরা এবং এটা শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক ছিল না, গণ আন্দোলন হিসাবেও বিকশিত হয়ে উঠছিল এবং আইন-শৃঙ্খলার প্রতি হুমকী হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এটা কংগ্রেস-বিরোধী ছিল কিন্তু সরকার বিরোধীও হয়ে পড়ছিল। সুতরাং, একে কঠোরভাবে দমন করা হল। অধিকতর মধ্যশ্রেণী-ভিত্তিক, উচ্চমার্গী ও রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভিতর কোনো সরকার-বিরোধিতার সম্ভাবনা আছে কিনা তা খুঁটিয়ে দেখা হল, কিন্তু যখন দেখা গেল যে তার সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার কোনো আশু উদ্দেশ্য নেই তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হল।

সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি জনভিত্তিসম্পন্ন শক্তি হয়ে উঠতে পারে যা সরকারের বিরুদ্ধে ঘুরে যেতে পারে, এই ভয় সরকারী নীতির আরো কয়েকটি দিক ব্যাখ্যা করে দেয়। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের মত অতখানি মদত দেওয়া হয়নি, কারণ হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার দরুন তা এক জনভিত্তিসম্পন্ন শক্তি হয়ে উঠতে পারতো, এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের পক্ষে ততখানিই বিপদ ডেকে আনতে পারতো, যেমন এনেছে আয়ার্ল্যাণ্ডে ক্যাথলিক-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং ইন্দোনেশিয়া ও আরব দেশগুলিতে ইসলামভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।[২২] ঊনবিংশ শতকের শেষে গোরক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, তাতেই এটা দেখা যায়। তার উপরে, হিন্দুদের দেখা হত জাত ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এবং তারফলে অধিক সংহত মুসলিমদের চেয়ে "সম্প্রদায়গতভাবে" কম বিপজ্জনক রূপে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন তাদেব মধ্যে একটি 'সম্প্রদায়' হিসাবে সংহতি গড়ে তুলতো এবং তাই 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল'-এর বিপরীত কাজ করত। সুতরাং, ব্রিটিশরা জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে মুসলিম লীগকে ব্যবহার করেছে, হিন্দু মহাসভাকে (যারা তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে যথেষ্ট উৎসুক ছিল) নয়। অনুরূপভাবে, আকালি আন্দোলনের ঐতিহ্যের দরুন, শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কিছু অংশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার দিকে ঝুঁকেছিল এবং তার ফলে বিশেষ সমর্থন পায়নি। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি সমান সমর্থন, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন এবং 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণও ছিল। মুসলিমদের মধ্যেও, যাদের নীতি সরকার বিরোধী, সেরকম সাম্প্রদায়িকতাবাদের, যথা ১৯৩০-এর

দশকের খাকসারদের বা কানপুর মসজিদ আন্দোলনকারীদের, কঠোর হাতে দমন করা হয়েছিল। একইভাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সরকার নবীন মুসলিম নেতাদের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিল, কারণ, সাম্প্রদায়িক ঝোঁক থাকলেও তাদের রাজনৈতিক চিন্তা কংগ্রেসের থেকে কিছু ভিন্ন চেহারা নিচ্ছিল না। অন্যভাবে বলা যেতে পারে পুরোপুরি একমত হলে তবেই সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করা যেত। সরকার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ভোটাধিকার প্রসারিত করতেও অস্বীকার করেছিল, যদিও তার মাধ্যমে একটি প্রধান মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাবী পূরণ হত যেহেতু বাংলা ও পাঞ্জাবে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতা মুসলিম হবে, এটা নিশ্চিত করা যেত। কিন্তু তা সাম্প্রদায়িক নেতাদেরও জনসমর্থন অর্জন করতে বাধ্য করত, এবং সমস্ত, বিশেষত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রদেশগুলিতে, কংগ্রেসের গণভিত্তি দৃঢ়তর করত। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ও বিংশ শতাব্দীর সবসময়েই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনায়করা ও পদস্থ কর্মচারীরা ইসলামী ঐক্যবাদের প্রতি এক বিকারগ্রস্ত নীতি অনুসরণ করে এসেছেন। একদিকে তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতের মধ্যে তাকে তাঁদের 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতির অংশ, এবং 'ইসলামের' বন্ধু সেজে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার শাসকদের দলে টানার পরিবর্তনশীল নীতির অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে; আর অন্যদিকে, তার গণভিত্তির সম্ভাবনা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার দিকে ঝোঁক, তাঁদের মারাত্মক ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

এ বিষয়ে যত্নশীল ও সাবধানী হওয়ার আরেকটি কারণ হল, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি খুব প্রকাশ্য, সক্রিয় ও সর্বাত্মক সমর্থন ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হত, কারণ তা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের শত্রুতা অর্জন করত, তাকে এবং তার সমর্থকদের কংগ্রেসের শিবিরে ঠেলে দিত এবং ভারতের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার দিকে নিয়ে যেত। ঘুরিয়ে বললে, হিন্দুদের হিন্দু হিসাবে বিশেষ চটানো যেত না। ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের অনেকে এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। যেমন, ভাইসরয় আরউইন ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জন সাইমনকে লিখেছিলেন: "আমি পারতপক্ষে চাই না যে সরকার এবং হিন্দু রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিরোধিতা স্থায়ী হয়ে বসুক।"[২৩] তার আগে, ১৯২৭-এ, কেন পাঞ্জাবের গভর্নর হেইলী হিন্দু মহাসভার মনোহর লালকে ইউনিয়ন পন্থী ছোটু রামের জায়গায় মন্ত্রীপদে বসিয়েছিলেন, রাষ্ট্রসচিবের কাছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরউইন লিখেছিলেন: "হেইলীর সমস্যাটা ছিল যে পুরোনো মন্ত্রীসভা নিয়ে চলতে গেলে হিন্দুদের দলকে চিরদিন বাদ দিয়ে রাখা হত···হয়তো তারা আবার বিরোধী পক্ষে ফিরে যেত··· এবং হয়ত স্বরাজের দিকে।"[২৪] ১৯২৬-এর নির্বাচনে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিরা স্বরাজ্যপন্থী জাতীয়তাবাদীদের থেকে বেরিয়ে আসে, তাদের চূড়ান্ত পর্যুদস্ত করে,

এবং তারপর 'হিন্দুদের সার্থরক্ষা করার জন্য' সরকারকে 'মুসলিমদের পক্ষাবলম্বী' নীতি থেকে 'নিরস্ত' করার জন্য সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে সহযোগীতার নীতি অনুসরণ করে। হেইলীর মনে হয়েছিল যে এদের অবহেলা করে শুধু মুসলিম ও ইউনিয়নপন্থীদের উপর ভরসা করলে এরা আবার জাতীয়তাবাদী "চরমপন্থীদের" দিকে চলে যাবে।[২৫] আরো আগে, ১৯০৯ সালের জানুয়ারীতে মরলি মিন্টোকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে "আমাদের যত্নশীল হতে হবে যেন মুসলমানদের তুলে নিতে গিয়ে আমরা আমাদের হিন্দু পার্সেলগুলিকে ফেলে না যাই।" যাই হোক, তিনি বলেছিলেন, এটা পরিস্কার যে শাসনকর্তাদের "মুসলিমদের পথেই" যেতে হত, যদিও তা করতে "আমরা কতদূর তৈরী আছি বা হতে পারবো তা বলা অসম্ভব।"[২৬] অনুরূপভাবে, উত্তর প্রদেশের গভর্নর মেসটন মিউনিসিপ্যাল কমিটিগুলিতে মুসলিমদের বিরাট গুরুভার রাখার, তাঁব পুর্বসূরী অনুসৃত নীতিকে পাল্টে দেন, কারণ তা "হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষের ঝড় তুলবে, যা মুসলিমদের দিয়ে আমাদের যতটা লাভ হবে তার থেকে বেশী ক্ষতি করবে।"[২৭] হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে বিরোধের দিকে নিয়ে যেতে এই দ্বিধা থেকে বোঝা যায়, কেন শুধু ১৯৩৯-এর পরেই, যখন সরকার হিন্দু জনগণ ও মধ্যশ্রেণীর সমর্থন হারিয়ে ফেলেছিল, যা ১৯৩৭-এর নির্বাচন এবং ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন দেখিয়ে দেয়, তখনই কেবল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সর্বাত্মক সমর্থনের নীতি গ্রহণ করেছিল।

কোনো কোনো অঞ্চল ভারতীয় সাম্রাজ্যে যে বিশেষ রাজনৈতিক স্থান অধিকার করেছিল এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে যে বিকল্প রাজনৈতিক নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল, তার চরিত্রের দরুন সে সব জায়গায় সাম্প্রদায়িকতাবাদকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়েছিল। পাঞ্জাব হল তেমন একটি জায়গা, যেখানে 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল'-র এক ভিন্ন রূপ অনুসরণ করা হয়েছিল। এটা ছিল সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রদেশ। উপরন্তু, সেটা ছিল সাম্রাজ্যের তরবারির ফলা। এখানকার মুসলিম, শিখ, এবং হিন্দু জাট ও রাজপুত জনগণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় অর্ধেক লোক যোগাতো। অনিয়ন্ত্রিত সাম্প্রদায়িক আবেগ ও বিশৃংখলা গ্রামাঞ্চলকে বিভক্ত করত, সেনাবাহিনীর সন্তোষে নাড়া দিত, এবং সীমান্তপ্রদেশের নিরাপত্তাকে অন্যভাবে বিপন্ন করত। তাই পাঞ্জাবে প্রকাশ্য ও বিষাক্ত ধরণের সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, এবং মুসলিম লীগের বদলে ইউনিয়নিস্ট পার্টি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। পাঞ্জাবীদের বিভাজনের চেষ্টা করা হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে নয়, নতুন সৃষ্টি করা কৃষিজীবী-অকৃষিজীবী বিভাগের ভিত্তিতে, যা জমিদারদের নেতৃত্বে কৃষক জাতগুলিকে 'শহুরে' হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজনদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এই বিভাগের আকর্ষণ ছিল এই, যে তা সৈনিকদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে নি, বরং

তাদের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবীদের যে কোনো ধরণের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বাইরে রাখার চেষ্টা করত। সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রতি কোনো সমর্থন হিন্দু জাতগুলির সংহতিকে উৎসাহ দিয়ে ইউনিয়নিস্টদের কৃষিজীবী বনাম অকৃষিজীবী রাজনীতিকে বিপদে ফেলত। ব্রিটিশ শাসকরা তাই মুসলিম লীগের সঙ্গে ইউনিয়নিস্ট পার্টির একীকরণের, অথবা ইউনিয়নিস্ট পার্টির মুসলিম সদস্যরা সারা ভারত মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার পরেও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারের বিরোধিতা করেছে। নগ্ন সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে ইউনিয়নিস্ট পার্টির উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করা হয় কেবল শেষের দিকে, যখন ক্ষমতা হস্তান্তর কাছে চলে এসেছিল এবং এক স্বাধীন ভারতের বিরুদ্ধে এক স্বাধীন পাকিস্তানকে ব্যবহার করার বিকল্প পন্থাটিকে তৈরী করা হচ্ছিল। হিন্দুরা ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য থেকে 'বঞ্চিত' করেছে বলে পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের হতাশাপূর্ণ ক্রোধ হয়তো তাদের মনোভাবের পরিবর্তনের পিছনে একটি ক্ষুদ্রতর বিষয় ছিল।

যাই হোক, পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে একটি প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করলেও, যতক্ষণ তা কৃষিজীবী বনাম অকৃষিজীবীর রণনীতির কাঠামোর সঙ্গে খাপ খেয়েছে, ততক্ষণ তাকে তারা একটি গৌণ বিষয় হিসাবে উৎসাহিত করেছে। ইউনিযনিস্ট পার্টি ও তার শাসক জোটের ভিত্তি ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবে ফজল-ই-হুসেন এবং সিকান্দার হায়াত খানের, মধ্য পাঞ্জাবে সুন্দর সিং মাজিদিয়ার, মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে রাজা নরেন্দ্রনাথ ও গোকুলচাঁদ নারাং-এর, এবং দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবে (হরিযানা) জাট জাতিবাদের আধা-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি।

একই রকম অসাম্প্রদায়িক নীতি মাঝে মাঝে প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে যুক্ত প্রদেশে, যেখানে তালুকদার ও জমিদারদের দেখা হত জাতীয়তাবাদ বিরোধী এবং ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক সবচেয়ে বলিষ্ঠ সামাজিক শক্তি হিসাবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ হিন্দু জমিদারদের থেকে মুসলিম জমিদারদের পৃথক করে তাদের দুর্বল করে দিত। তাই, এই অসাম্প্রদায়িক জমিদারদের উপর ভিত্তি করে ১৮৮০-র দশকের শেষদিকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম প্রকাশ্য বিরোধীপক্ষ গড়ার চেষ্টা হয়, সৈয়দ আহমদ খান এবং রাজা শিবপ্রসাদ ছিলেন কংগ্রেস-বিরোধী ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম নেতা। শুধুমাত্র যখন এই বিরোধীপক্ষ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হল, তখনই সরকার ও সৈয়দ আহমদ খান মুসলিম জমিদারদের কংগ্রেসের মুসলিম বিরোধীপক্ষ হিসাবে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আবার, ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে, অসহযোগ আন্দোলন এবং নির্বাচনী রাজনীতির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে, যুক্তপ্রদেশের সরকার সমস্ত

জমিদারদের একটি আন্তঃসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার জন্য, (রায়তদের মধ্যে যার প্রভাব বাড়ছিল) এবং তার মাধ্যমে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগকে রাজ্য রাজনীতির বাইরে রাখার জন্য। এইভাবে, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে, কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী দল ছিল ন্যাশনাল এগ্রিকালচারিস্ট পার্টি, এবং সরকার তাদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়েছিল মুসলিম তালুকদার ও জমিদারদের মুসলিম লীগ থেকে সরিয়ে ন্যাপ-এর সঙ্গে আনার জন্য।[২৮] এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ন্যাপ সাম্প্রদায়িক ঝগড়া ও অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয় এবং ১৯৩৭-এর নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। জমিদার ও ব্রিটিশরা উভয়েই তারপর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে চলে যায়।

প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক হিংসাকে বরদাস্ত করার ব্যাপারে ব্রিটিশদের অনীহার আরো একটা কারণ ছিল। দেশের শাসক হিসাবে আইন শৃংখলা, ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা ছিল সেই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও ঔপনিবেশিক নৈতিকতার অঙ্গ, যাতে শাসকরা শিক্ষিত হয়েছিল এবং যা উপনিবেশগুলিতে তাদের কাজকর্মের অন্তর্নিহিত নৈতিক ন্যায্যতা যুগিয়েছিল। কোনো সভ্য শাসকরাই তাদের নিজেদের নৈতিকতা না ভেঙে বা তাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি চূর্ণ না করে প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উৎসাহ দিতে বা এমনকি বরদাস্ত করতে এবং দাঙ্গার মুখে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারবে না। ব্রিটিশ শাসকরা বর্বরতার মুখে সেরকম এক নিষ্ক্রিয় নীতি অনুসরণ করতে পেরেছিল কেবল ১৯৪৫-৪৬এ, যখন তারা ভারতে কী হচ্ছে তার জন্য আর নিজেদের দায়ী মনে করেনি এমন কি ভারতীয়রা তাদের বিতাড়িত করেছে, এর যথার্থ প্রতিফল বলে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তাকে ন্যায্যতা দিতে পেরেছে। উপরন্তু, আইন-শৃংখলা ভেঙে পড়লে জনমন থেকে ব্রিটিশ শাসন গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ন্যায্যতা সরে যেত, যা হল আইন-শৃংখলা রক্ষায় তাদের পারদর্শিতা।

[চার]

উপরে আলোচিত কয়েকটি কারণে ১৯৩৭ পর্যন্ত ব্রিটিশরা পরিমিত সাম্প্রদায়িকতাবাদকে উৎসাহিত করেছে, এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে ও তার বল্গাহীন বৃদ্ধি রোধ করতে চেষ্টা করেছে। তাই বাংলার লেফ.টেন্যাণ্ট-গভর্নর ফুলার হিন্দু-বিরোধী ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের অত্যুৎসাহী সমর্থকে পরিণত হলে ১৯০৬ সালে তাঁকে অবসর গ্রহণ করানো হয়। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভূতপূর্ব রাষ্ট্রসচিব জেট্‌ল্যাণ্ড পাকিস্তানের দাবী প্রসঙ্গে ভাইসরয়কে লিখতে পেরেছিলেন : "সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে দেখলে আমার সন্দেহ হয়, সারা ভারত মুসলিম লীগের বর্তমান নেতারা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে যে

রকম মূলগত বিভাজনের কথা ভাবছেন, তা আমাদের উপকারে আসবে কিনা।"[২৯]

এই প্রসঙ্গে এটা দেখা উচিৎ যে প্রথমে প্রশাসকরা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের উৎসাহ দিয়েছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, সংগঠন বা আন্দোলনকে অনু-প্রাণিত করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, মুসলিমদের মধ্যে কোনোরকম আধুনিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন যাতে জেগে উঠতে না পারে, তার জন্য। এই পর্যায়ে ঔপনিবেশিক নীতি ছিল ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিকীকরণ রোধ করা, সাম্প্রদায়িক সহ যে কোনো ধরণের রাজনৈতিক সংগঠনই যে প্রক্রিয়াকে মদত দিতে পারতো। সুতরাং, শুধু মুসলিমদের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত রাখা নয়, তাদের রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখা এবং এমন কি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠনের দিকে যাওয়ার কোনো চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করাও লক্ষ্য ছিল। তাই সৈয়দ আহমদ খান যে চিরকাল বিপুল সরকারী সমর্থন পেয়েছিলেন, তার একটা কারণ হল তাঁর উচ্চশ্রেণীর মুসলিমদের কোনোরকম আধুনিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের বাইরে রেখে তার বদলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করার নীতি।[৩০] ১৮৬০-এর দশকে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সমিতিগুলিতে শিক্ষা ও দর্শন থেকে বিজ্ঞান ও সাহিত্য পর্যন্ত বহু বিষয় আলোচিত হলেও রাজনীতিকে এড়িয়ে চলা হত। তিনি এবং অন্যান্যরা সরকারী উৎসাহে ১৮৯৩ সালে মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতার ও 'মুসলিম' স্বার্থরক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়; কিন্তু এটাও বলে যে তা "মোহামেডানদের ভিতর রাজ-নৈতিক গণ আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করবে"। কোনো রাজনৈতিক সভা করা হবে না, অন্য কোনো মুসলিম সংগঠনকে এর সঙ্গে যুক্ত করাও হবে না। এর একটি লক্ষ্য ছিল তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রাজনীতির দিকে যাওয়ার প্রবণতাকে দমিত করা।"[৩১]

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার মুখে এই নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়, যখন যুক্ত প্রদেশ সরকারের নাগরী প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ মুসলিমরা সেখানে উর্দুর পক্ষে জোরদার আন্দোলন শুরু করে, যাতে আলিগড় কলেজের সচিব মোহসীন-উল-মুলকের মত রক্ষণশীলরাও যোগ দেন। যুক্ত প্রদেশের লেফ.টেন্যাণ্ট-গভর্নর আলি-গড় কলেজের অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁকে ও অন্যান্যদের সব সরকারবিরোধী আন্দোলন বন্ধ করতে, উর্দু ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন তুলে নিতে ও একটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম রোধ করতে বাধ্য করেন।[৩২]

১৯০৫-এর পর যখন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রা-মের নতুন স্তরে প্রবেশ করে, এই ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন করতে হয়। জাতিগঠনের প্রক্রিয়াকে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্মকে

ঠেকাতে নতুন পথ ও পাথেয় খুঁজতে হয়। ভারতীয় সমাজের বিদ্যমান বিভেদ-গুলিকে সক্রিয়ভাবে উস্‌কানি দিতে হয়। সর্বোপরি, রাজনৈতিক ভারতীয়দের পরস্পরবিরোধী সাম্প্রদায়িক শিবিরে বিভক্ত করতে হয়। শুধুমাত্র সংগঠিত রাজ-নৈতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদই এই কাজ করতে পারত। সেই পর্যায়ে ব্রিটিশরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদকে মদত দিয়েছে।

তার উপর, নতুন প্রজন্মের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা অস্থির হয়ে উঠছিল, জাতীয়-তাবাদ, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে এগোতে শুরু করে-ছিল, এবং কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার হুমকী দিয়েছিলো। (আগের একটি অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, প্রায় ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বামপন্থী জাতীয়তাবাদের দিকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল)। এমনকি অনুগত, উচ্চশ্রেণীর মুসলিমদেরও তরুণরা কোনো না কোনো রকম আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। এই ঝোঁককে দমন করা হলেও বেশীদিনের জন্য তা করা যায়নি। মোহসিন-উল-মুলক ১৯০৬ সালের অগাস্ট মাসে আলিগড় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আর্চি-বল্ডকে লেখা দুটি চিঠিতে একথা খুবই পরিষ্কার করে বলেছিলেন। প্রথম চিঠিতে তিনি সাবধান করে দেন যে মর্লির সংবিধান সংশোধনের ঘোষণা "তাদের (তরুণ শিক্ষিত মুসলিমদের) মধ্যে 'কংগ্রেসে' যোগ দেওয়ার প্রবণতা বেশী করে সৃষ্টি করবে।" দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি বলেন যে সারা ভারতবর্ষ থেকে তিনি এই মর্মে চিঠি পেয়েছেন যে "মোহামেডানদের চিন্তা ভাবনা ভীষণভাবে বদলে গেছে ·· লোকে সাধারণত বলে যে সার সৈয়দ আহমদ ও আমার নীতি মোহামেডানদের কোনো ভাল করতে পারে নি ··যে সরকার তার কাজেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে আন্দোলন ছাড়া কোনো সম্প্রদায়ের আর কোনো আশা নেই, এবং যদি আমরা তাদের জন্য কিছু করতে না পারি তবে আমাদের কলেজের জন্য কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা করা উচিত নয়···"। তিনি সাধবান করে দেন যে "যদি আমরা চুপ করে থাকি···লোকে আমাদের ছেড়ে তাদের নিজেদের রাস্তায় চলে যাবে·· "।[৩৩]

সুতরাং, কংগ্রেসের কাছে মুসলিমদের কিছু অংশকে যাতে হারাতে না হয়, তার জন্য পরম্পরাগত অনুগত সাম্প্রদায়িক শক্তিদের আরো সরকারী রাজনৈতিক ছাড় দেওয়া ব্যতীত, কিছু রাজনৈতিক সংগঠন ও আধুনিক রাজনীতিও অনিবার্য ছিল। এগুলিকে আন্দোলনহীন ও সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার দরকার ছিল। অনু-গত অংশগুলিকে এবার রাজনীতিতে উৎসাহ দিতে হল, কিন্তু কেবল সাংবিধানিক, সংসদীয় এবং নির্ভরশীল রাজনীতিতে। তার জন্য, ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ শাসকরা যে মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাবীগুলি এবং উচ্চশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক নেতাদের সমস্ত মুসলিমদের প্রতিনিধি হওয়ার দাবীকে মেনে নিয়েছিল, তার পিছনে, অংশত,

মুসলিমদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও কংগ্রেসে যোগদান করা রোধের উদ্দেশ্য ছিল। স্পষ্টতই, এই নীতিকে 'মুসলিমপন্থী' হিসাবে বর্ণনা করা ভুল। বরং, এর লক্ষ্য ছিল উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলিমদের ব্রিটিশপন্থী করে রাখা।

১৯০৬ সাল থেকে সংসদীয় এবং নির্ভরশীল সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সমর্থন করার নীতি অনুসৃত হয়। যখনই সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গী হয়ে উঠবার চেষ্টা করেছে বা জাতীয়তাবাদীশক্তিদের কাছাকাছি এসেছে, তখনই তাকে নিরুৎসাহ করা, এমনকি তার বিরোধিতা করা হয়েছে। এইভাবে, তরুণ, আধা-সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীদের ১৯০৬ থেকে নীচু চোখে দেখা হয়েছে। জিন্না কখনোই সরকারের সুনজরে ছিলেন না এবং ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে তাঁকে কংগ্রেস নেতাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হত। তাঁর প্রতি সরকারী বিতরাগের অবশেষ ১৯৩৬-৭-এও পাওয়া যায়। ১৯৩৯ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বাত্মক সমর্থন করাও হয়নি, যদিও ১৯৩০-৩৪-এর সাংবিধানিক আলোচনার সময় তাকে একটি প্রধান বিষয় করে তোলা হয় এবং সমবেদনা, বিবেচনা ও ছাড়ের মাধ্যমে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাকে ইতিমধ্যেই উদীয়মান জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে দেখা হয়েছিল।

১৯৩৭ এর পর ব্রিটিশরা সুষম থেকে অনিয়ন্ত্রিত সাম্প্রদায়িকতাবাদের দিকে চলে যায়, সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে উৎসাহ দেয়, মুসলিম লীগের কংগ্রেস-বিরোধী ভূমিকার প্রায় প্রকাশ্য সমর্থন করে এবং তার গণ-চরিত্র পাওয়ার চেষ্টাকে বরদাস্ত করে। ১৯৩৭-এর, সাম্প্রদায়িকতা বেশী বেশী করে ঔপনিবেশিক শাসকদের এবং 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতির একমাত্র আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। এটা ঘটেছিল কারণ প্রায় সমস্ত অন্য বিভাজন, বিদ্বেষ ও বিভেদপন্থা, যেগুলিকে আগে ঔপনিবেশিক প্রভুরা উৎসাহিত ও লালন করেছিল, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনৈতিকভাবে অচল হয়ে পড়েছিল। 'শ্রেণী ও স্বার্থের' ভারসাম্যগুলি, যা মিণ্টো এবং মর্লির সময় থেকে গড়ে তোলা হয়েছিল, নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে হয় তাদের জয় করতে, অথবা তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের অব্রাহ্মণ আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছিল। কিছু বিক্ষিপ্ত এলাকা ছাড়া তপশিলী জাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতিদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জমায়েত করা যাচ্ছিল না। শ্রমিক ও কৃষকরা ক্রমেই বেশী করে জঙ্গী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পিছনে সমবেত হচ্ছিল। ধনবাদীরা আগেই কংগ্রেসপন্থী ছিল। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে জমিদার ও ভূস্বামীদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, যেমন ব্যর্থ হয়েছিল কংগ্রেসের বাইরের সংবিধানপন্থী শক্তিদের মদত দেওয়ার চেষ্টা। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী অংশগুলিকেও আলাদা করা যায়নি। ১৯৩৬-এর লক্ষ্ণৌ অধিবেশন এবং ১৯৩৭-এর নির্বাচনে অংশ নেওয়া এবং প্রদেশ-

গুলিতে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত এ ব্যাপারে প্রশাসকদের সমস্ত আশা ধূলিসাৎ করে দেয়। দক্ষিণপন্থীদের বামপন্থীদের থেকে আলাদা করে আনা যায় নি এবং সেইসময় বামপন্থীরা 'যুক্তফ্রন্ট নীতি' অনুসরণ করছিল। লিবারাল ফেডারেশন তখন আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। কংগ্রেসের সাংবিধানিক ও অ-সাংবিধানিক অংশগুলিও ঐক্যবদ্ধ ছিল। নরমপন্থীদের আর ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের র‍্যাডিকালদের থেকে আলাদা করা যেত শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিলে, যা করা হল ১৯৪৭ সালে। রাজন্যরা তখনো ব্রিটিশরাজের প্রতিভূর ভূমিকায় ছিল, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণ আন্দোলন তাদের অসুবিধায় ফেলে দিয়েছিল। রাজন্যদের উপর ভরসা করে যে ফেডারেশনের তেপায়া দৌড়ের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা গোড়াতেই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রাদেশিক ও ভাষাগত রেষারেষির দমও ফুরিয়ে এসেছিল।

এইভাবে, ঠিক যখন ১৯৩৭-এর নির্বাচনে দেশের ব্যাপক অংশে কংগ্রেসের জয় এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তার স্পষ্টভাবে প্রধান শক্তি হিসাবে উঠে আসা ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে বিপদ-সংকেত সূচক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, ঠিক তখনই তাদের প্রধান অবলম্বনগুলির অনেকগুলিই ভেঙে পড়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মত শুধু সাম্প্রদায়িকতাই বাকি ছিল, এবং শাসকরা তাকে শেষ সীমা পর্যন্ত ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও জনগণের, বিশেষত তাদের বামপন্থী অংশের, ক্রমেই বেশী করে জাতীয় আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনা তাদের এই কাজ করার দিকে আরো ঠেলে দিয়েছিল। যে বিবেচনাগুলি এর আগে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে এক সতর্ক ও সীমাবদ্ধ সমর্থনের নীতি নির্দেশ করেছিল, তাদেব শক্তি এই সময়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বল্গাহীন সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক হিংসা তখনো আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের অস্তিত্বই যখন বিপন্ন, তখন তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। অনুরূপভাবে, হিন্দুদের সমর্থন হারানোতে আর বেশী কিছু তফাৎ হত না, কারণ সেটা ইতিমধ্যেই মোটামুটি হারানো গিয়েছিল। অন্যদিকে, হিন্দু মহাসভা ইতিমধ্যেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল।

জাতীয়তাবাদী চ্যালেঞ্জ, যা তখন আরো বেশী আশু এবং বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার মোকাবিলা করার জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক নীতি গুছিয়ে ওঠার মত সময় বা রাজনৈতিক জায়গা ছিল না, বিশেষত বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া এবং জাতীয় আন্দোলনের বামপন্থী অংশের শক্তিবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। অন্যদিকে, শাসকরা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং তা নিয়ে নাড়াচাড়া করার ব্যাপারে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছিল। তার উপর, আগেই যেমন দেখানো হয়েছে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ তার নিজস্ব কারণেই সে সময়ে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল।

এইভাবে, ১৯৩৭ সালের পর থেকে উত্তরোত্তর সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা হিন্দু-মুসলিম বিভেদ ভারতে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ও অস্তিত্বের প্রধান রাজনৈতিক বা 'সামাজিক' অবলম্বনে পরিণত হয়। ব্রিটিশরা এর উপর তাদের সব কিছু পণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৪] ১৯৩৮ এর রাষ্ট্রসচিব জেট্‌ল্যাণ্ড পরবর্তীকালে লিখেছিলেন যে সে সময় তিনি "এক ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসকে আটকাতে" পারেন নি "যে সারা ভারত মুসলিম লীগই ভারতের সরকারের ভবিষ্যৎ রূপ নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা নেবে"।[৩৫]

১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, সাম্প্রদায়িকতার উপর নির্ভরতা আরো বাড়িয়ে দিল। সমস্ত নীতিই এখন সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধের জন্য ভারতীয় সম্পদের সবচেয়ে বেশী আহরণের দিকে পরিচালিত হল। যুদ্ধের জন্য কংগ্রেসের সহযোগিতা পাওয়ার অনেক চেষ্টা হল, কিন্তু সেগুলি ব্যর্থ হল। কংগ্রেস তার মন্ত্রীসভাগুলিকে প্রত্যাহার করে নিল এবং দাবী করল যে ব্রিটিশদের ঘোষণা করতে হবে যে যুদ্ধের পর ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা এক শক্তিশালী গণসংগ্রাম শুরু করার হুমকী দিল। এই ভাবে ব্রিটিশরা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখা এবং বিশ্বজোড়া সংঘাতের জন্য ভারতীয় সম্পদের ব্যবহার করা, এই দুইয়ের জন্যই এক জীবন-মরণ লড়াইয়ের মুখোমুখি হল। এই দ্বৈত ক্ষেত্রে জয়ের জন্য তারা আর সব কিছুকে হারাতে রাজী ছিল। কংগ্রেসের দাবীর মোকাবিলা করা এবং যতগুলি প্রদেশে সম্ভব স্বাভাবিক প্রশাসন বজায় রাখার জন্য ভারতীয়দের মত ও দাবী বিভক্ত করা, এই দুই কারণেই নির্ভর করা হল মুসলিম লীগের উপর, যার রাজনীতি ও দাবী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও দাবীর বিরোধী ছিল। আমরা পরে দেখাবো যে লীগকে মুসলিমদের একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ; তাকে যে কোনো রাজনৈতিক মীমাংসা নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এবং তার পাকিস্তানের দাবীকে প্রকৃতপক্ষে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। বলা হত যে হিন্দু ও মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ না হলে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না। কিন্তু পাইকারী হারে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে প্রশাসনিক সমর্থন যুগিয়ে এই ঐক্যকে অসম্ভব করে তুলে, মুখে ঐক্যের কথা বলে, বিভেদকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা হয়েছিল।

যাই হোক, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সর্বাত্মক মদত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যুদ্ধের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক শান্তিরক্ষার কিছু চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৯৪৫-এর পরে তাও উঠে যায় এবং ১৯৪৬-৪৭-এ জনগণ বিষবৃক্ষের তিক্ত ফলের স্বাদ পূর্ণমাত্রায় পেয়েছিলেন।

[পাঁচ]

১৯৪৭-এর রাজনৈতিক মীমাংসা দেখিয়ে দেয় যে ব্রিটিশদের দায়বদ্ধতা সংখ্যা-লঘুদের রক্ষা করার নীতির প্রতি, বা মুসলিমদের প্রতি, বা এমনকি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিও ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে তাদের নীতি তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে তাকিয়েই স্থির হয়েছিল। এই পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার সব প্রতিশ্রুতি এবং শপথ ভুলে যাওয়া হল। পাকিস্তানে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু এবং ভারতে যে মুসলিমরা রইল, তাদের জন্য কোনো রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হল না। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে মুসলিমরা যদি সমান নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকতে পেরে থাকে, তবে সেই কারণে কংগ্রেস একটি হিন্দু সংগঠন যার লক্ষ্য মুসলিমদের উপর প্রভুত্ব করা এবং তাদের ধ্বংস করা—প্রায় একশ বছর ধরে চালিয়ে আসা এই সাম্প্রদায়িক ও ব্রিটিশ প্রচার মিথ্যা। আরো চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হল, যখনই ব্রিটিশরা আর উপমহাদেশে নিজেদের শাসন বজায় রাখতে পারল না, এবং তাই তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ব্যবহার বা সমর্থন করার আর তেমন কোনো স্বার্থও রইল না, তখন নির্দ্বিধায় তাকে ত্যাগ করল। এই দিক থেকে, ভারতভাগ বাস্তবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ঢেকে রেখেছে। যেহেতু জাতীয়তাবাদীরা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল, এটা ধরে নেওয়া হয় যে মুসলিম লীগ যা চেয়েছিল তাই পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এ যে পাকিস্তান রূপায়িত হয় তা তার ১৯৪০-এ প্রকল্পিত রূপের থেকে অনেক আলাদা ; তা ছিল 'কবন্ধ' বা 'পোকায়-খাওয়া' পাকিস্তান। পাকিস্তানের আদি প্রকল্পিত রূপকে বাস্তবায়িত করার ব্যর্থতা ঔপনিবেশিক শাসকদের মুসলিম লীগের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতারই প্রতি-ফলন, যেখানে দেশভাগ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরাজয়ের প্রতিফলন, এবং তার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিম উভয়েরই ক্ষতি হয়েছে। ইতিহাসে এটাই লিখিত হওয়ার সম্ভাবনা যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে, অথবা জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে, দ্বিতীয় পক্ষই লক্ষ্য পূরণের, ধারণার বাস্তবায়নের, এবং সাফল্যের দীর্ঘস্থায়িত্বের দিক থেকে বেশী ক্ষতি স্বীকার করেছে। তাই যখন ব্রিটিশ দেখলো যে তারা আর তাদের শাসন বজায় রাখার জন্য লড়াই করতে পারবে না, তখন তাদের আর লীগের দাবী অথবা সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে লড়াই করার কোনো ইচ্ছা—বা কারণ—ছিল না।[৩৬]

[ছয়]

'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতিকে কী কী হাতিয়ারের মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়েছিল? ব্রিটিশরা কী কী ভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে উৎসাহিত ও সমর্থন করেছিল?

এটা করা হয়েছিল, প্রথমত, ভারতবর্ষে মুসলিমদের একটি পৃথক সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসাবে ধরে নিয়ে, এবং, সাধারণভাবে, ভারত সর্বোপরি কতকগুলি সংগঠিত ধর্ম সম্প্রদায়ের সমষ্টি, ভারতে ধর্ম জাতীয়তার স্থান নিয়েছে, এবং ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মই সবচেয়ে অর্থপূর্ণ বিভাগ—এই ধারণাগুলি থেকে কাজ করে।

বেশীর ভাগ ব্রিটিশ নীতি নির্ধারক, প্রশাসক ও লেখক ভারতের মূলগত অনৈক্যের উপর জোর দিয়েছিলেন, বিশেষত ধর্মের বহুত্ব বা বৈচিত্র্যের জন্য। ভারতীয়রা যে একটি জাতি, বা গড়ে ওঠা জাতি; বা একটি জনসাধারণ, এই ধারণাটিকে একেবারে নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, পাশ্চাত্যের মত ব্যক্তিদের সমষ্টি বলেও মনে করা হত না। বলা হত, এখানে রয়েছে স্বার্থ ও সম্প্রদায়[৩৭], ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির স্বার্থ, যেগুলি আবার পরস্পর বিরোধী, সেগুলিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[৩৮]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, দল ও ব্যক্তির পরিবর্তে ধর্ম সম্প্রদায়গুলিকেই ক্রিয়াশীল, সংগঠনকারী, ইত্যাদি হিসাবে দেখা হত। সমসাময়িক রাজনৈতিক লেখায় দলীয় ও উপদলীয় গোষ্ঠী বা স্বার্থভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির যে ভূমিকা দেখানো হত, ভারতের ক্ষেত্রে তা দেখানো হত সম্প্রদায়ের ভূমিকা হিসাবে। দলের অস্তিত্ব থাকলেও, বলা হত যে তারা কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির ইচ্ছার প্রতিনিধি, যদিও কংগ্রেসকে অনেক সময়েই অধিকাংশ ভারতীয়দের হয়ে তো বটেই, অধিকাংশ হিন্দুর হয়েও কথা বলতে দেওয়া হয় নি। অতঃপর, সরকার রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত প্রশ্নকেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তোলার উপর জোর দিয়েছে, এবং অন্য-দেরও তাই করতে উৎসাহ দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে ভারতে আধুনিক রাজ-নীতির শুরু থেকে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত জিইয়ে রাখা ও প্রচার করা হয়েছে। ডাফরিন ছিলেন ভারতের অন্যতম প্রথম ভাইসরয়, যিনি মুসলিমদের ভারতে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসেবে নিজেদের মনে করতে উৎসাহিত করেছিলেন।[৩৯] ঔপনিবেশিক শাসকরা ক্রমেই বেশী করে ভারতকে দেখছিলেন "বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের দেশ" হিসাবে।[৪০] অনুরূপভাবে, ১৯০৬ সালে 'মুসলিম' প্রতিনিধিদের উত্তর দেওয়ার সময় মিণ্টো "এই মহাদেশের জনগণ যে সম্প্রদায় গুলি নিয়ে গঠিত, তাদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য''-র উল্লেখ করেন। আইন পরিষদের

মত সংস্থাগুলিতে "মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে" এবং হিন্দু ভোটে নির্বাচিত একজন মুসলিমকে "তার সম্প্রদায়ের বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতের কাছে"[৪১] তার মতামতকে বলি দিতে হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তিনি তাঁর সমর্থনও ব্যক্ত করেন। এখানে, ভারতে যেভাবে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ বিকশিত হচ্ছিল, তার পুরোদস্তুর স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

১৯২৬-এ, আরউইন হিন্দু ও মুসলিমদের "দুটি প্রাচীন এবং সুসংগঠিত সমাজ" বলে বর্ণনা করেছিলেন।[৪২] ১৯৩০-এ, সাইমন কমিশনের রিপোর্টে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে বলা হয় "একটি মৌলিক বিরোধিতা যা সামাজিক আচার ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রতি ঝাঁকে, এবং পারস্পরিক ধর্মীয় বিরাগে প্রকাশিত হয়।" এর ফলে, "প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়গুলির ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বই একমাত্র নীতি, যার ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলিকে গঠন করা সম্ভব হয়েছে…"।[৪৩] ভারতীয় সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে যৌথ সিলেক্ট কমিটি আরো এগিয়ে গিয়েছিল : হিন্দু ও মুসলিমদের "অবশ্যই বলা যায় দুটি এবং বিশিষ্টভাবে পৃথক সভ্যতার প্রতিনিধি"।[৪৪] ১৮ই অক্টোবর ১৯৩৯-এ, লিনলিথগো বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার "ভারতের একাধিক সম্প্রদায়, দল ও স্বার্থের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে ইচ্ছুক"।[৪৫]

এই ধরণের সরকারী ঘোষণা ছাড়াও, দীর্ঘ সময় ধরে, অনেক পদস্থ কর্মচারী দ্বিজাতিতত্ব এবং দুই 'সম্প্রদায়-জাতি'র খাপ না খাওয়ার তত্বকে হাজির করেন। তাঁরা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেব চাপও দেন রাস্তা না ছেড়ে পুরোটা দৌড়বার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা ভারতে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিলেন, যে ভূমিকা তাঁরা পালন করেছিলেন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে, যতক্ষণ না ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে তাদের নিজস্ব সমর্থ মতাদর্শ তৈরী করতে পেরেছিল।[৪৬]

একজন সাম্প্রতিক গবেষক, যিনি যুক্তপ্রদেশে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ নিয়ে গভীর অধ্যয়ন কবেছেন, তিনি এই দিকটার সারসংকলন করেছেন এরকমভাবে : "এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি পৃথক মুসলিম সত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রিটিশ নীতি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল।"[৪৭] অবশ্যই, একবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, হিন্দু ও মুসলিম, উভয় সাম্প্রদায়িকতাই সাম্প্রদায়িক পরিচয় বজায় রাখতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। এবং, পরবর্তীকালে, ব্রিটিশরা এই পরিচিতিগুলি ও তাদের উপর গড়ে ওঠা বিভেদগুলিকে সাংবিধানিক ছাড় বা ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বড় বাধারূপে চিত্রিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, লিনলিথগো ১৯৩৯-এর নভেম্বরে ভারতীয় রাজনৈতিক

নেতাদের বলেছিলেন, "প্রধান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে সমঝোতা থাকলে কেন্দ্রে স্বচ্ছন্দ-কাজে সাহায্য হত, তার অভাবের জন্যই" ব্রিটিশরা ভারতীয়দের হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পন্থা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।৬৮

জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যও ব্রিটিশরা সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলগুলিকে, এবং বিশেষভাবে মুসলিম লীগকে প্রত্যক্ষ সাহায্য করেছিল। গোড়া থেকেই, ব্রিটিশ পদস্থ কর্মচারী ও নীতি নির্ধারকদের প্রধান গোষ্ঠীর কাছে, জাতীয় কংগ্রেসে মুসলিমদের অংশগ্রহণ অবাঞ্ছিত ছিল, এবং তাঁরা এই প্রবণতাকে খর্ব করতে ও উদীয়মান জাতীয় আন্দোলনকে বিশৃঙ্খল করতে সবরকম চেষ্টা করেছিলেন। মুসলিমদের মধ্যে সাধারণভাবে আমলা, জাগীরদারী অংশগুলি, বেকার ও পেটি বুর্জোয়াদের মুসলিমদের এক পৃথক রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে চিন্তা করতে এবং তারপর হিন্দুদের মুখোমুখি বিশেষ অধিকারের জন্য লড়াই করতে, পাশাপাশি ব্রিটিশদের মুসলিমদের রক্ষক হিসাবে দেখতে, উৎসাহিত করে, তাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল। যেখানে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কংগ্রেস বিরোধিতাকে 'হিন্দু' বিরোধিতা হিসাবে না দেখে শ্রেণীভিত্তিতে দেখা হত, এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক বিরোধিতাকে সঠিকভাবেই সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা হিসাবে দেখা হত, সেখানে মুসলিম উচ্চশ্রেণী বা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরোধিতাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে 'মুসলিমদের' কংগ্রেসের বিরোধিতা রূপে চিত্রিত করা হত।

উদাহরণস্বরূপ, সৈয়দ আহমদ খানের প্রতি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্তরে বিশেষ দাক্ষিণ্য দেখানো হয়েছিল এবং তাঁর শিক্ষাগত ও অন্যান্য কাজকর্মে দরাজহাতে সাহায্য করা হয়েছিল। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাই আলিগড় কলেজ এবং সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর সহকর্মীদের একটি বড় রাজনৈতিক শক্তি করে তুলেছিল, এবং তা এতটাই যে ফ্রান্সিস রবিনসন সঠিকভাবে সিদ্ধান্তে এসেছেন: "সরকারী নীতির মাধ্যমে, সৈয়দ আহমদকে···তাঁর সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল", এবং সরকার আলিগড় কলেজকে মুক্তহস্তে আর্থিক ও রাজনৈতিক সাহায্য দিয়েছিল কারণ তা "রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সরকারী পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।"৬৯

একইভাবে, বঙ্গদেশে স্যার সালিমুল্লাকে বংশানুক্রমিক নবাব বাহাদুর খেতাব দেওয়া হল যাতে তিনি এক ঐতিহ্যময় শাসকের গৌরব অর্জন করে বাংলার মুসলিমদের নেতারূপে উদিত হতে পারেন। পরে তাঁর জ্ঞাতিদেরও খেতাব দেওয়া হয়েছিল। তার উপর, সরকার তাঁকে পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিল।

১৮৯৯-১৯০০ সালে, যুক্ত প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর এ. পি. ম্যাকডোনেল, ঐ প্রদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে সাহায্য করে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার

প্রতি এই সমর্থনের ভারসাম্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সরকারী চাকরীতে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়াতে চেষ্টা করেছিলেন এবং উর্দুর বিরুদ্ধে হিন্দীর প্রবক্তাদের সমর্থন করেছিলেন, এবং এইভাবে বহু জাতীয়তাবাদী হিন্দু ও মুসলিমদের যথাবিহিত সাম্প্রদায়িক শিবিরে ঠেলে দিয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি আর এক ধরণের সরকারী সমর্থন ছিল সাম্প্রদায়িক নামধারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির, যথা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সাহায্য। যুক্ত প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হারকোর্ট বাটলার ১৯১১ সালে ভাইসরয়কে বলেছিলেন, সাম্প্রদায়িক নামধারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধর্মীয় শিক্ষা দেবে এবং হিন্দু ও মুসলিম মনোভাব জিইয়ে রাখবে।[৫০]

এছাড়া, বঙ্গভঙ্গের পিছনে অন্য যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে শক্তিশালী করার জন্য ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে কার্জন ঘোষণা করেছিলেন যে তার অন্যতম উদ্দেশ্য "পূর্ব বাংলার মুসলিমদের মধ্যে এমন এক ঐক্য এনে দেওয়া, যা তারা পুরোনো মুসলমান সম্রাট ও রাজপ্রতিনিধিদের সময়ের পর আর পায়নি।"[৫১]

'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতি রূপায়ণ করা হয়েছিল প্রাথমিকভাবে সাম্প্রদায়িক দাবীগুলি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়ে এবং এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে, এবং জনগণের উপর তাদের প্রভাবকে, রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে। এটা পরিষ্কার দেখা যায় যে মুসলিম সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি দলকে এবং তার দাবীগুলিকে ১৯০৬ সালে ভাইসরয় মিণ্টো যে ভাবে অভ্যর্থনা করেন, তার থেকে। সেই বছরের ১লা অক্টোবর, আগা খানের নেতৃত্বে নেতৃস্থানীয় রক্ষণশীল, উচ্চশ্রেণীর মুসলিমদের এক প্রতিনিধিদল ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির প্রতি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক এক দাবীসনদ নিয়ে সিমলায় ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে। ভাইসরয় তখনি বেশীরভাগ দাবী মেনে নেন এবং অন্তর্নিহিত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকৃতি দেন।[৫২]

প্রতিনিধিরা দাবী করেন, তারা "সম্রাটের মুসলিম প্রজাদের এক বিরাট অংশের" পক্ষ থেকে এসেছেন। উত্তরের প্রারম্ভেই ভাইসরয় স্বীকার করে নিয়ে বলেন "আপনাদের ডেপুটেশনের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র, যা ভারতের আলোকপ্রাপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙ্খাকে প্রকাশ করছে"। তিনি আরো বলেন যে "আপনারা যা বলেছেন তা এক প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা নিঃসৃত··· ।" আরো এগিয়ে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন "মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থান, যাদের হয়ে আপনারা কথা বলেছেন, তার কথা"। প্রতিনিধিরা তাঁদের সমস্ত দাবীকেই উপস্থিত করেছিলেন মুসলিমদের "এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়" রূপে স্বীকৃতির ভিত্তিতে। ভাইসরয় এই দাবীকেও গ্রহণ করেন।

প্রতিনিধিরা দাবী করেন, মুসলিমদের "রাজনৈতিক গুরুত্ব" এবং "কিঞ্চি-

অধিক একশ বছর আগে ভারতে তারা যে অবস্থানে ছিল…”, তার ভিত্তিতে সংস্কার পরবর্তী কাউন্সিলগুলিতে তাদের সংখ্যাগত শক্তির থেকে অতিরিক্ত বিশেষ প্রতিনিধিত্ব রাখতে দিতে হবে। এই দাবী মেনে নিয়ে ভাইসরয় বলেন, “আপনারা সঠিকভাবেই বলেছেন যে আপনাদের অবস্থান শুধু আপনাদের সংখ্যাগত শক্তির ভিত্তিতেই স্থির করা চলে না, আপনাদের সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং সাম্রাজ্যের প্রতি তার সেবার দিকটার দেখতে হবে। আমি আপনাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত…।” তিনি প্রতিনিধিদের সম্পর্কে একথাও বলেন যে তাঁরা “একটি বিজেতা ও শাসক জাতির বংশধর”।

প্রতিনিধিরা দাবী করেছিলেন যে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর বিদ্যমান ব্যবস্থা নিজেদের ‘সম্প্রদায়ের’ প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিমদের নির্বাচিত হতে সাহায্য করছিল না। সুতরাং তারা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী চেয়েছিলেন। ভাইসরয় একমত হয়েছিলেন যে মুসলিমদের “একটি সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিৎ”। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃত হয়েও তিনি বলেছিলেন, “এই মহাদেশের জনগণ যে সম্প্রদায়গুলি নিয়ে গঠিত, তাদের বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে ব্যক্তিগত ভোটাধিকার প্রদানকারী যে কোনো প্রতিনিধিত্ব ভারতে একটি দূরভিসন্ধিমূলক অসাফল্য হতে বাধ্য”।

প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন যে ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক পুনর্গঠনের সময়ে যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করা হবে, যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের অসুবিধা না হয়। ভাইসরয় কথা দিয়েছিলেন যে: “মুসলিম সম্প্রদায় নিশ্চিন্তে থাকতে পারে যে কোনো প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সময়ে তাদের সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষিত হবে..”। এই প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি পরবর্তীকালের সমর্থনেব ন্যায্যতা নির্ধারণ করা হত।[৫৩]

ঐতিহাসিকদের লেখায়, সিমলা ডেপুটেশনের তাৎপর্য এই সমস্ত প্রশ্নকে ঘিরে বিতর্কের মেঘে ঢেকে গেছে: ডেপুটেশন সংগঠনে উদ্যোগ নিয়েছিলেন কারা—সরকারপক্ষ না ডেপুটেশনে যারা গিয়েছিলেন? এটা কি সত্যিকারের ডেপুটেশন ছিল? এই ডেপুটেশন কি সত্যিই ভাইসরয়ের পূর্বসম্মতিতে পদস্থ কর্মচারীদের সংগঠিত করেছিলেন? ভাইসরয় ও পদস্থ কর্মচারীরা কি মুষ্টিমেয় মুসলিম নেতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন? ফলতঃ, এটা কি ‘সাজানো’ অভিনয় ছিল? বাস্তবিক, এই প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয় অথবা এদের তাৎপর্য সামান্য।

আসল প্রশ্নটা হল কীভাবে ডেপুটেশনকে অত তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করা হল, তার দাবীগুলি ও তাদের পিছনের যুক্তিগুলি অত সহজে মেনে নেওয়া হল এবং মৌলিক প্রতিশ্রুতিগুলি কিভাবে অত সহজে দেওয়া হল? এরজন্য কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা সংগ্রাম করতে হয়নি। হাজার হোক, ভইসরয়দের কাছে পৌছানো অত সহজ ছিল না। তাঁরা ডেপুটেশন গ্রহণে অভ্যস্তও ছিলেন

না, অত সহজে তাদের অনুরোধ বা দাবী মেনেও নিতেন না। একজন সাম্প্রতিক গবেশকের কথায়: "এই ডেপুটেশন যদি হুকুমমাফিক অভিনয় নাও হয়ে থাকে তবে তাকে অগ্রীম বক্স অফিস সাফল্যের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল।"[৫৩]

অন্যদিকে, জাতীয় কংগ্রেস, তার মুক্তকণ্ঠে আনুগত্য ঘোষণা সত্ত্বেও, এবং পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ধনবাদী অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থক হওয়ার দরুণ মতাদর্শগতভাবে ব্রিটিশদের নিকটতর হওয়া সত্ত্বেও, বছরের পর বছর আন্দোলন করছিল, এবং তা সত্ত্বেও তার সবচেয়ে সরল দাবীগুলিও মানা হয়নি। জাতীয়তাবাদীদের কেন দুর্ব্যবহার করা, গালি গালাজ করা এবং অবহেলা করা হয়েছিল? কেন ১৯০৫-এর আগে এমনকি নরমপন্থীদের প্রতিও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রসারিত করা হয়নি, যাঁরা ব্রিটিশ-রাজের প্রতি তাঁদের আস্থা ঘোষণায় পঞ্চমুখ ছিলেন? অনুরূপভাবে, সিমলা ডেপুটেশনে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল, তাঁরা কোনো প্রমাণ না দেখানো সত্ত্বেও, অথচ অনেক বেশী জনপ্রিয় এবং রাজনৈতিকভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভারতীয়দের হয়ে কথা বলার দাবীকে একেবারে নাকচ করে দেওয়া হল। তাকে বরং এক আনুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু অংশের মুখপাত্র আখ্যা দেওয়া হল।

আনুগত্যের কয়েকটি প্রকাশ দুজনেরই মধ্যে একভাবে থাকলেও, জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্যই দুজনের প্রতি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের একেবারে দুরকম মনোভাবের ব্যাখ্যা দেয়। নরমপন্থীগণ সহ জাতীয়তাবাদীরা, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মতাদর্শের জন্ম দিয়েছিলেন এবং ঔপনিবেশিকতা ও তার আধিপত্যের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল, যেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আনুগত্যের রাজনীতি প্রয়োগ ও প্রচার করেছিল, এবং শাসকরা তাই সঠিকভাবেই তাদেয় ঔপনিবেশিক শাসনের স্তম্ভরূপে দেখেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, সিমলা ডেপুটেশনের সৌভাগ্য এবং ছাড় আদায় করার ক্ষেত্রে তার 'উল্লেখযোগ্য সাফল্য'কে শুধু উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইকে বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সহায়তা ও উৎসাহিত করার ইচ্ছাকৃত ব্রিটিশ নীতির অঙ্গ হিসাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। মিণ্টো মুসলমানদের একটি পৃথক সাম্প্রদায়িক পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিলেন, এবং তারপর চেষ্টা করেছিলেন তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের, যারা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছিল, তাদের আয়ত্বে আনতে। তিনি এটা করেছিলেন প্রবীণ, উচ্চশ্রেণীর মুসলিম নেতাদের মাধ্যমে, যাদের ছাড় দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল যাতে তারা মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার নামে তরুণদের দলে টানতে পারে। সিমলা ডেপুটেশনের ঠিক পরেই লেডী মিণ্টো তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন:

আজ সন্ধ্যায় আমি এক পদস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে এই চিঠি পেয়েছি: "সম্মানীয়াকে আমার এক লাইন লিখে জানাতেই হচ্ছে যে আজ একটা মস্ত বড় ঘটনা ঘটে গেছে। রাজ্যপরিচালনার এক পদক্ষেপ যা অনেক অনেক বছর ধরে ভারত ও ভারতের ইতিহাসকে প্রভাবিত করবে। সেটা হল রাজদ্রোহী বিরোধীপক্ষে যোগ দেওয়া থেকে কমপক্ষে বাষট্টি মিলিয়ন লোককে ফিরিয়ে আনা।"[৫৫]

মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাবিগুলিকে তৎক্ষণাৎ মেনে নেওয়ার নীতি ১৯০২-এর সাংবিধানিক আইন তৈরী করার সময় পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ যে দাবীগুলি নিয়ে আন্দোলন করছিল তা হল: (১) 'রাজনৈতিক গুরুত্বের' ভিত্তিতে জনসংখ্যায় মুসলিমদের অনুপাতের থেকে বেশী হারে নতুন আইন পরিষদে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্ব, এবং (২) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, অর্থাৎ এই আসনগুলিতে শুধু মুসলিমদেরই ভোটাধিকার। ভারত সরকার অবিলম্বে এই দাবীগুলি সমর্থন করেছিল। রাষ্ট্রসচিব মর্লি কিছুদিন বাধা দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন একাধিক আসন সম্বলিত কেন্দ্রগুলিতে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন, যাতে একটি কেন্দ্রের সমস্ত ভোটদাতা ভোট দেবে। কিন্তু অবশেষে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী, ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল, দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদ্ ও ভারতীয় পদস্থ কর্মচারীদের যৌথ চাপের ফলে তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক দাবীগুলিকে 'পুরোপুরি' মেনে নিতে রাজি হয়েছিলেন। এইভাবে, যখন কংগ্রেসের ২৫ বছরের বেশী সময় ধরে উত্থাপিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবী অগ্রাহ্য হল, তখন মুসলিমদের জন্য জনসংখ্যায় তাদের অনুপাতের চেয়ে বেশী হারে আসন সংরক্ষণ ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী পুরোপুরি মানার কথা বলা হল।

নরমপন্থীদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার ভয়, তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, ইসলামী ঐক্য চেতনার উত্থান, এবং খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের ফলে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এবং ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকে, সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি সরকারী নীতিতে খানিকটা নিষ্ক্রিয়ভাব দেখা গিয়েছিল, যদিও রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পোষণ ও উৎসাহ দান চলছিল। উপরন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টার ব্যর্থতা এবং ১৯২০-র দশকের শেষদিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পুনরভ্যুত্থান, ব্রিটিশদের এই নীতি আবার চালু করার নতুন সুযোগ এনে দিয়েছিল।

১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় সরকার সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল এবং জাতীয়তাবাদী নেতা ও ব্যক্তিদের অগ্রাহ্য করেছিল। এই বৈঠকগুলিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে কোনো মতৈক্যে আসতে না পারায় এটা

ছিল একটা কারণ। উপরন্তু, সমস্ত আলোচনাটাই হয়েছিল সাম্প্রদায়িক মাত্রার চৌহদ্দির মধ্যে, যার ফলে রাজনৈতিক অগ্রগতি অথবা মূল রাজনৈতিক সমস্যার কোনো সমাধান অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৩২ সালে সরকার সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ নামে পরিচিত সাম্প্রদায়িক দাবীসমূহ প্রসঙ্গে তার সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করে। এই রোয়েদাদ তৎকালীন প্রধান মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাবীগুলির সবকটিই গ্রহণ করে। এই দাবী, সংরক্ষণের মাধ্যমে বঙ্গদেশে ও পাঞ্জাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করে; কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিমদের এক-তৃতীয়াংশ আসনের নিশ্চয়তা দেয়; সিন্ধু প্রদেশকে বম্বে থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংস্কারের প্রবর্তন ঘটায়; এবং স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর প্রথা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ সেটা যতটা না রোয়েদাদ ছিল, তার বেশী ছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো। এবং তার ভিত্তিতে ছিল এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা সাম্প্রদায়িক মাত্রাগুলিকে এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের চিরস্থায়ী বিভাজনকে পূর্ণরূপে স্বীকার করেছিল।

সুতরাং, ১৯৩৫-এর মধ্যে, যখন নতুন সংবিধান আইন পাশ হয়, তার মধ্যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাবী মেনে নেওয়া হয়েছিল। এর আরো দুটি ফলশ্রুতি ছিল। প্রথমত, মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাবীগুলি তৎক্ষণাৎ মেনে নেওয়ায় জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীর উপরের স্তরের নেতাদের মধ্যে আলোচনায় সাফল্য প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে যেটুকু ছাড় দেওয়ার বা সমঝোতার কথা বলা হয়েছিল, ঔপনিবেশিক সরকার সবসময়েই তার চেয়ে বেশী সুযোগ দেবে বলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের সমঝোতার সব উৎসাহ সরিয়ে দিতে পারত। তার উপর, যেসব মুসলিম নেতা জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সমঝোতা করতে রাজী ছিলেন, তাঁদের এই সময়ে 'হিন্দুপন্থী' বা 'মুসলিম জনমতে' অ-প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে চিহ্নিত করা যেত। এইভাবে, ঔপনিবেশিক শাসকরা সময়োপযোগী ছাড় দিয়ে সমঝোতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক নেতাদের অদ্বিতীয় না হলেও শ্রেয়তর 'মুসলিম' নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ও তাদের রাজনৈতিক শিকড় গাড়তে সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয়ত, ১৯৩৫-এর আইন-এ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্তভাবে চাকরী ও আইনসভার আসন সংরক্ষণের সাম্প্রদায়িক দাবীগুলি মেনে নিতেই, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাতে এমন আর কোনো মীমাংসাযোগ্য দাবী রইল না, যা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে পেশ করা যায় এবং যা নিয়ে বিতর্ক করা যায়। ফলতঃ, উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদকে হয় লোপ পেতে হত, অথবা 'এগিয়ে' যেতে হত এক ফ্যাশিস্ট, যুক্তিহীন অবস্থান ও কর্মসূচীর দিকে। পেশ করার এবং চাপ দেওয়ার মত কোনো দাবী না দেখতে পাওয়ার ফলেই জিন্না ১৯৩৭-এর পর

কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসতে অস্বীকার করলেন এবং একটি অসাধারণ পূর্বশর্ত দিলেন যে কংগ্রেসকে আগে মেনে নিতে হবে যে সে একটি হিন্দু সংগঠন এবং লীগ সমস্ত মুসলিমদের প্রতিনিধি। এই ভাবটা বেশীদিন দেখানো যেত না। পাকিস্তানের দিকে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ সাম্প্রদায়িক মতা-দর্শগত কর্মসূচীর মধ্যে একমাত্র বিচ্ছিন্নতার দিকটাই তখন পূরণ হতে বাকি ছিল, যদিও জিন্না ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করেছিলেন, পাকিস্তানের চেহারাটা কেমন হবে এবং কী করে তা লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের, তথাকথিত হিন্দু প্রাধান্যের ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করবে।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী দাবীগুলি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেওয়ার নীতি ১৯৪৫ পর্যন্ত চলেছিল। এটা চিত্তাকর্ষক যে, উদাহরণস্বরূপ, যেমন পরবর্তী অংশে দেখানো হয়েছে, সাংবিধানিক বিকাশের উপর মুসলিম লীগের ভেটো ক্ষমতার দাবীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রুত মেনে নেওয়া হয়েছিল, এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবী মানারও আগে পাকিস্তানের দাবী মেনে নেওয়া হয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও নেতাদের 'সম্প্রদায়গুলির' প্রকৃত মুখপাত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের রাজনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েও ব্রিটিশরা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সাহায্য করার নীতি অনুসরণ করেছিল। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকে তাকে বিরামহীনভাবে বাড়িয়ে তোলা এবং মুসলিমদের প্রতি-নিধিত্বকারী একমাত্র দলরূপে আরো বেশী করে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, যদিও তা কোনো গণ আন্দোলন গড়ে তোলেনি, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে বেশ খারাপ ফল করেছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত মুসলিমদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করত।[৫৭] সরকার পুরোনো অনুগত রাজনীতিবিদদের মুস-লিম লীগে যোগ দেবার জন্য উৎসাহ দিতেও শুরু করেছিল। অন্যদিকে, জাতীয়-তাবাদী মুসলিমদের ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলিত ও নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। কেবল ১৯৪০-এর দশকে মুসলিমদের মধ্যে তাদের প্রভাব খুব কমে যাওয়ার সময়েই নয়, ১৯৩০-এর দশকে, যখন তাঁরা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন, তখনও এটা করা হয়েছে। যেমন, আগে দেখানো হয়েছে, গোল টেবিল বৈঠকে তাঁদের সম্পূর্ণ অবহেলা করে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরই মুসলিম প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করা হয়। এই সরকারী স্বীকৃতি ছিল একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়, যা ১৯৩০-এর দশকের শেষে ও ১৯৪০-এর দশকের গোড়ায় মুসলিম লীগের বিকাশে সহায়তা করেছে।

ব্রিটিশ নীতির এই দিকটা তুঙ্গে ওঠে ১৯৩৯ ও তারপর, যখন যুদ্ধের সময় ভারতের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ রাখবার জন্য এবং কার্যকর ক্ষমতা হস্তান্তরের জাতীয়-তাবাদী দাবীকে মোকাবিলার জন্য ব্রিটিশরা জোর দেয় যে স্বাধীনতার ব্যাপারে

কোনো সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার আগে হিন্দু ও মুসলিম, দুটি 'সম্প্রদায়'কে সমঝোতায় আসতে হবে। মুসলিম লীগকে মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সরকারী নীতির সঙ্গে মিলে, এটা যে কোনো সাংবিধানিক পদক্ষেপের ব্যাপারে লীগকে চূড়ান্ত ভেটো ক্ষমতা দিল। জিন্নাও তাঁর এই অসম্ভব দাবীর উপর জোর দিলেন যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোনো আলোচনার আগে কংগ্রেসকে তার নিরপেক্ষ চরিত্র ছেড়ে নিজেকে একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করতে হবে বা পরিবর্তিত হতে হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত লীগ কংগ্রেসের সমস্ত প্রস্তাবেই 'না' বলে যাবে—এবং গিয়েছিলও। তার মানে দুজনের মধ্যে প্রকৃত আপোষ-আলোচনা কখনোই শুরু হতে পারবে না। ব্রিটিশরা তখন নীতি নিষ্ঠ হয়ে ঘোষণা করবে যে ভারতে কোনো রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটাতে না পারার দায়িত্ব 'সম্প্রদায়গুলির'র ঐক্যের ব্যর্থতা এবং কংগ্রেসের পক্ষে সংখ্যালঘুদের মন জয় করায় অক্ষমতার। তারা, তাদের দিক থেকে সংখ্যালঘুদের প্রতি দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারে না।[৫৮] এই ছক এই পর্যায়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা, মুসলিম লীগ ও জিন্নাকে মদত দেওয়ার এবং কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের মুখোমুখি দাঁড় করানোর ব্রিটিশ নীতির এত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, প্রকৃতপক্ষে মধ্যমণি ছিল, এখানে তাকে আর একটু বিশদভাবে দেখানো যেতে পারে যে, যদিও লীগের প্রতি যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ নীতির সবকটি দিক আলোচনা করা সম্ভব নয়।[৫৯]

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পদক্ষেপের ব্যাপারে ভেটো ক্ষমতা চেয়ে দাবী করলো যে "সারা ভারত মুসলিম লীগের অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া ভারতে সাংবিধানিক পদক্ষেপের ব্যাপারে কোনো ঘোষণা করা চলবে না।" কমিটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অবসান ঘটাতেও চাইলো। সে দাবী করলো যে সে-ই "একমাত্র সংগঠন যা মুসলিম ভারতের হয়ে কথা বলতে পারে।"[৬০]

ব্রিটিশরা লীগকে খুশী করতে রাজী ছিল, কেননা ব্রিটিশ ক্যাবিনেট "কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাককে তাদের তুরুপের তাস হিসাবে দেখেছিল।...ক্যাবিনেটের বেশীরভাগ সদস্য সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে জাতীয়তাবাদী শক্তিদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ফাঁদ রূপেও দেখেছিলেন।"[৬১] ১১ই সেপ্টেম্বর ভাইসরয় ফেডারেশনের দিকের সমস্ত অগ্রগতি স্থগিত ঘোষণা করলেন।[৬২] ৫ই নভেম্বর তিনি মুসলিম লীগের ভেটো ক্ষমতার দাবীকে মেনে নেওয়ার দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে জিন্নাকে বললেন যে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে আরো ভারতীয় সদস্য নেওয়া এবং প্রদেশগুলিতে জনপ্রিয় সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে কংগ্রেস ও লীগের চুক্তির উপর।[৬৩] রাষ্ট্রসচিব জেটল্যাণ্ড

২রা নভেম্বর সাড়া দিয়ে বললেন যে, কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হবে।[৬৪]

পরবর্তী মাসগুলিতে জিন্না ও লীগ বারবার ভেটো ক্ষমতার দাবীর পুনরাবৃত্তি করেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে বিখ্যাত লাহোর অধিবেশনে প্রথম পাকিস্তানের দাবী তোলা হয়।[৬৫] সরকারের সমর্থক সাড়া দেওয়াও চলছিল। ১৮ই এপ্রিল ১৯৪০, জেটল্যাণ্ড হাউস অভ লর্ডসে বললেন, বৃটেন অনিচ্ছুক মুসলিমদের উপর সংবিধান চাপিয়ে দেবে না।[৬৬] ১৯শে এপ্রিল, লিন্‌লিথগো জিন্নাকে বললেন যে মুসলিমদের পূর্বসম্মতি ছাড়া কোনো সংবিধান চালু হবে না।[৬৭] এবং অবশেষে এলো ভাইসরয়ের বিখ্যাত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক উক্তি—৮ই আগস্ট—যা লীগকে তার কাম্য ভেটো দিয়ে দিল। ভাইসরয় অঙ্গীকার করেন যে বৃটিশরা :

> এমন কোনো সরকারী ব্যবস্থার কাছে ভারতের শান্তি ও কল্যাণের জন্য তাদের বর্তমান দায়িত্ব হস্তান্তরের কথা ভাবতেই পারে না, যার শাসন ভারতের জাতীয় জীবনে বৃহৎ ও ক্ষমতাশালী অংশের দ্বারা সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হবে। তারা এই রকম একটা সরকারের কাছে এই অংশকে নতি স্বীকার করানোতেও অংশীদার হতে পারে না।[৬৮]

এইভাবে ব্রিটিশরা বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে, সর্বোপরি অগাস্ট ঘোষণার মাধ্যমে, মুসলিম লীগকে ভারতের সমস্ত পরবর্তী রাজনৈতিক অগ্রগতির উপর ভেটো ক্ষমতা দিয়েছিল। এই ভেটো লীগকে উৎসাহিত করে, কংগ্রেসের তুলনায় তার দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং মুসলিমদের মধ্যে তার সম্মান বাড়িয়ে তোলে। জিন্না ও লীগের কংগ্রেসের সাথে আর কোনো সমঝোতা করার দরকার ছিল না। তারা 'বসে বসেই' সময় কাটাতে পারতেন। অন্যদিকে কংগ্রেসকে হয় পাকিস্তান মেনে নিতে হত, নয় ব্রিটিশ ও লীগের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী যুদ্ধ ঘোষণা করতে হত।

৮ই আগস্টের 'প্রতিজ্ঞা'র যুক্তিকে পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া হয় যখন ১৯৪২-এর মার্চে ক্রিপস প্রস্তাবে পাকিস্তানের দাবীকে প্রচ্ছন্নভাবে মেনে নেওয়া হয়। এতে প্রস্তাব করা হয়, একটি বা একাধিক প্রদেশ যদি যুদ্ধের পর পরিকল্পিত ডোমিনিয়ন স্টেটাসভুক্ত ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে না চায়, তবে তারা তার থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজস্ব সংবিধান রচনা করে ব্রিটেনের সঙ্গে অনুরূপ, পৃথক ডোমিনিয়ন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। আরো একবার, পাকিস্তানের দাবী এইভাবে দ্রুত মেনে নেওয়া লীগকে উদ্যম যোগালো, তার আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে দিল, এবং মুসলিমদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী শক্তিদের মনোবল ভেঙে দিল। লীগের পক্ষে এই সময়ে এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেও দ্রুত বেড়ে ওঠা সম্ভব হল, যেখানে তাকে আগে অনেক বাধা পেতে হয়েছিল।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের জমায়েত করার নীতি আরো দৃঢ়ভাবে অনু-

সৃত হয়েছিল ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে ও তার পরে। কংগ্রেসকে দমন করা এবং তার নেতাদের রাজনীতির আঙিনা থেকে সরানো ছাড়াও, আসাম, সিন্ধু, বঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে, অর্থাৎ প্রস্তাবিত পাকিস্তান গঠনকারী প্রদেশগুলির একটি ছাড়া সবকটি থেকে লীগ-বহির্ভূত মন্ত্রীসভাগুলিকে হঠিয়ে দিয়ে লীগের প্রাধান্য সমৃদ্ধ মন্ত্রীসভা বসাতেও সরকার লীগকে সাহায্য করেছিল। তার বিনিময়ে লীগ জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সরকারের দমননীতিকে পুরো সমর্থন করেছিল। এই সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া লীগের রাজনৈতিক বিকাশে, মুসলিমদের উপর বেশী করে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করাতে, এবং জাতীয়তাবাদী ও লীগ বহির্ভূত অন্য মুসলিম নেতাদের মনোবল ভাঙাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৪৫-৪৬-এর মধ্যে লীগ ও তার প্রধান দাবীগুলি গণভিত্তি পেয়েছিল, যা দেখা যায় ১৯৪৬-এর নির্বাচনে।

যুদ্ধের সময় ভারতকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় রাখা ছাড়াও, পাকিস্তানের দাবীসহ লীগকে সমর্থনের নীতি ছিল যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বজায় রাখার রক্ষণশীল দলের নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চার্চিল বলেছিলেন, "আমরা পাকিস্তান, রাজন্যশাসিত ভারত ও হিন্দুদের দিয়ে তৈরি একটি তিনপেয়ে কুর্সীতে বসে থাকতে পারি"।[৬৯] লিন্‌লিথগোর আশা ছিল যে ব্রিটেন "আমাদেরই চাপিয়ে দেওয়া কোনো এক শাসন-প্রকল্পের সাহায্যে চালিয়ে যাবে, এবং অবশ্যই তার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী অন্তসিদ্ধান্ত যে ভারসাম্য রাখার জন্য আমরা সেখানে থেকে যাব"।[৭০]

জিন্না ও লীগ কিছুদিন যুদ্ধোত্তর সাংবিধানিক আলোচনাগুলিতে ভেটো প্রয়োগ করেছিল, যেমন সিমলা সম্মেলনে, যতদিন ব্রিটিশদের উপমহাদেশে কোনোরকম উপস্থিতি রাখার আশা টিঁকে ছিল। যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে তা সম্ভব নয়, তখন ব্রিটিশরা একদিকে খোলাখুলি পাকিস্তানের দাবী মেনে নিল, আর অন্যদিকে ভেটোর ক্ষমতা তুলে নিল। ভারত বিভাগ এখন 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতির থেকে, সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণের নীতির অংশ হয়ে দাঁড়ালো। অতঃপর, ১৫ই মার্চ ১৯৪৬, প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী ঘোষণা করলেন:

> সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে আমরা অবহিত এবং সংখ্যালঘুদের ভয়শূণ্যভাবে বাস করতে পারা উচিৎ। অন্যদিকে, কোনো সংখ্যালঘু অংশকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অগ্রগতির পথে ভেটো প্রয়োগ করতে আমরা কখনোই দিতে পারি না।[৭১]

এবং, ভারতে থাকার অজুহাত হিসাবে লীগের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে, তাকে একটা 'কবন্ধ' বা 'পোকায় কাটা' পাকিস্তান ছেড়ে দেওয়া হল। আর, সমস্ত সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার যে নীতিকে অসংখ্যবার সাংবিধানিক

অগ্রগতি রোধ করার অজুহাত রূপে দেখানো হত, তাকে হঠাৎ ভুলে যাওয়া হল।

পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা, যা জাতীয় আন্দোলন ও সাংবিধানিক সংস্কার প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে বেড়ে উঠেছিল, তা ছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। নির্বাচিত আইন সভা ও পৌর সংস্থাগুলির সঙ্গে সঙ্গে চালু করা হয়েছিল সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব, তুলনামূলক গুরুত্ব, সংরক্ষণ, এবং সর্বোপরি, সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত পর্যায়ানুক্রমে এই ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা হয়েছিল।

এই ব্যবস্থায় মুসলিম ভোটারদের, এবং পরে, অন্যদেরও, পৃথক পৃথক কেন্দ্রে ফেলা হয়, যেখান থেকে কেবল মুসলিমরা বা অন্য নির্দিষ্ট 'সম্প্রদায়' বা জাতের সদস্যরাই প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে পারবে। ১৯০৯-এর আইন অনুযায়ী, মুসলিম কেন্দ্রগুলিতে কেবল মুসলিমরাই ভোট দিতে পারত, যেখানে সাধারণ কেন্দ্রগুলিতে হিন্দুদের সঙ্গে তারাও ভোট দিতে পারত। ১৯১৯-এর আইনের পর, মুসলিমরা শুধু মুসলিম প্রার্থীদের এবং হিন্দুরা শুধু হিন্দু প্রার্থীদেরই ভোট দিতে পারত। এই ব্যবস্থার পিছনে ছিল তিনটি মূল ধারণা। প্রথমত, হিন্দু ও মুসলিমদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ আলাদা, যার ফলে অন্য ধর্মের প্রার্থীদের দ্বারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থায়, যেহেতু লোকে শুধু তাদের ধর্মের প্রার্থীদেরই ভোট দেবে, সেহেতু, হয় হিন্দুরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন সমস্ত নির্বাচনে বিপুলভাবে জিতবে এবং তার ফলে খুব অল্পসংখ্যক মুসলিম নির্বাচিত হবে, নয় প্রধানত সেই মুসলিমরাই নির্বাচিত হবে যারা তাদের নির্বাচিত করার দরুন সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে বাধিত থাকবে এবং হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হবে।[৭২] তৃতীয়ত, আইন প্রণয়নকারীরা কেবল তাদের 'সম্প্রদায়ের' হয়েই কাজ করবে এবং অন্য 'সম্প্রদায়গুলির' উপরে প্রভুত্ব করার জন্য তাদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে।

পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন ও আইন পরিষদগুলিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের আঙিনায় পরিণত করল। যেহেতু ভোটদাতারা ছিল একটিমাত্র ধর্মেরই অনুবর্তী, প্রার্থীদের আর অন্য ধর্মের লোকেদের ভোট পাওয়ার অধিকার রইল না। তাই তারা সোজাসুজি সাম্প্রদায়িক আবেদন রাখতে পারত। নির্বাচনের সময়ে, ভোটদাতারা সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা ও আবেদন শুনতো; তাদের অনেকে তাই সাম্প্রদায়িকভাবে চিন্তা করতে ও ভোট দিতে, এবং সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক ক্ষমতা ও অগ্রগতির সপেক্ষে ভাবতে এবং তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষোভকে সাম্প্রদায়িকভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিল।[৭৩]

পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ফল তীব্রতর হয়েছিল ভোটাধিকারের চরিত্রের জন্য, যা ছিল সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এর অর্থ, নির্বাচনগুলি মূলতঃ মধ্যশ্রেণীদের মধ্যেই সীমিত থাকত, যারা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে,

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে জড়িয়ে ছিল চাকরী ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগের সন্ধানে। তাই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অর্থ ছিল উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীদের চাহিদা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক সাম্প্রদায়িকরণ। এর মাধ্যমে মধ্যশ্রেণীর ভিতর উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আবেগকে খানিকটা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে আইনসভার আসন ও সরকারী চাকরীর জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় রূপান্তরিত করে ফেলাও গিয়েছিল।

ফলতঃ, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী কেবল মুসলিমদের মধ্যেই নয়, হিন্দুদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিশালী করেছিল। সাধারণ কেন্দ্রগুলি থেকে বেশীর ভাগ জাতীয়তাবাদীরাই নির্বাচিত হত, কিন্তু কোথাও কোথাও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও হত। এমনকি, জাতীয়তাবাদীদেরও তাদের মধ্যবিত্ত ভোটদাতাদের বহু সাম্প্র-দায়িক ধারণাকে মর্যাদা দিতে হত এবং তার ফলে তাদেরও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রভাবে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। যেভাবেই হোক, তাদের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করার ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। কানপুর দাঙ্গা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে লক্ষ্য করা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে "নির্বাচনী প্রচারের প্রয়োজন···কংগ্রেসের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে প্রকাশ্য ও সরাসরি মোকাবিলা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিল।"[৭৭]

আসন সংরক্ষণ ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের দিকে পাল্লাভারী রাখাতেও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছিল। সংখ্যালঘুদের কাছে প্রতিপন্ন হয়ে-ছিল যে সাম্প্রদায়িকতা এবং সরকার তাদের স্বার্থরক্ষা করছে, এবং সংখ্যাগরি-ষ্ঠরা মনে করছিল যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার "স্বাভাবিক" অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের আক্রোশকে সংখ্যালঘুদের দিকে পরিচালিত করতে পেরেছিল। এটা আরো হতে পেরেছিল এই কারণে যে, অন্যান্য 'স্বার্থের' জন্য আসন সংরক্ষণের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বকে সংখ্যালঘু করে দেওয়ার ঝোঁক দেখা যাচ্ছিলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৫ সালের আইনে প্রকল্পিত ফেডারেল অ্যাসেম্বলীতে মুসলিমদের ২৫০টির ভিতর ৮২টি আসন (এক-তৃতীয়াংশ) দেওয়া হয়েছিল, যেখানে সাধারণ আসনের (যা হিন্দুদের জন্য বলে ধরা হয়েছিল) সংখ্যা ছিল ১০৫ (৪২ শতাংশ)।

পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীগুলি আসলে তাদের কাছে প্রত্যাশিত কাজ করতে পারেনি। তারা কোনো অর্থপূর্ণ বা দীর্ঘমেয়াদীভাবে মুসলিমদের বা অন্য সংখ্যা-লঘুদের স্বার্থরক্ষা করতে পারেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের সংখ্যালঘুদের সম-র্থন পাওয়ার জন্য প্রচারের দায় থেকে মুক্ত করে দিয়ে তারা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যেখানে সংখ্যালঘুদের পক্ষে তাদের প্রভাবিত করার আর কোনো শক্তিই ছিল না।[৭৮] সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিরাও যদি সাম্প্রদায়িক আচরণ করে, সংখ্যালঘুদের হয় 'চিরস্থায়ীভাবে নিষ্ফল সংখ্যালঘুর অবস্থান' নিতে হত এবং

হয়তো স্থায়ী সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের মুখোমুখি হতে হত, নয়তো তারা এলাকা-গত ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে যেতে বাধ্য হত।

পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা জাতীয় সংহতি ও জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়েছিল। এটা সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিস্তারের জন্য একটা নিয়মিত রাজনৈতিক মাধ্যম তৈরি করেছিল। এটা এমন এক রাজনৈতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল যেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে। হিন্দু ও মুসলিমদের পৃথক রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে দেখার অভ্যা-সকে উৎসাহিত ও পুষ্ট করেছিল। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এখন নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক সামাজিক গোষ্ঠীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারতো, যারা এমনিতে চাকরীর জন্য সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের বাইরে ছিল। এটা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো কঠিন করে তুলেছিল। সাধারণভাবে, এটা সাম্প্রদায়িক মনো-ভাবকে যন্ত্রণাদায়ক এবং স্থায়ী করে তুলেছিল এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তার উপর, এই ব্যবস্থা নিজেকে চিরস্থায়ী করে ফেলছিল। তা এমন কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করেছিল যা একবার তৈরী হওয়ার পর তাকে আর ছাড়বে না। ভারতে, স্বাধীনতা ও দেশভাগের আগে তাকে ঝেড়ে ফেলা যায় নি।

ব্রিটিশরা সাম্প্রদায়িক পৃষ্ঠপোষকতা ও সংরক্ষণকে সরকারী চাকরী এবং ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেছিল। মধ্য ও উচ্চ-শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে সাম্প্রদায়িক রাজ-নীতিতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে এই নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। চালু হওয়ার পর থেকেই এই নীতি সাম্প্রদায়িকতাকে সমানে বাড়িয়ে চলছিল। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আরো বেশী বেশী করে সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষ-কতা চাইছিল, এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সমানে সুযোগ হারানোর দুঃখ প্রকাশ করছিল ও একে আক্রমণ করছিল। তার উপর, ব্রিটিশরা বা ঔপ-নিবেশিকতাবাদ নয়, অন্য 'সম্প্রদায়ের' ব্যক্তিরাই চাকরী পাওয়ার বা তার জন্য ক্ষমতা বাড়ানোর পথে বাধা হিসাবে প্রতিপন্ন হচ্ছিল। এভাবে মধ্যবিত্ত রাজনীতির ধারকে বিদেশী শাসকদের বদলে অন্য "সম্প্রদায়" বা জাতের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেওয়া যেত, এবং ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতি ক্রমাগত টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারত।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের ঠিক পরেই, ব্রিটিশরা মুসলিমদের অবিশ্বাস করতে এবং মুসলিম উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীদের দমিয়ে দিতে শুরু করে। সরকারী চাকরীতে, বিশেষ করে সেনাবাহিনী ও অসামরিক পদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো এবং মুসলিমদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার নীতি অনুসরণ

করা হয়। মুসলিমদের শিক্ষাও, মৌলবাদের নিয়ন্ত্রণের দরুন কিছু বাধার সম্মুখীন হয়ে ও তার বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি নজর না পেয়ে অবহেলিত হয়। ফলে মুসলিমরা শুধু সরকারী চাকরীতেই নয়, আধুনিক পেশাগুলির ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে।

১৮৮০-র দশক থেকে, ধীরে ধীরে, এই নীতি উল্টে যায়। তার কারণ ছিল, আংশিকভাবে, নব শিক্ষিতদের মধ্যে একটি সরব জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী অংশের জাগরণ, এবং আংশিকভাবে, মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও উচ্চশ্রেণীর নেতাদের একটি গোষ্ঠীর অভ্যুদয়, যারা বলতো যে সরকারের অনাস্থা দূর করার জন্য মুসলিমদের শাসকদের প্রতি আনুগত্য ও উদীয়মান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার নীতি অনুসরণ করতে হবে, এবং এইভাবেই শিক্ষা ও চাকরীর ক্ষেত্রে সরকারী দাক্ষিণ্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ফিরে পেতে হবে। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে তাদের প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করেছিলেন ভাইসরয় থেকে আরম্ভ করে নীচের স্তরের পদস্থ কর্মচারীরা, যারা জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন এবং তার বিপরীতে দাঁড় করাবার মতো কোনো শক্তি খুঁজছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বে মুসলিম মধ্য ও উচ্চশ্রেণীরা, সাধারণভাবে ভূস্বামী ও আমলাদের সঙ্গে মিলে, এই ভূমিকা নিতে পারবে।

১৮৮০-র দশকে নতুন নীতি গ্রহণ করা হল, যখন সরকার শিক্ষা ও সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুসলিমদের বিশেষ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিল, যদিও বাস্তবে কেবল উচ্চশ্রেণীর মুসলিমদেরই দাক্ষিণ্য দেখানো হয়েছিল। আলিগড়ে সৈয়দ আহমদ খানের শিক্ষা প্রচেষ্টায় বিপুল সমর্থন বাদ দিলে, শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই নীতিকে দুর্বলভাবেই প্রয়োগ করা হয়। উপরন্তু, হয়তো জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতা ও যুক্তপ্রদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা গোড়ার দিকেই বিকশিত হওয়ার দরুন, যেখানে হিন্দু মধ্যশ্রেণীরাই সরকারী চাকরীতে নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করত, লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর এ. পি. ম্যাক্‌ডোনেল ১৮৯০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করেছিলেন এবং প্রশাসনে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়াতে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট কোটার মাধ্যমে সরকারী পদ ও পদোন্নতি সংরক্ষণ নীতি বাংলা ও পাঞ্জাবে জোর-দারভাবে অনুসৃত হয়েছিল। ১৯৩৪-এ এই নীতিকে সমস্ত প্রাদেশিক ও সর্ব-ভারতীয় চাকরীর ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হয়। পেশাগত ও অন্যান্য সরকারী কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও তা বেশী করে প্রযুক্ত হতে থাকে।

যাতে সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠতে পারে, তার জন্য সরকার মিউ-নিসিপ্যাল কমিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সম্প্রদায়গত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে শিক্ষার বিকাশকে সযত্নে নিয়ন্ত্রণ করত।

চাকরী ও শিক্ষা ছাড়াও, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার আরো বহু মাধ্যম ছিল, যেমন কন্ট্রাক্ট দেওয়া, খেতাব দেওয়া, সাম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিয়োগ করা, পৌরসংস্থা ও আইনসভায় মনোনীত করা, যা ব্যবহার করা হত সাম্প্রদায়িক নেতাদের এবং তাদের রাজনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কিছু না করার মধ্যে দিয়েও ব্রিটিশরা তাকে উৎসাহ দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ রোধ করার জন্ম দরকার ছিল কিছু ইতি-বাচক পদক্ষেপ, যা কেবল রাষ্ট্রই নিতে পারতো। এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণে ব্রিটিশদের ব্যর্থতা সাম্প্রদায়িক শক্তিদের প্রতি পরোক্ষ সমর্থনের কাজ করেছিল।

প্রথমত, ভারত সরকার হিংস্র সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিষাক্ত ও বিপজ্জনক প্রচারের প্রায় সবকটি মাধ্যমই ব্যবহার করেছিল : বক্তৃতা, গুজব, জনপ্রিয় সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, প্রচারপুস্তিকা, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ব্যঙ্গরচনা, ব্যঙ্গচিত্রণ, ব্যঙ্গগীতি। খুব কম সময়েই সরকার তাকে দমন করতে বা তার প্রচারকদের শাস্তি দিতে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে। এই বিরল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কেবল ধর্মীয় আক্রমণের জঘন্যতম ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে, যখন ধর্মীয় দুর্বলতাব জায়গায় আঘাত লেগেছে, যাতে উত্তেজনা এমন পর্যায়ে না উঠতে পারে যে আইন-শৃংখলা বিপন্ন হবে।

এটা মনে রাখা দরকার যে ১৯২০-র দশকের মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকার পুলিশ রিপোর্ট, খবর সংগ্রহ, এবং সেন্সরশীপ ও সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার অন্যান্য আইনের এক বিস্তৃত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এই দমনযন্ত্রের প্রায় পুরোটাই চালিত ও নিয়োজিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে সরকার ছিল সক্রিয়, অনমনীয়, সতর্ক এবং কার্যকর। 'অসন্তোষ' ও 'রাজদ্রোহ' জাগানোর সামান্যতম চেষ্টাও ধরা পড়তো এবং অনেক সময় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হত।[৭৬] কিন্তু সেই একই আইন প্রণয়নকারী, পুলিশ এবং প্রশাসক যন্ত্র অন্যমনস্কতা এবং আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তা দেখাতো, যেখানে এমনকি সাম্প্রদায়িক প্রচারের সবচেয়ে বিষাক্ত রূপগুলি ও অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে সাম্প্রদায়িক হত্যা ও দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ প্ররোচনা দিচ্ছে, বা সাধারণভাবে সাম্প্র-দায়িকতাবাদ স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। এখানে অনেক সময়ে নাগরিক স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের নীতির কথা ও তাদের প্রতি ভালবাসার কথা তোলা হত। এ-ধরণের দুই-মানদণ্ডের ব্যবহারের বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, ১৯০৭-এর বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আলোচনা করতে গিয়ে সুমিত সরকার দেখিয়েছেন : "সাম্প্রদায়িক **লাল-ইস্তাহার**-এর লেখক ইব্রাহিম খানকে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে লিয়াকত হুসেন ও আবদুল গফুর খানকে (স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক) রাজদ্রোহের অপরাধে সতর্ক করা হয়েছিল।"[৭৭]

তার আগে, ১৮৯০-৯১ সালে, যখন উত্তর ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক গুজব ছড়ানো হচ্ছিল, কোনো কোনো পদস্থ কর্মচারী মিথ্যা খবর পরিবেশনের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া সহজতর করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৫ ধারার সংশোধনের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু ভাইস্‌রয় ল্যান্সডাউন তা নাকচ করে দিয়েছিলেন এই বলে, যে তা "এক প্রতিবাদের ঝড়" তুলবে। অথচ ঐ বছরই, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, ঘৃণা বা অসন্তোষ জাগাতে পারে এমন 'রাজদ্রোহমূলক' লেখার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য কঠোরতর সংবাদপত্র আইন পাশ করা হয়।[৭৮] জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক নীতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ১৯২০-র দশকে, যখন সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রথম হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাম্প্রদায়িক এবং ব্রিটিশ মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলিকে অবাধে ধর্ষণ, অপহরণ ও হত্যাসহ তথাকথিত সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলীর চাঞ্চল্যকর খবর সাড়ম্বরে প্রকাশ করতে দেওয়া হয়েছিল এমন ভাষায়, যা নগ্নভাবে পাঠকদের মধ্যে চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, মোপলাদের কার্যকলাপের এই বিবরণীটি ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২১-র **টাইমস অফ্ ইণ্ডিয়া**-তে প্রকাশিত হয় এবং পরে ব্যাপকভাবে পুনঃপ্রচারিত হয়:

> "বিদ্রোহীরা... সুন্দরী হিন্দু মেয়েদের জোর করে ধর্মান্তরিত করেছিল এবং তাদের অস্থায়ী জীবনসঙ্গিনীরূপে ব্যবহার করেছিল। হিন্দু নারীদের শাসানো হয়, দৈহিক নির্যাতন করা হয়, এবং তারা আশ্রয়ের জন্য অর্ধনগ্ন অবস্থায় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সম্মানিত হিন্দু ভদ্রলোকদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং কতিপয় মুসলিয়র ও থাঙ্গালদের সাহায্যে সুন্নত করা হয়।"[৭৯]

যে সময়ে উদীয়মান চলচ্চিত্র মাধ্যম সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল, তখন হিন্দুদের উপর মোপলাদের অত্যাচারের ছবি, প্রবল চাক্ষুশ ও আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি সত্ত্বেও, অবাধে দেখাতে দেওয়া হয়েছিল।[৮০] জাতীয়তাবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে সরকারী সক্রিয়তা ও মোপলা উত্থানের সময়ে সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার বিরুদ্ধে তার চরম নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে প্রভেদ সমসাময়িক ভাষ্যকারেরা উল্লেখ করেছিলেন। ২১শে অক্টোবর ১৯২১ লাহোরের উর্দু সংবাদপত্র **জমিন্দার** লেখে:

> "অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও নরমপন্থী পত্রিকাগুলির প্রতিবেদকরা মোপলা অত্যাচারের লম্বা লম্বা গল্প প্রকাশ করছে...হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ জাগানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। সরকারের ক্ষতি করতে পারে এমন রিপোর্ট কেউ ছাপলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু যারা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভিত্তিহীন ও উদ্ভট বিবৃতি ছেপে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ১৫৩ক ধারা পঙ্গু হয়ে পড়েছে।"[৮১]

১৯৪৬-এর দুর্যোগের আগে, ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত সময়কাল ছিল সাম্প্রদায়িক হিংসার সবচেয়ে খারাপ পর্যায়। কেন্দ্রীয় আইনসভার একাধিক হিন্দু ও মুসলিম সদস্য প্রস্তাব করেছিলেন, বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি সৃষ্টিকারী কাজকর্ম নিরোধের জন্য আইন করা হোক। স্বরাষ্ট্র দপ্তর সাফল্যের সঙ্গে এইরকম আইনের বিরোধিতা করে এই যুক্তিতে যে তা ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে।[৮২]

একই বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল ইতিহাস রচনা এবং পড়ানোর সংবেদনশীল ক্ষেত্রে। সাম্প্রদায়িক, আধা-সাম্প্রদায়িক, বা সাম্প্রদায়িকতাবাদ-দুষ্ট ঐতিহাসিকরা নিয়োগ বা পদোন্নতিতে কোনো বাধা পায়নি। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের সর্বপ্রকারভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী কে. পি. জয়সওয়ালকে ১৯১২-১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, এবং কলকাতার উপাচার্য ১৯২৯-৩০ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি., এস সান্যালকে লেক্‌চারার পদে নিয়োগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কারণ গভর্নর সন্দেহ করেছিলেন যে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা রয়েছে। বেসরকারী স্কুল-কলেজের ছাত্ররা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিলে অথবা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরলে, তারা সরকারী সাহায্য বা এমনকি স্বীকৃতি হারানোর সম্মুখীন হত। অন্যদিকে, শিক্ষক ও ছাত্রদের অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে সক্রিয় হতে বা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রচার করতে দেওয়া হত। অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী লেখক বা অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাও এরচেয়ে ভাল ছিল না। প্রেমচন্দ্র প্রথমে তাঁর জাতীয়তাবাদী ছোট-গল্পের একটি সংকলন নষ্ট করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং পরে একই ধরণের গল্প ও উপন্যাস লিখে যাওয়ায় শিক্ষা দপ্তর থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। ঝাঁসীর রাণীকে প্রশংসা করে একটি কবিতা লেখার জন্য সুভদ্রা কুমারী চৌহানকে জেলে যেতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে, টিপু সুলতান, বাহাদুর শা, ঝাঁসীর রাণী, তাঁতিয়া টোপি, কুঁয়র সিং, ক্ষুদিরাম বসু, ভগৎ সিং প্রমুখের জীবনী তৎক্ষণাৎ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অন্যদিকে, যেসব লেখকরা নাটক, কবিতা, গল্প, ইত্যাদির মাধ্যমে, মধ্যযুগীয় জমিদার, দলপতি ও শাসকদের অন্য ধর্মের প্রতিরূপদের বিরুদ্ধে জনশ্রুতিমূলক লড়াইকে মহিমান্বিত করছিলেন, ও তার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগ্রত ও বর্ধিত করছিলেন, তাঁদের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার, বা অন্তত চাকরী রাখার বা পদোন্নতির, ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা হয় নি।

এর থেকে আংশিকভাবে বোঝা যায়, কেন স্বাধীনতার আগে কোনো প্রতিষ্ঠানিক ইতিহাসবিদ্ একটিও ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক, প্রবন্ধ বা গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেন নি, যাতে ঔপনিবেশিক শাসনের মৌলিক সমালোচনা ছিল:

গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদাহরণ একরকম পথ দেখিয়েছিল। "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় প্রকাশিত "আনন্দমঠ"-এর প্রথম সংস্করণটিতে সন্ন্যাসীদের সংগ্রাম প্রসঙ্গে এমন বহুকথা, স্থানের নাম, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছিল যাতে বোঝা যায় ঐ সংগ্রাম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। সে সময়ে বঙ্কিম ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। সরকারী মহল থেকে তিনি আভাষ পেয়েছিলেন যে এইরকম রচনা তাঁর সরকারী কর্মজীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি তাড়াতাড়ি লেখাটা এমনভাবে পাল্টালেন যাতে ইংরেজদের সম্পর্কে সব বিরূপ মন্তব্য উঠে গিয়ে নবাবের মুসলিম পদস্থ কর্মচারীরাই একমাত্র খলনায়ক রূপে প্রতিপন্ন হল, এবং তাদের বিরুদ্ধেই এই দেশপ্রেমিক সংগ্রাম। যেমন, বঙ্গদর্শন এবং বইয়ের প্রথম সংস্করণে, বঙ্কিম জীবানন্দের শত্রুদের ইংরেজ বলে উল্লেখ করে ছিলেন, কিন্তু সংস্করণে তাদেব বলা হয় 'যবন', এবং একজায়গায় 'নেড়ে' বা নিম্নশ্রেণীর মুসলিম। পরে, পঞ্চম সংস্করণে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের প্রশংসাত্মক বহু বাক্য সংযোজন কবাও প্রয়োজনীয় এবং নিরাপদ বলে মনে করেছিলেন।[৮৩]

যে কোনো সম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রচনা ও অন্যান্য কাজকর্মকে নীচু দৃষ্টিতে দেখা এবং অনেক সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাস্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকাব সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী ও সরকারী কর্মচারীদের খেতাব, লাভজনক ও উচ্চ বেতনের পদ, বিনাবেতনের ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিয়োগ, ও অন্যান্য পুরস্কারের মাধ্যমে মুক্তহস্তে পুবস্কৃত করত। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা ছিল সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীদের সদস্য সরবরাহেব উর্বর ভূমি—মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার বহু নেতা এসেছিলেন আমলাদের মধ্য থেকে। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদী কাজকর্মের জন্য অনেক সময়ে পেনশন হারাতে হত। একদিকে চাকরীতে পদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও, জাতীয়তাবাদী কাজকর্ম কঠোরভাবে দমন করা হত এবং অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম মারাত্মক স্তরে পৌছানোর আগে নজরে পড়ত না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয়তা ও দায়িত্বহীনতার নীতি অনুসরণ করত। দাঙ্গা হলে, তাদেব পূর্ণোদ্যমে দমন করা হত না। সুবিদিত লৌহবেষ্টনীর রণনীতি অত্যন্ত অপটু হয়ে পড়ত এবং বন্দুকবাজ পুলিশরা প্রতিহিংসা পরায়ণে বিবেকের দংশন অনুভব করত। ১৯৩১ সালে সরকারী কানপুর দাঙ্গা তদন্ত কমিটি লক্ষ্য করেছিল :

> "সমস্ত শ্রেণীর সাক্ষীরা একটি বিষয়ে একমত ছিল যে দাঙ্গার সময়ে বিভিন্ন ঘটনার মোকাবিলায় পুলিশ ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়েছে। এই সাক্ষীদের মধ্যে আছে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা, সব ধরণের মতাবলম্বী মুসলিম ও হিন্দু, মিলিটারী অফিসাররা, আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ্ কমার্সের সচিব,

ভারতীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এবং এমনকি ভারতীয় পদস্থ কর্মচারীরা…আমাদের মনে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা নেই যে দাঙ্গার প্রথম তিনদিন পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালনে আশানুরূপ তৎপরতা দেখায়নি… বহু সাক্ষী এমন উদাহরণ দিয়েছে যেখানে পুলিশের চোখের সামনে গুরুতর অপরাধ ঘটেছে অথচ তারা কিছুই করেনি।"[৮৪]

এই রিপোর্টে আরো বলা হয় যে ২৪ থেকে ২৬শে মার্চ তিনদিন ভয়ঙ্কর দাঙ্গার সময় পুলিশের গুলিচালনার একটিও ঘটনা ঘটেনি, এবং কর্ণেলগঞ্জে ২৫শে মার্চ পঁচিশজনের গ্রেপ্তার ব্যতীত আর মাত্র আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।[৮৫] আবার, এই 'অসাধারণ নিষ্ক্রিয়তা' ও প্রশাসনিক ঔদাসীন্যের পাশাপাশি দেখা যায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, বা এমনকি আকালী আন্দোলন বা মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের মত সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলিকে পুলিশ কীভাবে মোকাবিলা করেছিল। এক্ষেত্রে আমরা দেখব ব্যাপক মানুষের তাড়া খাওয়া ও গ্রেপ্তার হওয়া, নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশুদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ, এবং পুলিশের প্রতিষেধক 'হানা'। উপরন্তু, দাঙ্গাব সময় যখনই কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, শুধু নিম্নশ্রেণীর অংশগ্রহণকারীরা শাস্তি পেয়েছে; মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর উস্কানীদাতারা বেকসুর খালাস পেয়েছে। অথচ জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে, নেতাদেরই আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রশাসন খুব কম সময়েই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি বা প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিয়েছে। এই প্রাথমিক প্রশাসনিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করাটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল কারণ এই ধরণের বেশীর ভাগ পরিস্থিতিই, যেমন হোলি ও মহরম একই দিনে পড়া, নতুন কোনো পৌর উপ-আইন, গোহত্যা বা গোমাংস বিক্রীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—অনেক আগে থেকেই আঁচ করা যেতো। অন্যক্ষেত্রেও, কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ আগে হুঁশিয়ারী না দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খুব কমই হয়েছে। দাঙ্গা হওয়ার জন্য, উত্তেজনাকে প্রয়োজনীয় স্তরে ওঠাতে হত। এতে সময় লাগতো। সি.আই.ডি বা গোয়েন্দা দপ্তর বেশ ভালোভাবেই কাজ করত। মসজিদের সামনে সঙ্গীতানুষ্ঠান, গরু বলি দেওয়ার শোভাযাত্রা সংগঠন প্রভৃতি প্ররোচনাগুলি সম্পর্কে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটরা সাধারণতঃ অবহিত থাকতেন। প্রশাসন অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পেতো। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মোকাবিলায় এই প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা কোনো অন্তর্নিহিত বাধার কারণ ছিল না।

এটা ঘটনার দ্বারা বোঝা যায় যে যখন প্রশাসন দাঙ্গাকে নিষ্ক্রিয় ও দমিয়ে দেবার ব্যবস্থা নিতে মনস্থ করত, দক্ষতা সহকারে ও সফলভাবে সেটা করা হত।[৮৬] বস্তুত, কঠোরভাবে আইন-শৃংখলা রক্ষা করা হলে এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এটা জনগণের জানা থাকলে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দাঙ্গা আটকানো,

তাদের বিস্তৃতি রোধ করা এবং যে কোনো ক্ষেত্রেই, তাদের হিংস্রতা কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হত।"

বহুসংখ্যক প্রখ্যাত ব্যক্তি এবং সংবাদপত্রের মত ছিল যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দিত এবং কলকাঠি নাড়তো বা অন্তত জড়িত থাকত, বিশেষত যখন তারা জাতীয়তাবাদী বা শ্রেণীগত অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হত। এই কাজ করা হত দালালদের মাধ্যমে উস্কানি দিয়ে, দাঙ্গার প্ররোচক বা সংগঠকদের সাহায্য করে, বা এইরকম আর কোনো উপায়ে। আঞ্চলিক-স্তরে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৮৭] অবশ্যই, গোপন পুলিশ রেকর্ড প্রকাশিত হওয়ার আগে আমরা এ ব্যাপারে সরকার কতটা জড়িত ছিল তা জানতে পারব না। একইসঙ্গে, আমাদের বিশ্লেষণের পক্ষে, এই দিকটা সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট বা দৃঢ় অবস্থান নেওয়া আবশ্যক নয়। আমরা এটা মেনে নিতে পারি যে ব্রিটিশদের দাঙ্গার সম্পর্কে নিজস্ব 'পরিষ্কার' যুক্তি ছিল। তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও বিভেদকে উৎসাহ যোগাতো, কিন্তু হয়ত হিংস্র দাঙ্গাগুলি সক্রিয়ভাবে সংগঠিত করার ব্যাপারে নীতির স্তরথেকে বেশীদূর এগোতে পারতো না। কিন্তু 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতি এবং ঔপনিবেশিক মতাদর্শের প্রভাবে তারা নিশ্চিতভাবেই এগুলি দমন করার জন্য বিশেষ কিছু করেনি। নিশ্চিতভাবেই, তারা দাঙ্গাদমনকে অনেক কম প্রশাসনিক গুরুত্ব দিয়েছিল। যেমন, জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার বা তার মোকাবিলার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য একজন পদস্থ কর্মচারীকে তার কর্মজীবনে বিপর্যয় না হলেও বাধার সম্মুখীন হতেই হত, যেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা সাম্প্রদায়িক নেতাদের প্রতি সহানুভূতি বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার দক্ষ মোকাবিলা না করা সহজেই চোখ এড়িয়ে যেতো।

এই নিষ্ক্রিয়তার নীতির ফলে ১৯৪৬-৪৭-এর সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের সময় হাজার হাজার জীবনের মাশুল গুণতে হয়েছিল। বাংলা ও পাঞ্জাব দু'জায়গাতেই, উপরতলা থেকে নীচুতলা পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্মচারীরা গণহত্যা ও একতরফা আক্রমণের মুখে নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, অথর্ব ও মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছিল, যেখানে সামান্য প্রশাসনিক শৃংখলা ও সক্রিয়তা হাজার হাজার প্রাণ বাঁচাতে পারত। বহু প্রশাসনিক কর্মচারী অবশ্য ভারতীয়দের উপর গভীর বিরাগ পোষণ করছিল, তারা উপনিবেশবাদের সঙ্গে তাঁদেরও ছুঁড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

দাঙ্গার সময় প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার আর একটা মারাত্মক ফল হয়েছিল। সেই সময় পুলিশের কাছ থেকে নিরাপত্তা না পেয়ে লোকে বাধ্য হয়েছিল হিন্দু বা মুসলিম হিসাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং নিজের নিজের সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির উপর নির্ভর করতে। এটা অনিবার্যভাবে সাম্প্রদায়িকতা-

বাদকে জোরদার করেছিল এবং সাম্প্রদায়িক সন্দেহ ও বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে তুলেছিল।

[সাত]

একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশে ঔপনিবেশিক নীতিকে খাটো করে দেখা উচিৎ নয়। এই নীতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র, শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল নয়। রাষ্ট্রের সবসময়েই ভালো বা মন্দ করার প্রচণ্ড ক্ষমতা রয়েছে। এটা আরো বেশী সত্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, যা জীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্র জুড়ে ছিল, লাগামহীন প্রশাসনিক সাংবিধানিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজে হস্তক্ষেপের অনেক বেশী ক্ষমতা রাখতো। উপরন্তু, জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে এটাই শুধু কার্যকরী হতে পারতো। সে একাই পারতো বিদ্বেষ প্রসূত ও উত্তেজনাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিরুদ্ধে, বিষময় মিথ্যা ও গুজব ছড়ানোর বিরুদ্ধে, স্কুল-কলেজে একপেশে ইতিহাস পড়ানোর বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে; সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ক্ষেত্রে পুলিশী ব্যবস্থা নেওয়াও তার একার পক্ষে সম্ভব ছিল—এবং অনেক সময়েই কঠোর আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে দমিয়ে রাখতে পারত; শুধু তারই দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের আইনী অধিকার এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল; সে একাই পারত দাঙ্গার উস্কানীদাতা ও সংগঠকদের শাস্তি দিতে এবং যারা দাঙ্গা থামাতে চেষ্টা করেছে তাদের পুরস্কৃত করতে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই শিক্ষাব্যবস্থা. রেডিও, সরকারী প্রচারযন্ত্র, এবং বিভিন্ন পদে বহাল করার মত পৃষ্ঠপোষকতার একটি কাঠামো—এইসব দমন যন্ত্র ছিল, যা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে মোকাবিলা ও ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করা যেত। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতি দায়বদ্ধ একটি জাতীয় সরকার নিশ্চয়ই তা করত।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বহুল পরিমাণে পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ করেছিল যার গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল সাধারণভাবে অর্থনীতির ও বিশেষভাবে শিল্পের অনগ্রসরতার দরুন। মধ্যশ্রেণীগুলির তুলনামূলকভাবে বৃহৎ আকারের সঙ্গে মিশে, চাকরী ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতা যোগাবার এই ক্ষমতা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পেটি-বুর্জোয়াদের রাজনীতিকে প্রভাবিত করার প্রবল শক্তি সরবরাহ করেছিল। এই শক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছিল পেটি-বুর্জোয়াদের এক অংশের বিরুদ্ধে আরেক অংশকে চালিত করতে, তাদের চাকরীর সন্ধানকে রূপ দিতে, সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও রাজনীতিকে ঘিরে নিরাপত্তা ও সত্তাকে গড়ে তুলতে, এবং তাদের চোখে সাম্প্রদায়িক নেতাদের আকর্ষণ বাড়িয়ে দিতে, যাদের মাধ্যমে অংশত ঔপনিবে-

শিক পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হত। সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তিগুলির অনুকূলে সাংবিধানিক, প্রশাসনিক এবং শিক্ষাগত কাঠামোকে গড়েপিঠে নেওয়ার বিরাট ক্ষমতাও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ছিল। তাই তার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ভারতীয়দের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং তার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের প্রসার ঘটানোতে জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সফলভাবে ব্যবহার করা গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার পিছনে রাষ্ট্রের শক্তি না থাকলে, জাতীয়তাবাদী নেতারা হয়তো তাকে নির্মূল করতে না পারলেও খর্ব করতে পারতেন। সর্বোপরি, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও তার নীতি, এবং সরকারী ঘোষণা, ঔপনিবেশিক লেখকবৃন্দ, সরকারী বা ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত গণপ্রচার মাধ্যম ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট ও প্রচারিত মতাদর্শ সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশের জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্র ও অনুকূল জমি তৈরীকরেছিল।

এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিশ্লেষণ থেকে একটি রাজনৈতিক অনুসিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে, ঔপনিবেশিক শাসন বজায় থাকাকালীন সাম্প্রদায়িকতার সমাধান হওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র একটি জাতীয় রাষ্ট্র, একটি রাষ্ট্র বা জাতীয় সংহতিতে ও জাতি গঠনে আগ্রহী ছিল, যা সমাজের বিভিন্ন অংশের অসাম্য দূর করতে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দমিত ও 'নিয়ন্ত্রিত' করতে ও রাজনীতির উপর তাদের প্রভাব খর্ব করতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে পারত। তার অসংখ্য মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহ দিতে পারত, এবং সর্বোপরি, অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদের ভিত্তিভূমিতে যে অর্থনৈতিক অসাম্যগুলি রয়েছে তাদের দূর করতে পারত। নিশ্চয়ই, সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করার জন্য ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উৎখাত আবশ্যিক কিন্তু যথেষ্ট শর্ত ছিল না।

ঔপনিবেশিক যুগের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৪৭-এর পর ভারত ও পাকিস্তানের পরিস্থিতির তুলনা করলে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি। ভারতভাগ ও তার সঙ্গে জড়িত সাম্প্রদায়িক গণহত্যা সহ অনুকূল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি প্রধান সামাজিক বা রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। তারা ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে ছড়াতেও পারেনি। যদিও মধ্যশ্রেণী ও আমলাতন্ত্রের একটা বড় অংশ সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও রাজনীতিতে সাড়া দিয়েছে। রাষ্ট্র মতাদর্শগত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদের মোকাবিলা করায় সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে বলে এটা হয়েছে, এমন নয়। রাষ্ট্র তা নেয়নি। কিন্তু রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থনও করেনি। আর ধর্মনিরপেক্ষতা সংবি-

ধানে স্থান পেয়েছে, শাসকদলের এবং অন্যান্য বেশীর ভাগ দলের ঘোষিত মতাদর্শ হয়ে উঠেছে। অন্যভাবে বললে, একটি দুর্বল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রও ভারতীয় জনগণকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ দমনে সাহায্য করেছে; এবং রাষ্ট্রীয় সমর্থনেব অভাব সাম্প্রদায়িক শক্তিদের বিকাশের পথে অন্যতম মূল অন্তরায় রূপে কাজ করেছে। তার বিপরীত ঘটেছে পাকিস্তানে, যেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদ রাষ্ট্রকাঠামো এবং সরকারী মতাদর্শের অঙ্গীভূত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশে ঔপনিবেশিক নীতির বিরাট ভূমিকা দেখে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও তার প্রভাবে গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক কাঠামোই যে এর মূল কারণ বা এর জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী, তা যেন আমরা খাটো করে না দেখি বা এড়িয়ে না যাই। ঔপনিবেশিকতাবাদ এই পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র, বা প্রধানত, একটি নীতি বা 'উপাদান' ছিল না। তা ছিল ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। ঔপনিবেশিকতা এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই ঔপনিবেশিক নীতি সহ বিভিন্ন উপাদান কাজ করেছিল, যার মধ্যে দিয়ে তারা নির্দিষ্ট অকার পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতাবাদ বেড়ে উঠেছিল এবং কাজ করেছিল। ঔপনিবেশিক কাঠামো, এবং তার থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও অর্থনৈতিক সুযোগের অভাবই একদিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অনুকূল এবং অন্যদিকে 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল', এই ঔপনিবেশিক নীতি যাতে সফলভাবে কাজ করতে পারে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থা না থাকলে এই নীতি এত সহজে সফল হতে পারত না।

সবশেষে, আমরা এটাও দেখতে পারি যে ঔপনিবেশিক নীতি সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ আমরা আগে চতুর্থ অধ্যায়ে যা বলেছি তাকেই আরো জোরদার করছে। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ শুধু মধ্যশ্রেণীদের, মহাজনদের, ভূস্বামী ও অন্যান্য জাগীরদারী শ্রেণীদের মত দেশজ সামাজিক শ্রেণী ও স্তবগুলিরই সেবা করেনি; এর মাধ্যমেই পেটি বুর্জোয়া রাজনীতিকে ঔপনিবেশিকতার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। অন্যভাবে বললে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ কাজ করেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের একটা পর্দা হিসাবে—এবং শেষের দিকে প্রধান সামাজিক পর্দা হিসাবে। এটা ছিল ঔপনিবেশিক নীতির কাজ। অন্যদিকে, রাষ্ট্রশক্তির অনুপস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের অনুকূল দেশজ সামাজিক শ্রেণী ও স্তরগুলির পক্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদের মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি করার ক্ষমতা ছিল না, এবং তারা সেই কারণেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করেছিল। সুতরাং, একদিক থেকে সাম্প্রদায়িকতা ছিল সেই প্রধান রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত যোগসূত্রগুলির অন্যতম, যাদের মাধ্যমে ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে এইসব শ্রেণী ও স্তরগুলির পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং আদান-প্রদান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

টীকা

১। কিন্তু সমাজের বা তার কোনো অংশের নতুন চাহিদা মেটানোর জন্য এক একটা বিশেষ মুহূর্তে কি নতুন উপলব্ধি, তত্ত্ব বা চিন্তা গড়ে ওঠে না? অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, কীনস্, মার্ক্স, লেনিন, মাও বা গান্ধীর চিন্তাধারা কি এর উদাহরণ নয়? যে দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনার গ্রহণীয়তাকে অস্বীকার করে এটা তার ক্ষেত্রেও সত্যি।

২। গোপালকৃষ্ণ, "রিলিজিয়ন ইন পলিটিক্স", পৃঃ ৩৬৩-৬৪। এখানে আমরা লেখকের, এবং অন্যান্য অনেকের, যেমন রবিনসনের (টীকা ৩) এক অদ্ভুত পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাই। জাতীয়তাবাদী লেখকদের ও যুক্তিগুলিকে 'জাতীয়তাবাদী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু অন্য লেখকদের বা অন্য যুক্তিগুলির মতাদর্শকে ছোঁয়াহ হয় নি। যেমন নিশ্চিতভাবে সাম্রাজ্যবাদী লেখক প্রমুখের এভাবে কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি। বোধহয় জাতীয়তাবাদ লেখকদের ও যুক্তিগুলিকে মতাদর্শ যুগিয়েছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তা করে নি।

৩। ফ্রান্সিস রবিনসন, 'সেপারেটিসম্ অ্যামং ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্', পৃঃ ২। এছাড়া দ্রষ্টব্য: জি. আর থার্সবি, 'হিন্দু-মুসলিম রিলেশনস্ ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ১৭৩।

৪। এবং এই স্তরে বিশ্লেষণের একধরণের স্থূলতা দেখা যায়। গণ-আন্দোলনের স্তর থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যদি মার্ক্সবাদ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার উদারনৈতিক রচনা ইত্যাদির বিশ্লেষণ করা হত, তবে ফলটা কী হত ভেবে দেখুন।

৫। মোতিলাল নেহরু, 'দ্য ভয়েস অফ ফ্রীডম: সিলেক্টেড স্পীচেস অফ পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু', পৃঃ ৫২-৫৩।

৬। পৃঃ ৪৫ ও ১৬১ দ্রষ্টব্য (জোর আরোপিত)। অনুরূপভাবে, বিটিশদের ও সৈয়দ আহমদ খানের রাজনীতি আলোচনা করতে গিয়ে এই রিপোর্ট-এ বলা হয়েছে যে, ভিন্ন উদ্দেশ্য সত্ত্বেও, দুজনেই "একই কেন্দ্রে মিলিত হচ্ছিল", পৃ. ১৮৩। কমিটির সদস্য ছিলেন, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, পণ্ডিত সুন্দরলাল, ভগবান দাস, মনজুর আলি সোখতা, আব দুল লতিফ বিজনোরি ও মৌলানা জাফরুল মুলুক।

৭। নেহরু, নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ৭, পৃঃ ১২০।

৮। ঐ, পৃঃ ৬৯-৭০।

৯। ঐ, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৮২।

১০। ঐ, খণ্ড ১৩, পৃঃ ২৪৪, ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা। অনুরূপভাবে, তাঁর আত্মজীবনীতে সাম্প্রদায়িকতা অধ্যায়ে নেহরু কোথাও সাম্প্রদায়িকতার বিকাশের মূল কারণ হিসাবে ব্রিটিশদের ভূমিকা নির্দেশ করেন নি। ১৯৩৩ সালে জে.টি গয়ন্সকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে "তাদের নীতির দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই রোগকে বাড়িয়ে তোলার" দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন, ঐ, পৃঃ ৫৬। গান্ধীর মতের জন্য দ্রষ্টব্য তার সঙ্কলন, 'দ্য ওয়ে টু কমিউনাল হারমোনি', পৃঃ ৬-৭, ১৯৪-৯৯।

১১। সুমিত সরকার, 'দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯০৩-১৯০৮'-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৮৩। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে নষ্টের গোড়াটা লুকিয়ে আছে হিন্দুদের সামাজিক ধারার ভিতর, যা তাদের মুসলিমদের ছোটো করে দেখতে শিখিয়েছে। মূলত, হিন্দু এক মুষ্টিমেয় শিক্ষিত গোষ্ঠীর সঙ্গে জনগণকে যে 'মহাসাগর' বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে একটি শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন গড়তে হলে এই সমুদ্রে সেতুবন্ধন করতে হবে।

১২। কে. বি. কৃষ্ণ, 'দ্য প্রবলেম অফ মাইনরিটিস', পৃঃ ২৯৩ ও ৩৪৬। আরো দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৭৭,

যেখানে ব্রিটিশ নীতিকে "দেশের সাধারণ অর্থনীতি"র ভিতর থেকে উঠে আসা উত্তেজনাকে "বাড়িয়ে তোলার" জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও দেখুন পৃঃ ২৬৩।

১৩। এ. আর দেশাই, 'সোশাল ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্‌ম', পৃঃ ৩৬০-৯৮। বিঃ দ্রঃ, পৃঃ ৩৬২-৬৩।

১৪। রজনীপাম দত্ত, 'ইণ্ডিয়া টুডে', পৃঃ ৪২৫। আরো দেখুন পৃঃ ৪২৮ ও তারপর।

১৫। সি জি. শাহ, 'মার্ক্সিসম্‌-গান্ধীসম্‌-স্তালিনিসম্‌', পৃঃ, ১৯১।

১৬। বেণীপ্রসাদ, 'দ্য হিন্দু-মুসলিম কোয়েশ্চনস্‌', পৃঃ ১৬৩।

১৭। এ. মেহতা ও এ. পট্টবর্ধন, 'দ্য কমিউনাল ট্রায়্যাঙ্গল ইন্‌ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ৭৯। আরো দেখুন "ভূমিকা", পৃঃ ৭-৯।

৮। ভারতীয়, বিশেষত মুসলিম, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, এই মতানুসারী ছিল এবং একে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করত। আমরা যেমন আগে দেখেছি, এটাই তাকে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার বানিয়েছিল, এমনকি যখন সে বিষয়ীগতভাবে জাতীয়তাবাদীও হয়ে থাকতে পারতো।

৯। যদিও দীর্ঘ উদ্ধৃতিমালা থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। লর্ড এল্‌ফিন্‌স্টান ১৮৫৮-তে বলেছিলেন : "ডিভাইড, অ্যাণ্ড রুল", ছিল প্রাচীন রোমান নীতি, এবং আমাদের তা গ্রহণ করা উচিৎ।" এ আর দেশাই, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩৬৩। ভারতের রাষ্ট্রসচিব চার্লস উড ১৮৬২-তে ভাইসরয়কে লিখেছিলেন যে ভারতের 'জাতিগুলির' অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতে ব্রিটিশদের শক্তি যোগাবে। তাই 'এক বিভেদকারী শক্তিকে' জিইয়ে রাখতে হবে, কারণ সমগ্র ভারত আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে আর কতদিন আমরা টি কে থাকতে পারব?"—এস গোপাল, ব্রিটিশ পলিসী ইন ইণ্ডিয়া ১৮৫৮-১৯০৫', পৃ. ৩৬। রাষ্ট্রসচিব ক্রস ১৮৮৭-তে ভাইসরয়কে লিখেছিলেন, "এই ধর্মীয় মনোভাবের বিভাগ আমাদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক"। 'ডাফরিণ পেপারস্‌', রীল ৫১৮। রাষ্ট্রসচিব বার্কেনহেড ১৯২৫-এর মার্চে ভাইসরয়কে লিখেছিলেন, "সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি চিরস্থায়ী হোক, সবসময় সর্বান্তকরণে আমি এই আশা রাখছি।" জি. আর থার্সবি, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৭৩। ভূতপূর্ব রাষ্ট্রসচিব অলিভার লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন মুসলিম সম্প্রদায়কে "হিন্দু জাতীয়তাবাদের উল্টো পাল্লার ওজন হিসাবে" ব্যবহার করার নীতি নিয়েছে—ডব্লু.সি স্মিথ, 'মডার্ণ ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া', পৃঃ ২০১। ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪০-এর ক্যাবিনেট বৈঠকে চার্চিল যে মত ব্যক্ত করেছিলেন তা ক্যাবিনেট পেপারস্‌-এ এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে'…তিনি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যকে উৎসাহ ও সমর্থন যোগানোর জন্য উদ্বেগের অংশীদার ছিলেন না। বস্তুত, এই ধরনের ঐক্য বাস্তব রাজনীতির প্রায় বাইরের জিনিষ, সেখানে, যদি এটা ঘটানো হয়, তার আশু ফল হবে এই যে দুই সম্প্রদায় মিলে একত্রে আমাদের দরজা দেখিয়ে দেবে। তিনি হিন্দু-মুসলিম কলহকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভরূপে বর্ণনা করেন"—আর জে. মুর, 'চার্চিল, ক্রিপস্‌ অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া, ১৯৩৯-১৯৪৫'-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ২৮। তার আগে, ৩ অক্টোবর ১৯৩৭-এ চার্চিল লিনলিথগোকে লিখেছিলেন : আমার মনে হয় আমাদের মনে প্রধান মতবিরোধ এই, যে আপনি এক ঐক্যবদ্ধ নিখিল-ভারতকে বাঞ্ছিত মনে করেন, যেখানে আমি তাকে মনে করি এমন এক বিমূর্ত ধারণা যা কখনো রূপায়িত হলে ব্রিটিশ স্বার্থের মৌলিক ক্ষতি করবে। আমার দৃষ্টিতে ভারত ইউরোপের মতই বিভাগ ও বৈপরীত্যে ভরা, এবং ব্রিটিশদের কাজ হল এই বিপুল জনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা, এবং এইভাবে আমাদের সুবিধা ও তাদের মোক্ষলাভের জন্য আমাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা"। তিনি আরো বলেছিলেন : "এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে আমি বরং দেখতে

চাইবো উত্তরের মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, যাতে কংগ্রেসের ব্রিটিশ-বিরোধী ঝোঁককে ঠেকানো যায়। আমি আশা করব ভারতীয় 'রাজন্যরা' ব্রিটিশ ভারতের অনুজ্জ্বল, আবছা দৃষ্টিভঙ্গির থেকে পৃথক-দৃষ্টিভঙ্গি ও সত্বা বজায় রাখবে। আমার ভাবা উচিত ছিল যে সংস্কৃতি ও চিন্তার এই সমস্ত রূপের ওপরেই ব্রিটিশ শক্তি আসলে দাঁড়িয়ে আছে…। যে ঐক্যবদ্ধ ভারত আমাদের দরজা দেখিয়ে দেবে, তার সম্ভাবনা আমাকে মোটেই আকর্ষণ করে না। আমরা হয়তো তাকে আটকাতে পারবো না, কিন্তু তা বলে আমরা তাকে বাস্তবায়িত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবো, এটা আমার পক্ষে চরম পীড়াদায়ক…। অবশ্যই আমার আদর্শ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আমি দেখতে চাই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আরো কয়েক প্রজন্মের জন্য তার সব শক্তি ও জৌলুস নিয়ে বেঁচে থাকবে। ব্রিটিশ প্রতিভার সর্বোত্তম প্রয়োগের মাধ্যমে কেবল এই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।" লিনলিথগো পেপারস্, রোল-নং ১৫০।

২০। ফ্রান্সিস রবিন্সন্, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৪৪।

২১। এস. গোপাল, 'ব্রিটিশ পলিসী ইন ইণ্ডিয়া, ১৮৫৮-১৯০৫', পৃঃ ২০১-এ উদ্ধৃত।

২২। ব্রিটিশ পদস্থ কর্মচারীরা আর্যসমাজের কঠোর সমালোচক ছিল কারণ যদিও তার সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের ঝোঁক ছিল, তাকে ব্রিটিশ-বিরোধী বলেও সন্দেহ করা হত।

২৩। জি. আর. থার্সবি, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৭৩-এ উদ্ধৃত।

২৪। প্রেম চৌধুরী, "রোল অফ স্যার ছোটু রাম ইন পাঞ্জাব পলিটিক্স", পৃঃ ২২৮-এ উদ্ধৃত।

২৫। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঐ পৃঃ ২২৭ ও তারপর।

২৬। এম এন. দাস, 'ইণ্ডিয়া আণ্ডার মোরলি অ্যাণ্ড মিণ্টো', পৃঃ ২৩৭-এ উদ্ধৃত।

২৭। ফ্রান্সিস রবিন্সন্, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৪৫-এ উদ্ধৃত।

২৮। মাহমুদাবাদের রাজা বর্ণনা করেছেন, কীভাবে ১৯৩৬-এ এক সাক্ষাৎকারে যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর তাঁকে ব্রিটিশদের দেওয়া জমি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ক্ষমতা আছে, এই ইঙ্গিত দিয়ে তাকে মুসলিম লীগের থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে ন্যাপ-এ যোগ দিতে আদেশ করেছিলেন।

২৯। জেটল্যাণ্ড, 'এসেসঃ মেমরীস অফ লরেন্স, সেকেণ্ড মার্কেস অফ জেটল্যাণ্ড', পৃঃ ২৯২।

৩০। এই কারণেও তাঁর প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি, ব্রিটিশরাজের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করেছে এমন নরমপন্থীদের প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির থেকে আলাদা ছিল। কিন্তু তাঁরা, ঔপনিবেশিকতার সমালোচক হওয়া ছাড়াও, আধুনিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচারক ছিলেন।

৩১। ফ্রান্সিস রবিন্সন, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮৯, ১২১-২৬।

৩২। ঐ, পৃঃ ১৩৬-৪১।

৩৩। এম. এন. দাস, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৩৪-৩৫, ১৬৭-৬৮, এবং বি. এল. গ্রোভার, 'আ ডকুমেণ্টারী স্টাডি অফ ব্রিটিশ পলিসী টুয়ার্ডস ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিসম্, ১৮৮৫-১৯০৯', পৃঃ ২৫৫, ২৫৯-৬০।

৩৪। রাজনৈতিক ঠেকো, কারণ প্রশাসনিক ঠেকো আর একটা ছিল, এবং ব্যবহৃত হচ্ছিল, যেমন আকাশ থেকে নিরস্ত্র জনগণের উপর বোমাবর্ষণ সহ নগ্ন দমন বা 'পাশবিক হিংস্রতা'। কিন্তু স্বদেশে ব্রিটিশ চরিত্র এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও ভারতের বিপুল জনসংখ্যা দীর্ঘ সময়ের জন্য কেবলমাত্র এই ঠেকনোর উপর নির্ভর করা অসম্ভব করে দিয়েছিল। এটাও মনে রাখা দরকার যে ১৮৭০-এর দশক থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে নাগরিক সমাজে ঔপনিবেশিকতাবাদের আধিপত্যের উপাদানগুলিকে, যেমন ব্রিটিশ ঔদার্যে বিশ্বাসকে, জনগণের মন থেকে ধ্বংস করে ফেলেছিল।

৩৫। জেটল্যাণ্ড, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৪৭।

৩৬। ১৯৪৪-এ সি. রাজাগোপালাচারী যখন গান্ধীর সমর্থন নিয়ে ১৯৪৭-এ গৃহীত পাকিস্তানের পরিকল্পনার অনুরূপ একটি পরিকল্পনা পেশ করেন, যাতে মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলিতে অবস্থিত পরস্পর সন্নিবিষ্ট মুসলিম-প্রধান জেলাগুলির ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছিল, তখন জিন্না সেটি নাকচ করেন এই যুক্তিতে, যে "এটা একটা ছায়া আর একটা অন্তঃসারহীন খোসা, একটা বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন ও পোকায়-কাটা পাকিস্তান।" ১৯৪৭-এ, র‍্যাডিক্যাল মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম জিন্নাকে কবন্ধ পাকিস্তান মেনে নিতে বারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা রাজাগোপালাচারীর পরিকল্পনার চেয়ে নিকৃষ্ট, এবং তা মেনে নেওয়ার অর্থ "লাহোর প্রস্তাব এবং সমগ্র পাকিস্তান আন্দোলনের" প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। এর ফলে সৃষ্ট পাকিস্তান হবে "এক শত্রুভাবাপন্ন ভারতের দুই প্রান্তে বহুদূরে দুটি ডানা মেলা এক দানব"। তিনি বরং চেয়েছিলেন ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে দশ বছরের জন্য পরীক্ষা করে দেখতে। জিন্নার উত্তর ছিল লীগ কাউন্সিলের কাছে এক আবেগপূর্ণ আবেদন করা: " 'আপনারা কী আমার জীবদ্দশায় পাকিস্তান পেতে চান' ? এবং প্রায় সমগ্র সভা ইতিবাচক ধ্বনি করে উঠল। একটু থেমে তিনি বললেন: 'তাহলে, বন্ধুগণ, আপনাদের এই কবন্ধ ও পোকায়-কাটা পাকিস্তান মেনে নিতে হবে'।" কামরুদ্দিন আহমদ 'আ সোশাল হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', পৃঃ ৬০-৬৪, ৭৯। একথা অবশ্য বলা হতে পারে যে জিন্না এবং লীগ যতটা পেয়েছিলেন, তাও তাঁরা আশা করেন নি।

৩৭। 'দি ইকনমিস্ট' পত্রিকা ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯০৯-এ লিখেছিল: "ভারতের রাজনৈতিক পরমাণু আর যাই হোক, নিশ্চিতভাবেই তা পশ্চিমী গণতন্ত্র তত্ত্বের ব্যক্তি নয়, তা হল একধরণের সম্প্রদায়।" কে কে. আজিজ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৭১-৭২-এ উদ্ধৃত।

৩৮। এটা পশ্চিমী রাজনীতি তত্ত্বের ভ্রান্ত প্রয়োগের ঘটনাও নয়। এখানে এমন এক নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছিল, সমসাময়িক পশ্চিমী রাজনৈতিক তত্ত্বে যার কোনো স্থান ছিল না।

৩৯। এস গোপাল, পূর্বোল্লিখিত, পঃ ১৫৮।

৪০। ডি. এ. লো, 'সাউণ্ডিংস ইন মডার্ণ সাউথ এশিয়ান হিস্ট্রি', পৃঃ ১৯।

৪১। রামগোপাল, 'ইণ্ডিয়ান মুসলিমস: আ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি (১৮৫৮-১৯৪৭)'; পৃঃ ৩৩৪ এবং বি এল. গ্রোভার, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৭২-এ উদ্ধৃত। ২১ জানুয়ারী ১৯০৬ মিণ্টো মোরলিকে আরো লিখেছিলেন যে "ভারতে বর্তমানে একমাত্র যে প্রতিনিধিত্ব খাপ খায় তা হল সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব ···"। বি এন পাণ্ডে, 'দ্য ব্রেক-আপ অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ৭৫-৭৬-এ উদ্ধৃত। অনুরূপভাবে, রাষ্ট্রসচিব মোরলি ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯, হাউস অফ লর্ডস-এ বলেছিলেন: "মহামেডান ধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গায় পার্থক্য নয়। তা হল জীবন, পরম্পরা, ইতিহাস, সমস্ত সামাজিক বিষয় এবং বিশ্বাসের জায়গায় পার্থক্য, যা নিয়ে একটা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।" 'পার্লামেণ্টারী ডিবেটস্', হাউস অফ লর্ডস, ১৯০৯, খণ্ড ১, স্তম্ভ ১২৬।

৪২। লর্ড আরউইন, ইণ্ডিয়ান "প্রবলেমস্", পৃঃ ২৩৮।

৪৩। "রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিউটরি কমিশন", খণ্ড ১, প্যারা ৩৬ ও ১৫২। পূর্ববর্তী "রিপোর্ট অন ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম", ১৯১৮-তে অনুরূপ মতের জন্য পৃঃ ৮৪-৮৫, ৯১, ৯৯ দ্রষ্টব্য।

৪৪। ১৯৩৩-৩৪-এর অধিবেশনের "রিপোর্ট", খণ্ড ১, প্যারা ১।

৪৫। "ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার", ১৯২৯, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৮৭; এবং এম. গাইয়ার ও এ.

মুসলিমদের নয়। এম. এন. দাস, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৩৩ দ্রষ্টব্য। বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্ণরের অনুরূপ মতের জন্য আরো দ্রষ্টব্য পৃঃ ২২৮।

৭৩। এর রাজনৈতিক প্রভাবকে ছবির মত ব্যাখ্যা করেছেন বেণী প্রসাদ : "মুসলিম কেন্দ্রগুলিতে…ধর্মের, ভাষার ও সংস্কৃতির বিপদ এবং সম্ভাব্য সবরকমভাবে তাদের রক্ষা করার বিষয়ে চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। হিন্দু প্রতিক্রিয়া এক হিন্দুদের অধিকার বিপন্ন হওয়ার গল্প যে দেছিল, কংগ্রেসকে মুসলিমপন্থী আখ্যা দিয়েছিল এবং অনেক সময়ে সমঝোতাকে আত্মসমর্পণ হিসাবে দেখেছিল, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৬। অনুরূপভাবে ডি. পেট্রী ১৯১১ সালে তাঁর গোপন সি আই ডি স্মারকলিপিতে লিখেছিলেন : এটা বিশেষভাবে সত্য সংস্কার-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, যা এই শিক্ষাই দিয়েছে যে প্রতিনিধিত্ব, এবং ফলতঃ ক্ষমতা, সংখ্যাগত শক্তির সমানুপাতিক। আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক রেষারেষির এক বিরাট জাগরণ হয়েছে এবং এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার মধ্যে নিজেকে সংহত করা ও ক্ষমতার শীর্ষে তোলার চিন্তা প্রজ্বলিত হয়নি।" "দ্য পাঞ্জাব পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেসেণ্ট",

৭৪। পৃঃ ২৩০ দেখুন।

৭৫। স্বাধীনতা উত্তর-ভারতে, যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থায়, মুসলিম ভোটাররা, যারা সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীর মাত্র ১০ শতাংশ। বিভিন্ন দলকে বাধ্য করে অন্তত জনসমক্ষে তাদের সাম্প্রদায়িকতাকে দমিয়ে বা এমনকি নীরব করে রাখতে। তারা সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে পরাজিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অনুরূপভাবে, তপশীলী জাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর ফলে তপশীলী জাতির প্রার্থীরা অ-তপশীলীদের এবং অ-তপশীলী প্রার্থীরা তপশীলীদের ভোট পাওয়ার জন্য প্রচার করতে বাধ্য হয়। এতে হিংস্র তপশীলী বা অ-তপশীলী জাতিবিরোধী মতাদর্শ, রাজনীতি ও প্রচার জেগে উঠতে বাধা পেয়েছে।

৭৬। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৪ সালে, যখন প্রায় সব কংগ্রেস নেতা ছাড়া পেয়ে গিয়েছে, কলকাতায় দুটি বক্তৃতায় বিপ্লবী ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের সমালোচনা করেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সংগঠিত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন বলে জওহরলাল নেহরুকে বিচার করে আবার দুবছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়।

৭৭। সুমিত সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮০।

৭৮। জি আর. থার্সবি, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২০। পৃঃ ২৩৩ দেখুন।

৭৯। ঐ, পৃঃ ১৪০-এ উদ্ধৃত। ধর্ষণকারীরা ব্রিটিশ সৈনিক, চা-বাগিচার মালিক, ইত্যাদি হলে এ রকম অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রকাশ করতে দেওয়া হত না।

৮০। ঐ, পৃঃ ১৫২।

৮১। ঐ, পৃঃ ১০৯-এ উদ্ধৃত।

৮২। ঐ, পৃঃ ১১৯। এবং একথা বলা হচ্ছে মাত্র চার বছর আগে অসহযোগ আন্দোলনকে দমন করার জন্য,সবচেয়ে পীড়নমূলক অর্ডিন্যান্সগুলি পাস করার পর।

৮৩। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, বি.বি. মজুমদার, "দি আনন্দমঠ অ্যাণ্ড ফাড়কে"।

৮৪। কে. বি কৃষ্ণ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৭৩-এ উদ্ধৃত।

৮৫। জি. পাণ্ডে, "দি অ্যাসেণ্ডাসি অফ দ্য কংগ্রেস ইন উত্তর প্রদেশ", পৃঃ ১৩৮-৩৯। আরো দেখুন কে. বি কৃষ্ণ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৭২-৭৩ ; সুমিত সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৪৮, ৪৫১-৫২ ; তনিকা সরকার, "দ্য ফার্স্ট ফেস অফ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স ইন বেঙ্গল, ১৯৩০-১", পৃঃ ৯১-৯২ এবং "কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল", পৃঃ ২৮৫-৯০।

৮৬। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, থার্সবি, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮৩, ৮৮ ; জি. পাণ্ডে, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ

১৩৯ ; তনিকা সরকার, "কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল", পৃঃ ২৯০ ; সি. ই. বাকল্যাণ্ড, "বেঙ্গল আণ্ডার দা লেফটেন্যান্ট গভর্ণর্স", খণ্ড ২, পৃঃ ১০০৪-০৫ ।

৮৭। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, সুমিত সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৫১-৫২ , তনিকা সরকার, "দ্য ফার্স্ট ফেস অফ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স ইন বেঙ্গল", পৃঃ ২৮৬-৯০ ; জি. পাণ্ডে, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৪২ ; কে. বি কৃষ্ণ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৭২-৭৩ ; বিরপাল সিং (সম্পাঃ), "সর্দার বাহাদুর মেহতাব সিংস্ রিপোর্ট অন রাওয়লপিণ্ডি রায়টস—১৯২৬" ।

৯

পশ্চাৎ-দৃষ্টি

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির সামনে কোন পথ খোলা ছিল? এবং আমরা সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে আজ কী শিক্ষা পাই?

সাম্প্রদায়িক চোরাবালি থেকে বেরোবার পথ নিহিত ছিল দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত রণনীতির ভেতর, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক সংকট মুহূর্ত একলাফে সমাধানের ভেতর নয়। ১৯৪৫-৪৭-এ দেশভাগের সময়ে নিশ্চিতভাবেই তেমন কোনো সমাধান সামনে ছিল না। সাম্প্রদায়িকতার মত একটি সামাজিক সমস্যার কখনোই তাৎক্ষণিক সমাধান হয়না। অতীত ও বর্তমান আন্তঃসম্পর্কগুলিকে উপেক্ষা করে এইরকম তাৎক্ষণিক সমাধান খুঁজতে যাওয়ার অর্থ অলীক আরাম, মিথ্যা আশা ও ব্যর্থ রোমান্টিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। এবং এই সমাধান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলে অনেক সময় একটা উপলক্ষ দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয়। সমাধানের উপযুক্ত পরিস্থিতি এবং শক্তিগুলিকে বহুবছর, এমনকি দশক, ধরে প্রস্তুত করতে হয়। তার ওপর জাতি বা সমাজ কখনো কখনো এমন পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়ায় যখন আর কোনো ধীরগতি সমাধান চলেনা, সেটা যারা চাইছে তাদের আকাঙ্খা ও চেষ্টা যতই সৎ ও শুভ হোক না কেন।

[এক]

একটি প্রধান ধারার চিন্তাবিদদের মতে এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীদের ব্যর্থতার কারণ হল সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ও তাদের মন জয় করতে না পারা, এবং বিশেষভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলন ঘটাতে না পারা। বাস্তবে, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সঙ্গে সমঝোতা কার্যকর বা বাঞ্ছিত, কোনোটাই ছিল না। এবং যে শর্তে তা করা যেত তা জাতীয়তাবাদী

শক্তিদের নিজেদেরই ধর্মনিরপেক্ষ সংহতি ও সত্বাকে ধ্বংস করে এক হিন্দু সাম্প্রদায়িক, হয়তো বা ফ্যাসিবাদী, ভারতের জন্ম দিত। অন্যদিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির চেষ্টার ফলে অনেক ক্ষতি হয়েছিল: এই প্রচেষ্টাগুলি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উদ্যম যুগিয়েছিল, পরোক্ষভাবে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দিয়েছিল, এবং দুইয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই ব্যহত ও দুর্বল করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে অক্ষম শক্তিদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা—'শক্তি হ্রাস করে, ছড়িয়ে দিয়ে, বাস্তব চাহিদানুযায়ী একটি শান্তি চুক্তি করে ক্ষতিপূরণ করার' চেষ্টা—এসবের ফল হতে পারতো শুধু ব্যর্থতা, এমনকি বিপর্যয়।

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীরা আরো কয়েকটি উদারনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা বা প্রচার করেছিলেন।[১]

(১) ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের ক্রমাগত পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহৃদয় হতে, এবং একে অপরকে 'ভাই-ভাই' হিসাবে দেখতে জোর দেওয়া হত। বিশেষ করে যখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হত, এই সমাধানকে প্রবলভাবে প্রয়োগ করা হত, এবং তার সঙ্গে থাকতো শান্তি কমিটি, হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ্য প্রদর্শনী, ইত্যাদি।

(২) ধর্মীয় অন্ধতা, অসহিষ্ণুতা এবং সঙ্কীর্ণতার বিরোধিতা করা এবং ধর্মীয় ঔদার্য ও সহিষ্ণুতাকে উৎসাহ দেওয়া। ধর্মকে বেশী বেশী করে ব্যক্তিগত বিষয় করে তোলা এবং জনজীবনের বাইরে নিয়ে যাওয়া। তার আনুষঙ্গিক দিকগুলোকে বাদ দিয়ে আত্মিক দিকটাকেই তুলে ধরা। সব ধর্মের ভেতরে ফারাক নয়, ঐক্যকেই জোর দিয়ে দেখানো।

(৩) ধর্মান্ধ দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় আসে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা থেকে। জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক ভাবনার প্রসারের জন্য শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ করা।

(৪) সাম্প্রদায়িকতা বেঁচে থাকে অর্ধসত্য, গুজব, বিকৃতি, মিথ্যা বাঁধাধরা গতি এবং ইতিহাসের একপেশে ও অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ওপর। জনগণ যাতে সত্য ও মিথ্যার তফাৎ বুঝতে পারে, তার জন্য সঠিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রচারের সবরকম ব্যবস্থা করা।

(৫) সংখ্যাগরিষ্ঠদের বৈষম্যমূলক আচরণ ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তাদের বাস্তব বা কাল্পনিক, সবভয় ও দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া। তাদের প্রকৃত ক্ষোভের কারণগুলি দূর করা এবং তাদের স্বার্থরক্ষা করা বা সেই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

উদারনৈতিক সমাধানগুলি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছিল, এবং সেগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও এগুলি 'ভুয়া' ছিলনা; এগুলি নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক

সমস্যার এক ব্যাপকতর সমাধানের এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সংগ্রামের অংশ ছিল। উদারপন্থী জাতীয়তাবাদীরা কেবল এই প্রশ্নগুলিকে কার্যকরভাবে দেখতে পারেনি : সাম্প্রদায়িকতা কেন বাড়ছিল? উদারপন্থী সমাধানগুলি কেন ব্যর্থ হচ্ছিল? সাম্প্রদায়িকতার গভীরতর সামাজিক ও মতাদর্শগত শেকড়গুলি কি ছিল? তারা অন্তত একটা প্রশ্ন তুলতে পারতো : কেন উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, ভারতীয় ঐক্য ও হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, শিক্ষার প্রসার, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদাযিক দাঙ্গার বিরোধিতা, এবং 'সাম্প্রদায়িক বিভেদের' আপোষ-মীমাংসা সহ সমস্ত উদারপন্থী সমাধানগুলির সঙ্গে ঘোষিতভাবে একমত হয়েও, অবিচল সাম্প্রদায়িকতাবাদী থেকে গিয়েছিল?

[দুই]

আমরা আগেই দেখেছি, সাম্প্রদায়িকতা ও তার বিকাশ ছিল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ও পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও জাগীরদারী শ্রেণী ও স্তরগুলির স্বার্থ, মধ্যশ্রেণীর শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা, ভারতীয় সমাজের মধ্যে সামাজিক বিভাজন, তার বহুসমন্বিত ও বহুরূপ-সম্বলিত সাংস্কৃতিক চরিত্র এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিদের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক দুর্বলতা—এসবের যোগফলে সাম্প্রদায়িকতা উৎসাহিত হয়েছিল বা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলতঃ, জটিল ভারতীয় বাস্তবতার এবং তা পরিবর্তনের লড়াইয়ের এক বহুমুখী, বহুসূত্রী উপলব্ধি প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু, সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির সামাজিক কাঠামো যুগিয়েছিল ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিকতা ছিল সেই সমাজ কাঠামোর ভিত্তি, যা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল ও তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সামাজিক অবস্থার আরো অনেকগুলি দিক যদিও সাম্প্রদায়িকতার বিকাশে সাহায্য করেছিল, ঔপনিবেশিকতার রূপদান করা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত ব্যবস্থার যুক্তিগুলিই তার বিকাশক্ষেত্রের জন্ম দিয়েছিল। এই যুক্তির পরিপূরক অবশ্যই ছিল ঔপনিবেশিক নীতি, যা আবার ঔপনিবেশিকতা সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং ভারতীয় সমাজের অন্যান্য দুর্বলতা, দুটোকেই সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক অনগ্রসরতা এবং ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সংকট সাম্প্রদায়িকতার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য উর্বর জমি তৈরী করেছিল। সর্বোপরি, এর ফল হয়েছিল ব্যাপক বেকারী, যার ফলে মধ্য শ্রেণীগুলির মধ্যে চাকরীর জন্য তীব্র লড়াই দেখা দিয়েছিল, এবং এইভাবে সাম্প্রদায়িকতা সক্রি-

কাবের গণভিত্তি পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক কৃষিব্যবস্থাও দেশের একাধিক জায়গায় জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের লড়াইকে সাম্প্রদায়িক চেহারা দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নীতি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমৃদ্ধির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

এরফলে, সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করার জন্য দরকার ছিল সেই সামাজিক বাস্তবতাকে পাল্টানো, যা তার জন্ম দিয়েছিল এবং তার বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল : বিদ্যমান ঔপনিবেশিক সমাজ-কাঠামোর ভেতর সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করা যেতনা। ঔপনিবেশিকতা এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে উৎখাত না করে সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্প্রদায়িক ধরণের মতাদর্শ, রাজনীতি ও আন্দোলনকে খতম করা অসম্ভব ছিল। অনুরূপভাবে, জাগীরদারী শ্রেণী ও স্তরগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হত। এটা এবং কৃষি-সম্পর্কের সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাস যদি নাও করা হত, তাহলেও, কৃষকদের দাবীর ভিত্তিতে সংগ্রামকে, বিশেষত পাঞ্জাব, বাংলা ও মালাবারের মতো জায়গাগুলিতে, এমনভাবে সংগঠিত করতে হত যাতে হিন্দু ভূস্বামী ও মহাজনদের প্রতি মুসলিম কৃষকদের বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে রূপান্তরিত হতে না পারে। ভূস্বামী ও মহাজনদের বিরুদ্ধে এইরকম সংগ্রাম মুসলিম কৃষকদের জাতীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা জাগাতে সাহায্য করতো এবং জাগীরদারী শ্রেণী এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ যে সাম্প্রদায়িক খেলা খেলছিল তার সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দিত।

এমনকি যদি খুব চেষ্টা করে ১৯২০ বা ১৯৩০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা করাও হত, তাহলেও সমাধানটা সম্ভবত হত অস্থায়ী, যেমন হয়েছিল লক্ষ্ণৌ চুক্তির এবং খানিকটা নেহরু রিপোর্ট-এর ক্ষেত্রে। যতক্ষণ মূল সামাজিক পরিস্থিতি একই থাকতো, যেমন, চাকরীর সুযোগ যতক্ষণ কম থাকতো, ততক্ষণ সাম্প্রদায়িকতা বা অন্য সাম্প্রদায়িক ধরণের আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিত। তাই, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ছাড়া সাম্প্রদায়িকতা বা অনুরূপ শক্তিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো প্রকৃত বা দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য সম্ভব ছিলনা। আসল কথাটা হল, কিছু সামাজিক সমস্যার মৌলিক সামাজিক সমাধান ছাড়া আর কোনো সমাধান হয়না। তার মানে এই নয় যে সমগ্র সমাজ না পাল্টানো পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করা যাবেনা। তা করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সমাজ পরিবর্তন না হলে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশের জমি উর্বর থাকবে, এই বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন থেকে।

এই পর্যায়ে আমরা এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আমাদের বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি ছিল এক মিথ্যা সচেতনতা, বাস্তবতার এক ভুল উপলব্ধি। শুধু ভারতীয় জনগণের সামাজিক অবস্থাকেই নয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলিমদের সমস্যাকেও তা

সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিল। তার ফলে সমস্যাটাকে বেঠিকভাবে উপস্থিত করা হয়েছিল, আর এই সমস্যার, এবং মুসলিমদের সামাজিক অবস্থার, এই ভুল সমাধান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেবল ঔপনিবেশিক ভারত সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উপলব্ধিই ভুল ছিলনা। সামাজিক বাস্তবতাতেই কিছু একটা গলদ ছিল। একটা বাস্তবতার—একটা প্রকৃত সামাজিক অবস্থার—বিকৃত প্রতিবিম্ব ছিল সাম্প্রদায়িকতা—এমন একটা বাস্তবতা যা সাম্প্রদায়িকতার বিকাশের অনুকূল জমি যুগিয়েছিল। একদিক থেকে, সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক বাস্তবতাকে ভুল-ভাবে ব্যাখ্যা করেছিল কারণ বাস্তবতাই মাথার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। সুতরাং, শুধু বাস্তবতার সঠিক ব্যাখ্যা নয়, শুধু সামাজিক অবস্থার ভুল ব্যাখ্যা করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সমালোচনা নয়, বাস্তবতাকেই সমালোচনা করা ও পরি-বর্তন করার দরকার ছিল। বিকৃত বাস্তবতাকে শুধু ঠিকভাবে বোঝা নয়, তাকে ঠিক করার দরকার ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এটা দেখানোই যথেষ্ট ছিলনা যে মুসলিম মধ্যশ্রেণীদের বেকারীর জন্য হিন্দু মধ্যশ্রেণীরা দায়ী ছিল না এবং দুজনেই ঔপনিবেশিক অনগ্রসরতাজনিত বেকারীর শিকার হচ্ছিল, তার সঙ্গে, বেকারীর জন্মদাতা অর্থনৈতিক অনুন্নতি ও স্থবিরতাকে 'ভাঙ্গার', এবং আরো চাকরীর রাস্তা খুলে দেওয়ারও দরকার ছিল। কারণ যতক্ষণ চাকরীর জন্য প্রতিযোগিতা চলতো ততক্ষণ মধ্যবিত্তরা সাম্প্রদায়িকতাকে কোনো না কোনো ভাবে ব্যবহার করতো তাদের চাকরীলাভের ব্যক্তিগত সুযোগ বাড়ানোর জন্য। সুতরাং যারা সাম্প্রদায়িকতাকে বিশ্লেষণ করেছিল এবং তার বাস্তবতার ব্যাখ্যাকে বিরোধিতা করেছিল, আর যারা সাম্প্রদায়িকতার জন্মদাতা সামাজিক বাস্তবতাকে পাল্টাবার কাজে রত ছিল, তাদের মধ্যে কোনো শ্রমবিভাজন করা যেতো না। বাস্তবতাকে পাল্টানো ছিল সাম্প্রদায়িকতা সহ সব ধরণের ভুয়া সচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যাখ্যা করা আর পরিবর্তন করার মধ্যে এক ধ্রুব দ্বান্দ্বিকতা আবশ্যক ছিল।

এখানে সাম্প্রদায়িকতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ভূমিকাকে খাটো করা হচ্ছেনা, কারণ তার সঠিক ব্যাখ্যা ছাড়া সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, বা যে কোনো নেতি-বাচক সামাজিক বিষয়ের বিরুদ্ধে, কার্যকর সংগ্রাম সম্ভব নয়; শুধু এটাকেই জোর দেওয়া হচ্ছে যে তা ছিল কেবল কাজের শুরু। সাম্প্রদায়িকতা দমন দাবী করেছিল সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। যে কোনো প্রকারের মীমাংসা আলো-চনাই রফা বা সমঝোতাই সমস্যাটার সমাধান করতে পারতোনা। সামনের রাস্তা ছিল এক নতুন দিকের অভিমুখী, যেদিকে ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

ঔপনিবেশিক ভারতের এক মৌলিক দিক ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিকাশে সহায়ক বাস্তব অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর সাম্প্রদায়িকতা-

বিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তিদের কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকা। ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতেই ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা, এবং তাই তারাই কেবল জাতীয় ঐক্য গড়তে ও সাম্প্রদায়িক শক্তিদের দমন করতে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পারতো। উদাহরণস্বরূপ, তারা তা করতে পারতো অর্থনীতিকে বিকশিত করে এবং তার মাধ্যমে চাকরীর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যাতে পেটি বুর্জোয়া রেষারেষি নিশ্চিহ্ন না হলেও কমে যেতো; ভূমি-সংস্কার করে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কঠোর হাতে দমন করে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে রাজনীতিতে জমিদার ও আমলাদের প্রভাব কমিয়ে, স্কুলে পাঠক্রম উন্নত করে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও মিথ্যা গুজব ছড়ানো বন্ধ করে। যাই হোক, এইরকম কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তার কাজ-অকাজের মধ্যে দিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিদের সাহায্য ও উৎসাহিত করায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ফলতঃ, ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী শক্তিরা সামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক মূল শুকিয়ে দিয়ে তাকে কাবু করে ফেলতে পারেনি। তারা কেবল ঔপনিবেশিকতার উচ্ছেদের জন্য, এবং আভ্যন্তরীণ সমাজ কাঠামোর, বিশেষত কৃষি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য, কাজ করে, এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম করে, যাতে সাম্প্রদায়িকতার সহায়ক সামাজিক অবস্থাকে স্বল্পমেয়াদীভাবে তার নেতিবাচক প্রভাবের দিক থেকে নিষ্ক্রিয় বা 'বিকল' করে দেওয়া যায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিবর্তন করা যায়, সেটুকু করতে পেরেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেব, সমাজবাদী ও কমিউনিস্টদের নিয়ে গঠিত তার বাম শাখা সহ, এই দিকগুলিতে বড় রকমের দুর্বলতা দেখা গিয়েছিল। একদিক থেকে, ১৯৩৭-এর পর সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ছিল দুর্বলতাগুলির শাস্তিস্বরূপ।

[তিন]

সাম্প্রদায়িকতাকে যদি, সামাজিক বাস্তবতাকে না পাল্টে, অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতাকে উৎখাত না করে, বন্ধ করা না যেতো, তবে উল্টোটাও সত্যি ছিল: সাম্প্রদায়িকতার বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি, বাস্তবতার ভুয়া সচেতনতার সঙ্গে তার সংস্পর্শ, এবং তার বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সংগ্রাম ছিল, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং বাস্তবতার পরিবর্তনকামী ব্যাপকতর সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ। এইভাবে দুটি লড়াইয়ের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ছিল। কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে, অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতা চলে গিয়ে সমাজ পরিবর্তন হয়ে, তার ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িকতা এবং অনুরূপ সমস্যাগুলির সমাধান হওয়ার অপেক্ষায় থাকা যেতো না; কাঠামোগত পরিবর্তনের ওপরেই দীর্ঘমেয়াদী সমাধান দাঁড়িয়ে আছে,

এটা মাথায় রেখে পাশাপাশি মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে হত। কার্ল মার্ক্স তাঁর ফয়েরবাথ সম্পর্কে তৃতীয় থিসিসে যেমন বলেছিলেন :

> অবস্থা এবং বড় হওয়ার পরিবেশই মানুষকে তৈরী করে, এবং সুতরাং, পরিবর্তিত অবস্থা এবং পরিবর্তিত বড় হওয়ার পরিবেশই পরিবর্তিত মানুষ তৈরী করে, এই বস্তুবাদী নীতি ভুলে যায় যে অবস্থাকে মানুষই পাল্টায়, এবং শিক্ষককেও শিক্ষিত হতে হয়।··· অবস্থার পরিবর্তন ও মানুষের ক্রিয়া কি-ভাবে একই সঙ্গে ঘটে, একমাত্র বিপ্লবী কাজের মাধ্যমেই তা ধরতে পারা এবং যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়।[২]

স্বল্পমেয়াদের মধ্যে, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের ভূমিকা আরো বড় ছিল, কারণ সেখানেই নিহিত ছিল সামাজিক কাজের আশু কার্যকারিতা। উপরন্তু, কার্যকরভাবে এই সংগ্রাম চালাতে পারলে, তা কিছু সময়ের জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে দমিয়ে রাখতে পারতো এবং সেই কাজের মাধ্যমেই ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিদের বিকাশের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারতো, যা ভবিষ্যতে ধর্মনিরপেক্ষতা-জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে লড়াইতে, এবং ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াইতে, অধিকতর অনুকূল ফলাফল নিশ্চিত করতে পারতো।

বস্তুত, এটা ১৯৪৭-পূর্ব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার একটা বড় শিক্ষা। এই-দিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কয়েকটি বড় দুর্বলতা ছিল। প্রথমত, সাম্প্রদায়িকতা ও তার পরিপোষকগুলির—ধর্মীয়তা, জাতপাত, সামাজিক ফারাক, জাতীয়তা-বাদী চিন্তায় হিন্দুয়ানী, ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা, অন্ধসংস্কার, ইত্যাদির—বিরুদ্ধে জোরদার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানো হয়নি। যাই হোক, তার মানে এই নয় যে কংগ্রেস ও তার নেতারা সাম্প্রদায়িক ছিল। গান্ধী ও নেহরুর মত নেতারা দৃঢ়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। কংগ্রেসের মতাদর্শ, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচী ও নীতিগুলি মূলত ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। কংগ্রেসের সদস্য ও সমর্থকদের বিপুল অংশ হিন্দু হওয়া এবং মুসলিমদের সমর্থন ও অংশ-গ্রহণ সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, কংগ্রেস ছিল মূলত একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয় সংগঠন। কংগ্রেস নেতারা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতেও শ্রমসাধ্য চেষ্টা করে-ছিলেন। তাঁদের দুর্বলতা ছিল এই জায়গায় যে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারকে রুখতে বা এমনকি সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের ছোঁয়াচ থেকে তাঁদের দলীয় কর্মীদের বাঁচাতে কোনো ফলপ্রসূ ও জোরদার কর্মসূচী নিতে পারেননি। তাঁরা যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্ব বুঝেছিলেন, সেখানে তাঁদের বেশীরভাগই যথেষ্ট ভালোভাবে বোঝেননি যে একদিক থেকে সাম্প্রদায়িক মতা-দর্শও সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং তাকেও সমান জোরের সঙ্গে মুকাবার দরকার আছে। সাম্প্রদায়িকতা হল জাতীয় ঐক্যের পথে আরেকটি

বাধা, যাকে রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা করতে হবে, এইভাবে দেখার একটা ঝোঁক ছিল। গান্ধী, নেহরু এবং বামপন্থীরা অবশ্য সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের গভীর সম্পর্কটা দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু, আমরা দেখবো যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অন্য দুর্বলতা ছিল। তার ওপর, কংগ্রেস নেতারা দৈনন্দিন রাজনীতি ও রাজনৈতিক জমায়েতের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ তাঁদের হাতে সময় কম থাকতো, এবং এই ক্ষেত্রে মতাদর্শগত কাজের প্রতি তাঁদের আগ্রহ কমিয়ে দিয়েছিল। এটা আরো ঘটেছিল ১৯৩৭-৩৯-এ, যখন তাদের অনেকেই প্রদেশগুলিতে প্রশাসন চালাতে ব্যস্ত ছিলেন, এবং ১৯৩৯-৪২-এর যুদ্ধের বছরগুলোতে, যখন তাঁদের সময় গিয়েছিল রাজনৈতিক আপোষ-আলোচনা, বিক্ষোভ ও আন্দোলনে। ১৯৪২-এর পর, তাঁরা ছিলেন জেলে, সুতরাং জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন। ১৯৪৫-এ তাঁরা যখন বেরিয়ে আসেন তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রেক্ষাপট পাল্টানোর জন্য বোধ হয় অনেক দেরী হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক, ঠিক তার পরেই, কংগ্রেস নেতারা আই.এন.এ. বন্দী-মুক্তি আন্দোলন ও রাজনৈতিক আপোষ-আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তার ফলে আবার তারা সাম্প্রদায়িক শক্তিদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে অবহেলা করেছিলেন। তার বদলে, তাদের ঝোঁক দেখা গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ওপর নির্ভর করার দিকে।

একেবারে রাজনৈতিক স্তরেও, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যেমন হয়েছিল, তেমন কোনো গণ-প্রচার সংগঠিত হয়নি। কোনো পর্যায়েই কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক সমস্যা বা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে সম্মুখসমরে নামেনি। সে ধৈর্যের সঙ্গে জনগণকে বোঝায়নি এই সমস্যার প্রকৃত বিস্তৃতি, বা সাম্প্রদায়িকতা এবং ঔপ-নিবেশিক পশ্চাদপদতার সম্পর্ক, অথবা একদিকে সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসকরা, জাগীরদারী স্তরগুলি, সঙ্কীর্ণ পেটি বুর্জোয়া স্বার্থ, এদের মধ্যে যোগাযোগ।[৩] বড়জোর, কংগ্রেসের প্রচার সাধারণ ও সর্বব্যাপীরূপে এবং গভীর আবেগের সঙ্গে ঔপনিবেশিক নীতিকে দোষ দিয়েছিল, কিন্তু তার ভেতরে এমন কোনো বিশ্লেষণ ছিল না যা সাম্প্রদায়িকতা এবং ঔপনিবেশিকতার জটিল সম্পর্ককে খুলে ধরতে পারতো। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোনো জোরদার ও টানা শিক্ষামূলক প্রচার অভিযানও হয়নি। তার বদলে জনগণকে থেকে থেকে পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার খপ্পরে না পড়তে, সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেরিয়ে আসতে, এবং ভারতীয় হিসাবে অনুভব করতে, চিন্তা করতে ও কাজ করতে। হিন্দু-মুসলিম 'ভাই-ভাই'-এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, অথচ বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের ভেতর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের চরিত্রকে বা ঔপনিবেশিক সমাজে শোষণের চরিত্রকে, যা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে

হয়নি, তাকে, ব্যাখ্যা করা কমই হয়েছিল। যেমন, হিন্দুরা বা হিন্দু 'সম্প্রদায়' মুসলিমদের বা মুসলিম 'সম্প্রদায়কে' শোষণ করছিল না, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ধনীক ও ভূস্বামীরা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তদের শোষণ করছিল, সমস্ত ভারতীয়ই সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিল ; এবং তাই, ভূস্বামী ও ধনীকদের বিপরীতে সমস্ত শোষিত শ্রেণীর স্বার্থই যেমন এক, তেমনি ঔপনিবেশিকতার বিপরীতে সমস্ত ভারতীয়দের স্বার্থও এক ; অথবা বেকারীর উৎস অন্য 'সম্প্রদায়' নয়, ঔপনিবেশিক অনগ্রসরতা। কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের প্রকৃত সমস্যা ও উৎকণ্ঠাগুলিকে, জাতীয় বা আঞ্চলিক স্তরে, দেখাতে, তাদের কারণগুলির মোকাবিলা করতে, বা সংখ্যালঘুদের উৎকণ্ঠা ও ভয়কে বিপথে পরিচালিত করার সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়তে, ব্যর্থ হয়েছিল। যা প্রয়োজন ছিল তা হল সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে বিতর্ককে দৃঢ়, যুক্তিনির্ভর, বিশ্লেষণমূলক খাতে চালিত করা, যাতে তারা যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়তে বাধ্য হয়, আবেগ ও পক্ষপাতের মাটিতে নয়।

তার বদলে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মোকাবিলা করতে ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতে কংগ্রেসের অনুসৃত মৌলিক নীতি ছিল, হয় ১৯২০-র দশকের মত, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক নেতা, গোষ্ঠী ও দলের ভেতর শালিসী বা মধ্যস্থতার কাজ করা, নয় ১৯২০-র দশকের শেষ, ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকের মত, মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে উচ্চস্তরের বৈঠক, ব্যক্তিগত আলোচনা, ইত্যাদির মাধ্যমে সমঝোতা করা। তা করতে গিয়ে, কংগ্রেস পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক নেতাদের তাদের 'সম্প্রদায়ের' সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার দাবীকে, এবং অবশ্যই, এইরকম সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে, মেনে নিয়েছিল, বা তাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।[৪] সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা করে সে তাদের রাজনীতিকে বৈধ করে দিয়েছিল। 'সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের অধিক গুরুত্ব ও সম্মান এনে দিয়েছিল', বা অন্ততপক্ষে তাদের মর্যাদা-সম্পন্ন করে তুলেছিল। সে পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক দল ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃঢ় রাজনৈতিক-মতাদর্শগত প্রচারের নিজের অধিকারকেও দুর্বল করে ফেলে-ছিল। সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে ক্রমাগত আলোচনা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুসলিমদের অবস্থাও দুর্বল করে দিয়েছিল, যারা বেশী করে বাধ্য হচ্ছিল জাতীয়-তাবাদী মুসলিম হিসাবে চিন্তা ও কাজ করতে। আবুল কালাম আজাদ ও আসফ আলির মত কেবল জাতীয়তাবাদী মানুষ হয়ে পড়ছিল দুর্লভ। উপরন্তু, ওপরতলায় বারবার আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও তিক্ততা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে হতাশা ও অসহায়ভাব জন্ম নিচ্ছিল। এই ওপর-থেকে-ঐক্যের নীতিই আবার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আলোচনায় জড়িত রাজনৈতিক নেতাদের ভেতর সম্প্রদায়গত চিন্তা জাগিয়ে

তুলছিল। তার ফলে, তাদের অধিকাংশের পক্ষেই সাম্প্রদায়িকতা ছেড়ে একেবারে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়েছিল, কারণ তা তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা কমিয়ে দিতো।[৫]

সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপকতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিস্তৃতি, চরিত্র ও কারণগুলিকে বোঝার এবং এই বোঝার ভিত্তিতে একটি মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রচার গড়ে তোলার একমাত্র সত্যিকারের চেষ্টা করেছিলেন ১৯৩৩-৩৭-এ জওহরলাল নেহরু ও বামপন্থীরা। এ বিষয়ে নেহরুর তখনকার লেখায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি পরিষ্কার দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন যে জাতীয় ঐক্যকে জনগণের ঐক্য হতে হবে, নেতাদের সুবিধামতন গাঁটছড়া বাঁধা নয়। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল এই সমস্যার প্রতি মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করার প্রথম প্রচেষ্টাগুলির একটি। তিনি ওপর থেকে জোড়াতালি ঐক্যের চেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিলেন এক বিকল্প রাজনৈতিক লাইন, যার মধ্যে ছিল জঙ্গী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, জাতীয় আন্দোলনকে মধ্যশ্রেণীর রাজনীতির মধ্যে আটকে রাখতে অস্বীকৃতি, রাজনীতিকে গণভিত্তি দেওয়া, এবং মুসলিম কৃষক ও শ্রমিকদের, রাজনৈতিক কাজের মাধ্যমে, শ্রেণীগত দাবী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচীর ভিত্তিতে, সরাসরি জয় করে নেওয়া, এবং এইভাবে, মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক নেতাদের শুধু পাশ কাটিয়ে যাওয়া নয়, তাদের ঔপনিবেশিকতাবাদী, সামন্ত ও ধনীকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং সঙ্কীর্ণ চাকরী-কেন্দ্রীক পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ উদঘাটন করা। নেহরুর ১৯৩৩-৩৭-এর কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ ছিল মুসলিম গণসংযোগ কর্মসূচী। এই তাড়াহুড়ো করে ভাবা, অ-পরিকল্পিত ও অ-সংগঠিত কর্মসূচী কখনোই যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হয়নি এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের চাপে শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয়েছিল। বাংলা, পাঞ্জাব ও বিহারের কয়েকটি জায়গায় এই কর্মসূচী ভালোভাবে নেওয়াই যায়নি। তা করতে গেলে, কংগ্রেসকে সেখানে একটি মৌলিক পরিবর্তনকামী কৃষি-কর্মসূচীর ও শহরাঞ্চলে শ্রমিক ও হস্তশিল্পীদের পক্ষে একটি নীতির প্রতি আরো বেশী আনুগত্য দেখাতে হত। তার ওপর, মুসলিম জনগণের শ্রেণী-উপলব্ধি ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না, যদি হিন্দু জনগণের ক্ষেত্রেও তা না করা হত।

নেহরু এবং বামপন্থীরা বাস্তবতাকে এক ঝলক দেখতে পেয়েছিলেন ; দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁরা সমগ্র অবস্থাটা ধরতে পারেননি। যাই হোক, ১৯৩৭-এর পর নেহরু এবং বামপন্থীরাও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইকে অবহেলা করতে শুরু করলো, বিশেষত মতাদর্শগত ক্ষেত্রে। একটি দুর্ভাগ্যজনক ব্যতিক্রম হল কমিউনিষ্ট পার্টির জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতির নামে পাকিস্তানের দাবীকে সমর্থন করা। তারপর এল মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে না দেখে

জাতীয়তাবাদী দল হিসাবে দেখার পালা। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়েছিল লীগকে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের চোখে মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা, যারা এখন কোনো পাপবোধ ছাড়াই তাতে যোগ দিতে বা তাকে সমর্থন করতে পারতো।

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে কংগ্রেস নেতারা এবং বিশেষভাবে নেহরু ও বামপন্থীরা সমস্যাটাকে দেখতেন এক যান্ত্রিক ও সরল দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থনীতিবাদী ও নির্ধারণবাদী ঝোঁক নিয়ে। এর ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সচেতন মতাদর্শগত সংগ্রামকে কম গুরুত্ব দেওয়া হত; কখনো সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টাকেই ছোটো করে এবং গৌণ দেখা হত।[৬] অনেক সময় ধরে নেওয়া হত যে 'প্রকৃত' সংগ্রামগুলির, অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের, বিকাশের, এবং অর্থনৈতিক বিকাশের, সাথে সাথে সাম্প্রদায়িকতা আপনা-আপনি চলে যাবে।[৭] জনগণ তখন নিজের থেকেই তাকে প্রতিক্রিয়াশীল ও বস্তাপচা মতাদর্শ রূপে দেখতে শুরু করবে। যা পুরোপুরি বোঝা যায়নি তা হল, সাম্প্রদায়িকতাকে মতাদর্শগতভাবে ও রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা না করলে এই আন্দোলনগুলির সম্পূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব নয়; অর্থনৈতিক ও জাতীয় সংগ্রামেব মতই মতাদর্শগত সংগ্রামও একটি 'প্রকৃত' সংগ্রাম; অর্থনৈতিক সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে 'শ্রেণী-সংগ্রাম' আপনা-আপনি সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির প্রভাব কাটিয়ে দিতে পারে না; ভারতীয় সমাজের শ্রেণীগুলিও গড়ে উঠবে জাতি গঠনের, বা 'ভারতীয় জনগণের' গঠনের সাথে সাথে; শ্রেণী সচেতনতা এবং শ্রেণীসংগ্রামই সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বাধা পেতে ও রুদ্ধ হতে পারে; এবং শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি ও সংগঠন সাম্প্রদায়িকতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাথে সাথে, জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ও তাকে পরাভূত করতে হবে। নেহরু ও অন্যান্যরা অবশ্য সঠিকভাবেই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রকৃত বস্তু অথবা বাস্তব সংঘাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রূপে না দেখে তাকে দেখেছিলেন বাস্তব স্বার্থের 'পরিবর্ত' এবং বিকৃত প্রতিফলন রূপে। কিন্তু তাহলে প্রকৃত সংঘাতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এবং সাম্প্রদায়িকতার অসত্যতা দেখানোর দরকার ছিল, শুধু প্রকৃত জাতীয় এবং শ্রেণী সংঘাতের মাধ্যমেই নয়, ধৈর্যশীল মতাদর্শগত শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে দিয়ে জনগণের চিন্তা ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে।

তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদীরা অনেক সময় সাম্প্রদায়িক প্রভাবাধীন লোকেদের কাছে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়বার বা তার শিকার না হওয়ার জন্য জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় স্বার্থের নামে আবেগপূর্ণ আবেদন করতো। তারা জাতীয় চেতনা ইতিমধ্যেই সমাজের গভীরে ঢুকে গেছে এটা ধরে নিয়ে আবেদন করতো সাম্প্রদায়িকতা ছেড়ে দিতে কারণ তা জাতীয়তা-বিরোধী। যাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল না, তাদের ওপর এটা সামান্যই প্রভাব ফেলতো। ভারত যে তখনো

একটি সুসংবদ্ধ জাতি নয়, তা হওয়ার পথে, এবং ফলতঃ প্রক্রিয়াটা তখনো সম্পূর্ণ নয়, এবং ভারতীয় জাতি তখনো পুরো গড়া হয়নি, এই কথাটা অবহেলা করা হত। এবং ভারত বস্তুগতভাবে জাতি রূপে গড়ে উঠেছিল বলেই যে জাতীয় চেতনার বিকাশ একটা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া হত তাও নয়। জাতীয় বা ভারতীয় সত্তার উদয় বা জাতিসত্তার বোধ তাই আগে থেকে ধরে নেওয়া যেতো না। ভারতীয় জনগণ নতুন জাতীয় সত্তা অর্জন করতো সচেতন রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কাজের মাধ্যমে, শুধুমাত্র তার বস্তুগত অস্তিত্বের জন্য নয়। জনগণ যদি জাতিসত্তা সম্পর্কে সচেতন হত এবং নতুন সত্তা অর্জন করতো, তবেই তার কাছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আবেদন করা সম্ভব হত। যেখানে নানা কারণে উঁচু জাতের হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের, মধ্যশ্রেণীগুলির এবং কৃষকদের ও শ্রমিকশ্রেণীর কিছু অংশের ভেতর ধীরে ধীরে জাতির অঙ্গীভূত হওয়ার বোধ জেগে উঠেছিল, মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের, মধ্যশ্রেণীগুলির, এবং হিন্দু ও মুসলিম কৃষক, শ্রমিক ও নিচুজাতের ভেতরে এই বোধ ছিল দুর্বল।

এইদিকে, এমনকি জাতীয়তাবাদের গোড়ার দিক থেকে খানিকটা পিছিয়ে আসাও হয়েছিল, যখন জাতীয় নেতাবা সত্যিই সচেতন ছিলেন যে ভারত জাতি হয়ে উঠতে শুরু করেছে মাত্র, এই প্রক্রিয়াকে সমানে উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে এবং এমনি এমনি ধরে নেওয়া চলবে না, ভারতীয় জনগণকে ঐক্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং এই ঐক্যের সপক্ষে যুক্তি দেখাতে হবে ও সংগ্রাম করতে হবে, এবং ফলতঃ, ধর্ম, জাতপাত ও অঞ্চলের বিভেদ ধৈর্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র থেকে দূর করতে হবে।

তাছাড়া ছিল সামাজিকভাবে অধিকতর প্রগতিশীল দিক থেকে জাতীয় স্বাধীনতার সামাজিক চরিত্রের সংজ্ঞা দেওয়ার সমস্যা। জাতীয় কংগ্রেসের করাচী (১৯৩১) ও ফয়েজপুর (১৯০৬) প্রস্তাবগুলি ছিল এইদিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১৯৩০-এর দশকে কংগ্রেসের উদীয়মান বামপন্থী অংশ সমাজবাদ, ভূমি সংস্কার ও মজদুর-কিষাণ রাজ-এর স্লোগানগুলিকে জনপ্রিয় করছিল। বুদ্ধিজীবীরা ক্রমেই বেশী করে সমাজবাদী মনোভাব নিচ্ছিল। মুক্ত ভারতবর্ষের একাধিক সামাজিক কল্পচিত্রের ভেতর তীব্র প্রতিযোগিতা চলছিল। জাতীয় আন্দোলনের ভেতর একাধিক মতাদর্শ ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত তীব্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। তার পাশাপাশি, অবস্থার চরিত্রই ছিল এমন, যে সব কংগ্রেসীর কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো একটি সমাজ-কল্পনা ছিল না। অনেকক্ষেত্রে, ঔপনিবেশিক শাসকদের বিতাড়নের, ঔপনিবেশিক শোষণের অবসানের ধারণা এবং দারিদ্র্য দূর করা আর শিল্প ও কৃষির বিকাশের আবছা প্রতিশ্রুতির মধ্যেই মোটামুটি জাতীয়তাবাদী প্রচার ও আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকতো। এতে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সুবিধা পেতো মধ্যশ্রেণী ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার এবং তাদের ভয় ও উৎকণ্ঠার কাছে

আবেদন করার। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের আরো কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা ছিল, যা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যে, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এক দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটের পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল এবং এইভাবে এমন এক অবস্থা তৈরী হয়েছিল যেখানে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি এক-সঙ্গে আমূল পরিবর্তন চাইছিল। দুর্ভাগ্যবশত, ঔপনিবেশিক শাসন ও অনগ্রসরতা থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সমস্যাগুলির উপযুক্ত মোকাবিলা করতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছিল।

চতুর্থত, সাম্প্রদায়িকতাকে সফলভাবে মোকাবিলার জন্য দরকার ছিল তার সমগ্র জটিলতা ও অস্বচ্ছতা ধরতে পারা—তার মতাদর্শ, তার উৎস, তার সামাজিক ভিত্তি, তার বৃদ্ধির এবং জাতীয়তাবাদী আক্রমণের মুখে তার দৃঢ়তার কারণ। যদিও কানপুর দাঙ্গা তদন্ত কমিটি রিপোর্ট এবং জওহরলাল নেহরু, কে. বি. কৃষ্ণ, কে. এম. আশরাফ, তুফাইল আহমদ মঙ্গলোরি, সি. মানশ'ট ও বেণী প্রসাদের লেখায় গভীর অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, সবমিলিয়ে তাঁরা এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতারা এ বিষয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি চ্যালেঞ্জের উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি গান্ধীর সাধারণভাবে উদ্দীপ্ত রাজনৈতিক উপলব্ধি সাম্প্রদায়িকতার জায়গায় অগভীর, এবং তিনি ক্রমাগত এতে এতই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন যে শেষপর্যন্ত তিনি এর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিলেন কেবল তার নিজস্ব নৈতিক ও দৈহিক সাহসকে।

এখানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাধারণ মতাদর্শগত দুর্বলতাও গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলা হয়েছে, যেসব সামাজিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং অন্ধসংস্কার-বাদী ধারণা এবং হিন্দুয়ানী জাতীয়তাবাদী প্রচারের অনেকাংশে ঢুকে পড়েছিল, তাদের কংগ্রেস নেতারা কখনোই মাঠে নেমে বিরোধিতা করেননি বা তাদের মূলোচ্ছেদ করেননি, এবং তারা জাতীয়তাবাদী কর্মীদের ভেতর ব্যাপকভাবে থেকে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক শক্তিরা, তাদের অস্তিত্বের সুযোগ নিয়েছিল সরা-সরি তাদের প্রতি আবেদন করে এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনের ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্রের সত্যতা প্রসঙ্গে সন্দেহ জাগানোর জন্য তাদের ব্যবহার করে। এই লেখার মূল অংশে আমরা দেখিয়েছি, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক আক্রমণ কোন কোন দিকে চালিত হওয়ার দরকার ছিল। আমরা আর একবার জোর দিয়ে বলতে পারি যে শুধু প্রচার বা মতাদর্শগত অভিযানে কাজ হতনা, জনগণকে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে, এবং সাধারণ স্বার্থের বাস্তব ভিত্তিভূমিতে একটি সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ভারতীয় জনগণের ঐক্য হবে দুটো পাশাপাশি ঘটনার প্রভাবের ফল : সাধারণ প্রকৃত স্বার্থ ও লক্ষ্যের জন্য কিছুটা একই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর

ভিত্তি করে জনগণের সাধারণ সংগ্রাম, এবং অংশত সাধারণ সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা তাদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সাধারণ উপলব্ধি।

[চার]

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের দুর্বলতার একটি কারণ ছিল, মধ্যশ্রেণীর ভেতর উভয়েরই সামাজিক ভিত্তি থাকা এবং উভয়েরই অভিমুখ একইদিকে থাকা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ঔপনিবেশিক অনগ্রসরতা পেটি বুর্জোয়াদের একটা সাংঘাতিক সামাজিক অবস্থায় ফেলেছিল, যারা একদিকে তাদের সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল, অন্যদিকে, সরকারী চাকরী ও শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের আশু, স্বল্পমেয়াদী স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ঢুকেছিল। সাম্প্রদায়িকতা যদিও ঔপনিবেশিকতা, জাগীরদারী শ্রেণীগুলি, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের সেবা করতো, এবং কোনো কোনো জায়গায় বিকৃতভাবে শ্রেণীসংগ্রামকেও প্রতিফলিত করতো, কিন্তু তার প্রধান সামাজিক ভিত্তি, তার গণভিত্তি, ছিল মধ্যশ্রেণীরা—এটা ছিল একেবারেই পেটি বুর্জোয়াদের ব্যাপার। তার ফলে, যতক্ষণ মধ্যশ্রেণীরা ভারতীয় রাজনীতিতে, বিশেষত পৌর কমিটি ও আইনসভার রাজনীতিতে, প্রাধান্যের অবস্থানে থাকবে, ততক্ষণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানও মিলবে না।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে রাজনীতিতে পেটি বুর্জোয়া প্রাধান্য একাধিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এমনকি যখন জাতীয় আন্দোলন এক ব্যাপকভিত্তিতে জাতীয় কর্মসূচী নিয়েছে, তখনও তা সাম্প্রদায়িক দলগুলির তুলে ধরা মধ্যবিত্ত আকাঙ্খা ও স্বার্থগুলিকে বেশীদূর পর্যন্ত বিরোধিতা করতে পারেনি। স্বল্পমেয়াদীভাবে, এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে কোনঠাসা অবস্থায়, মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিরা সাম্প্রদায়িকতার থেকে কিছু তুলনামূলক সুবিধা পেয়েছিল। এই দুটো বিষয় সাধারণভাবে পেটি বুর্জোয়া রাজনীতির, এবং বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামের রাজনীতির, ধর্মনিরপেক্ষতার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও রাজনীতিকে দেখেও না দেখার ভান করার, সাম্প্রদায়িক তাত্ত্বিক ও নেতাদের প্রতি নরম মনোভাব নেওয়ার, তাদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করার এবং এমনকি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করার সময়েও তার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম না করার যে সাধারণ প্রবণতা জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে ছিল, তার জন্যেও এটাই দায়ী।[৮] এর ফলে পেটি বুর্জোয়াদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক সঙ্কীর্ণমনস্কতার বিরোধিতা করাও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে

কঠিন হয়ে পড়েছিল। বস্তুত, সে নিজেই এই সঙ্কীর্ণমনস্কতা এড়াতে পারেনি।

হাজার হোক, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সত্যিই সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রকৃত মতাদর্শগত, ও রাজনৈতিক সংগ্রাম, যত অস্থায়ীভাবেই হোক, মধ্যশ্রেণীর কিছু অংশকে দূরে সরিয়ে দিতে পারতো। এই বিচ্ছিন্নতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারতো, যেহেতু ঔপনিবেশিক ভারতের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারে মধ্যশ্রেণীরাই ছিল শহরের ভোটারদের বৃহত্তম অংশ। প্রকৃতপক্ষে নেহরুর মত কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া বামপন্থীরা, যারা মাঠে নেমে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করেছিল, তারাও ব্যর্থ হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতাকে পেটি বুর্জোয়া রূপে বুঝতে, বা অন্তত তার মধ্যে মধ্যশ্রেণীর ভূমিকাকে যথেষ্ট খাটো করে প্রধানত তার আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং ঔপনিবেশিক ভিত্তির ওপর জোর দেওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছিল। হয়তো এটা পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে তাদের নিজেদেরই শেকড় ছিল বলেই।

ভারতীয় রাজনীতিতে মধ্যশ্রেণীর গুরুত্ব ছিল সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করার জাতীয়তাবাদী পরিকল্পনার ব্যর্থতার একটা কারণ। এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য দরকার ছিল চাকরী ও আইনসভার আসনের ব্যাপারে উদারভাবে ছাড় দিয়ে মধ্যশ্রেণীভিত্তিক সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাকে তোষণ করা। এমনকি যখন কংগ্রেস নেতৃত্ব এই যুক্তি মেনে নিয়েছিল,[৯] তখনও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দু মধ্যশ্রেণীদের চাপের ফলে সে ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব হয়নি। হিন্দুরা এরকম কোনো ছাড় দেওয়ার বিরোধী ছিল, এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই বিরোধিতা অমান্য করার রাজনৈতিক ইচ্ছা ছিল না। তার বদলে তারা চেষ্টা করেছিল মধ্যশ্রেণীর সব অংশকে সন্তুষ্ট করতে এবং মধ্যবিত্ত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে বিশেষ না চটিয়ে মধ্যবিত্ত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে তোষণ করতে। যাই হোক, তার মানে এই নয় যে সাম্প্রদায়িকতাকে তোষণ করা বা মুসলিম মধ্যশ্রেণীর দাবী মেনে নেওয়া কোনো বাস্তবানুগ বা বাঞ্ছিত নীতি ছিল। সমালোচনাটা এই যে কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের নিজেদের পরিকল্পনার সম্ভাবনাগুলিকেও সম্পূর্ণভাবে খতিয়ে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, আসল উত্তরটা ছিল সাম্প্রদায়িকতাকে সমস্ত ক্ষেত্রে—মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক—পুরোপুরি বিরোধিতা করা, এবং জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ও মতাদর্শগত ভিত্তিকে আরো বেশী করে পেটি বুর্জোয়াদের থেকে কৃষক ও শ্রমিক জনগণের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

যেহেতু কংগ্রেসের ব্যাপকতর গণভিত্তি ছিল এবং যেহেতু হিন্দু মধ্যশ্রেণীরা, রাজনৈতিক-মতাদর্শগত প্রভাবের দরুন, পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতার দিকে চলে যায়নি এবং যথেষ্ট জাতীয়তাবাদী আনুগত্য রেখেছিল, তাই কংগ্রেস সাধারণ-

ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি অনুসরণ করতে পেরেছিল। কিন্তু একাধিক জায়গায় জনগণের মধ্যে তার দুর্বল অবস্থা, এবং বিশেষত নির্বাচনের জন্য, মধ্য-শ্রেণীর ওপর নির্ভরতা, তাকে কিছুটা সাম্প্রদায়িক চাপের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। তার সঙ্গে, ছোটো ছোটো জায়গায় ছাড়া, তার মুসলিম কৃষক ও হস্তশিল্পীদের মধ্যে ভিত্তি অর্জনে ব্যর্থতা, এবং মুসলিম মধ্যশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়া, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সামনে তাকে অস্ত্রহীন করে ফেলেছিল। তার ফলে সে বাধ্য হয়েছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা করতে ও তাদের কাছে মাথা নোয়াতে। অন্যভাবে বললে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে হলে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়তে হলে, ভারতীয় রাজনীতিতে মধ্যশ্রেণীর গুরুত্ব কমানোর এবং সামাজিক মূল্যবোধ সমগ্রের ওপর তাদের প্রাধান্য শেষ করার দরকার ছিল। জাতীয় আন্দোলন যেহেতু সামাজিক অবস্থার প্রচণ্ড উন্নতি করে মধ্যশ্রেণীদের সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে বার করে আনার জায়গায় ছিল না, তাই এই দিকটা আরো গুরুত্ব পেয়েছিল।

সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর পেটি বুর্জোয়া প্রাধান্য শেষ করাকে সরল অথবা যান্ত্রিকভাবে বুঝলে চলবে না। একটি আলগাভাবে গঠিত ঔপনিবেশিক সমাজে, যেখানে শ্রেণীগুলি গঠনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং মতাদর্শগতভাবে বা সামাজিকভাবে আকার পায়নি, এমনকি, কারখানা, রেল ইত্যাদির শ্রমিকরা এবং মধ্য ও ধনী কৃষকদের উদীয়মান স্তরগুলিও এক পেটি বুর্জোয়া বাতাবরণের মধ্যে চিন্তা ও কাজ করতো; এবং তীব্র ও সচেতন মতাদর্শগত পুনর্গঠন না ঘটলে, তাদের ওপর ভিত্তি করে গড়া আন্দোলন ও রাজনীতিতেও পেটি বুর্জোয়া বিকৃতি থাকতে পারতো। তার ওপর, কৃষি ও শিল্পে স্থবিরতার ফলে, কৃষক, শ্রমিক ও ভূস্বামীদের ঘরের শিক্ষিত যুবকেরাও দ্রুত পেটি বুর্জোয়া আকাঙ্খা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করছিল। এই কারণে, এমনকি যেসব ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল শ্রমিক ও কৃষকদের হয়ে কথা বলার, বা তাদের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, দাবী করছিল, তাদেরও সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ লাগতে পারতো বা অন্তত তারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত লড়াই করতে ব্যর্থ হত।

মধ্যশ্রেণীর ওপর জাতীয় আন্দোলনের নির্ভরতা বা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যশ্রেণীমুখীনতার নেতিবাচক দিকগুলি দেখতে পাওয়ার অর্থ মধ্যশ্রেণী-বিরোধী একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী বা কৌশল তুলে ধরা নয়। আমার বিশ্লেষণে আমি সবসময় জোর দিয়েছি মধ্যশ্রেণী বা পেটি বুর্জোয়ারা সাম্প্রদায়িকতার যে সামাজিক ভিত্তি যুগিয়েছে, তার ওপর। কিন্তু এটা করা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের চাবিকাঠিটা দেখানোর জন্য। এই স্তরকে নিন্দা বা বিদ্রূপ করা উদ্দেশ্য ছিল না।

জটিল ঐতিহাসিক কারণে পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং এটা তাদের হতেই হত। তা হয়েছিল বিশেষভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাংবিধানিক ও নির্বাচনী রাজনীতির এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচারের দরুন, এবং এই মঞ্চ ছিল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক পরিকল্পনাব এক প্রয়োজনীয় এবং অপবিহার্য অঙ্গ। নির্বাচকমণ্ডলীর চেহারা যা ছিল, এবং ভারতে ঐতিহাসিকভাবে জনমত যেভাবে তৈরী হত, তাতে পেটি বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনেব সামাজিক ভিত্তির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে না ধরে উপায় ছিল না। এটা সত্যি যে সাম্প্রদায়িকতাকে সফল-ভাবে বিরোধিতা করার জন্য আন্দোলনকে মধ্যশ্রেণীমুখী রাজনীতির গহ্বর ছেড়ে বেরোতে হত। কিন্তু কেবল সাম্প্রদায়িকতা সর্বোপরি তাব মতাদর্শ ছিল বলেই পেটি বুর্জোয়াদের অবহেলা বা বাজনীতি থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব ছিল না। তাই দরকার ছিল সামাজিক প্রক্রিয়াষ তার গুরুত্ব কমানোর সাথে সাথে তার মতাদর্শগত গঠনের পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম করার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী শক্তিদের তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত এবং মানসিক চাহিদাগুলি সম্পর্কে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হত। এবং এই স্তরসমষ্টির মধ্যেই মতাদর্শগত সংগ্রামের বর্শামুখ খুঁজতে হত। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল মূলত পেটি বুর্জোযা শ্রেণীকে সাম্প্রদায়িক হয়ে যাওয়ার থেকে বিরত রাখার সংগ্রাম। এটা না দেখা মানে এই সংগ্রামকে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী (বা আজকের দিনে ধনবাদবিরোধী) সংগ্রামের সাথে এক করে ফেলা।

সাম্প্রদায়িক প্রভাবাধীন মধ্যশ্রেণীদের ধৈর্যের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও পক্ষপাতিত্ব থেকে সরিয়ে নিতে হত এবং **তাদের সামাজিক অবস্থা ও তার কারণ বুঝতে, মতাদর্শগত রাজনৈতিক কাজের মাধ্যমে সেই সামা-জিক অবস্থার প্রভাবমুক্ত হতে, উৎসাহ দিতে হত**। তাদের এটা বোঝার দরকার ছিল যে তাদের ক্ষোভের জায়গাগুলি বাস্তব, এবং তার কারণ ভারতীয় সমাজ, বাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্র, অন্য 'সম্প্রদায়ের' কলকাঠি নাড়া বা প্রাধান্য নয়, এবং জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক সম-স্যার শুধু যে কোনো মধ্যবিত্ত সমাধান হতে পারে না তাই নয়, মধ্যশ্রেণীর প্রকৃত সামাজিক সমস্যাগুলির কোনো সাম্প্রদায়িক সমাধানও হতে পারে না। যেমন, মধ্যশ্রেণীর কয়েকজন ব্যক্তিব লাভ হলেও, চাকরী সংরক্ষণ মধ্যশ্রেণীর বেকারীর ব্যাপকতর সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারে না; এই সমস্যা মিটবে কেবল তখনই, যখন অর্থনীতি বিকাশের পথে এগিয়ে গিয়ে মধ্যশ্রেণীদের জন্য শিল্প, ব্যবসা, পেশা, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, সংবাদপত্র, রেডিও, শিল্প-সাহিত্য, ফিল্ম, নাটক, ইত্যাদিতে চাকরীর সৃষ্টি করবে।

আরো একটা উল্লেখযোগ্য কারণে মধ্যশ্রেণীর মতাদর্শগত পুনর্গঠন ছিল গুরুত্ব-

পূর্ণ। ১৯২০-র দশকের মধ্যে, মধ্যশ্রেণী হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের, জাতীয়তাবাদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের, সমাজবাদী ও কমিউনিস্টদের, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনের মূল সদস্যভুক্তির জায়গা, যে কর্মীরা সমাজের অন্যান্য অংশের কাছে রাজনীতি নিয়ে যাবে। মধ্যশ্রেণীর মতাদর্শ ও রাজনীতির লক্ষ্যাভিমুখের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তাই সমগ্র রাজনীতিতে আশু ও পরিবর্ধিত প্রভাব ফেলতো।

টীকা

১। উদারনৈতিক সমাধানগুলির একটি ভালো সারসংক্ষেপ দিয়েছেন সি. ম্যানশার্ট, "দা হিন্দু-মুসলিম প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়া", পৃ: ১২১-২৩।

২। মার্ক্স-এঙ্গেলস, "কালেক্টেড ওয়ার্কস", খণ্ড ৫, পৃঃ ৭।

৩। বামপন্থীরাও সাম্প্রদায়িকতার পেটি বুর্জোয়া সামাজিক ভিত্তির ওপর বিশেষ নজর দেয়নি। ফলতঃ, তাঁদের সাম্প্রদায়িকতার মতাদর্শগত সমালোচনা অগভীর ও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

৪। মিলিয়ে দেখুন: "এটা ব্যাপকভাবে ধরে নেওয়া হতে শুরু করলো যে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির, যেমন মুসলিম সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায় ও শিখ সম্প্রদায়ের, বাস্তব জীবনে অস্তিত্ব রয়েছে। জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে একমাত্র বড় তফাৎ ছিল এই যে, প্রথম পক্ষ এই সম্প্রদায়গুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্প্রদায়গতভাবে একসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুক, এবং দ্বিতীয় পক্ষ চেয়েছিল যে তারা পরস্পরের সংস্পর্শ ছেড়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করুক। দুই পক্ষই সাম্প্রদায়িকতার যুক্তিটা মেনে নিয়েছিল। অতঃপর, জাতীয়তাবাদীরা সম্প্রদায়গুলির ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করবে এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই যুক্তিকে আরো দূরে টেনে নিয়ে যাবে। গোড়ার দিকে জিন্না দুটোই করতে পারতেন। এইভাবে, রাজনীতি সম্পর্কে মৌলিক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ, ভারতীয় রাজনীতির মূল কাজ বৈচিত্র্যময় ভারতীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করা নয়, পৃথকীকৃত সম্প্রদায়গুলিকে এবং তাদের নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করা, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভারতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল।" "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেণ্ট অ্যাণ্ড দা কমিউনাল প্রবলেম", বিপান চন্দ্র, "ন্যাশনালিসম্ অ্যাণ্ড কলোনিয়ালিসম্ ইন মডার্ণ ইণ্ডিয়া", পৃঃ ২৫৭-৫৮।

৫। সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতি জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ সমালোচনার জন্য দেখুন ঐ, এবং "রিপোর্ট অফ দা কানপুর রায়টস্ এনকোয়্যারী কমিটি". পৃঃ ২২৫-২৮।

৬। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, নেহরু বক্তব্যের এই অংশগুলি: "আমি এই সাম্প্রদায়িক বিষয়টি নিয়ে উত্তেজিত হতে পারছিনা, কারণ বিশেষ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, হাজার হোক এটা গৌণ বিষয়, এবং সমগ্রতার মধ্যে এর কোনো প্রকৃত গুরুত্ব থাকতে পারে না।" (লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ, "সিলেক্টেড ওয়ার্কস", খণ্ড ৭, পৃঃ ১৯০)। "ইউরোপকে মৌলিক সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হবে যা আমাদের সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মতো নয়। আমাদের প্রশ্নটা এক ভৌতিক, অন্তঃসারশূন্য বিষয়…আমার মনে হয় যে এই প্রশ্ন যদি জনগণের সামনে হাজির করা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান পাওয়া

যাবে।" (আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩, "সিলেক্টেড ওয়ার্কস", খণ্ড ৬, পৃঃ ১৩২-৩৩)। "সামাজিক ও অর্থ নৈতিক শক্তিগুলি অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্য সমস্যাগুলিকে সামনে নিয়ে আসবে। তারা বিভিন্ন ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করবে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর হয়ে যাবে।" ("হিন্দু অ্যাণ্ড মুসলিম কমিউনালিসম্", ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৭০)। "কিন্তু মুসলিম জাতির এই ধারণা কেবল কয়েকটি কল্পনাপ্রসূত, এবং সংবাদপত্রের প্রচার ছাড়া খুব কম লোকই তার কথা শুনতে পেতো। আর এমনকি, অনেক লোক তা বিশ্বাস করলেও, বাস্তবের ছোঁয়ায় তা অদৃশ্য হয়ে যেতো।" (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী, পৃঃ ৪৬৯)। গান্ধী এরকম ভুল করেননি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিলুপ্তি ঘটানোর রাজনীতিগত গুরুত্বকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যাইহোক, তিনি জানতেন না সাধারণভাবে জনগণের কাছে আবেদন বা সাম্প্রদায়িক নেতাদের আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা ছাড়া কীভাবে একাজ করা যায়।

৭। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৬-এর জানুয়ারীতে নেহরু লিখেছিলেন যে যদিও সাম্প্রদায়িকতাকে উপেক্ষা করা যায়না কারণ তা হল "আমাদের পথে এক বিরাট বাধা এবং আমাদের ভবিষ্যত অগ্রগতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে", তবু, "একে বাড়িয়ে দেখানো এবং বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে।···সামাজিক বিষয়গুলির সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে এটা পশ্চাদপটে চলে যেতে বাধ্য"। "সিলেক্টেড ওয়ার্কস", খণ্ড ৭, পৃঃ ৬৯। অনুরূপভাবে, সি জি শা, সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে একজন অতি সংবেদনশীল মার্ক্সবাদী লেখক, লিখেছিলেন: "শোষিত শ্রেণীগুলির বাস্তব স্বার্থ এক। বাস্তব স্বার্থের এই ঐক্য এবং তার থেকে বেরিয়ে আসা সাধারণ দাবীগুলির ভিত্তিতে যুক্ত সংগ্রামই শুধু তাদের ঐক্য গড়ে তুলতে পারে। যে অনুপাতে এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামগুলি গড়ে উঠবে, তারা হিন্দু বা মুসলিম রূপে নিজেদের দেখা ছেড়ে দিয়ে শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি রূপে দেখতে শুরু করবে। ক্রমবর্ধমান হারে সাম্প্রদায়িক চেতনার জায়গা নেবে শ্রেণী চেতনা। এইভাবে, সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলা করা এবং খতম করার "একমাত্র ফলপ্রসূ উপায়" হল জনগণকে, হিন্দু ও মুসলিমদের, তাদের সাধারণ স্বার্থের প্রতিফলনকারী দাবীগুলির ভিত্তিতে একত্রিত করা, তাদের শ্রেণীগত সংগঠনকে মজবুত করা।···ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীগত প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতার ফলে যে পরিমাণে তাদের শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি পাবে, সেই পরিমাণেই তাদের সাম্প্রদায়িক চেতনা ভেঙে যাবে।" এবং আবার, "জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে এবং অবশেষে লোপ পাবে, যে অনুপাতে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বিকাশ ঘটবে।" "মার্ক্স ইসম্-গান্ধীসম্-স্তালিনিসম্", পৃঃ ১৮৬-৮৭ ও ১৯৫।

৮। আজ জাতিভেদ সম্পর্কে কমবেশী সমস্ত বড় রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে অনুরূপ দুর্বলতা রয়েছে।

৯। নেহেরুর মতে, সাম্প্রদায়িকতার প্রতি কংগ্রেসের নীতির একটি প্রধান দিক ছিল যে "সংখ্যালঘুদের ভয় ও সন্দেহ, অযৌক্তিক হলেও তা কাটাবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে ঔদার্য দেখাতে হবে"। "সিলেক্টেড ওয়ার্কস", খণ্ড ৭, পৃঃ ১৯০।

১০

আজকের সাম্প্রদায়িকতাবাদ—সমাধানের উপায়

ভবিষ্যতে কি হবে? সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক ধরণের আন্দোলনও মতাদর্শ এখনো বেশ দৃঢ়ভাবেই আমাদের সঙ্গে রয়েছে। এরকম আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য ভারতীয় সমাজ বাস্তব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি এবং মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ভূমি যুগিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চাশের দশকের শেষদিক থেকে সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক, ভাষাগত ও জাতভিত্তিক দাঙ্গা বারবার দেশকে নাড়া দিয়েছে। উপরন্তু, নির্বাচনী এবং নির্বাচন-বহির্ভূত রাজনৈতিক গণ-জমায়েতের জন্য ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক ও জাতভিত্তিক আবেদনকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

আজ ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতি সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তা সম্ভবত সাম্প্রদায়িকতাবাদই। একদিকে, তা জাতীয় সংহতিনাশক শক্তিগুলির বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করে, যারা ক্রমান্বয়ে ভারতীয় জনগণের ঐক্যের বিরুদ্ধে হুমকি দেয়; আর অন্যদিকে তা চিহ্নিত করে বর্বরতার শক্তিদের বৃদ্ধিকে। উপরন্তু, এ এক সমস্যা, যা গোটা ভারতীয় সমাজেরই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে তার হিংস্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে; কিন্তু তীব্রতা কমবেশী হলেও তা গোটা দেশেই ছড়িয়ে আছে। তার শক্তিশালী উপস্থিতি ১৯৫০-এর দশক থেকে আসাম, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে আছে। কিন্তু কে ভাবতে পেরেছিল যে তা পাঞ্জাবে, গুজরাটে, কাশ্মীরে, হায়দ্রাবাদে ও কেরালায় এমন বড় আকারে দেখা দেবে?

নিঃসহায়তা ও হতাশার ভাবে গা ভাসিয়ে না দিলেও, এবং তাদের প্রতিরোধ করলেও, সাম্প্রদায়িক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে গোড়ার কথা হতে হবে এই চেতনা যে বেরোবার পথ এক দীর্ঘ যাত্রা। বহু দশক, বহু প্রজন্ম ধরে যে

ঐতিহাসিক সমস্যা সৃষ্ট হয়েছে তার কোনো স্বল্পমেয়াদী বা তাৎক্ষণিক সমাধান থাকে না। সেরকম সমাধান—সন্ধি, আপসরফা ও সঙ্গতিসূচক চুক্তি—অনেক সময়ে সমস্যাটা আরো জটিল করে তোলে। ভারতীয় সমাজের সাম্প্রদায়িকরণ এক দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়া, যা চলেছে ১০০ বছরেরও অধিক সময়কাল জুড়ে। তাই নিঃসাম্প্রদায়িকরণকেও একটি প্রক্রিয়া হতে হবে।[১] সাম্প্রদায়িক চ্যালেঞ্জের প্রকৃত উত্তর নিহিত রয়েছে ঐ দীর্ঘ পথযাত্রার প্রক্রিয়াকে সূচিত করা ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে।

সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে অতীতে আমাদের যা ভুলত্রুটি হয়ে থাকুক না কেন—এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূলোৎপাটন করতে ব্যর্থ হওয়ার মূল্য দিতে হয়েছে ১৯৪৭-এ দেশভাগের মধ্যে দিয়ে—ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা যে অন্তর্দৃষ্টি পাই তাকে ব্যবহার করতে হবে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক ধরণের আন্দোলন ও মতাদর্শগুলিকে আরো চুলচেরা ও বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে ও মোকাবিলা করতে।

অবশ্যই, ঔপনিবেশিক যুগের সাম্প্রদায়িকতার অধ্যয়নকে যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করে তার বিশ্লেষণ বা সমাধানগুলিকে উপনিবেশোত্তর ভারতের ক্ষেত্রে সরাসরি চাপিয়ে দেওয়া যায় না, কারণ ১৯৪৭-এর পর সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে।

এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রাষ্ট্রের ভূমিকার পবিবর্তন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যেখানে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির এক বড় সমর্থক ছিল, স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র এখনো পর্যন্ত মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী। অনুরূপভাবে, শাসক রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস এবং অধিকাংশ প্রধান সর্বভারতীয় বিরোধী দলগুলি—কমিউনিস্টরা, সমাজতন্ত্রীরা, স্বতন্ত্র, কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীগুলি, জনতা এবং লোকদল, অর্থাৎ আর. এস. এস., বি. জে. পি. (জনসংঘ) এবং মুসলিম লীগ ছাড়া সকলেই—ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রের এবং বেশীরভাগ রাজনৈতিক দলের ধর্মনিরপেক্ষতার গুণগত মানে অনেক দুর্বলতা থেকে গেছে। বস্তুত, খুব কম সময়েই তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা বলিষ্ঠ হতে পেরেছে।

উপরন্তু, সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে পড়েছে। অনেক সরকারী পদস্থ কর্মচারী ও মধ্যস্তরের নেতা প্রকাশ্যে বা গোপনে সাম্প্রদায়িক শক্তিদের সঙ্গে আপোষ করেছেন বা এমনকি তাদের সমর্থন করেছেন এবং কখনো কখনো নিজেরাই সাম্প্রদায়িক কাজ করেছেন। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি, অথবা রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষত শাসক কংগ্রেস দল, কেউই সাম্প্রদায়িকতাকে বৈজ্ঞানিকভাবে, বা উৎসাহ ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে, মোকাবিলা করে নি। তারা সুবিধাবাদীভাবে সাম্প্রদায়িক দল ও ব্যক্তিদের সঙ্গে সমঝোতা

বা এমন কি ঐক্য প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত করেছে ; যেমন কেরালায় মুসলিম লীগের সঙ্গে এবং পাঞ্জাবে আকালীদের সঙ্গে। অনুরূপভাবে, একাধিক ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী ও দল আর এস. এস-জনসংঘের সঙ্গে ১৯৬৭-৬৯-এ এবং আবার ১৯৭৭-৮০-তে হাত মেলাতে দ্বিধা করেনি।[২] কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে তারা নিজেরা সাম্প্রদায়িক হয়ে যায় নি। এটা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের একটা বড় প্রতিবন্ধক হয়েছে, তার দ্রুত বিকাশকে বাধা দিয়েছে, এবং তার জন্যই ভারত মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে পেরেছে। কিন্তু তা সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশকে, বিশেষত তার নোংরা, বর্বর রূপ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে, আটকাতে পারে নি।

১৯৪৭-এর পর সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক ও শ্রেণীগত চরিত্র এবং ভিত্তিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। ঔপনিবেশিক যুগে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রধানত জাগীরদারী শ্রেণী ও স্তরগুলির, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের, পেটি বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশের এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতিনিধিত্ব করত। সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ঔপনিবেশিকতার ভূমিকা এতদিনে কার্যত মুছে গেছে। জাগীরদারী শ্রেণী ও স্তরগুলি ভেঙে ধনবাদী কৃষক ও ধনী কৃষকদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, যারা পাঞ্জাবে শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদের শক্ত ভিত্তি যোগায়, এবং দেশের অন্যান্য অংশেও সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থন করার দিকে ঝোঁকে, যাতে তারা একই জাত বা ধর্মের দরিদ্র কৃষকদের উপর প্রভুত্ব রাখতে পারে। মহাজন ও ব্যবসায়ীরা এখনো সারা ভারতে সাম্প্রদায়িকতার এক প্রধান সামাজিক ভিত্তি। পাকিস্তানের জন্ম এবং গত ৩০ বছরে জমিদারী প্রথার ধীরে ধীরে অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ এখন খুব কম ক্ষেত্রেই, একমাত্র পাঞ্জাবে ছাড়া, শ্রেণী সংগ্রামের একটি বিকৃত রূপকে প্রতিফলিত করে। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে কৃষি-মজুর এবং ধনী কৃষক-ধনবাদী কৃষক ও ভূস্বামীদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের জাতভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক রূপ নেওয়ার দিকে ঝোঁক রয়েছে। এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য আজ পাঞ্জাবে। অনুরূপভাবে, যদিও আবার ধন-বাদী স্তর ও গোষ্ঠীগুলির লড়াই কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক রূপ নিতে শুরু করেছে, তবু এখনো তার প্রধান রূপ হল আঞ্চলিকতা। শহুরে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীর লড়াই কখনো কখনো জাতভিত্তিক রূপ নেয়, যদিও তার প্রধান রূপ হল কৃষকবাদী মতাদর্শ। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা এখনো সাধারণ-ভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদবিরোধী বা অন্তত সাম্প্রদায়িকতাবাদের পক্ষে নয়, যদিও সাম্প্রদায়িক শক্তি একবার তীব্র স্তরে উপনীত হলে তারা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম নয়, যা আবারো দেখা যায় পাঞ্জাবের উদাহরণ থেকে।

অন্যভাবে বললে, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী ছাড়া যাদের দল নতুন করে পুষ্ট হচ্ছে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর সন্তানদের দ্বারা, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ১৯৪৭-এর পর অন্য কোনো প্রধান সামাজিক শ্রেণী বা স্তরের উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিশেষত, এটা বলা যায় না যে অদূর ভবিষ্যতে তা ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে তেমন জোরদার সামাজিক সমর্থন পাবে, যা সে পেয়েছিল জাগীরদারী বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী বা স্তরগুলিব বা ঔপনিবেশিকতাবাদীদের কাছ থেকে। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এখনো মনে করে, যেমন সে ১৯৪৭-এর আগে মনে করতো, যে তার জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজন আছে, এবং সাম্প্রদায়িকতা (ও জাতিভেদ) ধনবাদী পথে ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের বিরুদ্ধে কাজ করে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং জাতিভেদ, দুইয়ের বিস্তারেই তার ভূমিকা নগণ্য, এবং কিছু সামাজিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ও ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং, এমন কোনো বিশ্লেষণ বা সাম্প্রদায়িকতাবাদ (বা জাতিভেদ) বিরোধী রণনীতি, যার ভিত্তি হল তাকে বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শ-গত হাতিয়ার হিসাবে দেখা, তা ভুল, এবং তার ফলে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবার, একথাও বলা যায় না যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি বুর্জোয়াশ্রেণীর এই দৃষ্টিভঙ্গিই চিরকাল থাকবে। জাপান থেকে জার্মানী পর্যন্ত বিশ্ব-ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দেখায় যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের এবং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার বা উচ্ছেদের হুমকীর সম্মুখীন বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বিতীয় বা শেষ প্রতিরক্ষাব্যূহ হয়ে ওঠার প্রবণতা থাকে সাম্প্রদায়িক ধরণের ফ্যাসীবাদী মতাদর্শের। যে কোনো দীর্ঘমেয়াদী নীতিকেই তাই সেই সম্ভাবনা মাথায় রাখতে হবে। অন্যভাবে বললে, ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে মদত দিচ্ছে, অথবা ভবিষ্যতে সে কখনোই তা করবে না, এর কোনোটাই জোর দিয়ে বলা যায় না।

[দুই]

স্বাধীন ভারতেব রাষ্ট্রনীতি মৌলিকভাবে সাম্প্রদায়িকতাপন্থী না হলেও, সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিন্যাস সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রসারের জন্য উপযোগী জমি তৈরী করে চলেছে। প্রথম অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করলে বলতে হয়, সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি নির্দিষ্ট সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির নির্দিষ্ট অবস্থার ফসল, যা ঐ সমাজের জনগণের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে—যে সমস্যার কারণ জনগণ সহজে বুঝতে পারেন না। অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদ হয় জনগণ কর্তৃক তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা, যেখানে তাঁরা সঠিকভাবে ধরতে পারেন নি, অবস্থাটা কি, এবং কেন সেরকম। অনেক সময়েই, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হল এমন সব ব্যক্তি, যারা তাদের চার-পাশের জগতটাকে বুঝতে পারে না এবং যারা হতাশাগ্রস্ত। অবশ্যই, সাম্প্রদায়ি-কতাবাদ সামাজিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণও নয়, সঠিক সমাধানও নয়।

একই সময়ে, তার পিছনে একটা সামাজিক পরিস্থিতি রয়েছে, যা তাকে একটি দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যাকে ছাড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদ দীর্ঘকালের জন্য বেঁচে থাকতে পারত না। আর, যদি না ঐ সামাজিক পরিস্থিতিকে শুধরে নেওয়া হয় বা তার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাকে ঠিকভাবে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়, তবে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের মত মতাদর্শের উত্থান ও বৃদ্ধি হতেই থাকবে। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে বেরোবার পথের স্থায়ী দিশা রয়েছে সামাজিক পরিস্থিতিকে শুধরে নেওয়ার মধ্যে।

কিন্তু, এ কথা বলার পর, অন্য দুটি কথাও বলা দরকার। প্রথমত, এই সংজ্ঞা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা যায় না, কারণ সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির ফসল হলেও, সেই পরিস্থিতিকে শুধরে নিতে গেলেও আবার সাম্প্রদায়িকতাবাদকে রুখতে ও উচ্ছেদ করতে হবে, নচেৎ ঐ পরিস্থিতির রূপান্তর সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক বিশ্লেষণকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী সক্রিয় সংগ্রাম না করার অজুহাত হিসাবে খাড়া করা ঠিক নয়, যা অনেকেই করে থাকেন। চূড়ান্ত সমাধানের জন্য লড়াই করা আজ, এখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কর্তব্যকে কিছু কমিয়ে দেয় না।

[তিন]

স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের ধনবাদী বিকাশের পথ সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধির জমি তৈরী করেছিল, দুইভাবে। প্রথমত, ধনবাদী অর্থনীতি, জনসংখ্যার এক বিপুল বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অপেক্ষাকৃত কম হারে বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র, বেকারত্ব ও অসাম্যের মত মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে, যে সমস্যাগুলি হতাশার জন্ম দেয় এবং অপ্রতুল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার জন্য অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা গড়ে তোলে। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে অর্থনৈতিক বিকাশের পথ খুলে দেওয়ার জন্য ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক শক্তিকে উৎখাত করা প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট শর্ত ছিল না।

বিশেষত, স্বাধীনতার পর প্রথমদিকে চাকরীর লভ্যতা হঠাৎ বেড়ে গেলেও, ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে নিম্নমধ্যশ্রেণীগুলির মধ্যে বেকারত্ব তীব্র আকার নিতে শুরু করেছিল। স্বাধীনতা ও তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে প্রশাসন যন্ত্রের ব্যাপক প্রসার, সেনাবাহিনীর অফিসার স্তরের ভারতীয়করণ ও সম্প্রসারণ, বিদেশী কোম্পানীর উচ্চপদস্থ স্তরের ভারতীয়করণ, ব্যাঙ্ক, ব্যবসা ও শিল্প কোম্পানীগুলির বিকাশ, স্কুল ও কলেজ শিক্ষার দ্রুত বিকাশ এবং ইঞ্জিনীয়র, ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ ও চাকরী দেওয়ার মাধ্যমে বহু ধরণের সুযোগ মধ্যবিত্তদের

এনে দিয়েছিল। ১৯৪৭-এর পর প্রায় কুড়ি বছর মধ্যশ্রেণীরা শুধু রেহাই পেয়েছিল তাই নয়, এক আনন্দদায়ক শৈথিল্যের মধ্যে ডুবে ছিল। রাজনীতিতে শুধু নেহরু যুগের স্থিতিশীলতাই ছিল না, সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সামাজিক বিভেদকামী শক্তিদের, এবং সমাজ পরিবর্তনের শক্তিদেরও, অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা ছিল। কিন্তু মধ্যশ্রেণীর নতুন সুযোগ অল্পদিনেই শুকিয়ে যেতে শুরু করেছিল। ধনবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের ধারণাটা এমনই ছিল যে কালক্রমে তা কিছুটা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্ম দিলেও শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক চাকরী সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সমাজকল্যাণমূলক ক্ষেত্রের বিস্তারকেও তা সীমিত করেছিল। একই সঙ্গে, শিক্ষাবিস্তার ও জনস্ফীতির ফলে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে হাজার হাজার নতুন যুবসম্প্রদায় চাকরীর সন্ধানরত পেটি বুর্জোয়াদের স্তরে চলে এসেছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে, ষাটের দশক থেকে, ত্রিশের দশকের অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে শুরু হয়েছিল, যার ফলে মধ্যশ্রেণীর ভিতর তীব্র অসন্তোষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। তার উপর, কৃষি-সম্পর্কে পরিবর্তন ধনী ও মধ্য কৃষক এবং ধনবাদী কৃষকদের কয়েকটি নতুন স্তর, অর্থাৎ গ্রামীণ বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের তৈরী করেছিল, যারা সাম্প্রদায়িক ও জাতভিত্তিক মতাদর্শ, আন্দোলন ও দলের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য উর্বর জমি যুগিয়েছিল। এই তরুণদের, বিশেষত তাদের শিক্ষিত অংশের মধ্যে আশা-আকাঙ্খা সঞ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু তা এমনকি আংশিকভাবে মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাও সমাজে বিকশিত হয় নি। গ্রামাঞ্চল ভরে আছে অসংগঠিত শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়, যাদের কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না এবং যারা জানে না, তাদের জীবন নিয়ে তারা আর কি করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কৃষি ও শিল্পে ধনবাদী বিকাশ কতকগুলি স্তরের ক্ষেত্রে ও কতকগুলি অঞ্চলে উচ্চতর আয়, এমন কি স্বচ্ছলতার জন্ম দিয়েছিল এবং নতুন সামাজিক গোষ্ঠীদের সামনের সারিতে এনেছিল। এই বিকাশের সঙ্গে এসেছিল নতুন সামাজিক টানাপোড়েন, ও নতুন সামাজিক দুশ্চিন্তা। এর ফলে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব, ক্রমবর্ধমান উচ্চাশা, আয়ের অসম বণ্টন এবং ধারালো ও দৃশ্যমান অসাম্য জন্ম নিয়েছে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করছে ও নতুন করে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জনপ্রিয়তার রাজনীতির সম্প্রসারণ হতে পারে এমন জমি তৈরী করছে। উপরন্তু, নতুন গোষ্ঠীদের যেমন সামাজিক শক্তি বাড়ে, তেমন অন্যদের ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস পায় ও তারা ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদের আবেদনের প্রতি মনোযোগ দেয়। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশমূলক ও বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী, যথা নিবিড় গ্রামীণ উন্নয়ন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, চাকরী নিশ্চয়তা পরিকল্পনা, দরিদ্রদের জন্য বার্ধক্য ভাতা, এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিতদের জন্য চাকরীর সংরক্ষণ, যারা গ্রামাঞ্চলে প্রভাবশালী, বা অন্তত নিজেদের মনে করত, তাদের মধ্যে

ক্ষোভ সৃষ্টি করে। উভয় সামাজিক স্তরই জাতপাতের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের খপ্পরে পড়ার প্রবণতা দেখায়।

তবে সমস্যাটা নেহাত অর্থনৈতিক স্তরে নেই, যেন মানুষ অস্তিত্বের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া মেটানোর জন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদের দিকে ফেরে। সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরম্পরাগত সামাজিক প্রতিষ্ঠানদের, যথা জাত, যৌথ পরিবার, এবং গ্রামীণ ও মহল্লা ভিত্তিক সম্প্রদায়, ভাঙন। এদের একটি ইতিবাচক দিক ছিল, যা হল পরিচিতির বোধ ও সহায়তার ব্যবস্থা করা। অন্যদিকে, শ্রেণী, রাজনৈতিক (পার্টিগত) ও জাতীয় সংহতি তাদের স্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই অনেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদের দিকে ফেরে, তাকে আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখে, ঐক্য ও সংহতির জন্য এক বিকল্প কেন্দ্র মনে করে। যে সব ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জনগণের সার্বভৌমিকতার পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের দ্রুত ও সহজ পথ খোঁজে তা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে হোক আর জনবাদী স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হোক—তাদের কাছে এক বাড়তি আকর্ষণ হল সাম্প্রদায়িক অনুভূতি ও আবেগকে জাগ্রত করা। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকটের সময়ে এই সম্ভাবনা বড় হয়ে দেখা দেয়।

ফলে, ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিক থেকে আরেকবার সাম্প্রদায়িকতাবাদ জাতিবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদের বিভেদপন্থী শক্তিগুলি ভারতীয় সমাজে গতিশীল হয়ে উঠেছে এবং তাদের জালের মধ্যে টেনে আনছে ভারতীয় সমাজের নিত্য নতুন অংশকে।

[চার]

সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সফলভাবে বিরোধিতা করার জন্য, আগেকার মতই, তার বিকাশের অনুকূল সামাজিক অবস্থাকে উচ্ছেদ করা দরকার, অর্থাৎ, সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তার সামাজিক শিকড়গুলিকে উৎপাটন করা দরকার। যেহেতু ধনবাদ আর জাতীয় ঐক্যের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে না, এই ঐক্য বজায় রাখা ও সুদৃঢ় করা যায় কেবল সমাজবাদী পরিবর্তন ঘটানোর জন্য লড়াই কবা এবং তা সাধন করার মাধ্যমে। ভারতীয় জনগণকে বুঝতে হবে যে সমাজের আমূল পরিবর্তন ছাড়া ভারত হয়তো এমনকি একটি জাতিরাষ্ট্ররূপেই টিকে থাকতে পারবে না, এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক ধরণের আন্দোলন হয়তো তার ঐক্যকে ধ্বংস করতে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্ত প্রচেষ্টাকে রোধ করতে সমর্থ হবে।

উপরন্তু, সাম্প্রদায়িকতাবাদ সাহায্যপুষ্ট হয়েছে মুনাফা করার প্রবণতার বল্গাহীন দাপটের ফলে মূল্যবোধ ও আদর্শের অবক্ষয় ও এমনকি ভাঙনের মাধ্যমে।

এর ফলে একধরণের নৈতিক শূন্যতা গড়ে উঠছে। বহু দশক ধরে, আদর্শবাদের প্রাধান্যের জন্য কাঠামো ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিল স্বাধীনতার ও সামাজিক সংস্কারের জন্য সংগ্রাম। ১৯৪৭-এর পর জনগণের দরকার ছিল একটি নতুন ঐক্যবদ্ধকারী, অনৈক্য-বিরোধী লক্ষ্য বা স্বপ্ন, যা ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগাতে পারতো, নতুন করে সুস্থ জাতীয় চেতনার আলো জ্বালাতে পারতো, এবং এক সাধারণ দেশ-জোড়া কর্মকাণ্ডে তাদের উৎসাহিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে পারতো যা জাতিগঠনের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেত। এই কর্মকাণ্ড কেবল হতে পারে এক গণতান্ত্রিক, নাগরিক অধিকারে স্বীকৃতিদানকারী, সমতাভিত্তিক, সামাজিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, জাতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ এবং অর্থনৈতিকভাবে বিকাশমান সমাজ—অর্থাৎ একটি সমাজবাদী সমাজ।

বিশেষত সংখ্যালঘুরা পূর্ণ মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে নির্ভয়ে বাঁচতে ও সমৃদ্ধ হতে পারে শুধুমাত্র এমন সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে তারা সমাজের ব্যর্থতার জন্য চিরকাল দায়ি হয়ে থাকবে না। আবিদ হুসেন, যিনি কোনো চরম বিপ্লবী নন, যেভাবে বলেছেন, "মুসলিমরা যখন 'সন্দেহের উপত্যকা' থেকে বেরিয়ে আসবে এবং স্বচ্ছভাবে ভাবতে পারবে, তারা এক সমাজবাদী সমাজের সাধারণ ধারণার উষ্ণ সমর্থক হবে এবং সেই আন্দোলনকে সঠিক পথ দেখানো এবং সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কার্যকর শক্তি হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করবে।"[৩]

তবে এখানে একটা 'কিন্তু' ঢোকানো যেতে পারে। সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক বিশ্লেষণ করার সময়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কঠোর গবেষণা ও বিশ্লেষণ-ভিত্তিক হতে হবে। তাকে হতে হবে এক গভীর ও জটিল তথ্যগত, বিশ্লেষণধর্মী ও তত্ত্বগত প্রয়াস। অর্থনীতি ও রাজনীতি, সংস্কৃতি, সামাজিক স্তর ও শ্রেণী, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি, রাষ্ট্র ও বিভিন্ন ধর্ম ভারতে সামগ্রিকভাবে ও তার বিভিন্ন অঞ্চলে কীভাবে কাজ করে তাদের সমস্ত জটিলতা মাথায় রেখেই দেখতে হবে। সহজ সাধারণীকরণ বা 'জটিল সমস্যা সমাধানের সরল প্রচেষ্টার' পথে যেন আমরা পা না বাড়াই। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে এরকম গভীর ও জটিল অধ্যয়ন না করার ও সহজ ফর্মুলার উপর নির্ভর করার মাশুল দিতে হয়েছিল ১৯৪৭-এ ভারত বিভাগে।

[পাঁচ]

আমরা বহুবার দেখেছি যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল একটি দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা যার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও চিন্তার ক্ষেত্রে তীব্র ও কঠোর সংগ্রাম প্রয়োজন। তার কারণ সাম্প্রদায়িকতাবাদ মূলতঃ এবং সবার উপরে একটি মতাদর্শ, ও সেই

মতাদর্শভিত্তিক রাজনীতি, তা প্রধানত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা ও তার নবতম রূপ, সন্ত্রাসবাদ, নয়। দুটির মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে, কিন্তু পরবর্তী দিকটি প্রধানত প্রথমোক্তটির সাময়িক ফলশ্রুতি ; তারা হল সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ও ফসল। হিংস্রতা ছাড়াও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ থাকতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ছাড়া সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা থাকতে পারে না। কোনো ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা, দাঙ্গা ও সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা ও তার নিন্দা করেও সাম্প্রদায়িকতাবাদে বিশ্বাসী হতে, এমন কি তার প্রচারক হতে পারে।

বিরোধী সংগ্রামের তিন প্রধান নায়কের অন্যতম করে নিয়েছিল, যেখানে বাকি দুজন ছিলেন শিবাজী ও রাণা প্রতাপ।

ফলে, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত, হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এমন কি শিখ বিরোধী ও হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশ ঘটানোর সময়ও, পরস্পরের বিরুদ্ধে, বা যথাক্রমে শিখ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার এড়াতে চেষ্টা করত। আকালীরা হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করে নি, কারণ তা বিংশ শতাব্দীতে বিকশিত তাদের সমগ্র সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ এবং ইতিহাস ও অতীতে শিখদের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাদের বিশেষ কাল্পনিক ব্যাখ্যার সমগ্র ধারার বিরুদ্ধে চলে যাবে। এমন কি পরবর্তী কালে আকালী তাত্ত্বিকরা যেমন জি.এস. তোহরা ও সন্ত লঙ্গোয়াল তাঁদের উগ্র পর্যায়ে এই ধারণা প্রচার করেন যে শিখদের চূর্ণ করে ও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে এবং শিখ ধর্ম মুছে যাওয়ার বিপদের সম্মুখীন, তখনও তাঁরা অপরাধী বলে অঙ্গুলী হেলন করেছিলেন 'কেন্দ্রের' (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের) প্রতি, হিন্দুদের দিকে নয়; যদিও এই ছদ্মবেশটা ছিল বড়ই হাল্কা। একইভাবে, আর.এস.এস. ও জনসংঘ (তার বিভিন্ন অবস্থানে) শিখদের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করা অত্যন্ত কঠিন, এমনকি অপ্রীতিকর বলে দেখেছিল, কারণ তাদের সাম্প্রদায়িক কল্প-ইতিহাসের অঙ্গ হল এই বিশ্বাস যে শিখরা হিন্দুদের একটি অংশ, এবং বস্তুত, শিখরা মুসলিম আক্রমণের হাত থেকে হিন্দুদের ও হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় রক্ষক। ফলে তারা মুসলিম ও খ্রীশ্চানদের বিরুদ্ধে যেমন সহজে ঘৃণার উদ্রেক ও প্রচার করছিল, শিখদের বিরুদ্ধে সেটা তেমন সহজ ছিল না।

কিন্তু যে কথাটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলি যথাক্রমে শিখ ও হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার ও প্রসার না করার চেষ্টা সত্ত্বেও, এবং পাঞ্জাবে তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদের স্তরে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত ঘৃণা ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদ্ভব হল, কারণ সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ—স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের মতাদর্শ—তার নিজের গতিতে চলে। একবার সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ গ্রহণ ও প্রচার করলে তার ফলাফল নিজের হাতে থাকে না। আর পাঞ্জাবই তার একটিমাত্র নজির নয়। আমরা আগেই দেখেছি কীভাবে জিন্না, যিনি ছিলেন তারুণ্যে 'হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দূত' এবং মধ্য বয়সে সংস্কৃতিবান ও সভ্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী, তিনি ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে এ কথা বুঝতে পারেন ও এই গতির পথে শেষ পর্যন্ত যেতে মনস্থ করেন, যেমন করেন ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় একদা জাতীয়তাবাদী ভি ডি. সাভারকর এবং উদারপন্থী শ্যামাপদ মুখার্জী। সন্ত লঙ্গোয়াল ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত গোটা পথটাই এইভাবেই গিয়েছিলেন; আর যখন তিনি পিছু হঠার চেষ্টা করেন, তখন তাঁকে প্রাণ দিয়ে তার মাশুল দিতে হয়।

পাঞ্জাবে আর.এস.এস.-এর মতাদর্শগত ইতস্ততভাবের ফলে তার জায়গা নিচ্ছে হিন্দু শিব সেনা। একইভাবে শাহাবুদ্দীন, একজন উদারপন্থী ও 'আধুনিক' ভূতপূর্ব আই.এফ.এস. অফিসার ও বর্তমানে অসাম্প্রদায়িক জনতা পার্টির সদস্য, দ্রুত পরিণত হচ্ছেন উগ্র মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের এক নতুন জোয়ারের তাত্ত্বিক রূপে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের যুক্তি এবং সাম্প্রদায়িকরণের ফলেই সাধারণ মানুষ ১৯৮৪-র নভেম্বরের গোড়ার ভয়াবহতা ঘটিয়েছিল। পাঞ্জাবে দুই সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোষ্ঠী নিজেদের বিকাশকে 'ঘৃণার স্তরে' পৌঁছোনো থেকে থামাতে পারে নি। অন্যভাবে বলা যায়, সাম্প্রদায়িকতাবাদের গতি শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার রূপ নেওয়া বিভিন্ন ধরণের তাৎক্ষণিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল হলেও, এই চূড়ান্ত বিকাশের জমি তৈরী হয় সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও রাজনীতির বিন্যাসের ঘটমান ও দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পূর্ববর্তী এই সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখাই। আমরা সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে সচেতন হই কেবল দাঙ্গা হলে। কিন্তু একেবার যদি এ কথা স্বীকার করা হয় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সর্বাগ্রে একটি মতাদর্শ, তা হলে সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে হবে ঐ মতাদর্শ-বিরোধী সংগ্রামের স্তরে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে বেরোবার পথ মানে সর্বস্তরে জনগণকে নিঃসাম্প্রদায়িকরণ করা। বিগত ১০০ বছরের বেশী সময় ধরে আমাদের জনগণের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ঢোকানো হয়েছে, তার শিকড় নিঃশেষ না করে সফলভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধিতা করা যায় না। সাম্প্রদায়িকতাবাদও ঐ ধরণের অনুরূপ মতাদর্শ বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন মাত্রার তীব্রতায় জনগণের মধ্যে প্রবেশ করেছে, যদিও অনেক সময়ে সচেতন স্তরের নীচে। তা এতটাই হয়েছে যে তার বহু উপাদান ধর্মনিরপেক্ষতা মনোভাবাপন্ন মানুষের মধ্যেও একরকম ন্যায্যতা অর্জন করেছে। তাঁদের অনেকেই নিজেদের চিন্তায় অনেকটা সাম্প্রদায়িক উপাদান ধারণ করেন। কোনো শ্রেণী বা সামাজিক স্তর বা গোষ্ঠীই সাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রদায়িক ধাঁচের মতাদর্শের আওতার বাইরে নেই। আর, নিছক সামাজিক রূপান্তরের সংগ্রাম যান্ত্রিকভাবে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বিলুপ্তি ঘটাবে না বা তার নিশ্চয়তা দেবে না, যা বোঝা যায় জাতীয়তাবাদী, কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য গণ আন্দোলনের অংশীদারদের মধ্যে তার বিভিন্ন উপাদান রয়ে যাওয়া থেকে। সেজন্য দরকার সচেতন ও সর্বাত্মকভাবে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা।

১৯৪৭-এর আগে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম জাতীয় ঐক্যের স্বপক্ষে একটি জোরদার শক্তি ছিল। অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও তা হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদ সহ বেশীরভাগ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও বিভেদপন্থী শক্তিদের ঠেকিয়ে রেখেছিল।

এর মাধ্যমে ১৯৪৭-এর পর ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতীয় জনগণ ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শকে আমাদের সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে, অন্ধকারের ভাবধারাগুলিকে নির্মূল করা না গেলেও আটকে রাখা গিয়েছিল, কারণ জাতীয় আন্দোলনের ঝোঁক ছিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক, মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী ভাবধারার দিকে।

দুর্ভাগ্যবশত, জাতীয় আন্দোলন ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারাকে যে উত্তম যুগিয়েছিল তা ধীরে ধীরে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে ১৯৪৭-এর পর শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে আর পূরণ করা যায় নি। তার উপর, পঞ্চাশের দশকের আনন্দদায়ক শৈথিল্যের মধ্যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে উপেক্ষা করার একটা সাধারণ ঝোঁক ছিল। সরকারী আশা ছিল যে অর্থনৈতিক বিকাশ, শিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিস্তার, এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ইস্পাত কারখানা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের মত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নতুন নতুন 'মন্দির' গড়ে তোলার মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িকতাবাদ (ও জাতিবৈষম্য) আপনা থেকেই দুর্বল হয়ে পড়বে ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, বামপন্থী শক্তিরা আশা করেছিল যে গণ-আন্দোলন এবং শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী-সংগঠন ও বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তার প্রসার আপনা-আপনি সাম্প্রদায়িক (ও জাতভিত্তিক) শক্তিদের দুর্বল করে দেবে। এইভাবে, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের (ও জাতিভেদ প্রথার) বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ মতাদর্শগত সংগ্রামকে উপেক্ষা করার একটা সাধারণ ঝোঁক ছিল। নেহরুর, সমাজতন্ত্রীদের ও কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি ছিল। এমন কি গান্ধীর নেতৃত্বে সংগঠিত অতীত আন্দোলনগুলির মত জাতভিত্তিক নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে কোনো দেশজোড়া বড় আকারের আন্দোলন বা প্রচার অভিযানও স্বাধীন ভারতে গড়ে ওঠে নি। ফলতঃ, ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ের প্রভাব নিরূপণ করার, ধর্মীয়তা, অলৌকিকতা, ও পরিবর্ত 'সাম্প্রদায়িক' জাতীয়তাবাদ ছড়ানো থেকে ফিল্ম, রেডিও ও টেলিভিশনকে বিরত রাখার, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বহু অংশের গভীরে ঢুকে-যাওয়া হিন্দুত্বের সংশ্লেষ মুছে ফেলার, এবং সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা সামান্যই করা হয়েছে।

অতএব, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জাতিবাদ, ভাষাভিত্তি, এবং আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী মতাদর্শগত আন্দোলনের বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা আগের মতই জরুরী থেকে গেছে। একথাও মনে রাখা জরুরী যে এদের নিন্দা করা, বা এসব যে অন্যায় তা দেখানো যথেষ্ট নয়। আজ অধিকাংশ ব্যক্তিই, অন্তত বিমূর্তভাবে স্বীকার করে নেবেন যে এসব অন্যায়। যা প্রয়োজন, তা হল তাদের ব্যাখ্যা করা ও তারা বাস্তবে কি তা উদ্ঘাটন করা, যে বিভিন্ন উপাদানগুলি তাদের মতাদর্শ করে তোলে সেগুলিকে বার করা, তাদের সামাজিক-

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎস বোঝানো, এবং তাদের সফলভাবে বিরোধিতা ও নির্মূল করার পথ দেখানো।

সাম্প্রদায়িকতাবাদকে একটি মতাদর্শ হিসাবে দেখলে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। সাম্প্রদায়িকতাবাদকে বলপ্রয়োগ করে পরাভূত করা যায় না, কারণ কোনো মতাদর্শকে বলপ্রয়োগ করে বা প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে দমন করা যায় না। সাম্প্রদায়িক হিংস্রতাকে দমন করতে পারে কেবল রাষ্ট্র, এবং তাকে তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে দুর্বল করা ও নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব কেবল রাষ্ট্রের নয়, বরং অধিকতর পরিমাণে বুদ্ধিজীবীদের, রাজনৈতিক দলগুলির, প্রচার মাধ্যমগুলির, স্বেচ্ছাসেবক গোষ্ঠীদের, ট্রেড ইউনিয়নদের, কিষাণ সভাদের, প্রভৃতির দায়িত্ব। রাষ্ট্র তার অংশীদার হতে পারে তার করা ও না করা কাজের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে উৎসাহদান না করে, এবং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তার প্রচার মাধ্যম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে।

মতাদর্শগত স্তরে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে কোনোরকম রফা হতে পারে না। নেহরু যেমন ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে লিখেছিলেন[৫] : "যেখানে তার নিজের নাগরিকরা জড়িত, সেখানে কোনো সরকারই সম্পূর্ণ আপসহীন হতে পারে না। সে চেষ্টা করে, বা তার চেষ্টা করা উচিত, যত বেশী সম্ভব মানুষকে নিজের দলে টেনে নিতে। তবু, যা নিশ্চিতভাবে অন্যায়, তার সঙ্গে আপোষ করা সবসময়েই বিপজ্জনক।" যে উদাহরণ অনুকরণীয়, তা হল ভগৎ সিংয়ের উদাহরণ। তিনি লালা লাজপত রাইকে শ্রদ্ধা করলেও, এবং তাঁর মৃত্যুকে জীবন দিয়ে শোধ করলেও, লাজপত রাই যখন ১৯২২-এর পর থেকে সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা প্রচার আরম্ভ করেন, তখন ভগৎ সিং তাঁকে কঠোরভাবে সমালোচনা ও নিন্দা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

এই কথা জোর দিয়ে বলা দরকার, কারণ এই শতাব্দীর গোড়া থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা হল যে যখনই সাম্প্রদায়িকতাবাদ নতুন করে মাথা তোলে তখনই বহু রাজনৈতিক দল ও নেতা ও বুদ্ধিজীবী তার ধাক্কায় কেঁপে ওঠেন এবং কোনো না কোনো ভাবে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের সঙ্গে আপোষ করতে বা তা করার প্রস্তাব করতে থাকেন, এবং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের অন্তর্নিহিত বাক্‌রীতি, ধারণা ও বক্তব্য গ্রহণ করার, বা অন্তত তার সমালোচনা করতে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখান। সাম্প্রতিককালে এই রকম আমরা দেখতে ১৯৬৭-তে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জনসংঘ প্রসঙ্গে আচরণ এবং ১৯৮১-র পর শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও আকালীদের সম্পর্কে আচরণ। একইভাবে, গত তিন চার বছরে বহু ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি এমন সব বক্তব্য ও ধারণা গ্রহণ করেছেন—অনেক সময়ে অচেতনভাবে—যা ১৯২০-র দশকের প্রথম দিক থেকেই সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের

ক্ষেত্রে মৌলিক ছিল। যেমন, হিন্দু, মুসলিম বা শিখ নেতৃবর্গ, হিন্দু, মুসলিম বা শিখ পরিচিতি, হিন্দু, মুসলিম বা শিখ ইতিহাস, সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, ইত্যাদি বিষয়ে আবার অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। ১৯৮৪-র গোড়ায় ভারতের ১৫০ জনেরও বেশী অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী সরকার ও জনগণের কাছে আবেদন করেন যে শিখ সম্প্রদায়ের নিজের ইতিহাসের জন্য গর্ব, তার "সমতার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্তির আকাঙ্খা" এবং পাঞ্জাবে উভয় সম্প্রদায়ের অর্থাৎ শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টনের মত সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ধারণাগুলিকে স্বীকার করা হোক। এইগুলিই হল ১৮৮০-র দশক থেকে ভারতে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের ভিত্তি। অনুরূপভাবে, ১৯৮২-র পর অদ্ভুত দাবী করা হয়েছিল, যেন ধর্মনিরপেক্ষ দল ও শক্তিগুলি "শিখদের বিভক্ত করতে" কোনো চেষ্টা না করে, তা ছিল ১৯৪৭-এর আগে এবং পরেও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী, উভয়েরই সাধারণ ধারণা, যে সম্প্রদায়দের বিভক্ত করা উচিত নয়। বস্তুত, তা ছিল সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের অন্যতম মৌলিক দিক। ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম মৌলিক চরিত্রই হল সম্প্রদায়দের বিভক্ত করা ও জনগণকে জাতীয়, ভাষাগত, শ্রেণীভিত্তিক, ইত্যাদি ভাবে, অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়, কর্মসূচী ও মতাদর্শের পথে ও তার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করা।

আমরা একথাও অনেক শুনেছি যে "শিখদের নিজস্ব পরিচিতি থাকা ও তা গড়ে তোলায় কারো আপত্তি করা উচিত নয়", এবং পাঞ্জাবের সমস্যা নাকি "শিখদের নিজস্ব পরিচিতি মেনে নিতে অস্বীকার করা", ইত্যাদি। এটাও একটা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক ধারণা, যদি না নিছক ধর্মীয় পরিচিতির কথা বলা হয়, যা এ পর্যন্ত কেউই শিখদের দিতে অস্বীকার করে নি। এটাও ১৯২০-র দশকের মৌলিক সাম্প্রদায়িকরণ আন্দোলন, হিন্দু সংগঠন ও মুসলিম তাঞ্জীমের মত দেখতে, যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলিম পরিচিতি সৃষ্টি ও সংহত করা।

এ সবই দেখাচ্ছে যে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ বা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের উপাদান আমাদের মনের কত গভীরে ঢুকে গেছে। আমরা যখন দীর্ঘকাল অবলুপ্ত বলে মনে করা ধারণা, প্রতীক ও চিন্তা নিয়ে ভাবনা করি; যদিও আমরা বহু বছর ও দশক ধরে তাদের বিরুদ্ধে লড়ছি, তবু যখন তারা আমাদের মনে আসে; যখন আমরা পরিস্থিতির চাপে হঠাৎ একটি বিবৃতির খসড়া লিখি এবং দেখি যে এই ধারণা ও উপাদানগুলি বেরিয়ে আসছে, ও তার তাৎপর্যকে এড়িয়ে যাই; তখন বোঝা যায় যে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের কেবল অস্থি নয়, তার মজ্জা পর্যন্ত যাওয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ।

এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে গবেষণা, শিক্ষা ও জনপ্রিয় স্তরে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচার করতে হবে, কারণ সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ, বিশেষত হিন্দীতে, দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের এক বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির উপর, যা জনগণের

মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় শৈশব থেকেই, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম মারফৎ, এবং পরিবার, স্কুল ও মহল্লায় সামাজিকরণের মারফৎ। আরেকটি যে ক্ষেত্রে বড় উদ্যোগ আবশ্যক তা হল এই ভ্রান্ত ধারণা, যে হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও খ্রীশ্চানরা ভারতে সুবিন্যস্ত ও সমরূপ সম্প্রদায়, বা বস্তুত কোনো রকম সম্প্রদায় রূপে সংগঠিত।

সাম্প্রদায়িক মতাদর্শগত প্রভাব উচ্ছেদের জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে সব রকম মানুষের মধ্যে; এবং কেবল সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্নদের মধ্যে নয়, বরং যারা নিজেরা ধর্মনিরপেক্ষ ও যারা ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে সমর্থন করে তাদেরও মধ্যে। সংকটের যুগে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ফুলে ফেঁপে ওঠে কারণ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরা তার কবলে পড়ে বলেই। তার কারণ, মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের চিন্তার মধ্যেও সাম্প্রদায়িক উপাদান থেকে যায়। এই বিষয়টি আরো বিস্তৃতভাবে বলা যায়। মতাদর্শ হিসাবে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ গঠিত অনেকগুলি উপাদানের দ্বারা; তার বহিঃপ্রকাশ হয় ও তা ব্যক্ত হয় ঐরকম এক বা একাধিক উপাদানের সঙ্গে। ফলে, একজন ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেন, অথচ তাঁর চিন্তা ও ব্যক্তিত্বে কিছু সাম্প্রদায়িক উপাদান থাকতে পারে। একটি নির্দিষ্ট মিশ্রণে এরকম কিছু উপাদানের অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে যেতে পারে; কিন্তু সার্বিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক উপাদান থাকতে পারে এবং থাকে, অথচ তা সাম্প্রদায়িকতাবাদ হয়ে উঠতে নাও পারে। সেরকম ব্যক্তিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলে সনাক্ত করা বা তাঁর সঙ্গে সেই হিসাবে ব্যবহার করা ও তাঁকে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দলে ঠেলে দেওয়া ভুল হবে। কিন্তু, যে বিরাট বিপদ থেকে যায়, তা হল যে এই উপাদানগুলিকে সাধারণ সময়ে বিরোধিতা করে উচ্ছেদ করা না হলে সংকটের সময়ে তারা বাড়তে থাকবে ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপুল ব্যাপ্তি ঘটাবে। পাঞ্জাবে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত ও বিশেষত অপরেশন ব্লু স্টারের পর, এবং দিল্লী ও ভারতের অন্যত্র ৩১শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর ১৯৮৪ পর্যন্ত এটাই হয়েছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বা শাহেবানু মামলার রায়ের বিরোধীরা বা বাবরি মসজিদের প্রবক্তারা এই সব উপাদানের উপরই ভরসা করে। লোকমান্য তিলক, খিলাফৎ আন্দোলন বা আদি আকালী আন্দোলন কেউই সাম্প্রদায়িক ছিল না, কিন্তু তারা জনগণের মধ্যে, এমনকি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক উপাদান জাগ্রত করে, যেগুলিকে পরে ব্যবহার করেছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতারা, সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিতে ও তার প্রসার ঘটাতে।

সুতরাং এই সাম্প্রদায়িক উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা ও তাদের বিশ্লেষণ করা, এবং তারা পূর্ণাঙ্গ সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে পরিণত হওয়ার, বা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শগত যুক্তির অঙ্গে পরিণত হওয়ার আগেই তাদের বিরোধিতা করা আব-

শুরু। এজন্য আবার দরকার সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও তার বহিঃপ্রকাশগুলির গভীর বিশ্লেষণ এবং মতাদর্শগত কাজের দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী।

আরেকটি অনুগামী সিদ্ধান্ত যা বেরিয়ে আসে তা হল: সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ ও তাদের সাম্প্রদায়িক অনুগামীদের মধ্যে পৃথকীকরণ করার প্রয়োজন রয়েছে। পরে উল্লিখিতদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা হেনস্থা করা উচিত নয়। তাদের দুষ্কৃতকারী হিসাবে না দেখে ভুক্তভোগীরূপে দেখতে হবে, যারা সাম্প্রদায়িকতাবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং যাদের সামাজিক অবস্থা তাদের সেদিকে ঠেলে দিয়েছে। তাদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও পূর্বধারণা কাটিয়ে উঠতে বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য করতে হবে। এটা বিশেষভাবে সত্য সাম্প্রদায়িকতাবাদের পেটি বুর্জোয়া সামাজিক ভিত্তির ক্ষেত্রে, যা, ভারতের বিশেষ সামাজিক বিকাশের দরুণ, বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের একটা বড় অংশের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িকতাবাদের তাত্ত্বিক ও নেতারা সাম্প্রদায়িক জীবাণুর জন্মদাতা ও তার ছোঁয়াচ বহনকারী, এবং তাদের দেখতে ও চিহ্নিত করতে হবে সমাজের শত্রু হিসাবে এবং তাদের কোনোরকম ছাড় দেওয়া চলবে না। আমরা কিন্তু উল্টোটাই করে থাকি। সাম্প্রদায়িক নেতা ও তাত্ত্বিকদের সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহার করা ও তাদের সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে দেখা হয়, যাদের জাতীয় সংহতি সম্মেলন, কমিটি ও কাউন্সিলে পর্যন্ত আমন্ত্রণ করা হয়, আর তাদের অনুগামীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণকারী বলে তাদের সমাজ-বিরোধী হিসাবে নিন্দা করা হয় ও তদনুসারে আচরণ করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে—যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিকারী মতাদর্শ সৃষ্টি ও প্রচার করে তারা শুধু আইনের হাতে শাস্তি পাওয়াই এড়িয়ে যায় না, এমন কি অনেক সময়ে সামাজিক অননুমোদন ও নিন্দাও এড়িয়ে যায়, তাদের শিকার যারা, তারাই প্রাণ দেয়।

উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং উগ্র বা ফ্যাসীবাদী সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা দরকার। কিন্তু তা উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম এড়ানোর জন্য বা তার প্রতি অপেক্ষাকৃত নরম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার জন্য বা তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য বা উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সাধুবাদ জানানোর জন্য বা তাদের সম্মানিত করা বা তাদের উপর ন্যাবাত্তা অর্পণ করার জন্য নয়। প্রভেদ করা প্রয়োজন, কারণ এই দুই সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধিতা করতে ও আক্রমণ করতে হবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধিতা করতে হবে অনিবার্যভাবে মতাদর্শের মাধ্যমে, যেখানে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের ক্ষেত্রে বহু সময়ে রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ করতে হতে পারে। উপরন্তু, যদি উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সফলভাবে রোখা না যায়, তবে তা উগ্র বা ফ্যাসীবাদী সাম্প্রদায়িকতাবাদের এই দুটি রূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতির

উপর নির্ভর করে পাল্টে যেতে পারে। আর.এস.এস. ও বি.জে.পি. (জনসংঘ, ইত্যাদি) ক্রমাগত অবস্থান পাল্টেছে। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত উগ্র ছিল, ১৯৪৭-এর পর ভারতে উদারপন্থী রূপে ফিরে যায়, এবং হালে আবার উগ্র রূপ ধারণ করছে। আকালী দল ও সন্ত লঙ্গোয়াল ১৯৮১ পর্যন্ত উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন, ১৯৮১-র পর থেকে ক্রমেই উগ্র হতে থাকেন যতক্ষণ না তাঁদের ও ভিন্দ্রনওয়ালে পন্থীদের মধ্যে প্রভেদ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং তারপর, ভিন্দ্রনওয়ালের মৃত্যু ও অপারেশন ব্লু স্টারের পর ধীরে ধীরে আবার উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদে ফিরে যান।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে মতাদর্শ হিসাবে দেখার প্রয়োজনীয়তার আরেকটি দিকের প্রতি নজর দিতে পারি। যেহেতু সব ধাঁচের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একই মতাদর্শ গ্রহণ করে, তাই উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতা-বাদীরা উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ভাবে লড়াই করবে, এই আশা করা বা সেজন্য তাদের উপর নির্ভর করা যায় না। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক প্রভেদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে পারে কেবল ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ও শক্তিগুলি। (বস্তুত, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও, চিন্তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক উপাদান থাকলে এই কাজে বাধাপ্রাপ্ত হন)। যেমন, অতীতে কবি ইকবাল, সিকান্দার হায়াৎ খান, এইচ. এস. সোহরাবর্দী ও অন্যরা (এমন কি ১৯৪২-এর পর যে সব বামপন্থীরা লীগে যোগদান করেন তাঁরাও), জিন্না ও মুসলিম লীগকে তাদের উগ্র পর্বে ঠেকাতে পারেন নি। দারুণ কঠিন পরিস্থিতিতে সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা হুসেন মাদানি, রফি আহমেদ কিদওয়াই এবং আসফ আলীর মতো দৃঢ় জাতীয়তাবাদীরা। অনুরূপভাবে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, এন. সি. চ্যাটার্জী ও মদনমোহন মালব্যের মতো উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আর.এস.এস. এবং ভি.ডি. সাভারকারের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা যখন ১৯৩৭ সালের পর উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের দিকে ঝুঁকে যায় তখন তার বিরোধিতা করেন নি। আরো সাম্প্রতিক কালে, জনসংঘ বা ভারতীয় জনতা পার্টির সবচেয়ে নরম-পন্থী গোষ্ঠী ও নেতারাও আর.এস.এস.-এর মতাদর্শকে সমালোচনা করতে বা এম. এস. গোলওয়ালকরের ফ্যাসীবাদী উক্তি বা আর.এস.এস শাখাগুলিতে যে বিদ্বেষ প্রচার করা হয় তার প্রতিবাদ করেন নি। সন্ত লঙ্গোয়াল, প্রকাশ সিং বাদল এবং এস. এস. বারনালার মত আকালী উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ক্ষেত্রে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত একই কথা প্রযোজ্য, কারণ তারা কেবল যে ভিন্দ্রনওয়ালের বিরোধিতা করেন নি তা নয়, বরং ক্রমাগত তার সঙ্গে উগ্র সাম্প্র-দায়িকতায় পাল্লা দিয়ে চলেছিলেন। কেবল কমিউনিস্টরা, ও দরবারা সিংয়ের মতো দৃঢ় ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস কর্মীরাই উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধিতা

করার সাহস দেখিয়েছিলেন। সুতরাং, উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, এবং তা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামে কৌশলগত প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারা, কিন্তু প্রথমোক্তরা পরবর্তী দলের বিরুদ্ধে মতাদর্শগতভাবে ও দৃঢ়ভাবে লড়াই করবে এ আশা করার অর্থ অসম্ভবের আশায় থাকা।

যে কোনো মতাদর্শগত সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করতে হয়, এবং বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সমাজে তাঁদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার যে প্রবণতা, তার সঙ্গে আমরা একমত নই। কিন্তু সফলভাবে এই ভূমিকা পালন করতে হলে তাঁদের নিজেদের সাম্প্রদায়িকতার জীবাণুমুক্ত হতে হবে। বহু ভারতীয় বুদ্ধিজীবীই মোটের উপর ধর্মনিরপেক্ষ হলেও, অন্য অনেকে আবার সাম্প্রদায়িকতাবাদের বাহক। এমনকি অন্যত্র ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরাও, যেমন ১৯৮৩ থেকে পাঞ্জাবের মত, অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িক দাপটের সামনে বৌদ্ধিক কাপুরুষতায় ভোগেন। ফলে, সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধী সংগ্রাম কেবল বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে করা যাবে না, প্রথমে সে সংগ্রাম চালাতে হবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে।

আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের সাম্প্রদায়িকরণ এবং ধর্মনিরপেক্ষকরণের মধ্যেও প্রভেদ করতে হবে। দুটিকে ধর্মনিরপেক্ষকরণের জন্য যে ধরণের প্রয়াস দরকার, তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ঝোঁক আছে, কেবল রাষ্ট্রীয় স্তর নিয়ে মাতামাতি করা এবং সামাজিক স্তরকে অবহেলা করা। রাষ্ট্র অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষত প্রচার মাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং চাকরীর সুযোগের উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকার দরুণ। কিন্তু রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলেই সমাজও ধর্মনিরপেক্ষ, বা তা হতে চলেছে, এ কথা মনে করা কমপক্ষে অত্যুক্তি। বস্তুত, অনেক সময়ে ঘটনা উল্টো হয়। যদি, বিভিন্ন কারণে, সমাজের সাম্প্রদায়িকরণ ঘটে তবে রাষ্ট্র তার অনুসরন করে, বিশেষত যেখানে জনগণের ভোট ও নির্বাচিত সরকারের প্রথা বিদ্যমান। অনেক সময়েই একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক প্রচার বা হিংস্রতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয় বা সংরক্ষণ, নির্বাচনী রফা ইত্যাদির জন্য সাম্প্রদায়িক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, তারা সাম্প্রদায়িক বলে নয়, বরং সাম্প্রদায়িকৃত সমাজ ও জনমতের বিরুদ্ধে তাদের দাঁড়ানো সাহস নেই বলে। এমনও হতে পারে যে রাষ্ট্রের সঙ্গে একই সময়ে সমাজের ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষয় বা সাম্প্রদায়িকরণ চলছে। তাছাড়া, সমাজের স্তরেই বুদ্ধিজীবীরা, সাংস্কৃতিক কর্মীরা এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনরা সবচেয়ে কার্যকর হতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতাকে মতাদর্শ হিসাবে দেখলে আরেকটি সুবিধা রয়েছে। তখন

এক সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে আরেকটির পৃথকীকরণের দরকার হয় না, তাদের দেখা যায় একই মতাদর্শের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হিসাবে। তখন আর হিন্দু বা শিখ বা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয় না, লড়াই হয় সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও তার বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে। অন্যভাবে বলতে হলে—সব রকমের সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে লড়াই করা আবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে যে আমার মতে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্য দায়ী নয়, এবং ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে ধর্মের অনুপ্রবেশকে রোধ করতে হবে। বিশেষ করে, ধর্মকে রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে বা সরিয়ে রাখতে হবে। এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও ধর্মের গণ্ডী ক্রমশ সংকীর্ণতর করতে হবে। উত্তরোত্তর বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, গর্ভপাত, পরিবার পরিকল্পনা এবং উত্তরাধিকারকে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে। উপরন্তু, ধর্ম থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ না এলেও, অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উপাসনা, ধর্মীয় সংকীর্ণ মানসিকতা এবং ধর্মের মূলে যাওয়ার নাম করে কুসংস্কার—বর্তমানে যা মৌলবাদ বলে কেতাদুরস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে—এবং ধর্মভাবের অত্যধিক বৃদ্ধি (অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিশ্বাস ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ধর্মের অনুপ্রবেশ) সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও রাজনীতিকে গ্রহণ করার এক রকম মেজাজ তৈরী করে বা তাদের জন্য ফাঁক রেখে দেয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মের কাজের পদ্ধতি, বিন্যাস, মতাদর্শ ও প্রয়োগে ঐতিহাসের বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী করেছে এমন উপাদান রয়েছে, যেগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদের খাতে প্রবাহিত হয় বা তার আসার পথ সৃষ্টি করে। এই উপাদানগুলিকে বার করে আনতে, বিশ্লেষণ করতে, সমালোচনা করতে এবং উচ্ছেদ করতে হবে। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধর্মের জন্য ভিন্ন ধরণের হতে বাধ্য। প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর বিপরীতই ঘটছে। চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঠিক ঐ উপাদানগুলিকেই শক্তিশালী করতে। যেমন, রাম ও কৃষ্ণর মত সর্বজনশ্রদ্ধেয় ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চরিত্রদের (যাদের হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও ক্রীশ্চানরা সমান শ্রদ্ধা করেন) সাম্প্রদায়িকরণ হচ্ছে। দশেরা, রাম নবমী, জন্মাষ্টমী, বিভিন্ন স্থানীয় দেবদেবীর পূজার দিন, মহরম, বিভিন্ন ঈদ, শব-এ-বরাৎ, এবং শিখ গুরুদের, রামদাসের, বাল্মিকী প্রমুখের জন্ম দিবস নিয়ে একই কাজ হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও চিন্তার প্রচার এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতার ধারণার জন্ম দেওয়াকে চিন্তা ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামের এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ হতে হবে।

এখানে শিক্ষা ও সংবাদপত্রের ভূমিকা মৌলিক। আশা করা হয়েছিল যে স্বাক্ষরতা এবং শিক্ষার বিস্তার জনগণকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জাতিবাদ থেকে সরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এক প্রধান ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু স্কুল ও কলেজ,

উভয় স্তরেই শিক্ষাব্যবস্থা, এবং সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে মুদ্রিত বক্তব্য ব্যবহার করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক, জাতিবাদী ও উগ্র আঞ্চলিকতাবাদী মতাদর্শের ধারণা ঢুকিয়ে দিতে ও ছড়াতে। ফলে, শিক্ষার বিস্তার সাম্প্রদায়িক, কুসংস্কারবাদী, এবং অযৌক্তিক চিন্তা ও মতাদর্শের প্রসার বাড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষার, বিশেষত সমাজ বিজ্ঞানের গতিমুখ বৈজ্ঞানিকভাবে পরিবর্তন করা তাই একটি আশু জরুরী কাজ। একইভাবে, পড়ার অভ্যাস বেড়ে যাবার ফলেও সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ঠেকানো যায় নি, কারণ জনপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য অত্যন্ত কম। বরং, আজকাল সাম্প্রদায়িক পত্রিকা, কার্টুনে গল্প, যা শিশুদের ও সগুস্বাক্ষর প্রাপ্ত-বয়স্কদের পাঠের জন্য রচিত, তাদের ছড়াছড়ি হচ্ছে। পাঠক সংখ্যা বাড়ায় সাম্প্রদায়িক পত্রপত্রিকাগুলির প্রভাবেরও রমরমা অবস্থা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি ক্রমেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে অনগ্রসর ও রক্ষণশীল শক্তিগুলিকে আত্মসাৎ করতে ও তাদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। ফলে জাতিগত নিপীড়ন ও জাতিভেদ ব্যবস্থার, মেয়েদের অসম অবস্থানের, উপজাতিভুক্ত মানুষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের এবং সাধারণভাবে সমাজে উচ্চবর্গীয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামের অংশ হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে, সমস্ত র‍্যাডিকাল ও উদারপন্থী জাতীয় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ শক্তিদের, রাজনৈতিক দলগুলিকে, গোষ্ঠীদের ও ব্যক্তিদের ভারতীয় সমাজে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটানোর জন্য একজোট হওয়া উচিত।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামে কয়েকটি বড় ভ্রান্তিকেও এড়াতে হবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জাতিবাদকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এবং নিম্নতর জাতিদের সুরক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে চলবে না। ভারতীয় সমাজে সংখ্যালঘু ও নিম্ন বর্ণের লোকেরা বহু অক্ষমতা, বঞ্চনা, বৈষম্য ও শোষণ এবং তজ্জনিত সংশয় ও ভীতির শিকার। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জাতিবাদের আবেদনের একটি অংশ হল এই ভীতি ও সংশয় কাটিয়ে দেওয়ার দাবী। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিদের এই সংশয় ও ভীতির প্রকৃত উৎস সন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে হবে, এগুলি অপসারণ করার এবং সংখ্যালঘু ও নিম্ন বর্ণের লোকেদের সুরক্ষার প্রকৃত পন্থা দেখাতে ও সেজন্য লড়তে হবে, এবং সাম্প্রদায়িক ও জাতি-বাদী ধারণার ভিত্তি ও তাদের প্রতিশ্রুতি যে মিথ্যা, তাও দেখাতে হবে। অন্য-ভাবে বলতে হলে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করতে হবে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা-বাদের মাধ্যমে নয়। তা হবে এমন এক প্রতিরক্ষা যা নিজেকে পরাস্ত করবে।

১৯৪৭-এর আগে যেখানে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ জাতীয় ঐক্যের প্রধান ক্ষতি করেছিল, ১৯৪৭-এর পর থেকে সেখানে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদই ফ্যাসী-বাদী বিপদ নিয়ে আসছে। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিদের তাকেই আক্রমণের মূল লক্ষ্য বলে ধরতে হবে। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদের উপস্থিতি ভুলে গেলে চলবে না।

তার মানে এই নয় যে আমাদের সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদগুলিকে উপেক্ষা করতে হবে বা তাদের প্রতি নরম ও সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতাবাদের মতো দৃঢ়ভাবেই তাদের বিরোধিতা করতে হবে। প্রথমত, সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিপজ্জনক, কারণ তা একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে সাম্প্রদায়িক নেতাদের হাতে তুলে দেয়, যাদের রাজনীতি ঐ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যদের স্বার্থের প্রতি অনিবার্যভাবে ক্ষতিকর। দ্বিতীয়ত, যদি না সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়, তবে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামকে অত্যন্ত কঠিন করে তোলে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক পাঞ্জাবে চরমপন্থী শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদকে। তার থেকে প্রকৃত বিপদ এসেছে এভাবেই। তার পক্ষে খালিস্তান সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না, হবেও না—দেশের বাকি অংশ সেটা হতে দেবে না। প্রকৃত বিপদ ছিল ও আছে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিস্ফোরণে—যেমন ঘটেছিল ১৯৮৪-এর নভেম্বরের গোড়ায়। তারা তা ঘটাতে পারত ভারতীয় জনগণের জাতীয় ঐক্যের পক্ষে যে দৃঢ় অনুভূতি, তার প্রতি আবেদন করে, এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ও রাষ্ট্র যেখানে উগ্রপন্থী হিংসাশ্রয়ী ঘটনা রোধে নিষ্ক্রিয়, সেখানে এই ধারণা করে নেওয়া হয় যে কেবলমাত্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ-ফ্যাসীবাদই পাবে দেশকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাখতে এবং পাঞ্জাবের হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী হিংস্রতার হাত থেকে রক্ষা করতে। সুতরাং, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ-ফ্যাসীবাদকে এড়াতে হলে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধিতা করা অত্যন্ত জরুরী। সবশেষে, ১৯২০-র দশক থেকে গোটা দেশে, এবং ১৯৪৮ থেকে পাঞ্জাবে, আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে আমরা যদি সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি নরম থাকি, তবে আমাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ঝোঁক আসবে। এইভাবে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতাবাদ একে অপরের দ্বারা পুষ্ট হয় এবং একটির শক্তিবৃদ্ধি হলে অন্যটিরও অনিবার্যভাবে শক্তিবৃদ্ধি হয়। এদের সকলের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একই সঙ্গে।

আমাদের অন্য দুটি দিকও দেখতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতাবাদের পরিণতি যেমন ফ্যাসীবাদ, তেমনি, সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদের পরিণতি বিচ্ছিন্নতাবাদ। একবার যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে সংখ্যালঘুরা চিরকাল এবং অনিবার্যভাবে সংখ্যাগুরুদের দ্বারা বিপন্ন, এবং সেই জন্য তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে, তবে এই বক্তব্যের সাম্প্রদায়িক প্রবক্তারা কোনো রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক গ্যারান্টিতেই সন্তুষ্ট হবে না। এবং তার সহজ কারণ হল এই, যে, সব দিক দেখে শুনে যে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাকেও প্রয়োগ করে এমন এক রাষ্ট্র, যা সাম্প্রদায়িক সংজ্ঞা অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, একবার যদি সাম্প্রদায়িক পরিচিতি এবং তার ভিত্তিতে রাজনীতি, এই দুটি

বদ্ধজ ধারণাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে সংখ্যালঘুরা দীর্ঘ মেয়াদী হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে হয় এক বাইরের শক্তির মধ্যস্থতার দ্বারা, অথবা তাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দ্বারা। সুতরাং এটা আকস্মিক নয় যে ১৯৪৭-এর আগে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রথমে 'মুসলিম' স্বার্থের রক্ষাকবচ রূপে বৃটিশ আধিপত্যের স্থায়িত্ব চেয়েছিল, এবং পরে বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ ধরেছিল। অনুরূপভাবে, ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা 'শিখ' স্বার্থরক্ষার জন্য বারংবার আবেদন করেছিল, গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ অভিমতের কাছে নয়, বরং হয় রাষ্ট্রসংঘের কাছে, অথবা এক স্বতন্ত্র বা স্বাধীন 'খালিস্থান', অর্থাৎ শিখ রাষ্ট্রের কাছে।

সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব বারবার বলে গেলে হিন্দু ফ্যাসীবাদী বিকাশ ত্বরান্বিত হওয়ার যে বিপদ রয়েছে, সে বিষয়ে সতর্ক করতে গেলে মুসলিম ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদের সমর্থক ও প্রবক্তারা একটি বিপজ্জনক তত্ত্বের অবতারণা করেন, যা হল, হিন্দু 'পরিচিতি' বা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের পিছনে হিন্দুদের দৃঢ়ভাবে একজোট করা কখনোই সম্ভব নয়। একথা সত্য যে সৌভাগ্যক্রমে, বিভিন্ন কারণে, এবং সর্বাগ্রে দাদাভাই নওরোজী থেকে গান্ধীজী ও নেহরু পর্যন্ত দৃঢ় ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্ব ও এক শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অস্তিত্বের ফলে এখন পর্যন্ত হিন্দুদের একটি সম্প্রদায় রূপে ঐক্যবদ্ধ করা যায় নি। কিন্তু এরকম এক তত্ত্বকে ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চয়তা প্রদানকারী রূপে দেখা হবে বিরাট হঠকারিতা। বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন বেশে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ সবসময়েই ভারতে শক্তিশালী উপস্থিতি রেখেছিল—যার প্রমাণ ১৯২৬-এ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মনিরপেক্ষ স্বরাজ্যপন্থীদের পরাজয় বা ১৯২০-র দশকের এবং ১৯৪৬-৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,

উগ্রমূর্তি। আজ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধিতা ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। আধুনিক ইতিহাসে এই প্রথম বুদ্ধিজীবীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হিন্দু ধর্মীয় পরিচিতির কথা বলতে শুরু করেছেন। উপরন্তু, এ কথা বোঝা উচিত যে হিন্দু পরিচিতি গঠন ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রক্রিয়া সীমিত হলেও, হিন্দু জনসংখ্যার আয়তনের দরুন এই সীমিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদও এক বিশাল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপদ আনবে।

সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ, গোষ্ঠী ও দলগুলিকে তোষণের পথেও সাম্প্রদায়িকতাবাদ উচ্ছেদ করা যায় না। বিশেষ সুবিধা দিলে কেবল সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের লালসা বাড়ে; তার ফলে তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ছেড়ে দেয় না। বস্তুত, প্রতিটি সুবিধার সঙ্গে তাদের দাবী বাড়তে থাকে; যখন আর কোনো দাবী বিদ্যমান থাকে না, তখন শেষ পর্যায়, অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদ, অনিবার্যভাবে এসে যায়। উপরন্তু, যখন সাম্প্রদায়িক নেতাদের এক অংশকে শান্ত করা হয় তখন আরেক-

অংশ, আরো ‘উগ্র’ ভাবে তাদের উপস্থিতি হাজির করে। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতা চক্রাকারে বেড়ে চলে। ১৯০৭ সালের পর থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে তুষ্ট করার চেষ্টা প্রসঙ্গে এই ছিল জাতীয়তাবাদীদের অভিজ্ঞতা। ১৯৩৭-এর মধ্যে প্রায় সমস্ত মুসলিম দাবী যা উঠতে পারত তা গৃহীত হয়েছিল। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রথমে আইনসভায় ও প্রশাসনে হিন্দুদের সঙ্গে সমতা দাবী করল ও তারপর পাকিস্তান দাবী করল। একইভাবে, ১৯৪৭-এর পর বহুবার পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখ উভয় সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপোষ করা হয়েছিল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। এর একমাত্র ফল ছিল পাঞ্জাবে কংগ্রেস দলের সাম্প্রদায়িকরণ, যার ফলে এই দল সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধিতা করার ক্ষমতা হারায়, এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও গোষ্ঠীগুলি সহ সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিদেব পক্ষাঘাতগ্রস্থ অবস্থা। অবশ্যই, যদি একটি প্রকৃত সংকট থাকে—দাঙ্গা ইত্যাদি—তবে কিন্তু আপোষের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হতে পাবে। কিন্তু সেরকম রফা অর্থবহ হয় কেবল তাকে সমাধান হিসাবে না দেখে সাম্প্রদাযিকতাবাদ বিরোধী শক্তিশালী রাজনৈতিক-মতাদর্শগত যুদ্ধারম্ভেব জন্য সময় আদায় করে নেওয়া হিসাবে দেখা হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেব ছাড দেওয়া বা তাদের সঙ্গে রফা করা কখনোই তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধ প্রস্তুতির বিকল্প হতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে আলোচনা ও রফা নয়, রাজনৈতিক বিতর্ক ও ধাবাবাহিক তর্কের প্রয়োজন রয়েছে। আর, এই বিতর্কের অংশ হতে হবে এই স্পষ্ট উক্তি যে সাম্প্রদায়িকতা সফল হবে না, যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটা মূল্য দিতে হয়। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িকতার প্রতি তোষণ নীতি গ্রহণ করলে জনগণ বিশ্বাস করেন যে সাম্প্রদায়িকতাই হল রাজনৈতিক সাফল্যের পন্থা।

বিশেষত কোনো অবস্থাতেই, কোনো অজুহাতে বা কোনোভাবেই, সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে ভদ্রস্থ বা ন্যায্য করে তোলা ঠিক নয়। ১৯৪৮ থেকে আমাদের সমাজের একটি ইতিবাচক দিক এই, যে সাম্প্রদায়িক কথাটা ক্ষতিকাবক বলে মনে করা হয়। এই মনোভাবের স্থায়িত্ব ফলপ্রসূ। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ভদ্রস্থ করে তোলার মূল্য, এবং সমগ্র জাতীয় আন্দোলন ও ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক স্পষ্টভাবে তাকে চিহ্নিত না করার মূল্য, দিতে হয়েছিল দেশভাগ ও ১৯৪৬-৪৭-এর সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। যদি কোনো কারণে উদারপন্থী বা নরমপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে রফা করতে হয়, তবে বলা হোক, যে উদারপন্থী সাম্প্রদায়িবাদের সঙ্গে তা করা হয়েছে, ‘উদারপন্থীদের’ বা ‘নরমপন্থীদের’ সঙ্গে নয়। (এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী জাতীয়তাবাদী কৃষক ১৯৮৫-র গোড়ায় আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আকালীদের সঙ্গে মিটমাটের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু

তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা হল : 'ইন ফিরকা পারাস্তোঁ কো কুছ দে দিজিয়ে'—এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কিছু দিয়ে দিন)।

১৯৪৭ উত্তর পর্বে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম দারুণ দূষিত হয়েছে কারণ ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি ও ব্যক্তিরা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে মেশার ও তাদের সঙ্গে রফা করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। এইভাবে একবার সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ভদ্র সাজিয়ে তুললে মানুষ তার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত প্রচারের কথাকে ভাঁওতা বলে দেখে এবং তা তাদের মনে খুব একটা দাগ কাটে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দৃঢ়তা বা বলিষ্ঠতার দরকার আছে। আর দরকার আছে একথা স্বীকার কবার, যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সহজ সমাধান নেই। কোনো অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িকতাবাদ যখন দুর্বল তখন তাকে আক্রমণ করা, যখন তা গণভিত্তি লাভ করেছে তখন নরম হওয়ার নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়।

একদিকে দরিদ্র ও অসাম্য, অন্যদিকে প্রত্যাশার বৃদ্ধি ও গণতন্ত্র, এই পরিস্থিতিতে, অবিকশিত ধনবাদ ও তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণ ঘটাতে, সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য বিভেদপন্থী শক্তিদের পরাজিত করতে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরো বেশী করে অক্ষম হয়ে পড়ছে। জাতীয় আন্দোলন, অপ্রতুলভাবে হলেও, এই দায়িত্ব যতটুকু পালন করেছিল, তাদের পক্ষে তাও শক্ত ঠেকছে। আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী, উদারপন্থী-গণতন্ত্রী এবং মানবতাবাদী শক্তিরা দুর্বল নয়, কিন্তু তাদের ঐক্যবদ্ধ ও কার্যকর হতে হবে। এই অবস্থায়, শুধুমাত্র সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই নয় জাতীয় একীকরণের ক্ষেত্রেও বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিদের উপর বিশেষ দায়িত্ব বর্তায়।

দুর্ভাগ্যবশত, বামপন্থীরা যদিও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জাতিভেদ প্রথা, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদির প্রসঙ্গে সঠিক মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েছেন, তবু তাঁরা আকাঙ্খীত ভূমিকা নিতে পারেন নি। বস্তুত, তাঁরা এমন কি এই জটিল বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনো গভীর বিশ্লেষণও করেন নি, কয়েকটি সরল সূত্র নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন। এর একটা কারণ ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে বামপন্থার সাধারণ দুর্বল অবস্থান। কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ হল সমস্যাটির প্রতি বামপন্থার অপেক্ষাকৃত অবহেলা, এবং জাতভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তিদের, বিশেষত সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকে যেগুলি উঠে এসেছে তাদের, সঙ্গে সমঝোতার প্রবণতা। ভারতে বামপন্থা সবসময়েই যে বিরাট অর্থনীতিবাদী ও অর্থনীতির মাধ্যমে সবকিছুকে দেখার প্রবণতা দেখিয়ে এসেছে, তা হয়তো এর একটা কারণ। এই ঝোঁক অন্তত কার্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদের গভীর ও জটিল অধ্যয়ন ও বিশ্লে-

বণ এবং মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে খাটো করে দেখার, এমনকি উপেক্ষা করার দিকে নিয়ে গেছে। এক নতুন সমাজ সৃষ্টি করতে একটি নতুন র‍্যাডিকাল চেতনা যে ভূমিকা নেয়, তাকে খাটো করে দেখা হয়েছে। তারফলে, জনগণের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও মতাদর্শগত পিছিয়ে পড়া অবস্থা শুধু জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রামকেই নয়, সমাজ বদলের সংগ্রামকে এবং শ্রমিকশ্রেণী সহ সর্বভারতীয় সামাজিক শ্রেণীগুলি গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকেও, বারবার আঘাত করেছে, বাধা দিচ্ছে—এমনকি পিছনে ঠেলে দিচ্ছে।

যেমন, সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী মতাদর্শগত সংগ্রামের অনুপস্থিতির ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ ভারতের প্রায় সর্বত্রই—পাঞ্জাবে, গুজরাটে, বম্বেতে, ভিওয়াণ্ডিতে, হায়দ্রাবাদে, মোরাদাবাদে, দিল্লীতে, জামসেদপুরে, কানপুরে, এমনকি ব্যাঙ্গালোরে—সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। শ্রেণী সংগ্রাম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ঠেকাতে পারেনি, বরং সাম্প্রদায়িকতাবাদ বম্বে, ভিওয়াণ্ডি, বরোদা, আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, কানপুর, ইত্যাদি জায়গায় শ্রেণীগত সংহতির ভিত কেড়ে নিয়েছে।

[ছয়]

সাম্প্রদায়িক হিংসাশ্রয়ী ঘটনার কী হবে? মতাদর্শগত সংগ্রাম এক দীর্ঘমেয়াদী ঘটনা। কিন্তু যখন সাম্প্রদায়িক হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটবে, তা দাঙ্গা হোক আর রাতের আঁধারে ছুরি মারা হোক বা সন্ত্রাসবাদ হোক, তার একমাত্র উত্তর হল রাষ্ট্র কর্তৃক তৎক্ষণাৎ এবং কার্যকর পাল্টা হিংস্রতার ব্যবহার। সময়ে সময়ে যখন সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ হয় হিংস্র রূপে, তখন কেবল রাষ্ট্রই পারে অবস্থার সামাল দিতে। যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তা আলিগড়ে বা মোরাদাবাদে বা ভিওয়াণ্ডিতে বা গুজরাটে বা পাঞ্জাবে যেখানেই হোক, রাজ্য সরকারকে এই বলে সমালোচনা করা উচিত নয় যে তারা কেন পুলিস বা সেনাবাহিনীকে পাঠিয়েছিল। বরং সমালোচনা করা উচিত, যে তারা কেন সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা গুঁড়িয়ে দিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাষ্ট্রীয় শক্তির এমন ব্যবহার করে নি যাতে তা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলার বদলে এক ঘণ্টা বা একদিনও চলতে না পারত।

সাম্প্রদায়িক হিংস্রতাই খারাপ। কিন্তু তার সবচেয়ে খারাপ দিক এই নয় যে তার ফল কত প্রাণহানি, কত সম্পত্তি নষ্ট হয়। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল জ্যামিতিক হারে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রসার। তাছাড়া, তা এমন কি ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকেও নিজের প্রাণ ও সম্পত্তি বাঁচাতে সাম্প্রদায়িক শক্তিদের সঙ্গে হাত মেলাতে,

বা এমন কি তাদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে। যদি একদল দাঙ্গাবাজ, বা একজন সন্ত্রাসবাদী কারো বাড়ি বা অফিস বা দোকান আক্রমণ করতে যায় তার ধর্ম কি তাই দেখে, তবে সে কংগ্রেসী হোক, জনতা বা লোক দলের সমর্থক হোক বা কমিউনিস্ট হোক, সে তখন তার সুরক্ষা যারা সংগঠিত করেছে তাদের চাঁদা দিতে, বা এমন কি আত্মরক্ষার, স্বেচ্ছা প্রয়াস ও সংগঠনের জন্য তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়। বস্তুত, যারা সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা উস্কিয়ে দেয় বা সংগঠিত করে, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য বিপরীত 'সম্প্রদায়ের' সংখ্যা কমানোর জন্য তার সদস্যদের আক্রমণ করা নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন মানুষরা যাতে সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

ফলে, এই সমস্ত কারণে, সাম্প্রদায়িক হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি-দের সাম্প্রদায়িকভাবে চিন্তা করতে ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করার আগেই তাকে ধ্বংস করতে হবে। তা করা যায় তিনভাবে: রাষ্ট্রীয় হিংস্রতা ব্যবহার করে, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে এবং আক্রান্ত গোষ্ঠীর আত্মরক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস ও অহিংসার অস্ত্র ব্যবহার করা অসম্ভব বলেই দেখেছিলেন, যতক্ষণ না গান্ধীজী নিজে ঘটনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছিলেন যে ঐ অস্ত্র উপযোগী নয়। তিনি তখন কংগ্রেস-মন্ত্রীসভাগুলিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে রাষ্ট্রের পূর্ণ শক্তির ব্যবহার করতে বলেছিলেন। যে সব অঞ্চলে বা যে সমস্ত সময়ে ঔপ-নিবেশিক রাষ্ট্র কার্যকর ভাবে ও যথাসময়ে কাজ করছে না, সেখানে ও সে সময়ে তিনি হিংস্রতার দ্বারা বিপন্ন গোষ্ঠীদের নিজেদের সংগঠিত করতে ও আত্ম-রক্ষার উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে তা সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে আগ্রাসী গোষ্ঠীকে ঠেকাবে। তিনি সেই পরিস্থিতিতে ঠিকই বলেছিলেন, যা তাঁর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই বলা যায়। কারণ তখন ফলশ্রুতি যাই হোক না কেন সেটোর অন্য কোনো পথ ছিল না। অতএব, আত্মরক্ষার ফলাফল মনে রাখলে, সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতির মোকাবিলা করার একমাত্র বাস্তব ও সঠিক ধর্মনিরপেক্ষ পথ হল রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ। হয় রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথ হস্তক্ষেপ অথবা আত্মরক্ষার মাধ্যমে সংঘর্ষ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যাওয়া, যেমন হয়েছে বেলফাস্ট ও লেবাননে। রাষ্ট্রশক্তিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ও ঠিক সময়ে ব্যবহার না করার অর্থ জনগণের উপর আত্মরক্ষা ও সাম্প্রদায়িকরণ চাপিয়ে দেওয়া।

বস্তুত, বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ইতিহাসও এটাই দেখায়। সংগঠিত আত্মরক্ষা ইতালী, জার্মানী ও অস্ট্রিয়াতে ফ্যাসীবাদের অগ্রগতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কেবল রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপই যথাযোগ্য হতে পারত। কিন্তু রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় ও

অকার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল, এবং তার ফল ছিল ফ্যাসীবাদের বিজয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পরোক্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে উৎসাহ দেওয়ার অন্যতম পথ হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে এবং হিংস্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে যথোপযোগী পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করা বা নিতে ব্যর্থ হওয়া। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে সমস্ত অঞ্চলে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন এবং কঠোর জেলা প্রশাসন যথাযথ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয় বা নেওয়ার হুমকি দেয়, সে সমস্ত জায়গায় দাঙ্গা হয় ঘটে না, অথবা এক-দু'দিনের বেশী থাকে না। যেখানে আধা-সাম্প্রদায়িক বা দুর্বল কর্মচারীরা পদাধিকারী হয়, সেখানে ঘটে এর ঠিক বিপরীত। গত কয়েক বছরে পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িকরণে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সংগ্রামের অনুপস্থিতি ছাড়াও, যে কারণেই হোক সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার সামনে রাষ্ট্রীয় নিষ্ক্রিয়তা এক প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাজ্যের সাম্প্রদায়িকরণকে সফলভাবে রুখে দিয়েছে। বাস্তবে, যদি সকলকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হত যে সরকার যুগপৎ শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ, এবং তাঁরা সাম্প্রদায়িক হিংস্রতাকে বা সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার যে কোনো কথাকে যে কোনো মূল্যে দমন করতে প্রস্তুত, তাহলে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার বিপদটাই কমে যেত। এ থেকে বোঝা যায় দৃঢ় ধর্মনিরপেক্ষ পুলিস ও অন্য অসামরিক কর্মচারীর প্রয়োজন কেন। তারা জনগণকে সাহস দিতে এবং সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার সম্ভাব্য সাধনকারীদের এবং সংগঠকদের মনেপ্রাণে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পাবে।

ঔপনিবেশিক যুগে আমাদের অভিজ্ঞতা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, এবং ইতালী, জার্মানী, জাপান, স্পেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার ফ্যাসীবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও সাম্প্রদায়িকধরণের আন্দোলন রাষ্ট্রীয় মদত বা অন্তত রাষ্ট্রশক্তির নিরপেক্ষতা ও নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া জয় বা প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। এই জন্যই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বা ফ্যাসিস্টরা রাষ্ট্রশক্তির ভিতরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে বা অন্তত নির্দোষের ভান করে এবং শুধু রাজনীতির মাধ্যমে তাকে নিরপেক্ষ রাখতে চেষ্টা করে। তাই তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার কোনো অংশ পেতে না দেওয়া এবং সাম্প্রদায়িক হুমকী বা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ক্ষমতায় আসার চেষ্টার মুখে রাষ্ট্রশক্তি যাতে নিষ্ক্রিয় না থাকে সেদিকে নজর রাখা দরকার। ধর্মনিরপেক্ষ দল ও শক্তিগুলি যাতে সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোষ্ঠী বা দলগুলির সঙ্গে নীতিহীন রাজনৈতিক ঐক্য না করে অথবা তাদের প্রতি কোনো নরম বা সবল 'উদাসীন' দৃষ্টিভঙ্গি না নেয়, সেটা আর একবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে।

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে এতক্ষণ আমি যে বলেছি তা জাতপাত ও আঞ্চলিকতার সঙ্গে সরকারী ও দলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরো বেশী করেই প্রযোজ্য।

তার অর্থ আরো দাঁড়ায় এই যে রাষ্ট্রযন্ত্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের অনুপ্রবেশ, যা ১৯৩০-এর দশক থেকে ঘটে চলেছে এবং যা গত দশক দুইয়ে ত্বরান্বিত হয়েছে তাকে থামাতে ও উচ্ছেদ করতে হবে।

পুলিশ, গোয়েন্দা ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করতে হবে। তাকে সদাসতর্ক থাকতে হবে এবং একটি অঞ্চল বা শহরে আগুন জ্বালাবার আগেই সাম্প্রদায়িকতার স্ফুলিঙ্গকে নেভাতে হবে। যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানী দেয় বা সেগুলি সংগঠিত করে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ায়, এবং যে পদস্থ কর্মচারীরা মদত দিয়ে বা নির্লিপ্ত থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রসারে সাহায্য করে এবং ব্যাপক জীবন ও সম্পত্তি হানিকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটতে দেয়, তাদের শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে এবং কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এটা করতে ব্যর্থ হওয়া ১৯৪৭-এর পর ভারতীয় রাষ্ট্রের এক প্রধান দুর্বলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

[সাত]

আমরা এতক্ষণ যা বললাম তাকে এই সতর্ক বাণীর মধ্যে দিয়ে সারসংক্ষেপ করা যায়: যদি না সামাজিক বাস্তবতার পরিবর্তন হয় এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক ধরণের দল, আন্দোলন ও মতাদর্শগুলির বিরুদ্ধে তীব্র ও ব্যাপক রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু করা হয়, এই ধরণের বিভেদপন্থী ও অনৈক্যকামী আন্দোলন বারবার দেখা দেবে এবং জাতীয় সংহতি ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বাধা দেবে, এমনকি এই দিকে গত একশো বছরে সীমিত হলেও যে বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, তাকেও বিপদগ্রস্ত করবে।

টীকা

১। মজার কথা, জাতপাতের সমস্যা, বা দারিদ্র বা শ্রেণীগত শোষণের সমস্যার কেউ 'তাৎক্ষণিক' সমাধান প্রত্যাশা করে না বা খোঁজে না। এখানে আমরা ফিরে তাকাই রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও মতাদর্শগত প্রক্রিয়ার দিকে।

২। জাতভিত্তিক দল ও গোষ্ঠীদের সঙ্গে তাঁদের সমঝোতার খতিয়ান সম্ভবত নিকৃষ্টতর।

৩। এস আবিদ হুসেন, 'দ্য ডেস্টিনি অভ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস', পৃঃ ৬।

৪। সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিভিন্ন মাত্রা, তা ভারতীয় জনগণের ও সামাজিক বিকাশের প্রতি কি রকম বিপদ আনে, এবং তার বিরুদ্ধে কেমন পদক্ষেপ নিতে হবে নেহরু তা বুঝেছিলেন। আমরা তার উদাহরণ দিতে পারি স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর প্রথম দুবছরের রচনা থেকে। উদাহরণগুলি নেওয়া হয়েছে তাঁর 'লেটারস টু চীফ মিনিস্টারস', খণ্ড ১, ১৯৪৭-১৯৪৯ (নিউ দিল্লী, ১৯৮৫) থেকে। তিনি বারংবার সাম্প্রদায়িক সংগঠন-

দের বর্ণনা করেছিলেন হিন্দু, মুসলিম ও শিখ বেশধারী ফ্যাসীবাদী বলে (পৃঃ ১১, ৩৩, ২৪৩, ৪২৮)। তিনি রাজনৈতিক প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন (পৃঃ ৬০, ৩২৯)। "সুতরাং, যতদিন আমরা সরকারে আছি, ততদিন আমরা এই অন্যায় মতাদর্শের প্রতি মদত দান ও এর প্রসার সহ্য করতে পারি না", এইকথা ঘোষণা করে তিনি রাজ্য সরকারদের বলেন, "যে কোনো রূপেই হোক না কেন, সাম্প্রদায়িক তত্ত্বের প্রসার অনুমোদন" না করতে (পৃঃ ১৭৯)। তিনি আবার বলেন যে আর. এস. এস. প্রচারিত সাম্প্রদায়িকতাবাদ "আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষিয়ে তুলবে, এ হতে দেওয়া যায় না, এবং আমাদের তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে" (পৃঃ ২৫১)। অন্য এক সময়ে তিনি লেখেন যে প্রয়োজন হল হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিরুদ্ধে "সমস্তভাবে লড়াই করা, কারণ তা না করা হলে তা দেশকে দ্বন্দ্ব ও ভাঙনের দিকে নিয়ে যেতে পারে" (পৃঃ ৫১৩)। কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় ছিল যে নেহরু জনগণের ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিদের সাম্প্রদায়িক বিপদ রোধে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার মতো কোনো পদক্ষেপ নেন নি। এমন কি ১৯৫০-এর দশকের শেষদিকে তিনি সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান দেখার পরও এবং ১৯৬১তে জাতীয় সংহতি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত করার পরও তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। এই সংস্থাটি ছিল একটি নিছক শোভাবর্ধনকারী মঞ্চ। তা আজও তেমনই রয়েছে।

৫। "লেটারস টু চীফ মিনিস্টারস, ১৯৪৭-১৯৪৯", খণ্ড ১, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫, পৃঃ ২৫১-২।

পরিশিষ্ট

আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন রূপ

আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার তিনটি প্রধান রূপ দেখা যায়।

১. সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ

সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই রূপটি সাম্প্রদায়িকতাই নয়। এটা জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর কাঠামোর ভেতর কাজ করেছে, এবং চারিত্রিকভাবে, এটা ছিল প্রধানত জাতীয়তাবাদের বিচ্যুতি বা দুর্বলতা। এটা ছিল অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদের একটি দিক। এই রূপটির ক্ষেত্রে, জাতীয়তাবাদই ছিল প্রাথমিক। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী সম্প্রদায় ও বিশেষ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মৌলিক ধারণাগুলিকে গ্রহণ করেও বিশ্বাস করতো যে বৃহত্তর জাতি এবং জাতীয় স্বার্থের মধ্যে এগুলির সংগতি বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভব। সে বিশ্বাস করতো এবং প্রচার করতো যে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই, এবং বিকাশমান জাতীয়তাবাদের মধ্যেই কেবল বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংরক্ষণ সম্ভব। সে আরো বিশ্বাস করতো যে তার একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার সঙ্গে, অন্তত আদর্শগতভাবে, তার রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই।

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও বহিঃপ্রকাশের অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, ১৯২০ সালের আগে তাঁর জাতীয়তাবাদী পর্যায়ে, একই সময় যখন তিনি মুসলিম লীগেও ছিলেন, এম. এ. জিন্না ভারতীয় জনগণকে ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করতে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করতে বলেছিলেন। ভারতে স্বায়ত্বশাসন হিন্দুরাজ তৈরী করবে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এই ধারণার তিনি বিরোধীতা করেছিলেন। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন বা বিরোধিতা না করে তিনি বলেছিলেন যে আসল বিষয়টা হল হোম রুল বা "আমলাতন্ত্রের থেকে গণতন্ত্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।"[১] অনুরূপভাবে, ১৯৩৮-এ জামাত-উল-উলেমার মৌলানা মাদানী বলেছিলেন: "আজকাল কাইয়ুম (জাতি) তাদের বাসভূমির (ওয়তন) দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। জনগোষ্ঠী বা ধর্ম কাইয়ুম তৈরী করে না।"[২] জামাত ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার পূর্ণ গ্যারান্টি সহ একটি ভারতীয় রাষ্ট্রের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেছিল।[৩] ১৯১৫-র ডিসে-

ম্বরে মুসলিম লীগ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী মজহর-উল-হকও বলেছিলেন :

> আমরা ভারতীয় মুসলিম। 'ভারতীয় মুসলিম', এই কথাগুলো আমাদের জাতীয়তা ও ধর্মের ধারণাকে প্রকাশ করে·· যখন ভারতের কল্যাণ ও ভারতীয়দের প্রতি ন্যায়বিচারের কোনো প্রশ্ন ওঠে, আমরা কেবল প্রথমেই নয়, তার পরেও এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয়, ভারতীয় এবং শুধুই ভারতীয়, কোনো সম্প্রদায় বা কোনো ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত না রেখে, যারা সামগ্রিকভাবে ভারতের অগ্রগতি চায় তাদের পক্ষে··· ।[৪]

গোড়ার দিককার জাতীয়তাবাদী ভি. ডি. সাভারকারেরও একটি মূলত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল। তাঁর '১৮৫৭-র বিদ্রোহ' বইয়ের মুখবন্ধে ১৯০৯ সালে তিনি লিখেছিলেন :

> জাতিকে তার নিজের ইতিহাসের প্রভু হতে হবে, দাস নয়·· । শিবাজীর সময়ে মহামেডানদের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব ন্যায়সঙ্গত ছিল—কিন্তু, এখন এইরকম মনোভাব পোষণ করলে তা অন্যায় এবং বোকামী হবে, কেবল এইজন্যেই যে তখন তা ছিল হিন্দুদের প্রধান মনোভাব।[৫]

মতাদর্শগত গঠন ও রাজনৈতিক কাজের দিক থেকে, অনেক হিন্দু কংগ্রেসকর্মী আসলে ছিল সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী। তারা নিজেদের জাতীয়তাবাদী হিন্দু হিসাবে দেখতো না বা পরিচয় দিতো না কারণ, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়'ভুক্ত হওয়ার দরুন, তাদের সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ তাদের মনে সাধারণ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যেতো। অন্যদিকে, অন্য ধর্মাবলম্বী সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের খোলাখুলিভাবে জাতীয়তাবাদী মুসলিম, জাতীয়তাবাদী শিখ বা জাতীয়তাবাদী ক্রীশ্চান হিসাবে পরিচয় দিতো। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অনেকে ১৯২০-র দশকে হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ এবং আকালী দলে যোগ দিয়ে এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির মধ্যে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী গঠন করেছিল।[৬] সেই সঙ্গে, তারা একটি সভায় হিন্দু, মুসলিম বা শিখদের স্বার্থের ওপর জোর দিয়ে অন্য একটিতে ভারতীয় জাতীয় স্বার্থকে তুলে ধরে এক চিত্তাকর্ষক ও বিভ্রান্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। অনেক সময়েই তাদের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান বা মর্যাদাই নির্ভর করতো তাদের সাম্প্রদায়িক জাতীয়বাদী, অর্থাৎ একইসঙ্গে জাতীয়তাবাদী এবং 'হিন্দু', 'মুসলিম' বা 'শিখ' নেতা, হওয়ার ওপর। এই দ্বিতীয় দিকটার জন্যই অন্যেরা তাদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতো। এটা সমানে তাদের সমসাময়িক চিন্তার দিকে ঠেলে দিতো। যাই হোক, এমনকি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের পক্ষেও জাতীয়তাবাদী হিন্দু বা জাতীয়তাবাদী মুসলিমের অবস্থান থেকে সাধারণ জাতীয়তাবাদীর অবস্থানে ওঠা কঠিন ছিল। বস্তুত, অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাই তাঁদের

চিন্তা ও কাজে সাম্প্রদায়িক দিকটাই একেবারে উপেক্ষা করা কঠিন বলে মনে করতেন। গান্ধী, নেহরু ও আজাদের মত নির্ভেজাল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিরা ছিলেন বিরল। অন্যদিকে, অনেক সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদের সীমানায় চলে আসতো এবং সহজেই তার মধ্যে গলে যেতো।[৭] যাইহোক, রাজনৈতিকভাবে অসতর্ক ব্যক্তিরা প্রায়শই তাদের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অস্বচ্ছতার দরুন উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের থেকে নিজেদের অবস্থানের সুস্পষ্টভাবে আলাদা করতে বেগ পেতো।

২. উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদ

উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিল মূলত সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং তার অনুশীলনকারী ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কিছু উদারপন্থী, গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী ও জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধ তুলে ধরতো। সে স্বীকার করতো যে ভারতকে শেষ পর্যন্ত একটি জাতিরাষ্ট্র রূপে দেখতে এবং গড়ে তুলতে হবে। সে বলতো যে ভারত কতগুলি সুস্পষ্ট ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত, যাদের পৃথক ও বিশেষ নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে যেগুলি প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে আসে। কিন্তু সে এটাও বিশ্বাস করতো যে এই স্বার্থগুলিকে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং সামগ্রিক, বিকাশমান জাতীয় স্বার্থের মধ্যে একসূত্রে গাঁথা যেতে পারে, যার কয়েকটি প্রথম থেকেই এক ছিল। সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা ও সংঘাত বর্তমানে যতই তীব্র হোক না কেন, শেষপর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির লক্ষ্য যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটি জাতিতে মিশে যাওয়া, তা সে মানতো। এইভাবে, উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী একটি বিকাশমান ভারতীয় জাতির বৃহত্তর ধারণার মধ্যেই পৃথক সাম্প্রদায়িক অধিকার, রক্ষাকবচ, চাকরী ও আইনসভায় গুরুত্ব ও সংরক্ষণ, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, ইত্যাদী দাবী করতো। হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও খ্রীশ্চানদের চরম সাধারণ লক্ষ্যের ধারণার মতোই জাতীয় ঐক্যকে চরম লক্ষ্য রূপেও সে গ্রহণ করেছিল। এটা লক্ষণীয় যে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ এবং তাকে উৎসাহিত করা সত্ত্বেও, কোনো উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী দাবীই ভারতীয় ঐক্যের প্রতি সরাসরি বিপদ ডেকে আনেনি। উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, 'সম্প্রদায়গুলির ন্যায্য স্বার্থ' সংরক্ষণের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হলে সাম্প্রদায়িক আশঙ্কা ও সংঘাত দূর হয়ে যাবে, এই সম্ভাবনাও পোষণ করতো, এবং খুব কম সময়েই অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক শত্রুতা প্রচার করতো।[৮] তারা প্রধানত জোর দিতো নিজেদের সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকারের জন্য সংগ্রামের ওপর। কালক্রমে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের গ্যারান্টি পাওয়া গিয়েছে বলে মনে হলে, সে

গণতন্ত্র এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধীতার বৃহত্তর নীতি গুলিকে গ্রহণ করার দিকে ঝোঁকও দেখিয়েছিল। সে যুক্তি দিয়ে নিজের বক্তব্য রাখতো, এবং ১৯৩৭-এর পরের মুসলিম লীগ বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মত না হয়ে সে আলোচনা ও বিতর্কে যেতে রাজী ছিল। প্রকৃত রাজনীতিতেও, তার সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালানো যেতো। বস্তুত, ১৯২০-র দশকে, উদার-পন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একে অপরের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতো। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে, উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদের আরেকটি গুরুত্ব-পূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তা যুক্তিগ্রাহ্যতাকে ধরে রেখেছিল এবং তাই তার সারমর্ম, কর্মসূচী, মতাদর্শ, ইত্যাদী অনেক সময়েই তার আত্মপ্রকাশ থেকে বিশ্লেষণ করা যেতো।

সৈয়দ আহমদ খান, আলতাফ হুসেন হালি, বেশীর ভাগ সময়ে আলি ভ্রাতৃ-দ্বয়, মহম্মদ আলি ও শওকত আলি, ১৯৩৭-এর আগে এম. এ. জিন্না, বিশেষত ১৯২২-এর পর মদনমোহন মালব্য, ১৯২২-এর পর লাজপত রাই, বিশ ও ত্রিশের দশকে এন. সি. কেলকার—এরা সকলেই ছিলেন মোটামুটি উদারপন্থী সাম্প্র-দায়িকতাবাদী। বিশের দশকের শেষদিক পর্যন্ত মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা প্রধানত উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদই অনুসরণ করতো। দুটি সংগঠনই যথাক্রমে মুসলিম ও হিন্দুদের 'ন্যায়সঙ্গত' অধিকারের জন্য লড়াই করছে বলে দাবী করতো, কিন্তু অন্যদিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং একটি ভারতীয় জাতি ও ভারতীয় রাষ্ট্র গঠনের সমর্থক ছিল।

উদারপন্থী সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, ১৯১৩ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে অনুমোদিত মুসলিম লীগের সংশোধিত সংবিধানে বলা হয়, লীগের লক্ষ্য "ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার এবং স্বার্থ" রক্ষা ও প্রসার করা, "জাতীয় ঐক্য" এবং "ভারতের মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির ভেতর বন্ধুত্ব ও ঐক্যকে" সুদৃঢ় করা, এবং অন্যান্য "সম্প্র-দায়গুলির" সহযোগিতায় "ভারতের উপযুক্ত একটি স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা" অর্জন করা।[১০] ১৯১৩ সালের শেষে আগ্রা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে ইব্রাহিম রহমত-উল্লাহ্‌ বলেন :

> প্রত্যেককে এটা বুঝতে হবে যে দুটি প্রধান সম্প্রদায়, হিন্দু ও মুসলিম, যদি নিবিড়ভাবে ও বিবেকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে ভারতে কোনো ধরণের স্বায়ত্বশাসনই সম্ভব নয়। ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলার প্রচেষ্টার থেকে মহত্তর লক্ষ্য, উচ্চতর আকাঙ্খা আর কী হতে পারে! একবার যদি আমরা আন্তরিক ও প্রকৃতভাবে ঐক্যবদ্ধ হই, পৃথিবীতে কোনো শক্তি নেই যা আমাদের ঐতিহ্য থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারে···।[১১]

তরুণ আহম্মদ আলি এমন একজন উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীর উৎকৃষ্ট

উদাহরণ, যে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে জাতীয়তাবাদকে মেলানোর চেষ্টা করছে। ১৯১১ সালে কমরেড পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লেখেন যে কমরেড "মুসলিমদের প্রস্তুত করবে, তাদের আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা, যা ইসলামের মর্মবস্তু, তা একটুও না খুইয়ে জাতীয় স্তরের দেশপ্রেমে তাদের যথাযোগ্য অবদান রাখার জন্য" ।[১২] অন্যদিকে, ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারীতে তিনি লেখেন, "আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে হিন্দু ও মুসলিমদের চিন্তা ও অনুভূতিতে দূরত্ব রয়েছে", হিন্দু ও মুসলিমদের স্বার্থ "অভিন্ন" এই মতকে "বুলি" বলে বর্ণনা করেন, এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বকে সমর্থন করেন, এবং তার পাশাপাশি, জোর দিয়ে বলেন যে ধীরে ধীরে একটি একক ভারতীয় জাতি-সত্তার আবির্ভাব ঘটবে। দুটি দিককে একসঙ্গে ধরে তিনি লেখেন "ভারতীয় জাতিসত্তার বিবর্তনের প্রচেষ্টায় রত যেকোনো প্রকৃত ভারতীয় দেশপ্রেমিককেই তার গঠনমূলক প্রচেষ্টার ভিত্তি হিসাবে মুসলিমদের সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করতে হবে।"[১৩]

শেষ উদাহরণ হিসাবে ১৯৩৭ সালের আগেকার জিন্নাকে নেওয়া যেতে পারে। ১৯২৪ সালের মুসলিম লীগ অধিবেশনে তিনি দাবী করেন যে তাঁর লক্ষ্য হল "হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঝগড়ার জন্য নয়, মাতৃভূমির জন্য তার সঙ্গে ঐক্য ও সহযোগিতার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে সংগঠিত করা"। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে "একবার সংগঠিত হতে পারলে তারা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে হাত মেলাবে এবং বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে, হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই" ।[১৪] ১৯৩৬ সালেও, জিন্না উদারপন্থী সাম্প্রদায়িক অবস্থান নিয়েছিলেন এবং তাঁর জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় মুক্তির আকাঙ্খা ঘোষণা করেছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার কথা বলে-ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, লাহোরে ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে তিনি বলেন :

> আমি যাই করে থাকি না কেন, আপনারা নিশ্চিত থাকুন যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যেদিন আমি যোগ দিয়েছিলাম, তার পর থেকে আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি, এটুকুও না। হতে পারে কখনো কখনো আমি ভুল করেছি। কিন্তু তা কখনোই পার্টিজান মনোভাব নিয়ে করা হয়নি। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমার দেশের কল্যাণ। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে ভারতের স্বার্থকে আমি পবিত্র মনে করি এবং করবো, এবং কোনো কিছুই আমাকে এই জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও নড়াতে পারবে না।[১৫]

তা সত্ত্বেও তিনি মুসলিমদের আলাদাভাবে সংগঠিত হতে বলেন যাতে হিন্দুরা "মুসলিমদের গুরুত্ব" অনুভব করে এবং তাদের "ঐক্যের যোগ্য" বলে মনে করে। "যদি মুসলিমরা এক কণ্ঠে কথা বলে, হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে মীমাংসা ত্বরান্বিত হবে।" একই সঙ্গে, তিনি মুসলিমদের বলেছিলেন "সেইরকমই দৃঢ়-ভাবে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে দাঁড়াতে"। বস্তুত, তিনি বলেছিলেন, "তাদের

প্রমাণ করতে হবে যে তাদের দেশপ্রেমে কোনো খাদ নেই এবং ভারত ও তার অগ্রগতির জন্য তাদের ভালোবাসা দেশের অন্য কোনো সম্প্রদায়ের চাইতে কম নয়।"[১৬]

লালা লাজপত রাইও ১৯২০র দশকে তাঁর সাম্প্রদায়িকতাবাদী পর্যায়ে উদারপন্থী সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৫ সালে হিন্দু মহাসভার সভাপতির ভাষণে তিনি একইসঙ্গে হিন্দু ঐক্য ও সংহতি এবং হিন্দু-মুসলিম একতার কথা বলেছিলেন। হিন্দুরা মুসলিমদের মতো শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ হলেই কেবল মুসলিমরা তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজের জন্য হাত মেলাতে রাজী হবে।[১৭] ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষৌতে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় স্বরাজ্য পার্টি থেকে তাঁর পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদের মর্মকেই তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে অসহযোগের নীতি সফল হতে পারেনি মুসলিমরা তা সমর্থন করেনি বলে। এবং তিনি তারপর বলেছিলেন :

> মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের সম্প্রদায়ের জন্য কিছু অধিকার দাবী করে, যা মেনে নিলে হিন্দু সম্প্রদায়, এখনি না হলেও অন্তত ভবিষ্যতে, অধস্তন অবস্থানে চলে যাবে।···ঘটনাক্রমে, মুসলিমরা সরকারের দিকে চলে গেছে।···হিন্দুদের মধ্যে এমন কিছু ভালো লোক আছেন যারা মনে করেন যে গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের পুনর্ধর্মান্তকরণ এবং একটি সর্বব্যাপী, সর্বাত্মক হিন্দু নীতি শুধু বাঞ্ছিতই নয়, সম্ভবও বটে।···আমার মনে হয় এরকম নীতি অসম্ভব। তারপর রয়েছে স্বরাজ্য পার্টি···যার নেতা মনে করেন যে সংবিধান অনুসারে তিনি সাম্প্রদায়িকভাবে চিন্তা করতে পারেন না, অর্থাৎ তিনি কেবল অসাম্প্রদায়িকভাবেই চিন্তা করতে পারেন। একটি তৃতীয় পক্ষ রয়েছে, আমি যার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্মান পেয়েছি, যারা মনে করে যে জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায়বিচারের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই এবং হিন্দুদের অধিকারের মূল্যে ঐক্য কেনা যায় না।···আমি চাইনা যে হিন্দুরা এমন লোকেদের কাউন্সিলে পাঠাক যারা হিন্দু রাজের প্রবক্তা, অথবা যারা সরকারের সঙ্গে এক পাল্টা ঐক্যের পক্ষে। আমি চাই যে হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলী প্রকৃত জাতীয়তাবাদী, দৃঢ় দেশপ্রেমিক ও অবিচল হিন্দুদেরই নির্বাচন করবে, যারা এমন কোনো সমঝোতা করবে না বা এতটা জমি ছাড়বে না যাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান বিপন্ন হয়।

তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন সেই মৌলিক উদারপন্থী সাম্প্রদায়িক সেন্টিমেন্ট দিয়ে, যা সমসাময়িক মুসলিম ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও প্রকাশ করছিল : "আমি চাই আমার দেশ স্বাধীন হোক, কিন্তু আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে হিন্দু হিসাবে আমার মর্যাদা না হারিয়েই সেই স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। আমি প্রভুর

পরিবর্তন চাই না।"[১৮] সেই সময় থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বারবার এই স্লোগান ঘোষণা করেছেন : "হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা না করে কোনো স্বরাজ আসবে না।"[১৯]

এখানে উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ্য করা দরকার। বেশ কয়েকজন হিন্দু কংগ্রেসকর্মী ছিল, বিশেষত নেতৃত্বের মাঝারী স্তরে, গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক[২০], কিন্তু তাদের প্রকাশ্যে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে জনসমক্ষে উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী রূপে উদয় হতে হয়নি। একজন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীকে তা করতে হয়েছিল। সংখ্যালঘু উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিসাবে, সে জাতীয়তাবাদের আবরণে সহজে নিজেকে ঢেকে রাখতে পারতো না। তার কারণ, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ছিল একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ 'সম্প্রদায়ের' সাম্প্রদায়িকতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতা একই মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক আকার বা রূপ নিতে পারেনি ; তাদের মৌলিক ভিত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি এক হলেও রূপ আলাদা হতে বাধ্য ছিল। সংখ্যালঘু চরিত্রের জন্যই, সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা খোলাখুলিভাবেই এক আংশিক, সঙ্কীর্ণ, অগণতান্ত্রিক ও বিভেদপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল ; এবং তাকে 'সংখ্যালঘুর রক্ষাকবচ' ইত্যাদির বিষয়ে কথা বলতে হতো। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জানতো যে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা, যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী ইত্যাদি গণতান্ত্রিক নীতিগুলি তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীকে রূপায়ণ করার সুযোগ এবং তাদের মধ্য ও উচ্চশ্রেণীদের জন্য চাকরী ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা কব্জা করার ক্ষমতা দিতে পারতো। সুতরাং, তারা নিরাপদে ও সহজে জাতীয়তাবাদী মুখোশ পরে, বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদের মহান্ নীতিগুলির, যেমন সংকীর্ণ স্বার্থের ওপর জাতীয় স্বার্থকে স্থান দেওয়া, গণতন্ত্র, সুযোগের সমতা, মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা, ইত্যাদির, কথা বলতে পারতো। তারা সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয়তাবাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারতো। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তা পারতো না। তারা প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হতো। মহম্মদ আলির মতো একজন মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতা তাঁর সাম্প্রদায়িক পর্যায়ে প্রকাশ্যে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে তিনি প্রথমে মুসলিম, তারপর ভারতীয়। মদনমোহন মালব্যের মতো হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের তা করতে হয়নি[২১], যদিও যখন পৃথক সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য নির্বাচিত আইনসভা, অথবা কাশ্মীরে গণতন্ত্রের কথা উঠেছে, অর্থাৎ হিন্দুরা যেখানে সংখ্যালঘু এমন অবস্থায়, তাঁরাও একই নীতি নিয়েছেন।[২২] বস্তুত, এই দৃষ্টিকোণ থেকে, একজন সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মুসলিম বা শিখ ছিল একজন বিশিষ্ট ও দৃঢ় জাতীয়তাবাদী, কারণ জাতীয়তাবাদ ছাড়া তার জাতীয়তাবাদী হওয়ার আর

কোনো কারণ ছিল না; তার পক্ষে গোপনে সাম্প্রদায়িকতাবাদী হওয়া সম্ভব হতো না।[২৩]

কোনো ইতিহাস বা রাজনীতির ছাত্রের পক্ষে, বা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে, একজন জাতীয়তাবাদী এবং একজন উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীর মধ্যে জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক দাবীর প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্যের মতো সরল পার্থক্য রেখা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাকে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদের মুখোশধারী সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে প্রভেদ করতে শিখতে হবে। একজন জাতীয়তাবাদীর সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া চলবে না, যাতে সে একটি বিশেষ অংশের সঙ্গে মিলে যায় বা তার প্রতিনিধিত্ব করে। যারা জাতীয়তাবাদ বা একটি জাতির ধারণাকে গ্রহণ করতো তারা সবাই ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না; অনেকের মধ্যেই কমবেশি সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও আনুগত্য ছিল এবং কখনো কখনো একজন প্রকাশ্য সাম্প্রদাযিকতাবাদী মুসলিমের মতোই তাদের গভীরে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রবেশ করেছিল। তার ওপর, চরম ক্ষেত্রে, একজন সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা-বাদী 'বিচ্ছিন্নতাবাদের' দিকে চলে যেতে পারতো, কিন্তু একজন হিন্দু সাম্প্র-দায়িকতাবাদী 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হতো না; সে ভাবতো হিন্দু 'প্রভুত্বের' কথা। অন্যভাবে বললে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীর চেহারা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীর থেকে আলাদা হতো। তার জাতীয় ঐক্য এবং পারস্পরিক আস্থার ব্যাপারে কথা বলার ও তার ওপর জোর দেওয়ার সম্ভাবনা বেশী ছিল, কিন্তু সে একই রকম মারাত্মক সাম্প্রদায়িকতাবাদী হতে পারতো।[২৪] তাই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী-দের মতাদর্শ, মানসিকতা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করার জন্য উপযুক্ত বিশ্লেষণ দরকার। উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী পর্যায়ের মুসলিম লীগের সমস্তরের হিন্দু শক্তি হিন্দু মহাসভায় ছিল না, যার ফলে অনেক সময় জাতীযতাবাদী নেতৃত্ব হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে দুর্বল করে রাখা গেছে বলে আত্ম-সন্তুষ্ট থাকতো; জাতীযতাবাদী নেতৃত্ব এবং তাদের অনুগামীদের ভেতরেই নানা ধরণের ও নানা মাত্রার বহু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী আশ্রয় নিয়েছিল। জাতীয়-তাবাদের মুখোশধারী এই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া মুস-লিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ, এমনকি হয়তো সম্ভবও, হতো না, যা, তার ক্ষেত্রের বিশিষ্টতার জন্যই, প্রধানত জাতীয়তাবাদী শিবিরের বাইরে থেকে গিয়েছিল।

৩. উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা ফ্যাসিস্ট সাম্প্রদায়িকতাবাদ

উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ, বা সাধারণভাবে ফ্যাসিস্ট লক্ষণযুক্ত সাম্প্রদায়িকতা-বাদ, ছিল যৌক্তিকতাবর্জিত, ভয় ও ঘৃণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং রাজনৈতিক

বিরোধীদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে হিংসা বা সন্ত্রাসকে ব্যবহার করার দিকে তার একটা ঝোঁক ছিল। ত্রিশের দশকের শেষদিক পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি ছিল সঙ্কীর্ণ। জনগণ তখনো তাদের অভাব-অভিযোগ মেটানোর জন্য কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে থাকতো। তখনো পর্যন্ত, জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় অনুভূতি হিন্দু ও মুসলিম সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবী উভয়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৩৭-এর পরেই উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ উত্তরোত্তর গণভিত্তি অর্জন করে এবং জনমত গঠন করতে শুরু করে। ১৯৩৭-৩৮এ উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতা থেকে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, যখন মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আকারে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই তাদের মতাদর্শ ও রাজনীতিতে ফ্যাসিস্ট ও যুক্তিবর্জিত হয়ে পড়তে থাকে। এই সময় সাম্প্রদায়িকতাকে শহরের নিম্নমধ্য শ্রেণীর মধ্যে আক্রমণাত্মক, উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেন্দ্রীক এক গণ-আন্দোলন রূপে এবং একটি নতুন গণভিত্তিতে সংগঠিত করার চেষ্টা চলছিল, যা করা যেতো কেবল উগ্রপন্থা বা ফাসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা উভয়েই উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিসাবে নির্বাচনী প্রচার করেছিল এবং কম ভোট পেয়েছিল। নির্বাচনের ফল থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে কংগ্রেস গভীর গণভিত্তি অর্জন করেছে, তার কৃষি কর্মসূচী, জনসংযোগের কর্মসূচী এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যাকে সে দৃঢ়তর করার চেষ্টা করবে, এবং সাম্প্রদায়িক দলগুলি যদি জঙ্গী, গণভিত্তিক রাজনীতিতে না নামে তাহলে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে। এতদিন পর্যন্ত, র‍্যাডিকাল, বিদ্যমান অবস্থাবিরোধী জাতীয়তাবাদী, সমাজবাদী ও কমিউ-নিস্টরাই সংগঠিত গণ-আন্দোলন ও গণভিত্তিক রাজনীতি করতো। রক্ষণশীলরা গণ-আন্দোলন ও প্রকৃত সংগঠন থেকে দূরে সরে থাকতো। এখন ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের আকারে দক্ষিণপন্থী গণ-রাজনীতির এমন এক ধারা দেখা দিল, যার থেকে কায়েমী স্বার্থরা ভয় পেয়ে সরে যাবে না। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়ি-কতাবাদীরাই এই ধারাকে অনুসরণ করতে মনস্থ করলো। তার ওপর, কংগ্রেস তখনো জনগণের মধ্যে, বিশেষত মুসলিম জনগণের মধ্যে, শক্ত শিকড় গাড়তে পারেনি ; বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার আগে, এটাই ছিল তাদের রাজনৈতিক অপরি-পক্কতার সুযোগ নেওয়ার সময়। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সময় থেকেই মুসলিম লীগ ফ্যাসিস্ট-সাম্প্রদায়িকতাবাদের দিকে প্রথম মোড় নিল। ভি. ডি. সাভারকারের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা একইদিকে বাঁক নিলো। আর.এস.এস. প্রথম থেকেই ছিল ফ্যাসিস্ট লাইনে সংগঠিত ; কিন্তু ১৯৩৭ থেকেই তা মহারাষ্ট্রের বাইরে বেরোনোর ভালোরকম চেষ্টা শুরু করলো। এটা চিত্তাকর্ষক যে এই ফ্যাসিস্ট পর্যায়ে লীগ, মহাসভা এবং আর.এস.এস.-এর মোটামুটি স্থিতি-শীল সভাপতি থেকেছে, যারা ফুয়েরার (নেতা) রূপে কাজ করতে চেয়েছিল।[২৫]

সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিস্তৃতি ও স্তর, যার চরিত্র ও পদ্ধতি ছিল ফ্যাসিবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, এই সময় তীব্র হয়ে উঠেছিল। দক্ষতাসম্পন্ন ফ্যাসিবাদের অনুরূপ প্রচার অভিযান চালানো হতে লাগলো। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে বেশী করে যুদ্ধ ও শত্রুতার ভাষা প্রয়োগ করতে শুরু করলো। হিন্দু ও মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা ও প্রসার এবং কার্যকর রক্ষাকবচের দাবীর পরিবর্তে, তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন এবং তাকে রক্ষা করা দরকার, এই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হলো। চীৎকার করা শুরু হলো যে মুসলিমরা, মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলাম, এবং হিন্দুরা, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম, অবদমিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার বিপদের মুখোমুখি। এই পর্যায়েই উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই তত্ত্ব হাজির করলো যে হিন্দু ও মুসলিমরা আলাদা জাতি, যাদের পরস্পর বিরোধিতা স্থায়ী এবং সমাধানের অযোগ্য।[২৬] উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এমনভাবে ভারতীয় বা হিন্দু জাতির সংজ্ঞা দিলো যাতে মুসলিমরা চিরকাল তার পরিধির বাইরে থাকে।[২৭] মুসলিমদের দেখা হলো ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এক চিরকালীন বৈরী ও বিজাতীয় অংশ রূপে যারা 'বিদেশী' হিসাবে হয় হিন্দুদের কাছে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করবে অথবা মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করবে নয়তো বহিষ্কৃত হবে।[২৮]

উগ্র মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এর উত্তরে এই তত্ত্ব উপস্থিত করলো, যে ভারতীয় মুসলিমরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু নয়, একটি পৃথক জাতি। তারা একতরফা-ভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে একটি হিন্দু ও ফ্যাসিস্ট সংগঠন বলে চিহ্নিত করলো এবং ঘোষণা করলো যে ভারতে যে কোনো গণতান্ত্রিক শাসনের মানেই হচ্ছে হিন্দুরাজ।[২৯] মুসলিম লীগ এখন খোলাখুলিভাবেই জাতীয় ঐক্য, ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন, গণতন্ত্র ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ত্যাগ করলো।[৩০]

উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনৈতিক অবস্থানের আবেদন ছিল মূলত যুক্তি-বর্জিত ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি ও ভয়ের কাছে। কম সময়েই সেগুলিতে যুক্তি বা ইতি-হাসচেতনা থাকতো। ধরেই নেওয়া হতো যে সেগুলি সত্যি এবং শুধু প্রমাণ করা দরকার। সেগুলি সত্যি বলে ঘোষণা করা হতো কেবল গলার জোরে এবং বারবার আউড়ে গিয়ে। সাম্প্রদায়িক নেতাদের লেখা ও বক্তৃতাগুলি হতো বুদ্ধি-বৃত্তি ও যুক্তির দিক দিয়ে ফাঁকা এবং অনেকসময়েই তা প্রশ্নোত্তরমূলক হত।[৩১] ফ্যাসিস্টদের মতোই তাদের বাক্যগুলি হতো 'অর্থবর্জিত, কেবল উদ্দেশ্যপূর্ণ'। ডব্লু. সি. স্মিথ জিন্নার সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ক্ষেত্রেও সত্যি ছিল :

> যুক্তির দিক থেকে, চেষ্টাটা ছিল শ্রোতাদের কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিঃসংশয় করা নয়, কোনো মতান্তরই হতে পারে না এমন কতগুলি

বিষয় আলোচনা করার জন্য তাদের ব্যবহার করে তাদের মনে কিছু চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া। আপত্তিটা উঠতে পারতো যা বলা হচ্ছে তার সম্পর্কে নয়, যেভাবে বলা হচ্ছে তার সম্পর্কে। সেটা অনেক বেশী কঠিন, এবং তার সম্ভাবনা ছিল কম। বারবার একই ইঙ্গিত দিয়ে, বক্তা চেষ্টা করতেন জনগণ যাতে মনে করতে থাকে যে মুসলিম লীগ ভারতের মুসলিমদের সমার্থক, কংগ্রেস ভারতের হিন্দুদের সমার্থক, এবং যে সমস্যাটার সমাধান দরকার তা হলো এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাত। সমালোচকরা দ্বিমত হতে পারতো জিন্নার উত্তরগুলির সঙ্গে নয়, তাঁর প্রশ্নগুলির সঙ্গে।

মুসলিম লীগ কোনো সময়েই কাউকে নিঃসংশয় করতে চেষ্টা করেনি যে সে ভারতের সমস্ত মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করছে। সে মনে করত যে সে তাই করছে, এবং তার থেকে বেরিয়ে আসে এমন কতগুলি বিষয়ে লোককে নিঃসংশয় করার চেষ্টা করেছিল। জনমনস্তত্ত্বে চতুর প্ররোচনা যুক্তির চেয়ে শক্তিশালী।[৩২]

উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা রাজনৈতিক চিন্তা গঠন না করে রাজনীতি করেছিল[৩৩] এবং কর্মসূচীর বদলে রাজনৈতিক কৌশলের ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছিল।[৩৪] তারা তাদের কর্মসূচীকে অস্পষ্ট রেখেছিল অথবা আশু রাজনৈতিক প্রয়োজন বা হাতের কাছের শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে দায়সারাভাবে দাঁড় করিয়েছিল। বস্তুত, তাদের কোনো বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কর্মসূচীই ছিল না। এই দুর্বলতাকে ঢাকতে চাওয়া হয়েছিল সমসাময়িক বিষয়গুলি সম্পর্কে নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে বা কংগ্রেস এবং অন্য 'সম্প্রদায়গুলির' প্রতি বর্বর আক্রমণ করে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এমনভাবে হিন্দু সংস্কৃতি ও জাতীয়তার সংজ্ঞা দিয়েছিল যাতে তাদের যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা না ওঠে। আর.এস.এস.-এর কর্মসূচী তিনটি যথাসম্ভব অস্পষ্ট, প্রায় কিম্বদন্তীমূলক কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল: শৃঙ্খলা, চরিত্র এবং ভারতীয় সংস্কৃতি। আর.এস.এস. এবং ভি. ডি. সাভারকারের 'হিন্দুত্ব' ও 'উই' নামে দুটি পুস্তিকা বাদ দিলে প্রায় আর কোনো লেখাই পাওয়া যায় না। পঞ্চাশের দশকের আগে আর.এস.এস. এমনকি তার নেতার কোনো বক্তৃতাও প্রকাশ করেনি।[৩৫]

মুসলিম লীগ প্রথমে কোনো সত্যিকারের দাবী তুলে ধরতেই অস্বীকার করেছিল এবং ১৯৪০ সালে যখন পাকিস্তানের দাবী করেছিল তখন পাকিস্তানের সংজ্ঞা, তার ভৌগোলিক সীমা, বা এমনকি তার মধ্যে একটা না দুটো রাজ্য থাকবে তাও পরিষ্কার করে বলতে অস্বীকার করেছিল। নিজের দাবীকে ব্যাখ্যা করতে বা তা নিয়ে আলোচনা করতে রাজী হওয়ার আগেই সে চেয়েছিল যে তার দাবী মেনে নেওয়া হোক। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪১-এর এপ্রিলে যখন রাজেন্দ্র-

প্রসাদ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করেছিলেন যে তিনি পাকিস্তান পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত যদি তার চরিত্র ও বিশদ বিবরণ জানানো হয়, জিন্না উত্তর দিয়েছিলেন, "কংগ্রেস আগে মনস্থির করে লাহোর প্রস্তাবের মূল নীতিগুলি গ্রহণ করুক" এবং "আগে ভারত ভাগের নীতিতে একমত হওয়া দরকার, তার পরেই একমাত্র সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার পন্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।"[৩৬] উপরন্তু, ১৯৩৭ থেকে জিন্নার নেতৃত্বে লীগ যে কোনো রাজনৈতিক আলোচনা বা আপোষরফাকেই ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে, যদি না গোড়া থেকেই তাকে সমস্ত ভারতীয় মুসলিমদের একমাত্র প্রকৃত ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন বলে মেনে নেওয়া হয়, এবং এইভাবে একতরফা চেষ্টা চালিয়েছে যাতে জাতীয় কংগ্রেস নিজেকে একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিবর্তিত করে এবং তা ঘোষণা করে।[৩৭] এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে কংগ্রেসের পক্ষে এই দাবী মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ, রাজেন্দ্রপ্রসাদের কথায়, কংগ্রেসের পক্ষে নিজেকে একটি হিন্দু সংগঠন হিসাবে মেনে নিলে "তার নিজের অতীতকে অস্বীকার করা, তার ইতিহাসকে বিকৃত করা, এবং তার ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবা হবে।"[৩৮] এটা হবে কংগ্রেস এবং ভাবতীয় জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক আত্মহত্যার সামিল।[৩৯]

দুটি উগ্র সাম্প্রদাযিকগোষ্ঠী এইসময় বিপরীত 'সম্প্রদায়ের' প্রতি সম্পূর্ণ বিরোধীতা ও বিদ্বেষ প্রচার করতে থাকলো। তারা অন্য সম্প্রদায়কে "তীব্র অনুভূতি, ভয়, বিতৃষ্ণা ও তিক্ত ঘৃণা"[৪০] নিয়ে আক্রমণ করতে থাকলো। উদারপন্থী সাম্প্রদাযিকতাবাদীদের বিপরীতে, তাবা ঘোষণা করলো যে হিন্দু ও মুসলিমদেব মধ্যে সংহতি দূরে থাক, কোনো মীমাংসা, বোঝাপড়া বা সহাবস্থানই সম্ভব নয়। তারা নিজের নিজের 'সম্প্রদায়ের' মধ্যে এমনকি লুপ্ত হয়ে যাওযার ভয়ের উদ্রেক করলো।[৪১] তাবা ক্ষেত্র অনুসারে হিন্দু বা মুসলিমদের প্রতি, এবং কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রতি এক তীব্র ঘৃণার অভিযান শুরু করলো, বিশেষত, তাদের নিজেদের 'সম্প্রদায়ের জাতীযতাবাদীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করলো। তাদের নীতি ছিল, মিথ্যার আকার যত বিরাট হয় ততই ভালো। এইভাবে, গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদীদের উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা চিহ্নিত করলো প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু জাতির' প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও তার শত্রু হিসাবে,[৪২] এবং একইভাবে লীগের নেতা ও প্রচারকরা চিহ্নিত করলো মুসলিমদেরও ইসলামের শত্রু হিসাবে, যারা মুসলিমদের পদানত ও তাদের সংস্কৃতিকে অবদমিত করে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান এবং হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।[৪৩] মৌলানা আজাদ ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদীবা, যারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছিলেন, তাদের মুসলিম লীগের লোকজন কংগ্রেসের শিখণ্ডী, ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতক এবং হিন্দুদের ভাড়াটে সৈন্য বলে অভিহিত করলো; তাঁরা ধর্মান্ধ-

তার প্রতি আবেদনের ফলে জাগ্রত সামাজিক সন্ত্রাসের কাছে নতিস্বীকার করলেন[৪৪], এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দ্বারাও আক্রান্ত হলেন।[৪৫] দু'পক্ষের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই এক অধিকতর জনপ্রিয় স্তরে হিটলারের অনুকরণ করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে অভিযোগ করেছিল—একটি "বণিক কেন্দ্র" স্থাপন করার, "বণিক সাম্রাজ্যবাদ" কায়েম কবার এবং সমস্ত মুসলিমদের হিন্দু ধনপতিদের দাক্ষিণ্যনির্ভর "এক মজুরের জাতে" পরিণত করার[৪৬] তা ছিল ইহুদী ধনবাদের তত্ত্বেরই ভারতীয় সংস্করণ। অন্যদিকে, ভি. ডি. সাভারকার "অ-হিন্দু আগ্রাসনকারীদের হাতে" হিন্দু কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদেব দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী দিয়েছিলেন।[৪৭] ১৯৩৮ সালে এবং তারপর মুসলিম লীগ বিরাট মিথ্যার নীতির ভিত্তিতে এক বিষাক্ত প্রচার অভিযান চালিয়ে কংগ্রেসকে মুসলিমদের ও ইসলামকে অবদমনের এবং মুসলিমদেব প্রতি অকথ্য অত্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত করে।[৪৮] হিন্দু উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একইভাবে এবং একই মাত্রায় মধ্যযুগের ইতিহাসকে বিবাট মিথ্যা হিসাবে কাজে লাগায়।

ফ্যাসিবাদ ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে সম্পর্কটা অবশ্যই কার্য-কারণের ছিল না। দুটো এক জিনিষও ছিল না। দুটোর সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে বিশাল পার্থক্য ছিল। এও বলা যায় না যে আর এস.এস., খাকসার, এবং কয়েকজন লীগ প্রচারকদের কথা বাদ দিলে, শেষেরটি আগেরটিকে সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে মডেল হিসাবে ব্যবহার করছিল। তা সত্ত্বেও পরেরটির ওপর আগেরটির প্রভাব ছিল গভীব, বিশেষত রাজনৈতিক কৌশল ও প্রচার, নেতার গুণকীর্তন, এবং আর.এস.এস. ও খাকসারদের ক্ষেত্রে, সংগঠনের স্তরে, এবং প্রায় এই সমস্ত দিক থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এটা অবশ্য খুব কমই প্রকাশ্যে স্বীকার করা বা বলা হত, একমাত্র আর.এস.এস. তার শাখাগুলিতে যুবকদের আকৃষ্ট করার জন্য গোপনে তা করতো। এর কারণ ছিল ভারত তখন ব্রিটিশ শাসনাধীন, এবং জাতীয়তাবাদীরা এবং বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিবাদকে একটা নোংরা কথা বলে মনে করতো, বিশেষত ১৯৩৫ সালের পর। তা সত্ত্বেও, নাজিদের কথা ও সূত্রাবলী কখনো কখনো লেখার শব্দের মধ্যে সরাসরি প্রতিধ্বনি তুলতো। ১৯৩৯-এ লেখা 'উই'-তে এম. এস. গোলওয়াকার বলেছিলেন যে ইতালী ও জার্মানী হলো দুটি দেশ যেখানে "প্রাচীন জাতির আত্মা" "পুনরুজ্জীবিত হয়েছে"। "আমাদের এখানেও তাই : আমাদের জাতির আত্মা আবার জেগে উঠেছে", এবং হিন্দুদের অধিকার দিয়েছে মুসলিমদের "বহিষ্কৃত" করার। তিনি আরো বলেন :

> জার্মান জাতির গরিমা আজ সবার আলোচনার বিষয়। জাতি ও সংস্কৃতিকে খাঁটি রাখার জন্য জার্মানী বিশ্বকে চমকে দিয়েছে দেশ থেকে সেমিটিক জাতির লোকেদের—ইহুদীদের—বহিষ্কার করে দিয়ে। এখানে জাতির

গরিমার উচ্চতম রূপ দেখা গেছে। **জার্মানী এটাও দেখিয়ে দিয়েছে যে মূলগতভাবে পৃথক জাতি ও সংস্কৃতিগুলির পক্ষে মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া কতখানি অসম্ভব, যা আমাদের হিন্দুস্থানের লোকেদের একটি লাভজনক শিক্ষা দেয়।**[৫০] (জোর আরোপিত)

অনুরূপভাবে, মুসলিম লীগের একটি সাংগঠনিক প্রকাশনায় ঘোষণা করা হয়েছিল: পণ্ডিত জওহরলালের ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে সফরগুলিকে ইহুদী সংবাদ সংস্থা রয়টারের জোরদার প্রচারের সাহায্য নিয়ে বামপন্থী গোষ্ঠীরা চতুরভাবে উপস্থাপিত করেছিল।[৫১] সিন্ধুর লীগ নেতা এম. এইচ. গজদর ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে করাচীতে লীগের এক সভায় বলেছিলেন: "হিন্দুরা যদি ঠিকমত ব্যবহার না করে তবে জার্মানী থেকে ইহুদীদের যেমন দূর করে দেওয়া হয়েছে, তাদেরও তাই করতে হবে।"[৫২]

ফাসিবাদের একটি মৌলিক অঙ্গ হলো ফ্যাসিস্ট দুষ্কৃতকারীদল ও ঝটিকাবাহিনীর ভূমিকা, এবং হিংসাব আবহাওয়া ও বিরোধীদের প্রতি বিশেষ হিংসার ভূমিকা। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে 'শক্তিমত্তা' ও হিংসা এবং শৃঙ্খলা ও আনুগত্যকে রাজনৈতিক প্রয়োজনের থেকেও বেশী করে মহিমান্বিত করার ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। তারা হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের মধ্যেই এবং সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নিজস্ব ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে ঘৃণা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও হিংসার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে হিংসার আশ্রয় নিতে পারেনি কারণ যুদ্ধের সময় ভারতকে ভারতরক্ষা আইনের অধীনে কড়া শাসনে রাখা হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশরা কিছুতেই সাম্প্রদায়িক হিংসাকে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটাতে দিতে পারতো না। কিন্তু ফাসিবাদের অনুরূপ সাম্প্রদায়িক হিংসা, দাঙ্গা ও দলবদ্ধ আক্রমণ—অর্থাৎ, একতরফা আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড—সর্বশক্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ১৯৪৬-৪৭ সালে, যখন ঔপনিবেশিক শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং কঠোরভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাতেও তার আর কোনো স্বার্থ নেই। এইসব দাঙ্গা ও দলবদ্ধ আক্রমণগুলিতে ফ্যাসিস্ট যুব স্বেচ্ছাসেবক গোষ্ঠীগুলি অনেক সময়েই উদ্যোক্তা ও প্রধান সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিল।

এটা লক্ষ্যণীয় যে একাধিক সমসাময়িক পর্যবেক্ষক উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে তখনকার ফ্যাসিবাদের মিল লক্ষ্য করেছিলেন।[৫৩] কেউ কেউ এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে ১৯৩৭ সাল থেকে সাম্প্রদায়িকতা এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছিল।[৫৪] অনেক উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী এই পরিবর্তন সম্পর্কে যে অবহিত ছিলেন, সেটা দেখা গিয়েছিল তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার মাধ্যমে।

এই উগ্র পর্যায়ের সময়েই সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় সমাজে গভীরভাবে প্রবেশ

করে এবং অনেক ব্যক্তি, যাদের মতাদর্শগত গঠনে সাম্প্রদায়িকতার ভাগ ছিল, এই সময় পুরোদস্তুর সাম্প্রদায়িকতাবাদী হয়ে ওঠে।

[চার]

আমাদের অবশ্যই, সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন রূপ ও পর্যায়ের মধ্যে কেবল পার্থক্য-গুলিই নয়, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ও ধারাবাহিকতাও দেখতে হবে। তাদের মধ্যে কোনো কঠিন প্রাচীর ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতা শেষ পর্যায়ের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বৃহত্তর কাঠামোর ভেতরে এবং বাইরেও থেকে গিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, এন. সি. চ্যাটার্জি, শিকান্দার হায়াত খান, চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং খিজর হায়াত তিওয়ানা ১৯৩৭ সালের পরবর্তীকালে এই ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কমিউনিস্ট পার্টি পাকি-স্তানের দাবী সমর্থন করার পর, কিছু বামপন্থী ব্যক্তিও লীগে যোগ দিয়েছিল; এবং কিছুদিনের মধ্যেই লীগের ভিতরে একটি বাম ধারা গড়ে উঠেছিল, যা ছিল পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে দুর্বল ও বাংলায় শক্তিশালী। কিন্তু শেষ পর্যায়ে প্রধান ধারাটি ছিল উগ্রপন্থী ফ্যাসিস্ট ধারা ঠিক যেমন আগে উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাই ছিল প্রধান।

বিভিন্ন পর্যায়কে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে একেবারে এক করে দেখাও যায় না। এক শ্রেণী বা রূপের থেকে আরেক শ্রেণী বা রূপে নেতা ও ব্যক্তিরা অনায়াসে চলে যেতো। মদনমোহন মালব্য, লাজপত রাই ও মহম্মদ আলি তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী ও উদার-পন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমনকি সাভারকারও একটি উদারপন্থী পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। জিন্নার রাজনৈতিক জীবন তিনটি পর্যায়ের ভেতর দিয়েই গিয়েছিল, এবং তিনি সত্যিই আশা করেছিলেন স্বাধীন পাকিস্তানে আবার উদারপন্থী পর্যায়ে ফিরে যাওয়ার, যা তাঁর ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট বক্তৃতায় দেখা যায়। অনুরূপভাবে, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ ১৯৩৭ সালের আগে ছিল উদারপন্থী সাম্প্রদায়িক সংগঠন। ত্রিশের দশকের মধ্যভাগের আগে এদের প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের খুব বৈরিতাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করতে না পারার এটা একটা কারণ। উদারপন্থী থেকে উগ্রপন্থী পর্যায়ে চলে যাওয়াটা যেমন দীর্ঘায়ত ছিল, তেমনি তা ধরতে পারাও ছিল কঠিন বিশেষত মুসলিম লীগের ক্ষেত্রে। জাতীয়তাবাদীদের তার প্রতি একটি সঠিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি নিতে না পারার এটা ছিল আর একটা কারণ।

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ উদারপন্থী ও উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদকে পুষ্ট করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো কঠিন করে তুলে-

ছিল। সেগুলি আবার জাতীয়তাবাদী শিবিরে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা-বাদের জন্ম দিয়েছিল। অনুরূপভাবে, উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতার যুক্তি ক্রমাগত উগ্র সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল, কারণ একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং বিদেশী শাসনের অনুপস্থিতিতে পৃথক সাম্প্রদায়িক 'স্বার্থ', 'রক্ষাকবচ', 'সংরক্ষণ' ইত্যাদির কোনো গ্যারান্টিই থাকতে পারতো না। ঔপনিবেশিক শাসকরা চলে যাবে, একবার এটা পরিষ্কার হয়ে যেতেই, যে উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু বা মুসলিমদের 'বিশেষ অধিকার' রক্ষা করতে চাইছিল, তাদের হয় ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে হতো, নয় ক্রমাগত উগ্র সাম্প্রদায়িকতার দিকে সরতে হতো।

টীকা

১। মোহন শাবির, 'খিলাফত টু পার্টিশন', পৃঃ ১৮১-৮২-তে উদ্ধৃত।

২। সৈয়দ মহম্মদ মিয়া, 'উলেমা-ই-হক...' খণ্ড ২, পৃঃ ১৩৭-৩৮।

৩। ঐ, পৃঃ ১৬৪-৬৫।

৪। এস এস পিরজাদা (সম্পাঃ), 'ফাউণ্ডেশনস্ অফ পাকিস্তান...' খণ্ড ১, পৃঃ ৩৩৫-৩৬। অনুরূপভাবে, মহম্মদ আলি তার জাতীয়তাবাদী পর্যায়ে গোল টেবিল বৈঠকে বলেছিলেন : "যেখানে ঈশ্বর নির্দেশ দেন, সেখানে আমি প্রথমে মুসলিম, তার পরেও মুসলিম শেষেও মুসলিম ; এবং মুসলিম ছাড়া আর কিছুই না।" "কিন্তু ভারতের প্রশ্নে, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে...আমি প্রথমে ভারতীয়, তারপরেও ভারতীয়, এবং ভারতীয় ছাড়া আর কিছুই না।" 'সিলেক্টেড স্পীচেস্ অ্যাণ্ড রাইটিংস্', পৃঃ ৪৬৫। এই মতের এক সাম্প্রতিক সারসংকলনের জন্য দেখুন, আবিদ হুসেন, 'দ্য ডেসটিনি অফ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্', পৃঃ ১০০।

৫। 'দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, ১৮৫৭'। বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন : "বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক অংশের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলেও, তার গঠনমূলক অংশ তত আকর্ষণীয় ছিল না।...ব্যাপক জনগণের সামনে যদি তাদের চিত্তাকর্ষক এক নতুন আদর্শ পরিষ্কারভাবে রাখা যেতো, বিপ্লবের বিকাশ ও পরিণতিও তার শুরুর মতোই সফল ও উজ্জ্বল হতো।" ঐ, পৃঃ ৫৪২।

৬। উদাহরণস্বরূপ : মুসলিম লীগের মহম্মদ আলি ও হাকিম আজমল খান, হিন্দু মহাসভার লাজপত রায় ও মদনমোহন মালব্য, এবং সেন্ট্রাল শিখ লীগের মঙ্গল সিং, শার্দুল সিং কাভীশের ও খড়ক সিং।

৭। এটা বিশেষভাবে সত্যি ছিল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রে, যখনই তারা চাকরী সংরক্ষণের মতো সাম্প্রদায়িক দাবীগুলি নিয়ে লিখতো।

৮। ১৯০৬ সালে সারা ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে বিশেষভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিল "ভারতের মুসলমানদের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়গুলির প্রতি কোনো বিদ্বেষভাব জেগে ওঠাকে রোধ করার"। এস. এস. পিরজাদা, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ৬। হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ বিশের দশকে অনেক সময়েই এইরকম মত প্রকাশ করেছে।

৯। বিশের দশকের শেষদিকের এম. এ. জিন্না অন্তত ততখানি ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী ছিলেন, যতখানি ছিলেন এম. এম. মালব্য। তিনি চেয়েছিলেন যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেই হিন্দু ও মুসলিমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে।

১০। এস. এস পিরজাদা, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ২৫৮, ২৭৯।

১১। ঐ, পৃঃ ৩০৫। ১৯১৩-র (লক্ষ্ণৌ) অধিবেশনে আর একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল, যাতে "ভারতের জনগণের ভবিষ্যত বিকাশ ও প্রগতি নির্ভর করছে একান্তভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ কাজকর্ম ও সহযোগিতার ওপর, এই দৃঢ় বিশ্বাস" এবং "দুপক্ষের নেতারা নিয়মিত আলোচনায় বসবেন…জনকল্যাণের প্রশ্নে যৌথ ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে খুঁজে বার করার জন্য", এই আশা প্রকাশ করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবে "হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক ব্যবধানকে বাড়িয়ে দেওয়ার সমস্ত দুষ্ট প্রয়াসের" নিন্দা করা হয়েছিল। ঐ, পৃঃ ২৮১।

১২। 'সিলেক্‌শনস্ ফ্রম মহম্মদ আলি'স কমরেড', পৃঃ ৩৯।

১৩। 'সিলেক্টেড রাইটিংস্ অ্যাণ্ড স্পীচেস্', পৃঃ ৬৮-৬৯। অনুরূপভাবে, এর আগে ১৯ অগাস্ট ১৯১১ সালের 'কমরেড'-এ তিনি লিখেছিলেন যে মুসলিমদের সমস্ত আকাঙ্খা রয়েছে "দেশপ্রেমিক ভারতীয় হিসাবে বাস করার ও কাজ করার, এবং এমন একটি জাতির জন্য কাজ করার, তারা যার অন্তর্ভুক্ত অথচ সচেতন অংশ হবে। কিন্তু ভারতীয় জনতার একাংশের নতুন গজিয়ে-ওঠা 'জাতীয়তাবাদ' এবং সংবাদপত্রগুলি তাদের যে দ্বিতীয়শ্রেণীর অবস্থানে ঠেলে দিতে চাইছে তাকে তারা ভয় পায়"। মুসলিমরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা সংগঠিত করছে যাতে তারা "এই দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের যে ব্যাপক প্রক্রিয়া চলছে তাতে খানিকটা সমতার ভিত্তিতে অংশ নিতে" সক্ষম হয়। ফ্রান্সিস রবিনসন, 'সেপারেটিসম্ অ্যামাং ইণ্ডিয়ান মুসলিম', পৃঃ ২০০-০১-এ উদ্ধৃত।

১৪। রাম গোপাল, 'ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্', পৃঃ ১৬৩-এ উদ্ধৃত।

১৫। এস. গোপাল, 'জওহরলাল নেহরু - আ বায়োগ্রাফি', খণ্ড ১, ১৮৮৯-১৯৪৭, পৃঃ ২২৩, পাদটিকা ৫-এ উদ্ধৃত।

১৬। জেড. এইচ. জাইদি, "আসপেক্টস অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ মুসলিম লীগ পলিসি, ১৯৩৭-৪৭", পৃঃ ২৫০-এ উদ্ধৃত। অনুরূপভাবে, অগাষ্ট ১৯৩৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন : "মনে রেখো, ভারতের মুক্তি নিহিত আছে সব সম্প্রদায়ের, বিশেষত হিন্দু ও মুসলিমদের, ঐক্যের ভেতর, তা ছাড়া ভারতের কোনো অগ্রগতিই সম্ভব নয়।…তোমাদের ওপরে, কি হিন্দু, কি মুসলিম, কি পার্সী, কি খ্রীশ্চান, তোমাদের ওপরেই হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়, ভারতীয় হিসাবে সমাধান খুঁজে বার করার দায়িত্ব রয়েছে"। ঐ, পৃঃ ২৫১, পাদটিকা ১। আরো দেখুন, ১৯৩৬-এ লীগের বম্বে অধিবেশনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি করিমভাই এব্রাহিমের ভাষণ, এস.এস. পিরজাদা, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ২, পৃঃ ২৩৬-৩৮-এ উদ্ধৃত।

১৭। ইন্দ্রপ্রকাশ, 'আ রিভিউ অফ দ্য হিস্ট্রী অ্যাণ্ড ওয়র্ক অফ দ্য হিন্দু মহাসভা অ্যাণ্ড দ্য হিন্দু সংগঠন মুভমেণ্ট', পৃঃ ১৭।

১৮। 'রাইটিংস্ অ্যাণ্ড স্পীচেস', খণ্ড ২, পৃঃ ৩১৮-২০।

১৯। 'দ্য ট্রিবিউন', ২৮ অক্টোবর ১৯২৬। আরো দেখুন ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সংখ্যা।

২০। এর সঙ্গে দেখুন, জওহরলাল নেহরু, 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি', পৃঃ ১৩৬ ; "অনেক কংগ্রেসকর্মীই ছিল তাদের জাতীয়তাবাদী আবরণের নীচে সাম্প্রদায়িকতাবাদী।" নেহরু অবশ্য সঠিকভাবেই যোগ করেছিলেন : "কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল,

এবং, ভোটের ওপর, কোনো সাম্প্রদায়িক দল বা কোনো সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর পক্ষ নিতেই অস্বীকার করেছিল।"

২১। যাই হোক, কিছু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী এমনকি এটাও জোর দিয়ে বলেছিল। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, লাল চাঁদ, 'সেল্ফ্ অ্যাবনিগেশন ইন পলিটিক্স', পৃঃ ৭০ : "একজন হিন্দুকে শুধু এটা বিশ্বাস করলেই চলবে না, তার শরীরের, তার জীবনের ও তার ব্যবহারের অঙ্গ করে নিতে হবে যে, সে প্রথমে হিন্দু তারপর ভারতীয়।"

২২। অনুরূপভাবে, পাঞ্জাব ও বাংলায়, অনেক কংগ্রেস নেতা বা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করতো, এবং একইসঙ্গে চাকরী, সাংবিধানিক আলোচনা বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে 'হিন্দু স্বার্থ'-কে তুলে ধরতো।

২৩। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার যে জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি ও জাতীয়তাবাদী ছিল। শেষপর্যন্ত তারা রাজনৈতিকভাবে 'ব্যর্থ' হয়েছিল বলে আমরা প্রায়ই তাদের চরিত্র ও অবদানের কথা ভুলে যাই। কিন্তু একজন উর্দু কবি যেমন বলেছিলেন : "জমানে কি নজর মে কামইয়াবী আসলি মনজিল হ্যায় ; জমানে কি নজর জাহেদ-এ মুসলসিল পে নহীঁ পড়তি।" (পৃথিবীর চোখে সাফল্যটাই আসল লক্ষ্য ; অবিরত যে যুদ্ধ চলছে, পৃথিবী তার দিকে তাকিয়েও দেখে না)।

২৪। বিশ ও ত্রিশের দশকের কিছু রাজনৈতিক নেতা এই দিকটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন। যেমন, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, যিনি সে সময়ে জাতীয়তাবাদী মুসলিম ছিলেন, সেপ্টেম্বর ১৯৩৪-এ ডঃ আনসারিকে লিখেছিলেন, "মালব্যজী ও আনী যদি জাতীয়তাবাদী বলে দাবী করতে পারেন, তবে আমার মনে হয় প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক মুসলিম যে সরকারী দাক্ষিণ্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থের তোয়াক্কা না রেখে সততার সঙ্গে নিজের সম্প্রদায়ের অধিকারের জন্য লড়াই করে, সে-ই জাতীয়তাবাদী।" তা ছাড়া, উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিল না।

২৫। অবশ্যই, হেডগেওয়ার, জিন্না ও সাভারকারকে ঘিরে এক নেতাকেন্দ্রীক আচার গড়ে ওঠার একটা কারণ ছিল, তাঁদের তিনজনেরই কিছুটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অতীত ছিল এবং তাঁরা ঔপনিবেশিক, শাসকদের ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এ ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন বেশীরভাগ উদারপন্থী সাম্প্রদায়িক নেতাদের থেকেই আলাদা।

২৬। ভি. ডি. সাভারকার, 'হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন', পৃঃ ২৭ ও ৬৪, ভাই পরমানন্দ, 'দ্য ট্রিবিউন', ২৭শে জুন ১৯৩৬ এবং ইন্দ্রপ্রকাশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ xxxiv ; এম এস. গোলওয়ালকার, 'উই', পৃঃ ১৯-২০, ২৬-২৭, ৫২, ৬২, ৭৩ ; এম. এ. জিন্না, 'স্পীচেস্ অ্যান্ড রাইটিংস্', খণ্ড ১, পৃঃ ১১৬-১৭, ১৬০-৬২।

২৭। দেখুন, ভি. ডি সাভারকার, 'হিন্দুত্ব' এবং এম এস. গোলওয়ালকার, 'উই'।

২৮। এম এস. গোলওয়ালকার, 'উই' পৃঃ ১৯, ৫২-৫৬, ৬২। কয়েকটি অনুচ্ছেদ লক্ষ্যণীয় : "প্রাচীন হিন্দু জাতিই হিন্দুস্থানে বর্তমান, এবং বর্তমান থাকা উচিৎ ; হিন্দু জাতি ছাড়া আর কিছুই নয়।...এতদিন পর্যন্ত, যেভাবেই হোক, যেহেতু তারা [মুসলিম ও অন্যান্য অ-হিন্দুরা] তাদের জাতিগত, ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য বজায় রেখেছে, তারা বিদেশী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।...বিদেশীদের সামনে কেবল দুটি পথ খোলা আছে, হয় দেশীয় জাতির সঙ্গে মিশে যাওয়া এবং তার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা, নয়তো দেশীয় জাতির সদিচ্ছার ওপর বেঁচে থাকা...হয় তাদের আর বিদেশী হয়ে থাকা চলবে না, নয় তাদের হিন্দু জাতির কাছে পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করে এদেশে থাকতে হবে, কোনো কিছুই দাবী করা চলবে না, কোনো অধিকার রাখা চলবে না, পক্ষপাতমূলক ব্যবহার তো দূরে

থাক—নাগরিকত্বের অধিকার পর্যন্ত নয়। এই দেশে হিন্দুরাই প্রকৃত জাতি, এবং মুসলিম ও অন্যান্যরা, দেশদ্রোহী যদি নাও হয়, অন্তত জাতি-বহির্ভূত।”

২৯। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, এম এ. জিন্না, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ৬৯-৭৩, ৭৭, ৮৮, ৯১-৯২, ১৫২-৫৩, ১৮৫-৮৬, ২৪৫-৪৬। আরো দেখুন, গোইয়ার ও আপ্পাদোরাই, ‘স্পীচেস্ অ্যাণ্ড ডকুমেণ্টস্ ’ খণ্ড ২, পৃঃ ৬২০-২১। একই অনুভূতির আরো বিষময়, জনপ্রিয় সুরের প্রকাশের জন্য দেখুন, ডব্লু. সি স্মিথ, ‘মডার্ণ ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া’, পৃঃ ২৯৬-৯৮।

৩০। এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় দেখুন।

৩১। ১৯৪৭-এর পর ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাশিবাদের একটি দুর্বলতা হল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও আন্দোলনে যুক্তিবর্জিত ধারার তুলনামূলক অনুপস্থিতি, যার দরুন সাম্প্রদায়িক প্রচার জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের মূলস্রোতের বিপরীতে যায়। ১৯৪৭-এর পূর্ববর্তী মুসলিম লীগ ও উলেমার কাছ থেকে পাকিস্তানের (ও পরে বাংলাদেশের) নতুন রাষ্ট্র বুদ্ধিবৃত্তি ও মতাদর্শগত যে ঐতিহ্য পেয়েছে তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম নয়। সুতরাং, এই দুটি দেশেই সাম্প্রদায়িকতা ও একনায়কতন্ত্র সহজে সাফল্যলাভ করতে পেরেছে।

৩২। পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৯১। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি উদাহরণ ১৯৪০ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে জিন্নার ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে: “শ্রীযুক্ত গান্ধী কেন এটা গর্ব করে বলবেন না, ‘আমি হিন্দু, কংগ্রেসের পেছনে হিন্দুদের দৃঢ় সমর্থন রয়েছে’? আমি মুসলমান এটা বলতে আমি লজ্জা পাই না। মুসলমানদের উৎখাত করার জন্য ব্রিটিশদের বাধ্য করতে এত চেষ্টা কেন?…একজন হিন্দু নেতা হিসাবে আপনাদের জনগণের গর্বিত প্রতিনিধি হয়ে এসে, আমাকে গর্বের সঙ্গে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে দিলেই তো হয়?” পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ১৫২-৫৩। আরো দেখুন, ডি. আর. গোয়েল, ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ’ পৃঃ ৫০।

৩৩। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক চিন্তা সম্বলিত কোনো লেখাই লেখেনি, যা ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয়তাবাদী উদারপন্থী, সমাজবাদী বা এমন কি সমসাময়িক রক্ষণশীলরাও করেছিল।

৩৪। কংগ্রেস নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী দিয়ে মোকাবিলা করেছিল, কিন্তু তাদের কৌশলকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তার ফলে প্রতি পদে তারা ঠকে গিয়েছিল। ঠিক যা দরকার ছিল তা হল সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের কৌশলের বিরুদ্ধে যথাযথ কৌশলগত আত্মরক্ষা। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এবং বিশেষত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিদের এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

৩৫। বস্তুত, এই যুক্তিহীনতা, তাদের যা প্রকাশিত কাগজপত্র পাওয়া যায়, তা থেকে তাদের রাজনীতি, মতাদর্শ বা সংগঠনকে বিশ্লেষণ করা বা বোঝা কঠিন করে তোলে। হিন্দু সংস্কৃতি ও জাতির তারা যে সংজ্ঞা দিয়েছিল, তার জন্য দেখুন ভি ডি. সাভারকারের ‘হিন্দুত্ব’ ও এম এস গোলওয়াকারের ‘উই’।

৩৬। এম. এ. জিন্না, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ২৬৯-৭০।

৩৭। গান্ধীর প্রতি জিন্না, ৩ মার্চ ১৯৩৮, ‘ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার’, ১৯৩৮, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬১; নেহরুর প্রতি জিন্না, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯, জওহরলাল নেহরু, ‘আ বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স’ পৃঃ ৪০৪; এম. এ জিন্না, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ১০৮; এম নোমান, ‘মুসলিম ইণ্ডিয়া’, পৃঃ ৩৬১; ডব্লু. সি. স্মিথ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৮৬। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটা কারণ ছিল যে সব পুরোনো সাম্প্রদায়িক দাবীই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় মেনে নেওয়া হয়েছিল বা কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল। নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবে, লীগ এখন এমন সব দাবী

তুললো যা স্পষ্টতই ছিল ছোটোখাটো, এবং কংগ্রেস যা সহজেই মেনে নেবে। অতঃপর সব দাবীর সঙ্গেই ওপরে আলোচিত লেজটি জুড়ে দেওয়া হতো, অথবা অনেক সময় সব দাবীকেই এই একটি দাবীতে এনে ফেলা হতো। চৌধুরী খালিকুজ্জামান, 'পাথওয়ে টু পাকিস্তান', পৃঃ ১৭৮ ও ১৯২ ; অশোক মেহতা ও অচ্যুত পটবর্ধন, 'দ্য কমিউনাল ট্রাই-অ্যাঙ্গল ইন ইণ্ডিয়া', পৃঃ ১৯৯।

৩৮। 'ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড', পৃঃ ১৫৩।

৩৯। এর সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ফলাফল মারাত্মক হতো ; স্বাধীন ভারত হতো পাকিস্তানের একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতিরূপ, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়।

৪০। ডব্লু সি স্মিথ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৯৫।

৪১। এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় দেখুন।

৪২। এম এস গোলওয়ালকার, 'উই', পৃঃ ২০, ৫২, ৬৮, ৭০-৭৩, ও 'বাঞ্চ অফ থটস্' পৃঃ ১৪৯-৫২, সাভারকার, 'হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন', পৃঃ ২৮, ১২৫, ২৬০, ২৮০, ও 'হিন্দু সংগঠন', পৃঃ ২০৫, ২১২ ; ইন্দ্রপ্রকাশ, 'এ রিভিউ...', পৃঃ xviii, xx-xxi-তে, এ. মেহতা ও এ. পটবর্ধন, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৫৫-তে উদ্ধৃত ; ভাই পরমানন্দ, দ্য ট্রিবিউন, ২৭ জুন ১৯৩৬, ইন্দ্রপ্রকাশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ xxi-xxii, xxx, xxxiv, xxxxv-এ ; বি. এস. মুনজে, ইন্দ্রপ্রকাশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ vi., ১০৭, ২০৯-এ, এবং মুশিরুল হাসান, "কমিউন্যাল অ্যাণ্ড রিভাইভ্যালিস্ট ট্রেণ্ডস্ ইন কংগ্রেস", পৃঃ ২০৯-এ উদ্ধৃত।

৪৩। জিন্না, পূর্বোল্লিখিত খণ্ড ১, পৃঃ ৭২-৭৩, ৭৭, ৮৮, ৯১-৯২, ১২২-২৩, ১৩৯, ১৪১, ১৫২-৫৩, ১৮৫-৮৬, ২০৪-০৫, ও তারপর ; জেড. এ. সুলেরি, 'মাই লীডার', পৃঃ ১২, ৩৮, ৪২, ৫২-৫৭, ৫৫-৫৬, ১৯৩। আরো দেখুন, এস গোপাল, 'জওহরলাল নেহরু—আ বায়োগ্রাফি', খণ্ড ১, পৃঃ ২৩৮ ; রাম গোপাল, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৫৭-৫৮ ; ডব্লু সি স্মিথ পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ২৮২, ২৮৫-৮৬। জিন্নার মাপের একজন নেতা মুখে গোয়েবলস্ এর মতো মিথ্যাভাষণে, কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১৯৪০-এর মার্চ মাসে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন : 'তারা (কংগ্রেসের নেতারা) চায়না যে ব্রিটিশ সরকার চলে যাক, তারা শুধু চায় তাকে চাপ দিয়ে এমন কিছু একটা আদায় করে নিতে, যার দ্বারা তারা ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় থেকে মুসলিমদের ওপর আধিপত্য চালাতে পারবে।" পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ১৪১। অথবা, "শ্রীযুক্ত গান্ধীর আশা যে মুসলিমদের হিন্দুরাজের অধীনস্থ প্রজা করে রাখা যাবে" ; 'তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি কংগ্রেসকে হিন্দু পুনরুত্থানের হাতিয়ারে পরিণত করার জন্য দায়ী। তার আদর্শ হলো এদেশে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ ও হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠা।" ঐ, পৃঃ ১৩৯ ও ৭৩, যথাক্রমে। অন্য মুসলিম ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারাও এব্যাপারে এর থেকে খারাপ বই ভালো ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের কেউই জিন্নার মাপের ছিলেননা। এবং এই পর্যায়ের সাম্প্রদায়িকতার ফ্যাসিস্ট চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে এটা দেখলে যে তিনিও এই স্তরে রাজনীতিতে ও আন্দোলনে নেমেছিলেন।

৪৪। জিন্না, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ১, পৃঃ ১৮৫ ; জেড এ সুলেরি, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৩ ; ডব্লু সি স্মিথ পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩০০, আবিদ হুসেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১১২-১৩ ; কে. বি. সঈদ ও অন্যান্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের পাদটিকা ১৫।

৪৫। ভি ডি. সাভারকার, 'হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন', পৃঃ ২৮৬ ; এম. এস গোলওয়ালকার, 'বাঞ্চ অফ থটস্', পৃঃ ১৪৯।

৪৬। এফ. কে খান দুরানী, 'দ্য মীনিং অফ পাকিস্তান', পৃঃ ১৯৭ ; আল হামজা, 'পাকিস্তান

আ নেশন', চতুর্দশ অধ্যায়। শেষোক্ত বইতে "হিন্দুস্থানী পশ্চাদ্‌ভূমির"-র সমগ্র জনগণকেই বাণিয়া বলা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "ভারতে দশ কোটির ওপর বানিয়া রয়েছে", এবং তাদের "দেশ" হলো হিন্দুস্থান (পৃঃ ১২০)। আরো দেখুন ডব্লু. সি. স্মিথ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৮৮।

৪৭। ভি ডি. সাভারকার, হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, পৃঃ ১৪২।

৪৮। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, ডব্লু. সি. স্মিথ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৯৫-৯৯ ; এস. গোপাল, 'জওহরলাল নেহরু—আ বায়োগ্রাফি', খণ্ড ১, পৃঃ ২৩৯ ; 'পিরপুর কমিটি রিপোর্ট' ও 'ইট শ্যাল নেভার হ্যাপেন আগেইন'। বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বশীল পদের অধিকারী ফজলুল হক লীগের ১৯৩৮ সালের অধিবেশনে বলেছিলেন: "কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে দাঙ্গায় গ্রামাঞ্চল ছারখার হয়ে গেছে। মুসলিমদের জীবন, অঙ্গ ও সম্পত্তিহানি হয়েছে এবং রক্ত বয়ে গেছে অবাধে।···সেখানে মুসলিমরা জীবন কাটাচ্ছে সন্ত্রাসের মধ্যে, হিন্দুদের দ্বারা উৎপীড়িত, অত্যাচারিত হয়ে। সেখানে মসজিদগুলির পবিত্রতা নষ্ট করা হচ্ছে এবং অপরাধীদের কখনোই ধরা যাচ্ছে না, মুসলিম পূজার্থীদের নির্যাতনও বন্ধ হচ্ছে না···।" রামগোপাল, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৫৮-তে উদ্ধৃত। এই প্রচারে যে সামান্য সত্য রয়েছে তা হলো, অনেক কংগ্রেসকর্মীর কাজকর্ম ও মতাদর্শের মধ্যে হিন্দুয়ানার ছাপ ছিল। তাকেই লীগের প্রচারে অসম্ভব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা হতো। এই হিন্দুয়ানার ব্যাপারে পঞ্চম অধ্যায় দেখুন।

৪৯। অষ্টম অধ্যায় দেখুন।

৫০। এম. এস গোলওয়ালকার, 'উই' পৃঃ ৪০-১ ও ৪৩।

৫১। ডব্লু. সি স্মিথ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২১৯-এ উদ্ধৃত।

৫২। ঐ, উদ্ধৃত।

৫৩। জওহরলাল নেহরু, 'নেহরু, দ্য ফার্স্ট সিক্সটি ইয়ার্স', খণ্ড ২, পৃঃ ৩৪৪-৪৫-এ উদ্ধৃত, ডব্লু. সি. স্মিথ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৮০ ও তারপর।

৫৪। এস. ওয়াজির হাসান, যিনি উদারপন্থী পর্যায়ে লীগের একজন প্রথম সারির নেতা ও ১৯৩৬ সালে তার সভাপতি ছিলেন, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮-এ নেহরুকে লিখেছিলেন যে "কেবল মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যেই নয়, মুসলমানদের নিজেদের ভেতরেও, বিকৃতি, মিথ্যা এবং ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার শুরু হয়েছিল গত অক্টোবরে মুসলীম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ থেকে। দিনে দিনে সংখ্যালঘুদের অধিকারের মুখোশের আড়ালে সত্যের আলাপ ও ধর্মীয় বিদ্বেষ আরো বেড়েই চলেছে।" জওহরলাল নেহরু, "আ বাঞ্চ অফ ও লেটার্স", পৃঃ ২৬৯।